আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ উপলক্ষে প্রকাশিত

রচনাবলী

জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনাবলী

সম্পাদনা

শ্রীমতী রাণী রায়

রামায়ণী প্রকাশ ভবন

২১৬/১, রাজা রামমোহন সরণী

কলিকাতা—৭০০ ০০৯

উৎসর্গ

স্নেহভাজন শ্রীমান প্রবোধকুমার সান্যাল,

কল্যাণীয়া শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী

এবং

বিশেষ শ্রদ্ধা ও স্নেহের পাত্রী, কবি ও সুলেখিকা

অধ্যাপিকা শ্রীমতী কল্যাণী দত্ত

ও

অধ্যাপিকা শ্রীমতী মহাশ্বেতা দেবীকে সাদর

আশীর্বাদসহ দিলাম।

আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ রাজ্যস্তর সমিতির প্রকাশনা উপসমিতি

কমলা দাসগুপ্ত

অশোকা গুপ্ত

কল্যাণী প্রামাণিক

মঞ্জুশ্রী সিংহ

বাণী রায় (আহ্বায়িকা)

রচনাকাল ও সূচী

ছোট গল্প

জীবনী ও সাহিত্যকৃতি

বাংলা সাহিত্যের বর্ষীয়সী মহিলা-সাহিত্যিকদের মধ্যে যে দু'-একজন সৌভাগ্যবশতঃ এখনও জীবিত আছেন, তাঁদের মধ্যে জ্যোতির্ময়ী দেবীর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। মোটামুটি হিসাবে বলা যায় যে, প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল ধরে তিনি অনলস সাহিত্য সাধনা করে চলেছেন। কিন্তু তাঁরা যে যুগের মানুষ, সেই যুগধর্ম অনুযায়ী, খ্যাতির মোহ তাঁকে মোহগ্রস্ত করেনি। সেই কালে সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁর যতটা খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি লাভ করবার কথা ছিল, প্রচার বিমুখ মনোভাবের জন্য, প্রথম যুগে তার প্রায় কিছুই তিনি পান নি। সাহিত্যিক হিসাবে নাম বা যশ লাভের আকাঙ্ক্ষায় তিনি লেখনী ধারণ করেন নি; জীবনকে গভীরভাবে দেখবার সূক্ষ্মদৃষ্টি তাঁর ছিল। তাই তাকে সহজ সুন্দর ভাষায়, গল্প-উপন্যাসের আকারে প্রকাশ করার দুর্লভ ক্ষমতার পরিচয় তিনি দিয়েছেন।

তাঁদের যুগে বাইরের জগৎ ও অন্তঃপুরের জগতে ছিল এক বিরাট ব্যবধান। অথচ পর্দার আড়ালে বসে রচিত হলেও, সে সাহিত্য রস-সন্ধানী পাঠকের দৃষ্টি ও মনকে সহজেই আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল। অবশ্য সময়ের হিসাবে, তাঁর রচনার সংখ্যা বা পরিমাণ বিচার করলে মনে হবে, গ্রন্থ সংখ্যা খুব বেশি নয়। কিন্তু সংখ্যা বা রচনার পরিমাণ দেখে কোনদিনই সাহিত্য প্রতিভার বিচার হয় নি, হবেও না। সে যুগে মহিলাদের পক্ষে সাহিত্যচর্চা করার অনুকূল পরিবেশ থাকা তো দূরের কথা, একে রীতিমতো অন্যায় বা অমার্জনীয় অপরাধ বলে গণ্য করা হতো। জ্যোতির্ময়ী দেবী কিন্তু এই যুগেরই একজন নির্ভীক লেখিকা। তাঁর রচিত সাহিত্য পড়বার আগে, তাঁর জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়টি জানা প্রয়োজন।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী (বাংলা ১৩০০ সালের ৯ই মাঘ),—এক সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত বাঙালী পরিবারে জ্যোতির্ময়ী দেবী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মস্থানটি হল সুদূর মরুপ্রান্তরের দেশ রাজস্থানের জয়পুর। দেশ নাটাগড় গ্রাম চব্বিশপরগণা।

জন্ম ও বংশ-পরিচয়

তাঁর পিতামহ ছিলেন, জয়পুর ষ্টেটের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী সংসারচন্দ্র সেন। তাঁর পিতা অবিনাশচন্দ্র সেন ছিলেন এই জয়পুর ষ্টেটেরই অন্যতম মন্ত্রী। মহারাজা সওয়াই মাধবসিংহের 'হিন্দুমতে বিলাত যাত্রা'র সময়, তাঁর একান্ত সচিব বা প্রাইভেট সেক্রেটারী রূপে ইনি বিলাতে গিয়েছিলেন। জ্যোতির্ময়ী দেবীর মায়ের নাম সরলাদেবী। মাতামহের বাসস্থান কলিকাতা, দেশ হুগলী জেলায় সোমড়া গ্রাম।

তাঁর ছেলেবেলার মধুমাখা দিনগুলি অধিকাংশই অতিবাহিত হয়েছিল রাজস্থান ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে। যে স্থানটির সঙ্গে তাঁর নাড়ীর যোগ ছিল তাকেই তিনি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নানা ভাবে দেখিয়েছেন তাঁর গল্প-কাহিনী ও অন্যান্য রচনার মধ্যে।

তখনকার দিনে গতানুগতিক রীতিতে স্কুল-কলেজে শিক্ষালাভের সুযোগ, মেয়েদের ভাগ্যে তেমন সুলভ ছিল না। নিজেই তিনি বর্ণনা করেছেন তাঁদের শিক্ষা ব্যবস্থার কথা "রাজা ও রাণীর যুগ" নামক গ্রন্থটিতে। বলেছেন "যাই হোক মেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষালয় বা স্কুল থাকা সত্ত্বেও আমরা জন্মে স্কুলের মুখ দেখিনি সেকালের প্রথা মতো। এবং স্কুলগুলিতে 'রইস' বা 'ঘরানা' ঘরের রাজপুত ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-বাঙালী কারুর মেয়েই পড়তে যেত না। নিন্দার ভয়ে বা লোকাচার অনুসারে যে কারণেই হোক। দেশের অন্য সকলে কি করতেন জানি না, মনে হয় বেশীর ভাগই নিরক্ষর থেকে যেত। আমরা বাঙালী মেয়েরা ঘরোয়া পণ্ডিতজী ও মাষ্টার-মশাইয়ের কাছে সামান্য হিন্দী ও বাংলা খান চার-পাঁচ বইয়ের প্রথম ভাগ থেকে বোধোদয় অবধি 'বিদ্যাসাগরী' প্রথম পাঠের শিক্ষা পেয়েছিলাম পাঁচ থেকে দশ-এগার বছর অবধি। অর্থাৎ বিয়ে না হওয়া অবধি। পাঁচ-ছয়টি বছরেই শিক্ষা সমাপ্ত হত আমাদের মাষ্টারের কাছে। পরবর্তী কালে কিন্তু নিজের আগ্রহ ও চেষ্টায় শিক্ষার অভাবটুকু ইনি পূরণ করেছিলেন। কারণ একান্নবর্তী অভিজাত পরিবারের ছেলেদের উচ্চশিক্ষা লাভের যথেষ্ট সুবিধা ছিল। সেই সঙ্গে পরিবারের উৎসাহী মেয়েদেরও পড়াশুনা চলত। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার

শিক্ষালাভ

করেছিলেন তিনি। ফলে বাংলা ইংরেজী গল্প-উপন্যাস, কবিতা, নাটক থেকে আরম্ভ করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা দিকও তিনি জেনে ছিলেন নিজের চেষ্টায়। বাংলার বাইরে পিতার কর্মস্থল ছিল বলেই, বৃহত্তর ভারতীয় জীবনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, বাস্তব সত্যের ক্ষীণ কাঠামোর উপর গড়ে উঠেছে তাঁর বহু গল্প-উপন্যাসের কাহিনী।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে (বাংলা ১৩১১ সনের আষাঢ়) মাত্র দশ বছর ছয় মাস বয়সে কিরণচন্দ্র সেনের সহিত তাঁর বিবাহ হয়। শ্বশুরালয় ছিল গুপ্তি পাড়ায়। কিন্তু

বিবাহ ও বৈধব্য

দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনের সুখ তাঁর ভাগ্যে ছিল না। মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে তাঁর বৈধব্য ঘটে। চারটি কন্যা ও দুটি পুত্র, এই ছয়টি সন্তানকে ভাল ভাবে মানুষ করে তোলাই ছিল, সেদিন তাঁর জীবনের অন্যতম আশা বা সাধনা।

যুগ পরিবেশকে তো মানুষ সহজে অস্বীকার করতে পারে না। তাই সে যুগের সংকীর্ণ পরিবেশে, নারী যে অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছিল—তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে জ্যোতির্ময়ী দেবীকে বিশেষ ভাবে সচেষ্ট হতে হয়। সে প্রগতি বিরোধী পরিবেশে, নারী জীবনে—'অধিকারবাদ,' 'অধিকারবোধ' ও 'অধিকার প্রতিষ্ঠা'—এই তিনটি কথাকে সত্যে পরিণত করতে গিয়ে, কত যে সংগ্রাম করতে হয়েছে তাঁকে, সেই বোধটুকু তিনি যথাযথ ভাবে ফুটিয়ে তুলবার প্রয়াস পেয়েছেন তাঁর বিভিন্ন রচনায়। প্রথম এদেশের অবহেলিত লাঞ্ছিত-বঞ্চিত নারীদের সামনে অধিকারবাদের কথা ঘোষণা করেছিলেন, প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর নারী জাগৃতির ফলে বঙ্গনারীর মনে জেগে উঠল অধিকারবোধ এবং বহুদিনের সমবেত চেষ্টায় নারীর সেই অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হল।

সে যুগের পত্রিকা সম্পাদকরা লেখককে না চিনুন, লেখাকে চিনতেন।

সাহিত্যচর্চা

প্রবাসীর প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের একটি উক্তি "লেখা চিনি, লেখক চিনি না" আজও তাঁর মনে গাঁথা হয়ে আছে।

১৯২২ খৃষ্টাব্দ থেকে তাঁর কিছু কিছু লেখা প্রকাশিত হবার পর, বহু পত্রিকা থেকেই তাঁকে নিয়মিত ভাবে লিখবার জন্য, বিভিন্ন সম্পাদক-সম্পাদিকারা আমন্ত্রণ জানালেন। এইভাবে সে যুগের ছোট বড় পত্রিকায় তাঁর অনেক রচনা প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম জীবনে কবিতাই রচনা করেছেন বেশী। পরবর্তীকালে

কথা-সাহিত্য রচনাতে মনোনিবেশ করেন। প্রধানতঃ যে সব পত্রিকা তাঁর লেখা প্রকাশ করেছেন, সেগুলি হল প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বিচিত্রা, স্বদেশ, বিজলী, জয়শ্রী, নবযুগ, উদ্বোধন, শনিবারের চিঠি, মেয়েদের কথা, মহিলা, মহিলামহল, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি।

সে সময়কার অন্যান্য অনেক মহিলা লেখিকার মতো, প্রথম স্বনামে গ্রন্থ প্রকাশ করার ভরসা বোধহয় তাঁরও ছিল না। তাই 'সুমিত্রাদেবী' এই ছদ্মনাম নিয়ে প্রথম উপন্যাস 'সোনার কাঠি রূপার কাঠি' ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে লীলা রায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'জয়শ্রী' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করেন। পরে ১৩৪১ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় তার নাম হয় 'ছায়াপথ'।

'ছায়াপথ' ও অন্যান্য অনেক উপন্যাস এবং গল্পের মধ্যে তিনি প্রখর ব্যক্তিত্বপূর্ণ আত্মসচেতন নারীর চিত্র ও চরিত্র অনায়াসে ফুটিয়ে তুলেছেন যা তখনকার রচিত উপন্যাস ও গল্পে দুর্লভ ছিল বলা চলে। 'ছায়াপথে'র নায়িকা সুপ্রিয়া, জীবনে নানা দুঃখ কষ্ট ও দুরূহ পরীক্ষার মধ্য দিয়ে প্রেমতত্ত্বের চিরন্তন অভিজ্ঞতা লাভ করল, যার ফলে মনে হল, বিভাস তার কাছে অপরূপ।

পরবর্তী উপন্যাস 'বৈশাখের নিরুদ্দেশমেঘ' ১৩৫৫ সালে আষাঢ় মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এখানে আমরা তাঁর সংসার-অভিজ্ঞ বহুদর্শী মনের গভীর পরিচয় পাই। সে সময়কার তথাকথিত আভিজাত্যের লক্ষণগুলিকে পুংখানুপুংখ ভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন লেখিকা। অহঙ্কার ছাড়া সেখানে আর কিছু নেই—তা সে পদমর্যাদারই হোক, অর্থ সম্পদেরই হোক, আর বংশ পরিচয়েরই হোক, বা নামের জন্যই হোক। অন্তঃসারশূন্য অহঙ্কার সর্বস্ব আভিজাত্যের কোন মূল্যই যে নেই, নীতিশের শোচনায় আত্মদানের করুণ পরিণতির মধ্য দিয়ে সেটিকে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী করে তুলেছেন লেখিকা।

'মনের অগোচরে' উপন্যাসটির প্রথম তিনটি অংশ, ছোট গল্পের আকারে 'বিশাখা', 'ললিতা সখী' ও 'যশোধরা' নামে 'শ্রীহর্ষ' পত্রিকায় বেরিয়েছিল। পরে অন্য দুটি অংশ 'গোবিন্দ' ও 'নারায়ণ' 'বেণু ও চন্দ্র'—'উত্তরা' মাসিকপত্রে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল ১৩৫৯ সালের বৈশাখ মাসে। এখানে একই পরিবারের পিতা-মাতা, পুত্র-পুত্রী ও পৌত্র-পৌত্রীকে নিয়ে লেখা—তাদের মানসিক বিবর্তন ও বিপর্যয়ের কাহিনী। যে অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে লেখিকা অন্তরের অন্তস্তলের রহস্যগুলিকে উদ্‌ঘাটিত করেছেন, সেখানে রয়ে গেছে—তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি ও লাবণ্যময় ভাষা প্রয়োগের পরিচয়।

এগুলি ছাড়াও রয়েছে তাঁর অন্যান্য উপন্যাস 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা,' 'আম্নাকালীর ঝাঁপি', 'পিঁজরাপোল' ইত্যাদি।

বাংলা সাহিত্যের ছোট গল্পের ভাণ্ডার, আজ বাঙালীর গর্বের বস্তু। শরতোত্তর যুগের সাহিত্যিকরা বাংলা ও বাঙালীর জীবনকে কত বিচিত্র ভাবে ও রূপে ছোটগল্পের আয়নায় প্রতিফলিত করে দেখিয়েছেন, তার ইয়ত্তা নেই। আজও ছোট গল্পের মধ্যে দিয়ে চলেছে লেখকদের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা। তবে সাম্প্রতিক কালের ছোট গল্পে আঙ্গিক বা টেক্‌নিক নিয়ে যে, নিত্যনূতন পরিবর্তন ঘটাবার সচেতন প্রয়াস দেখা যায়,—সে যুগে তা ছিলনা।

যে সব মহিলা সাহিত্যিক ছোটগল্প রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে জ্যোতির্ময়ী দেবীর নাম উজ্জ্বল হয়ে আছে। এ পর্যন্ত তাঁর যে গল্প-সংকলনগুলি প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলি হল—'রাজযোটক' (১৩৪৮, বৈশাখ), 'আরাবল্লীর আড়ালে' (১৩৬২, আষাঢ), 'বাগুমস্টারের মা' , বৈশাখ), 'আরাবল্লীর কাহিনী' বৈশাখ) ও 'সোনা নয় রূপা নয়' , আশ্বিন)। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার পাতাতেও বহু গল্প ছড়িয়ে আছে।

গতানুগতিক বিষয় নিয়ে গল্প বা উপন্যাস লিখবার প্রবণতা জ্যোতির্ময়ী দেবীর নেই। অবরোধ বা পর্দার আড়ালের জীবনকে যথাযথ ভাবে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন লেখিকা। খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ ভাবে জেনে ছিলেন, দেখেছিলেন ও অনুভব করেছিলেন এই জীবনকে। শুধু বঙ্গদেশের নয়,—সুদূর রাজস্থান অঞ্চলের ও পাঞ্জাবের অভিজাত ও গ্রাম্য জীবনের কাহিনী ও চিত্র ফুটে উঠেছে অনেক গল্পে। সেই সঙ্গে রয়েছে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও বুদ্ধি-বৈদগ্ধ্যের পরিচয়।

জ্যোতির্ময়ী দেবীর লেখা প্রায় শতাধিক গল্পের মধ্যে, রাজস্থানের রাজ অন্তঃপুরকে কেন্দ্র করে যে গল্পগুলি রচিত হয়েছে—বাংলা সাহিত্যে তার তুলনা মেলা ভার। এগুলি পড়বার সময় মনে হয় যেন, আমাদের সামনে কোন এক অজানা রহস্যলোকের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' উপন্যাসে অবশ্য আমরা মোগল ও রাজপুত হারেমের চিত্র পাই। কিন্তু সে হল তাঁর সমৃদ্ধ কল্পনালোকের সঙ্গে গ্রন্থবর্ণিত সত্য তথ্যের সংমিশ্রণে রচিত। আর এখানে আমরা দেখি লেখিকা তাঁর নিজের চোখে দেখা জগতের কথাই ফুটিয়ে তুলেছেন। 'রাজা ও রাণীর যুগ' গ্রন্থ থেকে তুলে দেওয়া 'মুক্তান্তঃপুর' রচনাটি পড়লেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। রাজপ্রাসাদের অন্তরালের যে জীবনযাত্রা, নানা রীতিনীতি

এবং মানুষ—সযত্নে তাকে এঁকেছেন জ্যোতির্ময়ী দেবী। সে যুগ, সে পরিবেশ ও মানুষ লুপ্ত হয়ে গেলেও অমর হয়ে রইল বাংলা সাহিত্যের আসরে, লেখিকার লেখনীর আলপনায়। এই জাতীয় গল্পের কয়েকটি নিদর্শন এখানেও পাওয়া যাবে।

'সুমেরু রায়' গল্পে আমরা দেখতে পাই, একটি দুরন্ত গ্রাম্য রূপসী তরুণী উম্‌দাবাঈকে। যে শ্বশুর বাড়ির নির্যাতন সইতে না পেরে, দু'রাত্তির পায়ে হেঁটে এসে ভোরবেলা আশ্রয় নিয়ে ছিল পিত্রালয়ের গোয়ালঘরে। এই দুরন্ত বৌকে শায়েস্তা করার জন্য শেষ পর্যন্ত একটি কৌশল অবলম্বন করা হল। পাঠানো হল রাজ বাড়ীতে। তার রূপ দেখে রাজবাড়ীর সকলে যেমন বিস্মিত হল—তেমনি আবার, গ্রাম্য কৃষক বধূ উমদাও কল্পলোকের মতো, রাজপ্রাসাদের ঐশ্বর্য ও আদব-কায়দা দেখে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে রইল একদিন সে হল পর্দায়েত—তখন তার খেতাব হল সুমেরু রায়। জীবনে কিন্তু কোনদিন সে আর প্রাসাদের বাইরের আলো-হাওয়ার মুক্ত জগতে ফিরতে পারল না। সুরক্ষিত মহলে বসে শুধু শুনল—তার বৃদ্ধা মায়ের কথা, স্বামীর কথা, সপত্নী ও পুত্রের কথা—আর মনটা তার নিরুপায় হাহাকার ভরিয়ে দিল।

'শেঠানীজী' গল্পে দেখি একটি নারীকে। বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত একটি নিমন্ত্রণ সে পেল। রাজঅন্তঃপুরের তৃতীয়া রাণী চন্দাবৎজীর মহলের জলসায় দুর্লভ রত্নাভরণে ভূষিতা হয়ে যখন সে গেল—তার রূপ লাবণ্যময় দেহশ্রী রাজার মনকে মোহিত করল। এইভাবে রাজার মনোহরণ লীলায় মেতে উঠে সে রাণীদের ঈর্ষাভাজন হল। অথচ সেই ছলনাময়ী নারীর মনেই জেগে উঠল, চিরন্তন জননী সত্তা—যখন রাজার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল তার সুন্দরী যৌবনবতী কন্যার প্রতি। যুবতী কন্যাকে রাজার হাতে তুলে দিতে পারল না বলেই, রাজার আদেশে খোজার হাতে পাঠানো 'নিয়মিত ওষুধ' সেবনের ফলে চিরবিস্মৃতির তলে তলিয়ে গেল শেঠানীজী।

'আরাবল্লীর আড়ালে' দেখতে পাওয়া যাবে 'ধাপি'কে—যে, অপরূপ রূপ নিয়ে গ্রাম থেকে অজানা পথে রাজপ্রাসাদে এসে হয়েছিল 'গোদাবরী বাঈ'। কিন্তু আবার এক অজানা পথ বেয়ে কোথায় যে সে চলে গেল, যেখানে তাকে সমবেদনা জানাবারও কেউ নেই।

শুধুমাত্র নারী চরিত্র সৃষ্টিতেই যে লেখিকা কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তা নয়। পুরুষ চরিত্রগুলিও তাঁর গল্পের মধ্যে সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। যেমন 'লালাজী সাহেব' এবং 'খুশ্‌নজরজী' গল্প দুটি।

লালজীরা রাজার পুত্র হলেও কিন্তু রাজপুত্রের সম্মান তাঁদের নেই। এঁরা হলেন সেই সব বন্দিনীদের সন্তান, যাঁরা সখি বা সহচরী থেকে, সঙ্গিনী বা প্রেয়সীর পর্যায়ে পৌছান্।

সমাজে তাঁদের কোন পরিচয় যে স্বীকৃত নয়, সেটি প্রথম জানতে পারলেন সমর সিং যেদিন পিতার নিকটে বসে থাকলেও, রেসিডেন্ট সাহেব তাকে দেখেও দেখলেন না। তারপর অনেক বছর কেটে গেল। সমর সিং ক্রমে ক্রমে পুত্র-কন্যা-পরিবার এবং বংশানুক্রমিক ধন-ঐশ্বর্য-রূপসী নারী ও নৃত্যগীতময় স্থূল ভোগের বন্যায় নিজেকে ভাসিয়ে দিলেন। অথচ তাঁরই কনিষ্ঠ পুত্র সমুদ্র সিং এই অসম্মানকে সইতে না পেরে, ইংরেজী শিক্ষাদীক্ষা গ্রহণ করে, সামান্য পদাতিক সৈন্যের কর্ম গ্রহণ করল। কারণ আজীবন রাজপুত দাসীপুত্র হয়ে থাকার চেয়ে, এই সামান্য জীবন ও স্বাধীন জীবনই তার কাছে শ্রেয়। এই কারণেই সে খাস রাজার ঘর থেকে আসা বিবাহ সম্বন্ধকে উপেক্ষা করে অবিবাহিত থাকার সঙ্কল্পই জীবনে গ্রহণ করল।

'খুশ্‌নজরজী' গল্পে সর্দার খোজার গভীর অন্তর্বেদনাকে রূপ দেওয়া হয়েছে। যে মানুষটির প্রকৃত নাম ছিল 'আলাবক্স, নিজের কর্ম দক্ষতার জন্য, তিনিই হলেন একদিন 'খুশ্‌নজর' বা 'চক্ষু প্রীতকারী' পৌরুষহীন পুরুষ। আজীবন কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও দুঃখ বেদনার বোঝা বয়ে চললেন। কিন্তু মৃত্যুর পর তাঁর নিজের জায়গীর ও ধনদৌলত সব 'রাজে' বাজেয়াপ্ত হবার ভয়ে পোষ্য নিলেন খুদাবক্সকে। তাকে নিজের পদাধিকারী করে গেলেও কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারলেন না খুশ্‌নজরজী গুলস্থরতের ছেলে দুটিকে।

'সেপাই পিসিমা' গল্পে রয়েছে, রাজস্থানের একটি নির্ভীক নারীর গৌরব কাহিনী। দুর্দিনে নিরাপদ আশ্রয় দিয়ে সে রক্ষা করল যৌবনবতী বিধবা ভ্রাতৃবধূ ও তার সন্তানদের। পরে তার পিতৃবংশের সম্পত্তি উদ্ধার করে, পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করল তাদের সুখ ও সম্মান।

'ডাইনী' গল্পের লছমী একটি অসহায় গ্রাম্য বধূ, যাকে অকারণে 'ডাইনী' সন্দেহে নির্যাতন করত শ্বশুর বাড়ীর আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীরা। শিউলালের উদারতায় কিভাবে তার স্বামীর সঙ্গে মিলন ঘটল—আন্তরিক যত্নের সঙ্গে সেই চিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখিকা।

'পুণ্য পরিক্রমা'র সাত-আট বছরের ফুটফুটে সুন্দর মেয়েটি হারিয়ে গেল।

ভুল করে 'দাদী' বলে সম্বোধন করল সে যাকে, ঘটনাচক্রে জানা গেল—সেই বৃদ্ধা হল, তিজাবাঈ-এর সই। এমনি ভাবে সকল উদ্বেগের অবসান ঘটল।

ভারতের প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়, কন্যা সন্তান সকলের কাছে অবাঞ্ছিত। 'বেটিকা বাপ' গল্পে তার কিছুটা নমুনা ফুটে উঠেছে। প্রৌঢ়া পিতামহী নাতির আশায় দিন গুনছেন কিন্তু হল নাতনি। ছ'ছটা নাতনীর মধ্যে পদ্মের মতো সুন্দরী পদ্মিনীকে দেখলে ভূরিবাঈ-এর ভাল লাগে কিন্তু মায়া হয় না। বড ছেলে কুশলসিং শহর থেকে কাজ সেরে ফিরল যখন লাল ঝুমঝুমি হাতে নিয়ে —শুনল পদ্মিনী নেই। দৃঢ বিশ্বাসের সঙ্গেই সে জানিয়ে দিল তার মাকে, ছোট ছেলেমেয়েদের ঘুম পাডাতে আফিং-এর ব্যবহার করতে গিয়ে, ইচ্ছা করেই এবার মাত্রাটা বেশী দিয়েছে সে। রাজপুতের ঘরে ছটি মেয়ের বোঝা কমানোই ছিল তার উদ্দেশ্য। তাই আর ঘুম ভাঙেনি পদ্মিনীর।

কথা সাহিত্যিক হিসাবে জ্যোতির্ময়ী দেবীর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, অসহায় নারীর প্রতি গভীর মমতাবোধ। যে সব গল্পে তাঁর সেই সমবেদনা ও সহানুভূতির চিত্র ফুটে উঠেছে, তার মধ্যে 'সতী' গল্পটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রচনা। একদিন 'সতীদাহ' প্রথা প্রচলিত ছিল।—রামমোহন প্রমুখ মহানুভব মহাপুরুষদের চেষ্টাতেই সে নির্মম বর্বর প্রথার অবসান ঘটেছিল। উনিশ শতকের প্রথম দশকের এমনি একটি সত্য ঘটনাকে অবলম্বন করে গল্পটি লেখা হয়েছে। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায়ের দ্বি-শতবার্ষিকী স্মরণে এটি লেখা হয়।

স্বামীর মৃত্যুর পর তিনজন পত্নীর মধ্যে মধ্যমা অলকমণিকে 'সতী' সাজিয়ে নির্দয়ভাবে পুডিয়ে মারা হল কিভাবে তারই মর্মান্তিক চিত্র পাওয়া যাবে এখানে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় লেখিকার 'একাদশী' গল্পটি। বিদ্যাসাগরের জীবনের প্রধান কাজ ছিল বিধবা বিবাহ প্রবর্তন করা। কারণ, আইনের বলে সতীদাহ বন্ধ হলেও তিল তিল করে দগ্ধ হত কিভাবে সে যুগের বালবিধবারা, তারই চিত্র খুঁজে পাওয়া যাবে এই গল্পে—নির্জলা একাদশীর উপবাস করে শান্তশীলা বা শান্তর শোচনীয় মৃত্যুর মধ্যে।

'কালো মেম' গল্পে পাওয়া যাবে পুরোন কোলকাতার হারিয়ে যাওয়া কয়েকটি চিত্র ও চরিত্রকে। সমাজ যাদের ম্লেচ্ছ বা খৃষ্টান বলে দূরে সরিয়ে রেখেছিল, তাদের গভীর দয়া-দাক্ষিণ্য ও সহানুভূতির স্পর্শে 'কালো মেম'-এর মত অনেক অসহায় অনাথা আশ্রয় পেয়েছে ও অন্ধকার জীবনে আলো দেখেছে।

'জবালা' গল্পের রামাপতিয়া গ্রাম্য মেয়ে, প্লেগ-মহামারীর দিনে বাড়ী ছাড়া

হয়েছিল। এক দুর্যোগের দিনে ননীবাবুর বাড়ীতে সে আশ্রয় পেল 'দাই' বা ঝি হিসাবে। এই রামাপতিয়া যখন প্রাণ দিয়ে সেবা করে বাঁচাল ননীবাবুকে, তখন তার প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতার শেষ রইল না। তারই ছেলে শশীদত্ত—পিতার কাছে যেদিন তার সত্য পরিচয় জানল—তখন মায়ের জন্য তার হৃদয়পাত্রটি বেদনায় পূর্ণ হয়ে উঠল কি না, কে বলতে পারে সে কথা।

'চিরকালিনী' গল্পের 'যুঁই' মনে মনে স্বপ্ন দেখে সুস্থ সুন্দর জীবনের—সংসার-স্বামী-পুত্র ইত্যাদি। এদের কথা সহানুভূতি সহকারে আলোচনা করেছেন লেখিকা—'সমাজের একটি অন্ধকার দিক' বা অন্যান্য অনেক প্রবন্ধের মধ্যে।

আমাদের সমাজে কুমারী মেয়েদের জীবনের নানা সমস্যার চিত্র দেখিয়েছেন লেখিকা অনেক গল্পের মধ্যে। যেমন,—'একটি প্রকাণ্ড হাঁ' গল্পে, নীতির জীবনে অসবর্ণ বিবাহ সম্ভব হল বটে, তবে বড় বিলম্বে।

'অনৃতভাষিণী' গল্পের শতদ্রু—বিমলকে বিয়ে করতে পারল না শেষ পর্যন্ত। কারণ বিমলের বোন সুনীতির লাঞ্ছনা চোখের সামনে দেখবার পর, তার মনে হয়েছে, বিয়ে হয়তো অপেক্ষা করতে পারে—কিন্তু ভালো চাকরী অপেক্ষা করে না।

'যাচ্ ক্র' গল্পের রেবা—শঙ্করকে বিয়ে করে যে স্থানটি দখল করতে পারত, ইচ্ছে করেই তা করল না। বেশ কিছুদিন পরে, ট্রেনে আকস্মিক ভাবে শঙ্করকে সপরিবারে যখন দেখল সে, তখন অনুভব করল সেই স্থানটি আর শূন্য নেই!

'দময়ন্তীর ঠিকানা' গল্পটি হল, দময়ন্তীর করুণ আত্মবলিদানের কাহিনী। মনোমত ঘর-বর-পুত্র সব পেয়েও, সে শান্তিতে সংসার করতে পেল না। কারণ তার শান্তিপূর্ণ জীবনের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল সতীশ।

পণ প্রথাকে আইনের সাহায্যে দূরীভূত করতে চাইলেও পার যাবে কি না সন্দেহ। মানুষের মন থেকে এই কুপ্রবৃত্তিকে বিতাড়িত করা কঠিন। 'কনে দেখা' নিয়ে একাধিক রচনা প্রকাশ করেছেন লেখিকা সাময়িক পত্র ও সংবাদ-পত্রের পৃষ্ঠায়। কন্যাকে পাত্রস্থ করতে গেলে আজও আমাদের ভদ্র সমাজে কিভাবে পণ্যদ্রব্যের মতো দর কষাকষি চলে, তা সকলেরই জানা আছে। 'দর দস্তুর'-এ সেই চির প্রচলিত সমস্যাকেই দেখান হয়েছে—গল্পের মাধ্যমে।

এক সময় যে জননী থাকেন সংসারের মধ্যমণি গৃহিণী, বৃদ্ধ বয়সে তাঁকেই সংসারের আর পাঁচটা অপ্রয়োজনীয় জিনিসের মতো 'বাড়তি' হতে হয়। 'একদা

গৃহিণী'র শেষ জীবনের সেই করুণ দিকটিকে নানাভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখিকা একাধিক গল্প উপন্যাসে। এখানে 'পঞ্চাশোর্ধে' ও 'জননী' গল্প দুটিতে তার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যাবে।

স্বল্প পরিসরে কয়েকটি মাত্র নির্বাচিত গল্পের মধ্য দিয়ে, ছোট গল্পকার রূপে জ্যোতির্ময়ী দেবীর লিপিকুশলতার সামান্য পরিচয় দেবার চেষ্টা করা হয়েছে মাত্র।

বিচিত্র বিষয় নিয়ে বহু সুচিন্তিত প্রবন্ধও ইনি রচনা করেছেন—সাময়িক-পত্র ও সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় তা প্রকাশিত হয়েছে।

'রাজা ও রাণীর যুগ' (১৩৫০, কার্তিক) রচনা গ্রন্থটিতে পাওয়া যায়, রাজোয়ার অধুনালুপ্ত জীবনের নিখুঁত চিত্র। তার উদাহরণ স্বরূপ, এই রচনাবলীতে স্থান পেয়েছে—'শুদ্ধান্তঃপুর'

এ ছাড়া তীর্থ পরিক্রমার কাহিনী লিখেছেন ইনি 'সময় ও স্মৃতি' নামক গ্রন্থে (১৮৬৮ শ্রাবণ)। কারণ ভ্রমণ একদিকে যেমন মানুষকে আনন্দ দান করে, অন্যদিকে জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিকে করে প্রসারিত, সেই সঙ্গে জ্ঞান অর্জনের সুযোগও এনে দেয়।

উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক রূপে সম্মান লাভের সুযোগ জ্যোতির্ময়ীর জীবনে দু' একবার এসেছে। ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে, তাঁর রচনার জন্য 'ভুবনমোহিনী পুরস্কার' প্রদান করেন। ১৯৭২-৭৩-এ ইনি 'সোনা নয় রূপা নয়' ছোট গল্প সংকলনের জন্য 'রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার' লাভ করেন।

বাংলা সাহিত্যে সুযোগ্য মহিলা লেখিকার সংখ্যা খুব বেশি নয়। জ্যোতির্ময়ী দেবীর যোগ্যতা ও দানের তুলনায়, এই সম্মান লাভ যথেষ্ট বলে মনে হয় না। ১৯৭৫-এর "নারীবর্ষ" আজ তাঁকে উপযুক্ত স্বীকৃতি দেবার কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। সেই জন্যই তাঁর রচনাবলীর কিছু অংশ একত্রে বিধৃত করার এই আয়োজন।

মঞ্জুশ্রী সিংহ

ছায়াপথ

এ উপন্যাসটি ইতিপূর্বে কোথাও কোন আকারে প্রকাশিত হয়নি

উৎসর্গ

পরম শ্রদ্ধাস্পদা

শ্রীমতী অনিন্দিতা দেবী (বঙ্গনারী)

করকমলেষু—

ছায়াপথ

[উপন্যাস]

আচার

কুলের আচার, গত বৎসরের আমসত্ত্ব, হাড় তেঁতুল, আমের আচার, জেলী, মোরব্বা ইত্যাদি নানাবিধ শিশুতোষ সিবিক্ত ঠাকুমা রৌদ্রে দিতে দালানে সারি সারি করে সাজাচ্ছিলেন

চারিদিকে শিশি ও হাড়ি-কুঁড়ির সঙ্গে বল বাহুল্য ছেলেরাও ঘিরেছিল। ক্রমশঃ দু একটি বড় ছেলে মেয়েও এসে দাঁড়াল। ঠাকুমা ভাবলেন, ওরা সবাই ও আচার নিতে এসেছে। 'আচ্ছ—ঠাকুমা তোমার ক'বছরে বিয়ে হয়েছিল?'—একটি চতুর্দশী মেয়ে জিজ্ঞাসা করল।

'উঃ—অতবড়টি একলা হ ন, একটু খোকাকেও দে', কাকে বলে পিতামহী প্রশ্নের উত্তরে একটু হাসলেন। তারপরে বললেন, 'আমি বলি বুঝি আচার খেতে এসেছিস। বিয়ের কথা কেনরে?

আর একটি ষোড়শী দাঁড়িয়েছিল, 'বলন ঠাকুমা' এবার দুজনই বল্লে।

'কত আর এই সাত-আট, তোদের মত হাতী হাতী মেয়ে থাক তখনকার রেওয়াজ ছিল না।' আমসত্ত্বগুলি বিস্তৃত করে রোদে দিয়ে ঠাকুমা প্রশ্ন করলেন, 'তোরা নিবি নাকি'?

'আমাকে ঐ তেঁতুলের আচার দাও। আচ্ছা, ঠাকুর্দা তখন কত বড়?'—ষোড়শী মেয়েটি আবার জিজ্ঞাসা করলে।

—'শোনো। ওঁর বয়স নিয়ে কি হবে? যা না—তাঁকেই জিজ্ঞেস করগে না—'

'বলনা, ও ঠাকুমা'—দুই নাতনীতে অনুনয় করতে লাগল।

'উনি তখন তেরো বছরের'। কেন রে এত খোঁজ খবর কিশের? 'সরিৎ বুঝি কিছু জিজ্ঞেস করেছে?'

ষোড়শী মেয়েটি জবাব দিলে, 'না দাদা, কাল বলছিল অত ছোট্টতে বিয়েতে নাকি মানুষ ভালবাসে, ওতো মিছে কথা! তারপর বল্লে, তোরা আবার বড় হলি কবে?—হ্যাঃ তোদের আবার চিঠি—ঐ ইন্দুটা আবার শতিকে চিঠি দেয় রোজ রোজ!—'

শতি ওরফে শতদল অপ্রস্তুত হয়ে উঠেছিল, বল্লে, 'দাদা বল্লে কম্‌লিই তো ছেলে মানুষ, পুতুলের মত বিয়ে'।

ঠাকুমা হাস্‌তে লাগলেন! বাল্যবিবাহ ও তার প্রেমের জলন্ত দৃষ্টান্তের কথা এই বৃদ্ধ বয়সেও বলতে লজ্জা হচ্ছিল হয়ত। কিংবা ইচ্ছা হচ্ছিল না।

'তা বেশ তো!—তার আবার দোষটা কি? —আর তোরা তো বড় হয়েছিস, তাহলেই হোলো!' —বলিয়া তিনি আচারে মনোনিবেশ করিলেন।

'হ্যাঁ,—দাদা বুঝি আমাদের বড় বলে? দিদিকেই ছোট্ট বলে!'—শতদল বল্লে।—

কমলা বল্লে, 'আচ্ছা, ঠাকুমা, ঠাকুর্দা তখন তোমায় চিঠি দিতেন?—কত বড় ছিলেন'?

'হ্যাঁ চিঠি!'—তারপর যা বল্লেন তার গ্রাম্যতাকে বিশুদ্ধ ভাষায় রূপান্তরিত করলে বোঝায়, কিশোর বালক একরাশ ঘুড়ি-সূতো লাটাইসহ ছাদের ওপর কিংবা মাঠে মাঠে নৃত্য করে বেড়াতেন। এবং নিজে তিনি লিখতে পড়তে কিছু তখন জানতেন না।

নাতনীদের দল সবিস্ময়ে পিতামহীর নিরক্ষরতার কাহিনী গলাধঃকরণ করছিল।

বিচার

কমলা-শতদলের দাদার তর্কসভায় সেদিন লোক অনেক; শতদলের স্বামী ইন্দুভূষণ, কমলার স্বামী সরিৎ, তারপর বাড়ীর অন্য ছেলেমেয়েরা ও দু' একটি ঘনিষ্ট পাড়ার ছেলে।

বিশেষ করে আক্রমণ করা হচ্ছিল ঐ দুটি নববিবাহিত দম্পতীকে—সম্পর্কে ও ভগিনীপতি।

তর্কের বিষয় ছিল বিবাহিত প্রেম। বিবাহ, বিবাহিত প্রেম, ভালবাসা, বিরহ, মিলন প্রভৃতি কথা নিয়ে আর তার ব্যাখ্যা নিয়ে তুমুল গবেষণা চলেছিল। সভাস্থ বিবাহিত দু'চার জন অত্যন্ত ক্ষীণ ভাবে প্রতিবাদ করছিল।

কমলাদের দাদা অজিতের অট্টহাসি আর তীক্ষ্ণধার তর্কের অস্ত্রে অপরপক্ষ কাবু হয়ে পড়ছিল।

সরিৎ বল্লেন, 'আচ্ছা হে দেখা যাবে, এক মাঘে তো শীত পালায় না। হোক বিয়েটা'—

'দেখ আগে করি কি না' ?—অজিত বল্লে।

ইন্দু বল্লে, 'তুমি যে সব মিছে বলছ, বিয়ে করে যে ভালবাসাটা হয় সেটা তবে কি ? মানুষ ভালবাসে তো ? না, বাসেই না ? এই যে, আবহমান কাল থেকে কত মানুষ বিয়ে করে, ভালবাসে, তাকে তবে কি বল্‌বে' ?

'আহা তোমরা বুঝবে না। ওহে ওসব অভ্যেস। বিবাহিত প্রেম মানে হচ্ছে, অভ্যেসজনিত সেবা স্বাচ্ছন্দ্য শান্তি যাই হোক, তাতে প্রেমের চিহ্ন নেই। যে উন্মাদনা আকর্ষণ প্রেমের চিহ্ন স্বরূপ বলা যায় সে ওর মধ্যে নেই। তোমাদের প্রেম হ'চ্ছে একটি জিনিষ কিনলাম, সেটিকে যত্ন করে রাখলাম। তাকে ভালবাসা বলে না। ওটা হচ্ছে মায়া মমতা কিংবা যা ইচ্ছে বলতে পার, প্রেম নয়।'

অজিতের একটি বন্ধু টীকা করলে—'আর ভেঙে গেলে দুঃখ হল, আবার ভাল কিন্‌লাম।'

'তোমার প্রেমের আকার-প্রকার তবে কি রকম ব্যাখ্যা করতো শুনি'—সরিৎ বল্লে। মৃদু হেসে অজিত বল্লে, 'তোমরা মনে করছ সব ঠাট্টা, কিন্তু প্রেম হচ্ছে একটা অপূর্ব কিছু, সেটা বোঝবার বলবার ভাষা কবিরাই শুধু বলতে পারেন। আসলে সে হচ্ছে, হারাই হারাই ভয়—'হারাইয়া ফেলি চকিতে'; তার মাঝে বিরহ বিচ্ছেদ সমস্তক্ষণ লুকিয়ে আছে। অর্থাৎ তার ব্যাখ্যা করা শক্ত। তোমাদের মতন নিজস্ব করে, পরে নিশ্চিন্ত মনে ভালবাসা নয়। তুমি খেয়ে দেয়ে আপিসে যাবে, ফিরে এসে জলযোগ করবে, বন্ধুর বাড়ী আড্ডা দেবে, তারপর অবসর মত কমলির সঙ্গে গল্প করবে—কমলি না থাকলে একখানা চিঠি লিখ্‌বে 'আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি'। আর ফেরৎ ডাকে ঐ পনের বছরের মেয়ের একটি আঁকা বাঁকা লেখা সাড়ে তিন পৃষ্ঠা চিঠি যাবে—ঐ একই রিপিটেশন, নয়ত তুমি অবসর মত ভালবাসছ বলে অভিমান। নিশ্চিন্ত হয়ে পড়লে সেখানে ; ভয় নেই, ভাবনা নেই, কল্পনা নেই, কিছু নেই। ওকে আর যা ইচ্ছে বল, প্রেম বোলো না।

প্রেম হচ্ছে, জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।

প্রেম বলে, বিদ্যাপতি কহে কৈছে গোয়াইবি
হরি বিনে দিন রাতিয়া।

প্রেম হচ্ছে, কাছে এলে দুই চোখে কথাভরা আভা
দূরে গেলে, একা বসে মনে মনে ভাবা।

দেখনা, ঐ 'হরি বিনে দিন রাতিয়া' যা শুনলেই নিতান্ত অকবি-অরসিক লোকেরও মনে একটা আসন্ন বিরহের আভাসের বেদনায় দুঃখে মন আচ্ছন্ন হয়ে যায়। প্রেম এই রকম।

ইন্দু মৃদু হাস্যে বল্লে, 'ওতো গেল মেয়েদের তরফের ভালবাসা বর্ণন ; ওতো কবি নারীর-মুখ দিয়ে বলিয়েছেন।'

'আহা ঐ হল। ওর কি আবার মেয়ে পুরুষের ভেদ আছে নাকি?'

সরিৎ বল্লে,—'আচ্ছা, তোমার দেওয়া সংজ্ঞা মেনে নিলাম না হয়। কিন্তু কি করে জানলে আমাদের ঐরকম 'জনম অবধি' 'হিয়া দগদগি 'একা বসে ভাবা' এসব হয় না? কিন্তু যখন বিরহ নেই তখন খামখা বেদনাই বাজবে কেন? 'হিয়া দগদগিই বা হবে কেন?'

—'ঠিকতো।—তাইতো বলছিলাম' অজিত বল্লে। 'ঐ যে পেয়ে গেছ কি না। না,—ও অবসর মত ভালবাসায় আমার বিশ্বাস নেই। ও হবে এমন যে পেলেও পাইনি মনে হবে। এই হ্যাটটি মাথায়, চুরুটটি মুখে, নিয়মিত আপিস, সন্ধ্যাবেলা ফের, হাসিখুশী ও সন্ধ্যে-বেলা বেড়ান, ঘরে খোকা কাঁদছে, খুকি নাচছে, চিরকালের কেনা বৌ তোমার যেন স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করছে। তাকে ভালবাসা বলে না। ওকে বলে কেনা স্বাচ্ছন্দ্যের অভ্যাস, তুষ্টি—'

সরিৎ বল্লে, 'তোমার মত হচ্ছে আপিস যাবেন না। যদি বা যান হ্যাট পরব না, চুরুট খাবেন, অথবা সন্ধ্যে বেলা না ফিরে ঠিক দুপুরে ফিরে অবসরকে অবজ্ঞা করে নিরবসর ভালবাসার গুঞ্জনে দিন কাটাব?'

ইন্দু বল্লে, 'আর খোকাখুকী জাতীয় জীবদের?'—

সরিৎ বল্লে, 'যাই বল ভাই, নিরবসর প্রেমের চর্চা দুদিন চলে হয়ত—তারপর তোমার বোন মাথা খারাপ হয়েছে, বলে তাড়িয়ে দেবে। তোমরাই কোন্ বাড়ীতে ঢুকতে দেবে'?

'তোমরা খালি বাজে বকবে। আমি বলছি কি তোমাদের এই বিয়েটাই হচ্ছে

একটা অপ্রেমের ব্যাপার। খুকিদের মত বয়সের না জানা অচেনা একটি মেয়ে! ওতে আবার প্রেম, তার আবার অবসর নিরবসর ভালবাসা কোথায়? ওতো একটা নিয়মিত প্রথা, অভ্যস্ত জীবন যাত্রা—'

"তা হলে প্রেমটা হচ্ছে তোমার মতে একটা অনভ্যস্ত জীবন'? ইন্দু বল্লে, 'অর্থাৎ—'

বাধা দিয়ে অজিত বল্লে, 'অভ্যস্ততা অতিক্রম করে যে প্রেমকে লাভ করা যায় তাই হচ্ছে যথার্থ প্রেম। নিত্য জীবন যাত্রার মাঝে যে প্রেম সে তো সুখ স্বস্তির অভ্যেস।'

'তার মানে? তা হলে কোথায় তাকে পাওয়া যায়? আর পাওয়ার পরে অত:পর জীবন যাত্রাটাই বা কোথায় থাকবে—বলছ স্থান নেই? তোমার মতে প্রেম সরল সহজ জীবনযাত্রায় থাকে না'?

ইন্দু বল্লে, 'না তোমার ভুল হচ্ছে ওটা অজিতের মতে প্রথমে থাকবে প্রেম, তারপর হবে 'যাত্রা'—অতএব জীবনটাও রাখতে হবে নইলে যাত্রা দেখবে কে? একটু আগে পরে করে আর কি? অজিতের মতে আসল হচ্ছে ঐ প্রেমের 'যাত্রাটি—জীবনের যাত্রা নয়।'

সকলে হাসলে। অজিতও হাসলে, বল্লে, 'তোমরা নিজের বিয়ের victim হয়ে পড়েছ কিনা তাই এসব ঠাট্টা করছ—না বুঝতে পারার মত করছ। আসলে প্রেম জিনিষটা তোমরাও বোঝ না, অন্য অনেকেও বোঝে না, বিবাহিত জীবনে ওকে পাওয়া যায়না। বড় বড় মনস্তত্ত্ববিদ প্রেম সম্বন্ধে এই রকম বলেন; আমাদের দেশের বৈষ্ণব কবির কাব্যে এর প্রমাণ পাবে'।

সরিৎ ঈষৎ হাস্তে বল্লে, 'তা, যা হবার তাতে হয়েই গেছে, এখন না আছে বহু-বিবাহ, না চলে বিবাহ বিচ্ছেদ, আর তোমার ভাষায়—প্রেম না হোক তোমার বোন বেচারার ওপর একটু মায়া মমতা জন্মেছে ওদের আর কোথায় ভাসাব বল। আর চণ্ডীদাসের বিদ্যাপতির রাধাই বা পাই কোথায়? তুমিই এক্সপেরিমেন্ট কর, করে আদর্শ একটা দেখাও। আমাদের না হয় বোকামী হয়ে গেছে, আরও অনেকের দৃষ্টান্ত হবে 'খন।'

অজিত বল্লে, 'তুমি বুঝেও ঠাট্টা করবে। কিন্তু দেখো, তোমাদের মতন অভ্যেসকে আঁকড়ে ধরে চৌদ্দ বছরের খুকীর ভালোবাসাকে আমি ভালবাসা কখনও বলব না।'

ইন্দু বল্লে, 'আচ্ছা যারা আগে ভালবাসে অর্থাৎ তোমার মতে পূর্বরাগের পর

বিয়ে করে, তখন তোমার শাস্ত্রে সে প্রেমটিকে কোন্ জাতের বলা হয়? তখন বুঝি অভ্যেস হয় না?—সেটি কি real না ithereal বস্তু ?'

অজিতের জবাব দেবার আগেই খাবার যায়গায় ডাক পড়ল। গুরুজনেরা অপেক্ষা করছেন।

খ্যাতি

ব্যক্তিত্ব যদি ষ্টাইল হয়, তবে অজিতের তা খানিকটা ছিল, আর তর্কের আসরের ভক্তের সংখ্যাও ক্রমশঃ বাড়তে লাগল। আসলে অজিতের পড়ারও নেশা ছিল, কথা বলারও বিশিষ্ট ভঙ্গী ছিল, তার ওপর আর পাঁচটা সাংসারিক ভাবনার কোনো একটিও না থাকায় যা হয়ে থাকে, বাইরের সমস্যারূপ দুর্ভাবনাগুলি মাথায় খেলে বেড়াত। যেহেতু মাথার ওপর বাপই ছিলেন শুধু নয়, ঠাকুর্দাও ছিলেন—আর্থিক স্বচ্ছলতাও ছিল। প্রতিভা যারা নিয়ে জন্মায়, তাদের অর্থ থাক্ না থাক্ কিছু আসে যায় না, কিন্তু দেখা যায় প্রতিভা যাদের যত্ন-সাপেক্ষ তাদের অবস্থা বেশ স্বচ্ছল না হলে প্রতিভা আসেনা। মোটের ওপর অজিতের ঠাকুমা-ঠাকুর্দা, বাপ-মা, জ্যেঠা-খুড়া ইত্যাদি সবাই ছিলেন। আর সকলেই ছিলেন বেশ সেকেলে ধরনের লোক অর্থাৎ একালের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য শিক্ষাগুলো নিতেন কিন্তু গাঁথুনী ভেঙ্গে ফেলতে চাইতেন না। ফলে অজিত একেবারে বিরুদ্ধ আবহাওয়ায় মানুষ হচ্ছিল। বাড়ীতে অক্ষম, আশ্রিত, বাড়ীর ছেলে সকলের জন্যই আশ্রয়স্থল ছিল কিন্তু একটুকু প্রশ্রয় ছিলনা কারুর জন্যেই, ওর মধ্যে ওর বিশেষ করে।

অজিত মাকে দেখেছে বৌমার মতন, বাবাকে দেখেছে পিতা মাতার ছেলে, জ্যেঠামশাইয়ের ভাই। নিজে পৌত্র কিন্তু আগে পরে বাড়ীতে ছেলেমেয়ের অপ্রতুল নেই। বিশেষ বলে অজিতের শেষে স্থান ছিল না—অথচ অবিশেষ স্থানের অভাব ছিল না মোটে। সেই অবিশেষ যায়গাতে খেলার সঙ্গী ছিল প্রচুর, তাদের সঙ্গে মিলন বিবাদেরও অবসর ছিল অনেক। কেননা বড় পরিবারের কাজের আর লোকের গণ্ডি ছাড়িয়ে মার বা অন্য সব জনেদের এত সময় ছিল না যে, শিশু-সংখ্যাগুলির কথা ভেবে আবার তার ওপরদেরও খোঁজ-খবর রাখেন। তারা নিয়মিত খেতে পায় এবং মায়ের অথবা পিতামহীর আশ্রয়

ছায়ায় শুতে পায়, মাষ্টারদের কাছে পড়তে পায়, কর্তব্যের দিক দিয়ে এই যথেষ্ট।

কাজেই ঐ অবিশেষ অবস্থাতে অজিতের শিশু মন তারপর কিশোর মন অনেকদিন ছেলেমানুষ থাকতে পেরেছিল। সঙ্গী সমবয়সী ছেলে মেয়ের সঙ্গে 'গাছ-পালা' 'ঘাট-পুকুর' 'মাঠ-ময়দান' 'আকাশ-পাতাল' তার অনেকদিন সঙ্গী ছিল। গুরুতর কাজের মধ্যে ছিল পড়া আর তার জন্য মাষ্টার। একসঙ্গে সবকটি বালক-বালিকা পড়তে যেত, একসঙ্গে তার ছুটি ও পড়া তৈরী। এমনি হতে হতে হঠাৎ একদিন জ্যেঠামশাইয়ের চোখে পড়ল, অজিতের স্কুলে পড়বার বয়স হয়েছে। অজিতের বয়স প্রায় বার হল

পুরোনো নিয়মের ব্যতিক্রম হল। কিন্তু সবটা নয়। অজিত বড় হল কিন্তু বিশেষ কেউ হল না।

বিশেষ না হবার সুবিধা কিন্তু অজিত পেলে। অবসর পেল অনেক, আর বই পেল কিছু। এদিকে সঙ্গে সঙ্গে স্কুলের গণ্ডী ছাড়িয়ে কলেজেও এলো, আর বাড়ীর সঙ্গিনী বোনদের-পিসিদের বিয়ে হয়ে গেল।

সমবয়সীদের চেয়ে ছোটদের গেল বিয়ে হয়ে, তারা ভারিক্কি মুরুব্বি হয়ে উঠল ছোট সকলের কাছে, আর বড় বড় বিদ্বান বুদ্ধিমান ভগ্নীপতিরা তাদের বেশ যথোচিত ভাবে বড় মনে করতে লাগলেন। অজিতের কল্পনা এইবার পথ খুঁজে পেল যেন।

যে সব সমস্যা যুগধর্মের নামে স্থান পায়, যেমন সভ্যতার রূপান্তর হয়, সেটাকে প্রায়ই ভাবে তারা, যারা তাকে তার ঝঞ্ঝাটের বাইরে থেকে দেখে। যারা উৎপীড়িত হয় তারা ভাবলেও ভাবতে পারে, কিন্তু প্রকাশ করতে পারে না, আর ভাববার অবসরও বেশী পায় না। অজিতের বাড়ীর বিরুদ্ধ আবহাওয়া সেকেলে একেলে মিশ্র মতামত আর নিজের নিশ্চিন্ত কল্পনার বিলাস খোরাক পেলে তার ঐ বিয়ে, প্রেম বাল্যবিবাহ ইত্যাদি নানা সমস্যায়। চিরকালকার ছোট বলে একপাশে ছেলে হঠাৎ ভগ্নীপতিদের সঙ্গ পেয়ে আর আলোচনা করে তর্ক করে, হঠাৎ বিখ্যাত হয়ে উঠল যেন। পাড়ায় বন্ধু সমাজে মজলিসে মাসিকের প্রবন্ধ আলোচনায় তর্কের আসরে অজিতের বেশ খ্যাতি হল। ছেলে মানুষ বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, বিলিতি পণ্ডিতের মতামত তুলে দেয়, দিশি বিখ্যাত লোকদের অভিমত বলে। ভগ্নীপতিরা কখনো হাসেন কখনো মেনে নেন।

বোনেদের কল্যাণে খ্যাতির সঙ্গে মেয়েদের ভক্তিও কম উঠল না অজিতের।

নিভা, শোভা, সুধা, সুনীতি, বিজয়া, বীণা, সুপ্রিয়া একে একে অনেক মেয়েই রমার বিখ্যাত দাদাকে চিনলে। আর তার বিখ্যাত মতামত জেনে নিলে।

রমা স্কুলে গল্প করে, ছাদে গল্প করে দাদার কথা—তার দাদা বলে যে—বাঙালী মেয়ে আবার সুন্দর? তাদের বুদ্ধি? তাদের আবার ফিগার? মেয়েরা চুপ করে শোনে, কেউ কেউ ভাবে ফিগার কিরে ভাই? কিন্তু জিজ্ঞাসা করে না ভরসা করে।

সে বলে যায়—'রং তোরা কাকে ফরসা বলিস? লেখা পড়া জানা তোরা কাকে বলিস? ঐ চিঠি লিখতে পারাকে? না কথামালা পড়া কে? পরিশেষে দাদা যখন বলে যে, এই শতি-কমলির মত মেয়ের বিয়ে হওয়াই উচিত ছিল না, তায় কমলির একটা মেয়ে হয়েছে।' স্বভাবতঃই কমলা তাতে অপ্রস্তুত হয় যেন একটু। আর রমা হয় লজ্জিত। রমার বয়স পনের হবে, ও বয়সে ওর দিদিদের সব বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। ও ভাবে ওর এখুনি ভাগ্যিস বিয়ে হয় নি, তবু রমা সব গল্প করে না, একটু আধটু করে। আর ঐ বয়সের ছোট ছোট মেয়েরা আর তার চেয়ে বড়রাও অবাক হয়ে শোনে অজিতের মতামত। অজিতের মতানুসারে সব মেয়েরাই না জানে লিখতে, না পারে পড়তে, আবার দেখতেও ভাল নয়,—সুন্দরী তো নয়ই। পাশের বাড়ির হাসি বেশ মোটা সোটা সুন্দর ফর্সা। তার বোন লীলা সব বলে, 'হাঁ ভাই, আচ্ছা', আমাদের খুড়িমার মেয়ে হাসিদি তো বেশ ভাল দেখতে,—না?—ইচ্ছেটা রমার কাছে একটা প্রশংসাপত্র পাওয়া।

রমা ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে, দাদা বলে—রং আমাদের দেশে নেই, সে যদি কাশ্মীর পাঞ্জাব ওদিকে যাস তো দেখতে পাবি।

পাঞ্জাব, কাশ্মীর, দিল্লী, সিমলে তো কালীঘাট কি দক্ষিণেশ্বর নয়, বেচারীরা কে ব গেছে। অজিতের ব্যাখ্যা শুনে সবাই চুপ করে থেকে থেকে একটা মেয়ে হাসিদের খুড়িমার না জ্যেঠিমার মেয়ে সে বলে, 'নেই তো নেই রং। ভাই আর কি কথা, নেই তোদের'।

তারও রং অজিতের মতে তো ফর্সা নয়ই, তবে হয়ত মন্দ নয়, সুশ্রী। রমার বিশেষ বন্ধু সে ছাড়া আর রমার সঙ্গে ওভাবে কথা কেউই কয়না।

থামে বটে আলোচনা। কিন্তু অজিতের [illegible] যায়। মুখে ও কথা বল্লেও সকলের সঙ্গে সেও ভাবে, রমার দাদার কথা।

স্মৃতি
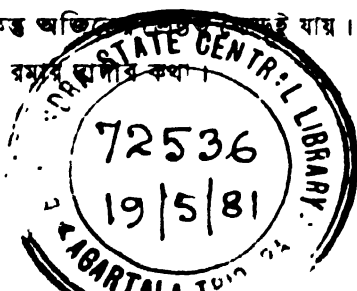
হাসিদের খুড়িমার না জ্যেঠিমার সেই মেয়েটির নাম ছিল সুপ্রিয়া। জ্যাঠতুতো বোন হাসির সঙ্গে মিলিয়ে ডাকনাম ছিল খুসী। রমাদের বাড়ী লাগাও বাড়ী। পরিচয়ের আলাপের অবকাশও প্রচুর ছিল সুতরাং ঘনিষ্ঠতাও ছিল।

ছোট বেলায় অজিতের ছোটভাই অসিত তাকে দেখলে হাসি খুসীর ছবির মতন বিস্ফারিত হাসিতে মুখ ভরিয়ে কোত্থেকে হাসি খুসী বই খানা এনে ধরত তার সামনে। অজিত তখন এত বিখ্যাত বিশিষ্ট ব্যক্তি হয় নি, সেও হাসির সঙ্গে খুসীর কি প্রভেদ—খুসীই বা কাকে বলে, আর কাকে বলে হাসি এই সব বলে হাসি খুসীর ব্যাখ্যা আরম্ভ করতে বসত।

খুসী ওরফে সুপ্রিয়ার মা বাপ ছিলেন, আর একটি ভাই ও দুটি বোন। খুসীর বাপ কাজ করতেন কোন্ এক আফিসে। ছেলেটি ডাক্তারী পড়ছিল। বড় বোন সবার বড়, তার বিয়ে সন্তান সব হয়েছে। সুপ্রিয়াই ছিল সব চেয়ে ছোট।

রমার বন্ধু সূত্রে রমার দাদার ওপর সুপ্রিয়ার যেমন ভক্তি ছিল, তেমনি তাদের বাড়ির গল্পেও রুচি ছিল। রমা তার দাদার গর্ব করে। আর তার বন্ধুরা মুগ্ধও হয়, আর ক্ষুব্ধও হয়। ক্ষুব্ধ, কেননা রমার দাদার মেয়েদের সম্পর্কে মতগুলো শুনতে খুব সুমধুর লাগেন কিন্তু এমন একটা ভাব ধরন ছিল যে তারা মুগ্ধ না হয়েও পারে না।

সুপ্রিয়ার কিন্তু ইচ্ছা হয় প্রায়ই সে রমার দাদাকে এমন কোনো একটা উপায়ে পরাজিত করে, যে ওর অত বেপরোয়া সমালোচনা করার উপায় থাকে না—এমন একটা কিছু হয়,—যেমন খুব একটা বিচ্ছিরী বৌ, নয়ত খুব বোবা মুখ্যু, হাঁদা একটা বৌ হয়—তাহলে দুনিয়ার লোকের ফিগার, রং, রূপ সমস্যা একেবারে থেমে যায়। সুপ্রিয়া মুখে একথা বলতে পারে না, কিন্তু রাগে জ্বলে। অথচ মনে মনে নিজেদের সম্পর্কে রমার দাদার মতামতগুলো শুনতে ইচ্ছাও করে। যেন চানাচুর ঝালছোলা।

সুপ্রিয়া থেকে থেকে একদিন বলে, ভাই তোমার যেন দাদা আর নিজেদের বাড়ীর গল্প ছাড়া পৃথিবীতে আর গল্প নেই। রমা বলে নেই-ই তো। যেন পরিহাস করে বলে,—

রমা সুরটা বুঝেও বোঝেনা। কথার সীমানাই বা কতটুকু! দুজনেই হাসে।

ঘুরে ফিরে সেই অজিতের কথাই এসে পড়ে। অজিতকে বারান্দায় দেখতে গিয়ে রমা বলে, দাদা দেখ, এই খুসী তোমার নিন্দে করছে।

'বাঃ—ওকি ভাই'—সুপ্রিয়া অপ্রস্তুত হয়ে ওঠে। 'এই বল্লি না পৃথিবীতে বুঝি দাদার গল্প ছাড়া-আর গল্প নেই'? দাদা একটু দাঁড়ায়, হাসে, তারপর বলে, 'সুপ্রিয়া তোমার পৃথিবীটা কতবড়'? অজিত আর খুসী বলে ক্ষেপায় না। অজিত হাস্‌তে হাস্‌তে চলে যায়।

সুপ্রিয়ার মা ডাকেন, 'খুসী, ওঁকে জলখাবার দে' সে নীচে নেবে যায়।

'সুপ্রিয়া তোমার পৃথিবীটা কত বড়'? সুপ্রিয়ার কানে যেন লেগে থাকে।

রমার দাদার ওপর রাগ ক্রমশঃ থাকেনা আর।

রমার দাদা তো বেশ লোক। বেশ ভাল।

আচ্ছা উনি কি করে জান্‌লেন, ওর নাম সুপ্রিয়া।

আচ্ছা উনি কি মনে করেন? উনি কি ওদের সমালোচনা করেন? তা বোধহয় করেন না। নিন্দে করা শুনে কি জানি কি ভাবলেন?

জব্দ করার একটা ভাব এক একবার মনে উঁকি ঝুঁকি মারে, আর তার পরই মনে হয়, না, রমার দাদা তো বেশ কথা কন।

কিন্তু কোনখানে যেন কিন্তু জাগে—

সে কিন্তুটা কি বলতে চায়, সুপ্রিয়া বোঝেনা, সব তাতেই মনে হয় শুধু, এতে ওদের কি মত? ওরা ভাল বল্‌বে? ওরা কি নিন্দে করবে? যেন ওদের ভাল মন্দর ওপর সুপ্রিয়ার সব নির্ভর করছে। যাই হোক অজিতের মতামত সুপ্রিয়ার আর তেমন তীব্র মনে হয় না।

সুপ্রিয়াদের বাড়িতে অজিত আসে কখনো কখনো। তার মাকে বলে খুড়িমা।

মার মুখে অজিতের প্রশংসা ধরেনা। ছেলেটি সোনার চাঁদ, অমায়িক কি ভাল ইত্যাদি।

অজিত শুনে হাসে। হঠাৎ একদিন বলে, খুড়িমা সুপ্রিয়া লেখাপড়া তো বেশ করছে—পড়াবেন তো? না বিয়ের সম্বন্ধ করছেন?

মা বললেন, কই বাবা ভাল পাত্র না পেলে আর কি করে বিয়ে দিই। আছে নাকি সন্ধানে তোমার?

'না পাত্র কোথা'? কিন্তু কেন খোসামোদ করে বেড়াবেন, রেখে দিন পড়ুক এখন। এই আমি রমার বিয়ে দিতেও এখনো দিইনি। বেশ মাথা আছে-

পড়াশোনা করুক না। আর ওতো ছোট আছে,'—অজিত সুপ্রিয়ার দিকে চেয়ে একটু হাসে ক্ষেপানোর ভাবে। 'কি বল খুসী ?' রমা আর সুপ্রিয়ার দাদা তারকও হাসে। সুপ্রিয়া অপ্রস্তুত হয়ে যায়, কিন্তু অজিতের কথা বেশ লাগে ওর।

কই উনি নিন্দে তো করেন না বেশী! রমা তো বলে উনি সমালোচনা করেন। তা করুন। কিন্তু সবাইকে করেন কি? আচ্ছা, ওকে একদিন জিজ্ঞাসা করলেন তো এইসব পড়া-শোনার কথা, তারপর কি—কিছুই মনে আসে না, তবু মনে হয় ওদের কি-ওর কি-সুপ্রিয়ার কি-উনি সমালোচন করেন?

এখন সুপ্রিয়া রমার দাদাকে মনে মনে বেশ আরতি করে। রমা এখন দাদার গল্প করলে ও হাসে শুধু, গায়ে মাখে না।

সম্বন্ধ

বাঙালী ঘরের হাজার হাজার ছেলের মতন যথারীতি এম এ. পাশ করল।

আর বাঙালী ঘরের বড় লোকের ছেলের মতনই ছেলে কি করবে, কি না করবে—ব্যবসা করবে, না বিলেত টিলেত ঘুরে আর কিছু দু'একটা অক্ষর নামের পেছনে লাগিয়ে নেবে, না কি ইত্যাদি জল্পনার অবধি রইল না গুরুজন মণ্ডলীতে।

পুরুষ গুরুজনের যেমন সেখান জীবন সমস্যা, আর জীবিকা সমস্যার দুর্ভাবনা মনে আর ভাষায় দেখা দিলে, ঠাকুমা আর মেয়ে মহলের কনিষ্ঠা, জ্যেষ্ঠা সব দলেই বিয়ের প্রস্তাব এবং কনের সমস্যা দেখা দিল।

এতদিন ঠাকুমা বেশ ছিলেন, যেমন অজিতের পাশের খবর বেরুলো হঠাৎ তার মৃত্যু ভাবনা দেখা দিল। 'কবে মরি কি হয়, কি বলা যায়, এইবার অজিতের বিয়ে দেও একটা'। অজিত অবাক। 'আচ্ছা ঠাকুমা তুমি মরবে তাতে আমার বিয়ের কি'? ঠাকুমা বল্লেন, 'শোনো, আমি তোর বৌ দেখে মরব না? পাশ-টাশ করলি এবার বিয়ের সময় হল না'?

'কি আশ্চর্য তুমি বাড়ীর সবারই বৌ দেখে মরতে চাও নাকি? আমি রোজগার না করে বিয়ে করব না'।—অজিত মুখ ভার করে বল্লে।—'আর পাশের সঙ্গে বিয়ের কি সম্পর্ক? পড়াশোনা চুকলেই বাঙালী মেয়েরা এই একটি কাজই দেখ্তে পায় শুধু বিয়ে করা'।

ঠাকুমা এবং সভাস্থ মহিলারা অর্থাৎ অজিতের বোনেরা-ভাজেরা-খুড়িরা এ ওর পানে অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন।

পিতামহীর বাক্যস্ফূর্ত্তি হলে বল্লেন 'অবাক! তুই রোজগার না করলে কি তোর বৌ খেতে পাবে না? তোর তো পড়াশোনা চুকেছে তবু: তোর বাপ ঠাকুর্দার তো কবে বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। কারুর পনের বছরে, কারুর আঠার বছরে, তোর তো বাইশ বছর বয়স হল।—আর তা কি আমরা খেতে পাই নি? না তোর মা খুড়িরা খেতে পায় নি'?

অজিত, হেসে ফেল্লে, বল্লে 'ও তোমরা বুঝতে পারবে না। খেতে পাওয়া যে কতখানি দুর্লভ হয়েছে কত লোকের পক্ষে, সে কথা ওরা সবাই মিলে বল্লেও ওদের বোঝাতে পারবে না। কেননা ঠাকুমা এবং অন্য সবাই বলবেন, যারা পায় না তারা পায় না তাতে তোর ভাবনা কি? এবং এও বলবেন, 'জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি'।

অজিতের কোনো কথাই মানবেন না।—অনেকে নিরাহারে, অনাহারে, অর্দ্ধাসনে কাটায়, তাদের সংখ্যাই যে অনেক বেশী; আর তাদের কাছে যে সব জীব ভগবান পাঠান, তারা খেতেও পায় না প্রায়ই, এ ঘটনা প্রায়ই দেখা যায়

অবশ্য এটা ঠিকই যে অজিতের নিজের জন্য বা বৌয়ের জন্য সে ভাবনা ওর নেই। তবু সৌখীন ভাবনা ভাবতে, বলতে দোষ কি? লেখাপড়া শিখে এইসব স্বাধীন' চিন্তা না করলে এবং মতামত যদি না বদলায় তাহলে লেখা-পড়া শেখার মূল্য কি?

পিতামহী কিন্তু ঐ স্বাধীন মতের বিশেষ মূল্য দিলেন না। মেয়ে দেখা এবং তাঁদের মত বড় ঘরের যোগ্য পাত্রী যেহেতু দুর্লভ তাই মেয়ে 'ছাঁকা' চলতে লাগল। কেউবা নিখুঁত সুন্দরী,—কিন্তু বড় গরীব, কেউবা সুন্দরী, কিন্তু 'ঘর' তেমন নয় কেউবা সব বেশ কিন্তু শ্যামবর্ণ। এমনি সকল মেয়েরই খুঁত বেরোয়। মাঝে মাঝে দৃষ্টান্ত স্বরূপ নারীজাতি কন্যাপক্ষকে বাড়ীর একটি সুশ্রী, সুন্দরী কোন বউকে ধরে দেখিয়ে দেন, এর মতন হওয়া চাই! তার ওপর শিক্ষা বিষয়ক ও উৎকর্ষ এবং বংশগৌরব কতখানি চাই তাও বলা হয়। তার ওপর রমা চট্ করে বলে বসে, ঠাকুমা 'ও বাবু লেখাপড়া জানে না!'—নয়ত 'তুমি বলছ ওকে সুন্দর? দাদা ওকে পছন্দই করবে না, ওকে দাদা রংই বলে না।'

পিতামহী চোখ কপালে তুলে বলেন, 'কি বলিস তার ঠিক নেই! খাসা ছিরিমন্ত মেয়ে! এক পিট চুল, কোমরটি সরু, রংটি মাজা মাজা!'

অজিতের ভাজেরা বৌদিরা মুখটিপে হাসে। জেঠ্‌তুতো এক ভাজ বলে, 'চুলের সঙ্গে কোমরের সঙ্গে রং এর কি সম্বন্ধ ঠাকুমা'?

'যা যা, তোরা সব সমান হয়েছিস।'—ঠাকুমা চলে যান কিন্তু বর্ণ সমস্যা তো জগতের ব্যাপারেই কম সমস্যা নয়, বিয়ের বাজারেই বা তা কেন থাক্‌বে না। তবু অজিতদের সুবর্ণ সমস্যা তত ছিল না; দুষ্টলোকে অবশ্য বলে, ঘুরিয়ে কানে হাত দেওয়ার মত বুঝি কি ছিল।

যাক, মেয়ে দেখাও চলে। আর প্রতিবাদও চলে। অজিত রেগে যায় বলে, 'কি তোমাদের দেশটা (যেন ওর নয়)! পাশ করলেই বিয়ে, করলেই বার্দ্ধক্য, আর বৃদ্ধ হবার আগেই মৃত্যু। সাধে বলেছে জন্ম মৃত্যু বিয়ে।—তাই তোমরা চাও।'—মহিলা গুরুজনেরা তারও চেয়ে রেগে ওঠেন, 'ষাট্, কি কথার ছিরি!'

বাইরে এসে অজিত বন্ধুদের কাছে বলে, 'দেখেছ ভাই, যেন অন্য কোন কাজ নেই। না আছে কোন বীরের কাজ, না আছে আবিষ্কার; না আছে দেশ বিদেশের সন্ধানের যাত্রা. না বিশেষরকম কাজের মতনই কিছু কাজ আছে। সমস্ত দেশটা আর সাহিত্যটা জানে কেবল হয় বিয়ে, আর না হয় বিয়ে।—দেশশুদ্ধ সবাই ঐ জন্ম মৃত্যু বিয়ে নিয়েই আছে। তেমনি জন্মাচ্ছেও, মরছেও; আর বাঁচলেই বিয়ে করছে, করে তারপর মেয়েদের শিশুদের অশেষ দুর্গতিতে ফেলে মরছে।'

স্তাবক বন্ধুরা অজিতের এই চিন্তাশীলতায়, বল্‌বার বিশেষ ধরণে মুগ্ধ হয়ে থাকে।

কিন্তু এক দুর্মুখ বন্ধু বলে, 'তুই শুধু গোটাকতক বেশ সাজানো কথা শিখে রেখেছিস্, সময়মত আউড়ে দিস্। কর্‌না তুই বীরত্ব যাত্রা, কর্‌না কিছু আবিষ্কার, কেউ তোর হাত বেঁধে রেখেছে কি? না হয় জন্ম মৃত্যুরই একট প্রতিকার, একটা কিছু আবিষ্কার কর্‌না, স্বাধীন দেশের মতন। আর আমাদের দেশেও তো জগদীশ বোস, বিদ্যাসাগর মশাই, নেতাজী, স্বামীজী, মহাত্মা, পি, সি, রায় জন্মেছেন। তুইও হ'না একটা কিছু।'

অজিত বলে, বন্ধুর কথার জবাবে—'আসল নেই যে দুর্মুখ মশাই, আসল হচ্ছে স্বাধীন ক্ষেত্র ও স্বাধীনতা! মনে করলেই যা পাওয়া যেতে পারে, তার মতন শিক্ষা-অর্থ-জ্ঞানের কোন্ ক্ষেত্র কোন্ সুযোগ আমাদের আছে?'

বন্ধু বলে, 'কিন্তু ইচ্ছেও নেই আন্তরিক, তাও স্বীকার কর।' তুমুল তর্ক

বেধে গেল। হারজিৎ কেউ মানবে না কারো। অজিতের বক্তব্য হচ্ছে, অচলে ভূতলে আকাশে পাতালে অভিযান, নব নব আবিষ্কার, যুদ্ধের বীরত্বের নানা কাজের ক্ষেত্র আমাদের জন্যে খোলা নেই ; মানে—অর্থানুকূল্য, কাজের ক্ষেত্র, শিক্ষা-দীক্ষা-উৎসাহ কিছুই আমাদের সপক্ষে নেই এবং আমরাও দরিদ্র।

অজিতের সেই বন্ধুটি বলে, 'আন্তরিকতা থাকলে সব না হোক্ খানিকটা লাভ করা যায়। তোর শুধু কথার কথা। ভাব-বিলাস।' আরও বলে, 'এবং যাদের ভাব-বিলাস আর ভাবুকতাই হচ্ছে সম্বল, তাদের জাত আর কি করবে ? ঐ হয় বিয়ে আর নয় বিয়ে ছাড়া ? অতএব তুইও বিয়েই কর্। ঐটেই হচ্ছে তোর ঐ কথার তুবড়ী বন্ধ করার উপায়। আমরা পাঁচজন বাঁচি—'

অজিতের এবার রাগ হয়। 'আচ্ছা, ভাববিলাস বলছ, দেখাও ক্ষেত্র। সোজা পল্লীসংস্কার বল, তারই কি টাকা সাহায্য পাচ্ছ ? কাজ করবার তো কত লোক রয়েছে।'

সব্যাঙ্গ বিদ্রূপ হাস্যে বন্ধু বলে, 'টাকা না থাকলেও অনেক কাজ করা যায় জানিস ? নিজেরা তারা ভাল ভাবে থাক্‌তে পারে, নিজের বাড়ীটা ভাল ভাবে রাখ্‌তে পারে। একটু এদিক ওদিক চেয়ে দেখ্‌লেই দেখতে পাওয়া যাবে, শুধু টাকাই নয়, আন্তরিকতা থেকেই কত কাজ গড়ে ওঠে। আসল আমাদের ইচ্ছেটাই ভাব-বিলাসের ইচ্ছে। আন্তরিক ইচ্ছে যেখানে হয়েছে সেখানে টাকা বা লোকের অভাব হয় না কাজ করবার ইচ্ছে থাক্‌লে তো। ভাবছিস বুঝি সবাই গরীব ?'

অজিত বলে, 'তাই বলে তুমি একটা-আধটা উপমায় তেত্রিশ কোটি অভাব ঢাক্‌তে পার না। আমাদের নেইও যে উপায় তা মান্‌তে হবে'।

অজিতের ভক্তবন্ধু একজন বলে, 'আচ্ছা নিশীথবাবু আপনিই না হয় করে দেখান একটা কাজ। এত যদি বোঝেন তো করে দেখান না।'

বিরাট কোলাহলে তার কথার সমর্থন হয়ে নিশীথের 'সত্যমপ্রিয়ম্' কোথায় ডুবে গেল। যেন সবাই বাঁচ্‌ল দুর্গা বলে। কথা হচ্ছে বিয়ের রস চর্চ্চা, তাকে শুক্‌নো কাজ করার কথা ভাব-বিলাসের কথা বলে বিদ্রূপ এবং পাল্টে দেওয়া।

নিশীথের হারই হোক বা জিতই হোক, কাজ করা যে কাজ করা এবং বিয়ে করা যে বিয়ে করা, সেটা তো অস্বীকার করবার উপায় নেই। এবং সে বিয়ের দায়িত্ব নেবেন পিতামহী, মা বাপ। যার বিয়ে তার কিছুই নয়; যেমন ভারতবর্ষের সমস্ত অনন্তস্ত কালের সমস্যা। ভূত কালে কবে ভাবা এবং লিপিবদ্ধ হয়ে

আছে, শোনা যায়, তেমনি অজিতের পুত্র পৌত্রাদির ভাবনা, সংসারের সমস্ত সমস্যা, দায় দুর্গতি, নানাবিধ বিষয় সবই তার পিছন দিকে ফিরে চাইলেই চল্‌বে, মীমাংসা হয়ে যেতেও পারে। নজীর পাবে কত! উপদেশও পেতে পারে।

পিতামহ-পিতামহী আছেন, মা-বাপ আছেন, পিসেমশাই, জ্যেঠামশাইও নেই কি? তাঁদের অমূল্য অভিজ্ঞতার ফলাফল অজিতরা সবাই মিলে ভোগ করবে, তার কম লাভ।

অতএব মেয়ের পর মেয়ে দেখা হয়, আর আলোচনা হয় রান্নাঘরের দালানে। পিতামহীর বক্তব্য, অজিত শুধু চুপচাপ থেকে বিয়েটা করুক্ না। আর তো কিছু নয়। এবং সেটি শক্তই বা কি? যার টাকা নেই তারাও বিয়ে করে, তাদের ছেলেমেয়ের কি গতি হয় না?

অজিতরা বল্‌তে গেল 'অকালে সদ্গতি'—ঠাকুমা রেগে উঠলেন, 'ঐ শিখেছ! বিশ্বাস নেই, খালি কথা'। নজীর দেন 'ওর বাপ, ঠাকুর্দা, তার বাপ কে বিয়ে ন করেছে? আর কম বয়সে না ক রছে? আর কার ছেলে মানুষ হয়নি? মেয়ের বিয়ে হয় নি?—তোরা সব হলি কোত্থেকে? এত বডটা হলি কি করে, সেই অমুক রায়ের দৌলতেই নয় কি? তারা কি বিয়ে করে সংসার ধম করে, কাজ কবে, রোজগার করে ছেলেমেয়ে ম বাপকে দেখেনি'? অতঃপর পিতামহী বেশী রাগ করে বল্লেন, 'যত সব চালাকি। কাজ করবার ইচ্ছেও নেই বিয়ে করবারও নেই, খালি কথার তুবড়ী'। সেকেলে বুড়ী হলে কি হয় নিশীথের ঐ কাজ করার ইচ্ছে নেই, কথাটা উনিও কেমন বল্লেন

অজিত হাস্‌ছিল, ঠাকুমাও একটা একট কথা কন মন্দ নয়। সে বল্লে, 'কিন্তু সেই প্র-প্র-প্র ঠাকুর্দা রামকান্ত রায়ের যুগ এখন আর নেই,—তারা পনের টাকাতে দোল দুর্গোৎসব অতিথিশালা সব করতে পারত। তোমার সেই প্রত্যন্ত প্র-শাশুড়ী ঠাকুরাণী এক কাহন কড়িতে দৈনিক বাজার করিয়ে নিতেন। তোমার তো পাঁচ টাকার কমে কুলোয় না'।

পিতামহী কৃত্রিম কোপে 'যাঃ যাঃ' বলে পঞ্চাশ বছর আগের সেই সেকালের বিবাহ প্রসঙ্গে ছেলে মেয়ের লজ্জা, সম্ভ্রম, বাধ্যতার কথা মনে করে আর এখনকার ধৃষ্টতা ও বাজে কথার জ্বালায় অতিষ্ঠ উত্যক্ত হয়ে ভাঁড়ারঘরে ঢুক্‌লেন সেদিনের মত চুপ করে।

তথাপি আধুনিক কালের হাওয়া-লাগা-মনে পিতামহী মৃদু হাস্যে স্বগত বল্লেন এবং ভাবলেন যে, কথাগুলো ছেলেটা বলে কিন্তু নিতান্ত অন্যায় নয়। যে

মাগ্‌গি গণ্ডার বাজার আজ কাল। এছাড়া যে সব শরীরের দশা, আক্ষেপ সহকারে ভাব্‌লেন, এই কম্‌লিটার দেখনা—যেন কাঠি, দুটো ছেলে হয়েই আঠারো বছরেই ; তাঁদের কালে তাঁরই বিশ বছরে তিনটি কোলে হয়েছে,—কিন্তু হঠাৎ মনে হয়, 'ও বৌমা, দেখতো রমাকে কি দিয়ে ভাত দিলে ? গাড়ীর সময় হল যে !' আধুনিকতাকে পছন্দ না করলেও স্কুলের সময়ানুবর্তিতা সম্বন্ধে তাঁর যথেষ্ট উৎকণ্ঠা থাক্‌ত।

বহুদিন পাত্রী দর্শন আর আলোচনা হতে হতে হেন কালে একদিন সুপ্রিয়াকে বিকালবেলা ছাদে রমার সঙ্গে গল্প করতে দেখে ভিজে কাপড় ছাদে মেলে দিয়ে ঠাকুমা নীচে নেমে এসে বল্লেন 'দেখ না বৌমা ভাল কথা, ওদের ঐ খুকি না খুসীকে দেখছ এদানী ? খাসা ছিরিটি হয়েছে। ওর সঙ্গে অজির সম্বন্ধ করলে কেমন হয়' ?

বধূমাতা চুপ করেই রইলেন। কেন না, শ্বাশুড়ী তাঁকে আহ্বান করলেও ওগুলো আসলে তাঁর স্বগতোক্তি। সামনের উপস্থিত কারুকে আহ্বান করে তিনি আপন মনেই ভাবেন এবং আলোচনা করেন।

সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত সরল ভাবেই তাঁর মনে হল আরো,—অজিত সুপ্রিয়াকে দেখেছে, নিশ্চয়ই তার অপছন্দ হবার মত কিছু নেইও ; আর লেখাপড়া জানা মেয়ে, অপছন্দ বা অমতের আছেই বা কি ? তেমন রং ময়লা নয় এবং উনি যে একটা স্বাধীনতা ওদের দিচ্ছেন এই বা দেয় কে ? তাদের এত বড় 'বিরোধ' (বৃহৎ) গুষ্টিতে দিয়েছে কে ? সুতরাং গর্ব্বিত হলেনও খুব এ সুযোগ অজিতের মত পায় কে ? হাজার হলেও তাঁরাও বাল্যকালে কি উপন্যাস পড়েন নি ? প্রেমে না পড়ুন তার মর্ম তো বোঝেন।

কথা উঠ্‌লও, চাপাও পড়্‌ল, কেননা রমার বিয়ে না হলে তো অজিতের বিয়ে হবে না, অতএব রমার অপেক্ষায় আলোচনা স্থগিত রইল।

কিন্তু কথা 'কানে উঠল'।

জন্মনা

সেকালে শোনা গেছে যে যাঁরা প্রেমে পড়তেন তাঁরা নাকি জাতি কুল গোত্র পর্যায় সব বিবেচনা করেই পড়্‌তেন। স্বজাতি, বিজাতি, সগোত্র, বুঝেই সে প্রেম প্রবাহিত হত। তারপর কোথাও কোথাও অসবর্ণও চলেছে শোনা গেছে।

সবাই বলে, কিন্তু অজিতের মত, সুপ্রিয়ার মত এ সুযোগ কে পায়? স্বজাতি, বিগোত্র, সুকুল, সেকেলে পিতামহী পর্যন্ত অনুকূল।

যাহোক সুপ্রিয়া শুনে কি ভাব্‌ল কে জানে।

কিন্তু অজিত প্রথমে খানিক অবাক ও আশ্চর্য হল, খুকি-খুসী? কেমন দেখ্‌তে তাই যে মনে পড়ে না। শত পৃথিবী তোলপাড় করে কি না বাড়ীর পাশে খুসী? তার হাসি যদি মনে হয় তে দাঁত কেমন তাই মনে পড়ে না; তাও বা মনে পড়ে তো চোখ মনে পড়ে না। রং? কোথায় কাশ্মিরী, কোথায় ক্ষেত্রী মেয়ে, কোথায় বা পাঞ্জাবিনী, নিতান্ত সোজা সুজি, ফরসা, হাতের পাঁচ বাঙালী শ্রী। কিছু বল্‌তে পারে না। ভালও লাগে না, মন্দও বড় লাগে না।

বন্ধুরা শুন্‌লে। কটুভাষী নিশীথ, সেই ছিল বিশিষ্ট বন্ধু, মিষ্টভাষী ভক্তদের অজিতের ভাল লাগে কিন্তু তাদের চেয়ে কথা কয়ে সুখ হয় নিশীথের সঙ্গে।

সে বল্লে, 'দেখ্‌ লোকের ভাগ্যে শুধু প্রিয় জোটাই ভার হয়, তোর শুধু প্রিয়া নয়, আবার সুপ্রিয়া। আবার বাড়ীর পাশে থাকা, স্কুলে লেখাপড়া শেখা, চেনাশোনা মেয়ে। কোনো দিকে কোন সুযোগের ক্ষেত্র নেই ভাব্‌ছিলি বিয়ের আগে কল্পনার দৌড়ের, কাব্যের ক্ষেত্রের জন্যে, সুযোগের জন্যে তোর আর ভাব্‌তে হল না। এইবার খোকা ঘুমলো পাড়া জুড়োলো—'

'যাঃ ফাজিল!' অজিত বল্লে।

ভক্ত বন্ধু পরেশ জিজ্ঞাসা করলে, 'খোকা ঘুমলো মানে'? মানে তোদের বন্ধুটির আর কাব্যিক তর্ক ও আলোচনার সুযোগ হবে না, পৃথিবী নিশ্চিন্ত হবেন। প্রথমে বৌ, তারপর সংসার, তারপরে সংসার নির্বাহ-যাই হোক তোর ডাকবার কি সুবিধে'—নিশীথ থেমে বল্‌লে। অজিত তার কথায় হাস্‌লোনা বরং মৌখিক একটু রাগ দেখালে।

ভগ্নিপতিদের কানে উঠ্‌ল, তাঁরা বল্লেন, 'ওহে মূল্যবান অভিজ্ঞতাটির প্রসাদ একটু আমাদেরও দিও, তোমার সেই তর্ক আমরা ভুলিনি।' অজিতের এই নিতান্ত জানা জিনিষ খুব ভাল না লাগলেও কল্পনা বস্তুটা আর শূন্যে নেই, আধার পেয়েছে একটা—আপনিই মনে হয়, নামটি কিন্তু সত্যিই বেশ এবং ঐ নামকে কেন্দ্র করে নামাধিকারিণীকে এখন দেখতে ইচ্ছে করে এক এক সময়। এখন একবার আলাপ হলেও মন্দ হয় না—এও মনে হয়। কিন্তু ভেতরে কথা উঠেই চুপচাপ আবার। কেন তা অজিত অবশ্য জানে না, অন্য কেউও না। আর বড়দের যেমন স্বভাব, কথা একটা বলে চুপচাপ নিশ্চিন্ত থাকেন, উচ্চবাচ্য নেই

অথচ বাইরের ছেলে মহলে ও ছোটদের মধ্যে সবাই জানল, যেমন হয়ে থাকে সাধারণতঃ, অজিত যেন সত্যই বর আর সুপ্রিয়া কনে। স্কুলের সখিরা-সঙ্গিনীরা জানলে রমার সেই বিখ্যাত দাদার সঙ্গে সুপ্রিয়ার বিয়ে স্থির। একে তো সবাই আইবুড়ো—তার মাঝে সুপ্রিয়ার বিয়ে! আবার কিনা বিখ্যাত মেয়ে নিন্দুক, সব বিষয়ে—রূপ-গুণ-গড়ন-শ্রীর নিন্দুক, সেই রমার দাদার সঙ্গেই বিয়ে!

কেউ বা রমাকে জিজ্ঞাসা করে, 'হ্যাঁ-রে' তোর দাদা বুঝি নিজে পছন্দ করেছে? কিন্তু রং তো খুসীর খুব ফরসা নয়? তোর দাদা কিনা শেষকালে, বলে শেষ করে না আর তার পরে।

অন্য একজন বলে, 'তোর দাদার বুঝি বদলে গেল মতটা'—'

রমা জ্বালাতন হয়ে বলে যে, 'ঠাকুমা সম্বন্ধ করেছেন এবং এখনও পাকাপাকি হয় নি, আশীর্বাদ হয় নি, কিচ্ছু না—কিছুই ঠিক হয় নি তোরা যেন কি।' কেবা কার কথা শোনে। রমার দাদার ভক্ত-অভক্ত, ঈর্ষা-কাতর, কৌতুকপ্রিয়, উদাসীন, কৌতূহলী সবাই এসে এসে বলে, হয় সুপ্রিয়াকে না হয় রমাকে—'তা'হলে তোমার দাদা এতদিনে সেই অপার্থিব—প্রিয়াকে—সুপ্রিয়াকে খুঁজে পেলেন?'—

নয়ত,—'কিরে সুপ্রিয়? তোর ভাগ্যিটা ভাল দেখছি': —যদি বা সোজা-সুজি বিয়েতে একটু কম কথা হত। একে রমার দাদা, তাতে সেই বিশ্ব-নিন্দুক দাদা, আবার মেয়ে কিনা সেইত জানা শোনা, সুপ্রিয়ার মতন চলনসই মেয়ে।

ঠোঁটটা একটু বেঁকিয়ে রমার এক বন্ধু বেশ বল্লে, (সে দেখতে সুন্দর) 'আহা, ক'টাই বা আছে আমাদের জাতে সুন্দর? সবাই তো চলনসই পাঁচ পাঁচি; আমার পিসিমা বলেন, শুনেছি নাকি শুধু সোনার বোনেদের ঘরে আছে। কোথাও আছেও বা, কিন্তু সে কি আর পথ ঘাটে পড়ে থাকে—'

বাইবেলে লেখা আছে, 'আদিতে বাক্য ছিল' লেখেননি 'অন্তেও থাকিবে'। স্কুল ভরে কথার স্রোত বইল, থামল না।

আকস্মিক

অজিতের সেই বিবর্জিত প্রেমকে সোজাসুজি ভালবাসাকে বিরহ মিলনকে নানাবিধ বিদ্রূপ পরিহাস শ্লেষ মধ্যেও কেমন করে প্রতিকূল সমাজেও এর জন্যে

প্রজাপতি এমন একটি কাব্য রচনা করছিলেন, সে কথা কে জানত! সবিস্ময়ে বন্ধুরা তাই ভাবে।

অজিতেরও ভাল লাগা না লাগা প্রেমের অবকাশ, অবকাশহীনতা সে সব কথা মনের যেমন এককোণে জটলা করছিল, অন্য সবখানটিতে কিন্তু তার আকাশে বাতাসে দিকে দিগন্তে বর্ষা-বসন্তের কাব্য রচনা আরম্ভ হয়ে গেল।

পুরাকালে যে কারণেই কেউ দুশ্চর তপস্যা আরম্ভ করলে ইন্দ্র যেমন করে হোক তার তা নষ্ট করে দিতেন, তপোভঙ্গ করতেন—এখনকার দিনে সে দুশ্চর তপস্যাও নেই, তপোভঙ্গও নেই, সে পৌরাণিক ইন্দ্র-চন্দ্র-বায়ু-বরুণও নেই, এখন ভাল কাজই হোক, আর শুভ কাজই হোক, আর ছোট খাটো সুখ দুঃখই হোক তাই আছে; তার জন্যে নানাবিধ ও বহুবিধ আকস্মিক বিঘ্ন উৎপাদনের ভার নিয়েছেন দেবরাজ ইন্দ্র নন ধর্ম্মরাজ যম।

তাই এমনতর সময়ে অজিতের পিতামহী নয়, যাঁর মৃত্যু ভাবনায় অজিতের বিয়ের চেষ্টা হচ্ছিল, সুপ্রিয়ার বাপ বীরেশ্বরবাবু সামান্য কি অসুখে মারা গেলেন। বেশী ভুগলেন না, ভোগালেন না, নিতান্ত অতর্কিতে অকস্মাৎ গেলেন। যেন পাড়ার লোক জানলে না এমনি ভাবে।

খানিকক্ষণের জন্য সমস্ত পাড়ার মনটা যেন থমকে দাঁড়িয়ে গেল। অজিতের পিতামহী শুধু ঠাকুমাই এবং একটি স্ত্রীলোক মাত্র, যাঁর জন্যে বিপুল বিশ্ব সংসারের একটি বিন্দুরও কোন অসুবিধা ঘট্‌ত না। কিন্তু সে ভাবনা ও জল্পনা মানুষের, ধর্মরাজ যমের তা —কাজেই মানুষেরা বিশেষ করে মেয়েরা ওদের পাড়ার মেয়েরা—শুধু ঐ কথাই নানা প্রকারে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বল্‌তে লাগলেন। যথারীতি মেয়েলী শোক-সভার বৈঠকে দুপুর বেলা যাঁরা যাঁরা জড় হতে লাগ্‌লেন সবাই রকম রকম করে বলেন।

বিপিনবাবুর স্ত্রী বল্‌লেন, 'আহা! তারকের মা তুমি গেলে না কেন? আহা কি হল বল দেখি।' মুখরা শ্যামা পিসিমা বসেছিলেন, সম্পর্কে ননদ, বল্লেন্‌ 'তোমার এক কথা বৌ, তুমি গেলে না কেন?' ওর যেন ইচ্ছা হলেই যেতে পারবে।

মধুবাবুর স্ত্রী বল্লেন, 'কি করে বোন, অনেক দুঃখেই বলে, কি কাণ্ড হ'ল বল ত!'

প্রফুল্লবাবুর মা বল্লেন, 'তা আর বল্‌তে? সংসারটা বয়ে গেল। এখনও আইবুড়ো মেয়েটি গলায় গলায়, মাসে তিনশ-চারশ টাকা আর কোথায় কি?

অজিতের মা আর পিতামহী এসে শুধু চোখ মুছ্ছিলেন। অজিতের পিতামহী বল্লেন, 'বিধাতার কাজে তো বিচার নেই, এই সব বুড়ীগুলো বুকে হেঁটে কোমর ভেঙ্গে বসে আছি কত কাল ধরে, তা আমাদেরই নেন না তো তারকের মা তো ছেলে মানুষ—গেলে তো ও জুড়োতো।

বহুকাল বিধবা শ্যামা পিসিমা বল্লেন, "আহা মেয়ে মানুষের একে এড়ান নেই, কবে যে সব যাব। পাড়ায় এতগুলো বিধবা-এরা মরে না গা।—মানুষও ভোলে যমও কি ভুলেছে।'

প্রফুল্লবাবুর মা বল্লেন, 'নিজেদের মৃত্যুর কথা নিজেরা বল্‌তে নেই আয়ু বাড়ে। কি আর করবে, যতদিন ঘাস জল ততদিন মেয়াদ।'

নিঃস্তব্ধ আচ্ছন্ন সুপ্রিয়ার মার চারিদিকের জনতা শুধু বাহিরের একাকিত্বকে পূর্ণ করে রাখে। অন্তরের কথা তার অন্তরেই থাকে।

তারপর যেমন হয়,—এক নিমিষে শাঁখ-সিঁদুর শাড়ী-চুড়ি থেকে, গৃহিণীপনা ঘরকন্না থেকে, সুপ্রিয়ার মা সন্ন্যাস ব থানে, নিরাভরণে, রিক্ততায়, অত্যন্ত বিমূঢ় ভাবে প্রমোশন পেলেন,—আর ছেলে-মেয়ের বাবার পৌনে চারশো টাকা মাইনে, তার জন্য স্বচ্ছল অবস্থা, দিন-যাত্রার নির্বিঘ্ন শান্তি থেকে 'কি করে কি হবে,' 'কি হলে কি হয,' 'কি করা যায' ইত্যাকার নানা সমস্যায় গড়িয়ে পড়ে অনেক রকম গবেষণা করতে লাগল।

ফলে সোজা এবং সহজ একটি মাত্র উপায়ে বাড়ীখানি ভাড়া দিয়ে বাবার আফিসের সঞ্চয়টুকু তুলে নিয়ে কলকাতার বাস কাটিয়ে তারক দূর আত্মীয়ের তার কাছে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করলে।

শোকের সময় শোক সমস্ত—ভাবনা-চিন্তা নানাবিধ ব্যাপার সকলের মনটাকে এমন করে জুড়ে রাখলে যে, তার মধ্যেও মনের একতলায় অন্ধকারে ঘরের কোণে গভীর মনের ভেতরে, সুপ্রিয়ার মার যে একটুখানি উদ্বেগ ভেতরে ফুটছিল, সে কথা না তিনি প্রকাশ্যে কি বাড়ীর গৃহিণীর কাছে বলতে পারলেন, না তাঁরা কিছু আশ্বাস দিলেন।

সবাই জানলেন এতবড় একটা ঘটনা—'ইন্দ্রচন্দ্র পাত' বাড়ীর কর্তার যাওয়া। এতে ও কথা কোনো পক্ষেরই প্রকাশ্যে বলবার নয়, এবং অন্তরে জানা রইল তার নিশ্চয়তা।—

শুধু মাস ছয়েকের জন্যে সুপ্রিয়া বোর্ডিং-এ থেকে গেল, প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবে বলে। সে ও অজিত লেখাপড়া ভালবাসে তাই।

পরিচয়

সহজ সময়ে যে আলাপ পরিচয় ঘনিষ্ঠতা দুঃসাধ্য বা অসাধ্য—হয়ত অসম্ভব থাকে বিপদের দিনে সঙ্কটের সময়ে সেটা এতই স্বাভাবিক আর অস্বাভাবিক ভাবে বাড়তে থাকে যে আগে ভাবাও যায় নি মনে হয়।

সুপ্রিয়া আর সুপ্রিয়াদের বাড়ীর সঙ্গে অজিতের মেলামেশা তেমনি করে সহজ হয়ে উঠছিল কখন, তা ওরা জানতে পারে নি।

রমা আসত—সমস্ত সন্ধ্যে থেকে রাত্রি অবধি থাকত। অজিতও নানা কাজের ভারে, শ্রাদ্ধের পরামর্শ যুক্তিতে, আয়-ব্যয় আলোচনায় নানা বিষয়ে যেন অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিল। কাজেই দুঃখের মাঝেও ঐ পরিবারটির মনে অজিতের ঐ ঘনিষ্ঠতা অন্তরঙ্গতাটা আশ্বাস স্বরূপই মনে হয়েছিল,—যেন কোন সম্পর্কের পূর্বাভাস স্বরূপই।

তাই সুপ্রিয়ারও মনে মনে আশ্বাস ভরসা পেতে, তাকে সহজেই গ্রহণ করতে বাধ হয় নি।

তার ওপর রমা আসে।

তরুণ বয়সের শোক বা বিয়োগ অথবা সন্তানদের কাছে পিতৃমাতৃ বিয়োগের বেদনা মনে বাজলেও, ততখানি গম্ভীর গভীর করে তোলে না।

রমা এসে তার মত বয়সের পক্ষে যেমন সম্ভব তেমনি সান্ত্বনা দিয়েছে, সুপ্রিয়াও কথা কয়েছে, এক আধবার হেসেও ফেলেছে।

শুধু মা,—তিনি সুমুখে না থাকলে ওরা অন্য কথা কয়, হাসেও।

এমনি করে শ্রাদ্ধ কাজকর্ম সব সারা হল, সুপ্রিয়ার বোর্ডিং বাসের দিন ঘনিয়ে এলো, আর সুপ্রিয়া-অজিতের মনে নিজেদের অজ্ঞাতেই নব ঘনিষ্ঠতার নূতন পরিচয়ের মোহ সঞ্চিত হল ; তার জন্য অভাববোধ আবার তা বন্ধ হওয়ার আসন্ন সম্ভাবনার জন্য বেদনা বোধ তা-ও।

কারণে-অকারণে সুপ্রিয়ার চোখ ক্ষণে ক্ষণে সজল হয়ে ওঠে। মাকে-দাদাকে ছাড়তে হবে। বাবা নেই—আরও হয়ত কি ; অজিতের তা চোখ এড়ায় না।

যত যাবার দিন ঘনিয়ে আসে, অজিতের যেন সান্ত্বনা দেবার, যেন আপনার জনের মতন কিছু বলবার ইচ্ছে মনকে পেয়ে বসে।

যাবার আগের দিনে সন্ধ্যায় অন্ধকারে কোন একটা আধ অন্ধকার ঘরের

কোণে ব'সে একগাদা বাক্সপেঁট্‌রা স্যুটকেসের মাঝে সুপ্রিয়া জিনিষপত্র গোছ-গাছ তোলাপড়া করে।

বৌদি রান্নাঘরে। দাদা মায়ের সঙ্গে কি কথায় ব্যস্ত অন্যত্র। বাক্সের পর বাক্স সারাদিন ধরে হয়ত কদিন ধরেই গোছানো চলেছে। কিন্তু কারো যেন হাতে ক্ষিপ্রতা নেই, কাপড় চোপড় সাজিয়ে তোলার যেন সঙ্গতি নেই। হঠাৎ মেয়ের হাতে বাবার কোটটা-ধুতিটা-পাঞ্জাবিটা নয়ত ফতুয়া কি রুমাল এসে পড়ে, নয়ত মার হাতে সেই রকমের কিছু জিনিষ পড়ে, আর সমস্ত করা কাজ অগোছ হয়ে যায়; সমস্ত সাজানো ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। মা মুখটা ফিরিয়ে চোখ মোছেন, মেয়েও মুখ নীচু করে কি গোছ করতে কি গুলিয়ে ফেলে, কেবলই চোখ ঝাপ্‌সা হ'য়ে আসে। এমনি ক'রেই কদিন গোছ-গাছ সমাধা হচ্ছে।

কাল যাওয়া—আজ আর শেষ না করলেই নয়। সুপ্রিয়া অন্য মনে গুছিয়ে তুলছিল—বাবারগুলো সব আলাদা ক'রে, যেন অসাড় বেদনায় মনে হয় কোথায় কোথায় সেগুলোকে নির্বাসন দিচ্ছে। মার ভাল কাপড় শাড়ী ইত্যাদিও কি ভেবে তারি সঙ্গে তোলে।

ওর চোখ আবার ঝাপসা হ'যে ওঠে। মাকে অন্য রকম দেখ্‌ছে, কিন্তু মার ঐ সব?—ওর মা-ও যেন আজ মৃত আর পৃথিবীতে নেই।—দুই মৃতের জিনিষের তাই একই আশ্রয় ঠিক করে।

অন্য মনে ঘরে আলোও জ্বালেনি, মাথা নীচু করে আধ অন্ধকারেই গোছাচ্ছে।

ঘরে ঢুক্‌ল রমা, তারপর অজিত।

'ওমা, তুই এখানে, আলোটাও জ্বালিস্ নি। অন্ধকারে কি করছিস্ একলাটি—'

রমা আলোটা জ্বেলে দিলে। অতর্কিত আলোতে তাড়াতাড়ি মুখটা নীচু করে সুপ্রিয়া চোখ মুছে নিলে। রমা বুঝতে পারলো। একটু চুপ করে তারপর এগিয়ে এল, 'দে আমিও গোছাই—'

অজিত কিংকর্তব্যবিমূঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল, এবার বলে, 'আমাকে দিয়ে বুঝি ও কাজটি করানো যায় না? দাওনা আমিও গোছাই, খুব শিগ্‌গীর হবে দেখ না।'

রমা হেসে ফেলে, 'রক্ষে কর। তোমার গোছে কাজ নেই, যে তোমার নিজের ঘর করে রাখ। উনি আবার আমাদের গোছাবেন।' সুপ্রিয়াও একটু হাসলে, 'না, আমরাই নিচ্ছি এক্ষুনি করে, আপনি বসুন।'

একটি বাক্সের ওপর অজিতের আসন নির্দেশ করে দিলে। 'তাহলে তোমাদের কালই যাওয়া ঠিক ?'—একটু থেমে অজিত বলে, 'কটার গাড়ী ?'

'বিকেলে পাঁচটায়।—কালই ঠিক হল।'

'তুমি তাহ'লে কাল সকালে যাবে ?'

'না, আমি মা'দের সঙ্গে যাবার সময় নেবে যাব, নয়ত স্টেশন থেকে ফিরে এসে'—সুপ্রিয়ার গলা ভারি হয়ে উঠল। 'স্টেশনে গেলে ফিরে আস্‌তে বড় মন কেমন করবে,' রমা বন্ধুকে বলে।

সবাই চুপ করেই রইল।

রাত্রি বাড়তে থাকে। আলো-ছায়া কুয়াসাঘেরা কলকাতায় ওরা আজকের মতন কোনোদিন আর একঘরে বসবে কিনা কে জানে। সুপ্রিয়াই বা আর কদিন আছে। ওর পরীক্ষার পরে ও হয়ত সেখানে। অজিত সব গোছ করা দেখে আর ভাবে। ওরা দুজনে একটার পর একটা গুছিয়ে সাজিয়ে সরিয়ে সরিয়ে রাখে।

শেষ হ'য়ে এলো সব।

অজিত বলে, 'আজকের রাত্রিটাই আর তোমরা আছ।'

কথার উত্তর দিতেও যেন মনটা মুচড়ে ওঠে।

সুপ্রিয়া শুধু 'হ্যাঁ' বলে।

রমা বলে, 'কেন ওতো রইল দাদা। আমার সঙ্গে দেখা হবে স্কুলে।' অজিত শুধু 'হ্যাঁ' বলে।

রাত্রি গভীর হয়ে এলো। রমা উঠ্‌ল। 'যাই তোর মার সঙ্গে একবার দেখা করে আসি।'

অজিত চুপ করে বসে রইল।

সুপ্রিয়ার তখনও কি সব ছোট কাজ বাকি।

'তোমার সঙ্গে আর এখন দেখা হবে না সুপ্রিয়া—না ?' অজিতের মুখে এই প্রথম সুপ্রিয়া ডাক শুনে সুপ্রিয়া একটু অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চাইলে। তারপর আস্তে আস্তে বলে, 'বোধ হয় না'।

'কি রকম সব গোলমাল হয়ে গেল,—না ?'

সে আস্তে আস্তেই বল্লে, 'হ্যাঁ'।

'কিন্তু যেন কত আপনার লোকের মতন তোমাদের জন্য মন কেমন করছে'—সেন্টিমেন্ট অজিতের মনে নেই সে বলত। তার মুখে 'মন কেমন' শুনে চকিতে

সুপ্রিয়া একবার চোখ তুলে অজিতের পানে চাইল, যেন বোঝা গেল বহুবচনটা একজনের জন্যেই প্রয়োগ করেছে। যা বলা হল তার মধ্যে বাকি কত কথা রইল! অনেক যেন, সবই যেন—রমা নীচে বৌদির সঙ্গে দেখা করতে গেছে—ফেরে না আর।

'পাশ করে কি পড়্‌বে আর?'—অজিতের পড়া জিজ্ঞাসাতেও আসল কথাটি বলা হয় না, আর কথাও শেষ হয় না। কি জানি?—মনে মনে সুপ্রিয়া ভাবে, পড়ব কিনা সে কি ওদের বাড়ার ওপরই নির্ভর করে না?

একটু থেমে কি ভেবে, সহজেই বলে, 'আপনার কি মনে হয় আর পড়া দরকার?'

এবার অজিত ওর মুখের দিকে চাইলে একটুখানি। তারপর মনে হল পিতামহীর উত্থাপিত প্রস্তাবটা। একটু হেসে বল্লে, 'আমার মত তোমার যদি পড়া হয়, আমি তোমায় পড়্‌তে বলব সুপ্রিয়া।'

সুপ্রিয়া অপ্রস্তুত হয়ে লজ্জিতভাবে মুখটা নীচু করে নিলে। দ্বিতীয়বার কানে শোনা নামটুকু একটু বেশী মধুর লাগল যেন। অজিতের কি সুন্দর সুপ্রিয়া বলবার ভঙ্গী। ওর মনে হল কই অজিত সুপ্রিয়া বল্‌ত না, খুসীই বলত।

হয়ত ভবী সম্পর্কের আভাস ও নামটুকু বলার মধ্যে মতামত দেওয়ার কথার মধ্যে যেন অনেকখানি ছিল।

রমা ডাকলে, নীচে যাবে?

সুদূরের উদ্দেশ্যে

সুপ্রিয়ার মা ভাইরা গেলেন সেই সুদূর আজমীরে, সুপ্রিয়া ফিরে এলো বোর্ডিং-এ।

ওদের বংশে ওদের বাড়ীতে মেয়ে বোর্ডিং-এ রাখা, মেয়ের পরীক্ষা দেওয়া, পাশ করা, মেয়ের অত বয়স পর্যন্ত বিয়ে না হওয়া এই প্রথম ও নূতন। কিন্তু কেন যে, কি জন্য যে তা' করলেন তা স্পষ্ট কেউ কারুকে বল্লেন না, অথচ একটু অস্পষ্ট হয়েও তা' রইলনা। মনের ভেতরে সবাই জান্‌লেন, অজিত পছন্দ করে। যেন অজিতরাও তাই বুঝ্‌লে।

স্কুল থেকে ফিরে রমা, কোনো দিন বলে, 'দাদা আজ ওর মুখটা এমন

শুকনো দেখলাম !' ভাই-বোনে গল্প করে ওদের। হয়ত কোনোদিন মাকে ঠাকুমাকে বলে, 'তোমরা ওকে একদিন—ছুটির দিনে নেমন্তন্ন কর না ঠাকুমা ?'

মা ভ্রূকুঞ্চিত করে চাইলেন। পিতামহী অত লক্ষ্য করেন না, অন্য মনে বলেন, 'আচ্ছা'।

কিন্তু নিমন্ত্রণ করা হয়ে আর ওঠে না।

আর অজিতও কিছু বলতে পারে না।

ট্রেনে পৌঁছে দেবার দিন ওরা ভাই-বোনেও গিয়েছিল অন্য আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে।

সুপ্রিয়ার বিষণ্ণ নীরব বিদায় নিয়ে চলে আসাটা মাঝে মাঝে মনে পড়ে।

দেখতে দেখতে পরীক্ষা এলো, তারপর ছুটি। রমা বল্লে, 'ঠাকুমা, ওকে ওর দাদা নিতে আসবেন, তোমরা একদিন খেতেও বল্লে না, আনলেও না, কি ভাববে বলো তো ওরা ?'

'ভাববে আবার কি ? তোর এক কথা।', উষ্ণস্বরে মৃদু কণ্ঠে মা জবাব দিলেন, শাশুড়ীর শ্রুতিগোচর না হবার মতন করে। ঠাকুমা বল্লেন, 'তা, নিয়ে আয় না একদিন।'

তারপর মৃদু হাস্যে বল্লেন, 'কি বলা যায় যদি আসেই ঘরে তাহলে আগেই—অমনি আসবে ?—একেবারে বরণ করে আনবি।'

রমা মার কথায় রেগে গিয়েছিল, বল্লে, 'হ্যাঁ, ভারি তো বিয়ে তার দু'পায়ে আলতা। বিয়ে হচ্ছে কিনা তারই ঠিকঠিকানা নেই। আমার বন্ধু বলেই আমি বলছিলাম। থাকগে—।'

রমা চলে গেল।

মা আর পিতামহী—নিমন্ত্রণের দিন ভাবতে, বলতে করতে পাঁচ সাত দিন গেল।—রমা খবর নিয়ে এলো, ওর দাদা এসে কোন্ মামার বাড়ী না কোথায় উঠেছেন, সুপ্রিয়া সেই দিনই রাত্রের গাড়ীতে যাবে।

তারক এসে অজিত ও অজিতের বাড়ীর সকলের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করে গেল।

অজিতের পিতামহী নানাবিধ হা-হুতাশ বিলাপ করে কথা কইলেন, শেষ কালে বল্লেন, 'দেখ, কবে আছি না আছি এই তো সব ব্যাপার ? তা' তোমরা আসছ কবে ?'

অর্থাৎ ওরা যখন পাত্রীপক্ষ তখন ওরা ওঁদের প্রাপ্য যথোচিৎ তোষামোদ এবং

তৈলদান যথারীতি কেন করবে না। ওরাই বলবে, 'আপনারা কবে দয়া করবেন,' 'আমাদের যে কি হল', 'আমার দায়' ইত্যাদি। বিয়ে না হয় দেওয়া যায়, কিন্তু ওঁদের অতটা ঔদার্য্য সত্ত্বেও (ঐ রকম সোজাসুজি মেয়ে নেওয়া) ওরা যে খোশামোদও করবে না তার কি মানে ?

তারক ভালমানুষ ও ছেলে মানুষও, সে বল্লে, 'এখন আর ছুটি কই—কি করে আর আসব ? আর সত্যি আপনারও শরীরও খারাপ দেখ্‌ছি।'

পাত্রপক্ষরা যারা আশেপাশে ছিল, তারা ওর নির্বুদ্ধিতায় চট্‌ল, এবং আর একটি কথাও ও বিষয়ে কইবে না স্থির করলে। পিতামহী আর একবার-দুবার ইঙ্গিত করে বল্লেনও—'ও আর পড়বে কিনা, আর কোথায় পড়বে ইত্যাদি।'

তারক নির্বোধের মতনই—সে কথাতে কিছু বল্লে না। প্রাইভেট পড়বে—এই সব বলে।

ট্রেনের সময় হয়ে এলো।

রমারা গেল ষ্টেশনে দেখা করতে।

সুপ্রিয়া অজিত অপ্রস্তুত ভাবে দু'একটা কথা কইলে। তারপর হাজার মাইলের উদ্দেশে গাড়ী ছেড়ে দিল। আজন্ম কলিকাতাবাসিনী শ্যামা বাঙ্গলা দেশের মেয়ের চোখের সামনে থেকে শ্যাম জননীর পল্লবঘন স্নিগ্ধদৃষ্টিটুকু, মধুর শান্তশ্রী কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তর তর করে সরে ভেসে গেল

তারপর কখনো রুক্ষ শ্যামশ্রী বন-অরণ্যের মাঝ দিয়ে, ধূসর-উষর মুক্ত প্রান্তর বনভূমির মধ্য দিয়ে কখনো বা ছোট ছোট পাহাড়ের পাশ দিয়ে, সুপ্রিয়া আর তারক দুদিনেই গন্তব্য যায়গার কাছাকাছি এসে পড়ল।

পিতৃ-বিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে এবারে সুপ্রিয়ার মনে আরও কোন নিবিড় মমতার বন্ধন, কোন্ জননীর স্নেহনীড় ক্রোড়, শত তুচ্ছ ঘটনায় ঘেরা তার চেয়ে তুচ্ছ মধুর স্বপ্ন যেন সবেরই বিয়োগ হল।

ভাববার পক্ষে সুপ্রিয়ার বয়স বেশী হয় নি, কিন্তু অনুভবের দিক দিয়ে, তার মনের ঘুম ভেঙ্গে ছিল।

দ্রুতগামী ট্রেনের মধ্যে বসে সংখ্যাহীন দেশ-গ্রাম-নগর-পল্লী ছাড়িয়ে যেতে যেতে অন্য মনে তীব্র রৌদ্রভরা মুক্ত প্রান্তরের দিকে চেয়ে তার মনে হতে লাগল, যেন কোথায় কোন্ অনির্দেশ্য যাত্রার পথে সে চলেছে।

প্রতিভা মল্লিক

যথাসময়ে পরীক্ষার ফল সব বেরুলো। সুপ্রিয়া রমা সকলেই ভাল করে পাশ করছে। রমা কলেজে ভর্তি হল। আর তাদের কলেজে পড়তে এলো প্রতিভা মল্লিক।

তার বাপ মফঃস্বলের কোন এক যায়গার সরকারী বড় ডাক্তার। ছয় ভাইয়ের এক বোন। রং বেশ ফরসা, মুখখানি ভালো। কাপড়-চোপড় সাজ-সজ্জা ততোধিক ভাল রকমের। পাশও ভাল রকমেই করেছে। বাপ বলেন, পড়বে। বি-এ পাশ করলে কিংবা আই-এর পর বিয়ে হবে। মা ভাবেন, এইবার সম্বন্ধ করি, এই দলের ঘরের মেয়ে, যাদের তাড়াও নেই' অথচ সখও হচ্ছে বিয়ে দেবার।

সম্বন্ধও তার এগারো বছরে এসেছে এক সতর বছরের বড় লোকের ছেলের সঙ্গে, চোদ্দ বছরে এসেছে আর এক বড়লোকের বিদ্বান্ ছেলের সঙ্গে, তারপর পনরো ষোল, সতেরো সকল বছরেই সমানেই রকম রকম ঘরের রাজ্যের সম্বন্ধ এসেছে।

কিন্তু ওর বাবার মাথায় ফুল পড়ে নি। কুলোকে বলে, মেয়ের বাবার আবার এত জাঁক কিসের? এমনি করতে করতে সে কলকাতায় কলেজে পড়তে এলো, কোন জিলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে। সে যাই হোক, সে কিন্তু ঐ সম্বন্ধ আসার চোটে অনেক কিছু কথা নিজের সম্বন্ধে জেনে-বুঝে নিয়েছিল। অর্থাৎ ওর যে রূপ আছে, ওর বাপের অবস্থা ভালো, ও যে সাধারণ মেয়ের চেয়ে লেখাপড়া শিখেছে ও শিখছে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

কলকাতায় পড়তে এসে দেখতে দেখতে সতীর্থ মেয়েরাও সে কথাগুলো জানলে কতকটা!

এমন সময় রমার সঙ্গে পরিচয় সূত্র বেরিয়ে পড়ল। প্রতিভার মা যে রমার মা'র বকুল ফুল। যেহেতু রমার মা'র দিদির ননদের মেয়ে প্রতিভার মা, সেইজন্য ছোট বেলায় কদিনের ভাব-আলাপে তাঁরা পরস্পর বকুল ফুল পাতিয়েছিলেন এতদিনের সেই বকুল বন্ধুত্ব পুষ্পের যে সৌরভটুকু আজো মরেনি, হঠাৎ রমার মা ও প্রতিভার মায়ের মেয়েদের পরিচয় আলাপে সেটা সুবাসিত হয়ে উঠল।

সম্বদ্ধ ঘরের মেয়ে তার ওপর সুন্দরী, আবার লেখাপড়া, বাড়ীর সকল মেয়েরা—শতদল, কমলা, অজিতের ভাজেরা, মা তো বটেই সকলেই তাকে দেখা করবার জন্য আলাপের জন্য উৎসুক হয়ে উঠলেন।

সুন্দর মুখখানি হাসিতে ভরে, অকৃত্রিম গর্বের আনন্দে লজ্জায় বিকশিত মুখে প্রতিভা এলো।

কাপড়-চোপড়, শ্রীশোভা তো আছেই, তারপর গান। শ্রোতারা অন্তরালে, শ্রোত্রীরা সম্মুখে—সবাই মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকে। এদের সেকেলে বাড়ীতে রমা পড়েছে এবং স্কুল ছেড়ে কলেজে ঢুকেছে এই না ঢের!

আর প্রতিভা!

না মেয়ের মত মেয়ে! ওর বাপ যে কি করেছে আর না করেছে, আর কি আশ্চর্য মহিমা সংঘটন হয়েছে তার।

তার মধ্যে গান আরম্ভ হল। তা আবার শুধু গলায়। বাজনা না হলে গাইতে পারার আভিজাত্যটুকুও সে মৃদু হাস্যে জানালে। ওর বাবা বলেন, মেয়েদের হয় শুধু গলায় গান গাওয়া, না কোনো ভারেব যন্ত্রের সঙ্গে গান গাওয়াই উচিৎ, গলা খারাপ হয় না। ও একটু একটু সেতার বাজাতে শিখেছে আরও শিখবে। শ্রোত্রীরা দর্শিকারা অবাক হয়েই থাকে।

রমার মা মুগ্ধ হয়ে বল্লেন, 'দেখেছ মা, যেমন রূপ তেমনি গুণ, কি ভালো মেয়েটি!'

শাশুড়ী বল্লে, 'খাসা। বড় সুবুদ্ধি মেয়েটির।'

ওঁরা প্রতিভাকে যাবার সময় সময়ে অনুযোগ করলেন, ওর মা কেন এখানে এলে দেখা করে না।

ঝরা বকুলের সৌরভ নতুন টাটকা ফুলের মত অকস্মাৎ সুদূরবর্তিনী বহুদিন বিস্মৃত দুটি সখীর মনের আঙ্গিনা সুরভিত করে তুল্লে।

সব কথার মধ্যে যে কথাটা কেউ বললেন না, অথচ সবাই ভাবলে, সেটা হচ্ছে প্রতিভার সঙ্গে সুপ্রিয়ার তুলনা।

সাবিত্রী

পূজার ছুটি এসে পড়ল।

অজিত আর নিশীথ বেরিয়ে পড়ল বিদেশের উদ্দেশ্যে। সবাই বল্লে 'কোথা?—পুরী?—মাদ্রাজ?—দক্ষিণে নয়?' 'কোথায়—পশ্চিমে?'

ওরা বল্লে, 'কোথায় কে জানে।'

যারা প্রশ্ন করে, তারা ওদের ইচ্ছামত আরো বোকা সেজে জিজ্ঞাসা করে—'কোথায় পালাবে? কাশ্মীরে'?

ওরা বলে, 'ঠিক করিনি, যেতে পারি!'

যাই হোক, ওরা এখানে ওখানে পাঁচ সাত যায়গায় ঘুরে কাশ্মীরে নয়, রাজপুতানার উদ্দেশ্যে বেরুলো। এবং আজমীরে এসে পৌছল।

মরুভূমি পাহাড়ের ধূসর বালির প্রান্তরের দেশ তখন বর্ষার সামান্য একটু প্রসাদ পেয়ে শ্যাম হয়ে উঠেছে। বাংলার মত সর্বশ্যাম নয়, বাবলা ভরা প্রান্তরের বালিতে, মাঠে, সুদূর গিরি পর্বতে, রৌদ্রের সেই তীব্র জ্বালাভরা ভাবই যেন গেরুয়া পরা শ্যাম হাসিমুখ উদাসীন বৈরাগ্য-স্নিগ্ধ স্নেহে সবার পানে চেয়ে আছে।

আনা সাগরের সামনের পাহাড়ে বেশ শ্যাওলা পড়েছে। পাহাড়ের কোলে আনা সাগর থৈ-থৈ জলে ভরা। আশ্বিনের প্রথম, তখন রোদ্দুর মধুর হয়ে উঠেছে, বেলা ছোট হয়ে এসেছে। সকালখানি যেন কোমল মাধুর্যে অপরূপ, এমন সময়ে তারকদের বাড়ীর সামনে অজিতদের গাড়ী এসে দাঁড়াল। বিস্ময়ে, আনন্দে স্নেহভরে বাড়ীর লোকেরা অতিথিদের অভ্যর্থনা করে নিলে।

দেখা শোনার পালা এলো।

তারক বল্লে, 'আমার তো সময় নেই, তোমরা তোমাদের সঙ্গে মাকে খুসীকে ওদের সবাইকে নিয়ে যাও।'

তারকের বন্ধু সে দেশের আর এক ডাক্তারবাবু ছিলেন।

তিনি বল্লেন, 'তা হলে আমার মাকে দিদিকেও আপনার মার সঙ্গে পাঠিয়ে দিই।'

অজিত হাসলে, বল্লে, 'তাহলে আপনাদেরও আমি নিয়ে যাব, সকলকেই দেখাব। সে বরং গর্বের কথা হবে আপনাদেরও দেখিয়ে এনেছি'।

নিশীথ একটু হেসে বল্লে, 'যেতেন ওরা, যদি তেমন সুখবহভার থাকতেন স্কন্ধে, তখন তোমাকে আর কষ্ট দিতেন কি।—কি বলেন বিভাসবাবু।'

বিভাসবাবু উচ্চ হাস্যে সমর্থন করলেন।

তারক হাসতে হাসতে বল্লে, 'সে কথা আমায় বলতে পার না, আমার সুখবহ ভারটি তোমাদের আমি অনায়াসে দিচ্ছি।

অজিতের পানে চেয়ে নিশীথ একটু হাসলে,—ভাবটা, তোমারো তো সুখবহ

ভাবের আভাসটা খানিকটা পাচ্ছ মন্দ কি!' ডাক্তার সামনে বলে আর কিছু বল্লে না।

মেয়েদের কপালে সাবিত্রীর সিঁদূরের রাঙ্গা ফোটা; পরিশ্রম শ্রান্তিতে মুখ আরক্ত; অপরাহ্ন বেলার রক্ত সবিতা সাবিত্রী পাহাড়ের পাশে হেলে পড়েছেন; পশ্চিমটা রাঙ্গা হয়ে এসেছে; পূবের প্রান্তরে বালির উপরে পাহাড়ের ছায়া বাবলা জঙ্গলের ছায়া ঘন হয়ে পড়েছে; ওরা সব নেবে এলো। যাত্রী পথিক দলের হাসি পরিহাস, আলাপ গল্প, সহজ কথাবার্তা কখন পরিচয়ের লজ্জা, মেয়েদের মুখে তার আভাসখানি মাত্র রেখে চলে গেছে,—জড়তা অপ্রস্তুত ভাবটা সহজ করে দিয়ে।

সুপ্রিয়ার মা সকলকে সিঁদুর পরিয়ে সুপ্রিয়ার কপালে একটা বড় ফোঁটা টিপ পরিয়ে দিলেন।

নামবার পথে বিভাসবাবুর বোন সহাস্যে বল্লেন সুপ্রিয়াকে, 'তুমি কবে লোহাটা পরছ? এবার পরে ফেল।'

মৃদু হলেও কথাটা সকলেরই কানে গেল রাঙ্গা ফোঁটা পরা সুপ্রিয়ার দিকে চেয়ে,—নিশীথ বন্ধুর দিকে চেয়ে একটু হাসলে। বিভাসবাবু একবার সুপ্রিয়ার মুখের দিকে চাইলেন শুধু। ওঁরা কেউই জানেন না, ওদের সঙ্গে এদের কি সম্বন্ধ হতে পারে।

সুপ্রিয়ার কান লাল হয়ে উঠল।

শ্রান্ত যাত্রিণীরা অনেক পেছিয়ে আস্তে আস্তে নেমে এলো। সূর্য তখন একেবারে ডুবে গেছে।

পার্বত্যতীর্থের পথ শেষ করে ওরা যখন গাড়ীতে উঠল তখন তীর্থপথ সমস্ত সন্ধ্যার ক্লান্ত গাম্ভীর্যের অন্ধকারে আচ্ছন্ন। আঁকাবাঁকা পথ দুধারে পাহাড় রেখে, কখনো একধারে পাহাড়, বাবলা জঙ্গল, অজানা গাছে আগাছায় শ্যাম ঘন বন, পরিচ্ছন্ন ধূসর প্রান্তর পাশে রেখে গাড়ী আজমীর সহরের পথে মোড় নিল।

সুপ্রিয়া নির্বাক দৃষ্টিতে বাইরের মুক্ত আকাশের নীচে অসম অপূর্ব রুক্ষ সৌন্দর্য ভরা সন্ধ্যারাত্রির দিকে চেয়েছিল।

অজিতরা যখন বেড়াতে গেছে,—তখন প্রতিভার মায়েরা কলকাতায় এসেছেন। এবারে আর এ পাত্রের লোভ প্রতিভার মা ছাড়তে দিলেন না। অজিতের ঠাকুর্দা কিসের কারবারে অনেক আয় ও সঞ্চয় দুই'ই করেছেন।

সেকালে বনেদীঘর, আবার হালের চালও আছে। তাতে একালের ছেলে। মেয়ে দিতে জানা-শোনা ঘর।

যথা সময়ে প্রস্তাব এলো।

মনে মনে সকলেই এ কথাটা ভাবছিলেন—পিতামহীও, কিন্তু সেটা যখন স্পষ্ট হয়ে এলো, তখন আচমকা একটু থমকে গেলেন। একটুখানি ভাবনায় পড়ে কর্তার কাছে কথাটা উত্থাপন করলেন। তিনি তামাক ও খাতাপত্রের আড়াল থেকে গম্ভীর ভাবে প্রস্তাবটা শুনলেন। প্রথম কথাতেই কথার জবাব দেওয়া বা ঔৎসুক্য প্রকাশ করা তাঁর স্বভাব নয়।

ঠাকুমা নানা রকম ভনিতা করে বল্লেন, 'তা আমরা ও বাড়ীর বীরেশ্বরবাবুর মেয়েটির সঙ্গে কথা বলেছিলাম।'

'কি রকম? আমি তো জানি না' নলটা মুখ থেকে নামিয়ে কর্তা বল্লেন।

'না তুমি জান না। মেয়েটি ভাল, বাপ থাকতে আমি একবার বলেছিলাম।'

'তা কি পাকা দিয়েছ নাকি?'

'না, পাকা কোথায়?'

'তবে আর কি'—কর্তা কাগজপত্রে মনোনিবেশ করলেন।

মনের ভিতর খচ খচ করে যেন কি একটা অশান্তি হয়।

অজিতের ঠাকুমা তাঁর বধূমাতার কাছে যান।

অজিতের মা ভাঁড়ারের কি কাজে ব্যস্ত ছিলেন।

বিয়ের প্রস্তাব তাঁরও কাণে পৌঁছেছিল।

শাশুড়ী বল্লেন, 'বৌমা শুনেছ? ওরা বলে পাঠিয়েছে।'

'হ্যাঁ, শুনলাম।' কাজ রেখে মাথার কাপড়টা টেনে শাশুড়ীর কাছে এসে দাঁড়ালেন অজিতের মা।

'তা ওদের যে কথা বলেছিলাম তার কি করি?' চিন্তিতভাবে শাশুড়ী বল্লেন—'ভায়রুর মা কি মনে করবে?'

বড় বৌ কমলার মা ছিলেন সম্মুখে, তিনি বল্লেন, 'কি আর মনে করবে মা ? ওদের মেয়ে তো তেমন নয় আর কথাই বা এমন কি ?'

এবার অজিতের মা বল্লেন, 'মেয়েটার আয় নেই, পয় নেই বিয়ের কথা উঠতে না উঠতেই বাপ মরে গেছে।'

তা বটে। কথাট বিয়ের সম্বন্ধ ভাঙ্গাবার পক্ষে মজবুত বটে।

কমলার মা বড় বৌমা বল্লেন, 'নিজেদের বাড়ীর আয়পয়ও তো দেখতে হবে'।

কর্তা, পুত্র, আর বধূদের সঙ্গে খানিক জল্পনার পর নিষ্পত্তি হল, ওদের চেয়ে এদের সঙ্গে কুটুম্বিতা বাঞ্ছনীয় যখন, তখন ওদের কোন ছুতো দেখালেই চলবে। বেশী ধরাধরি করে কিম্বা মনে খুঁত থাকে তো ওদের মেয়ের বিয়ের সময় যৌতুক বলে কোন গহনা বা কিছু দিলেই সাহায্য করা হবে।

ভগবানের ইচ্ছায় ওদের তো কোনো অপ্রতুলই নেই।

চিঠি

'ওগো শুনছ ?'—বিছানার উপরে সেদিনের কাগজ পাঠরত তারক কি ভেবে স্ত্রীকে ডাকলেন।

আলোর কাছে কি গোছাতে ব্যাপৃত স্ত্রী জবাব দিলেন, 'হু, শুনছি।'

অর্থাৎ 'ওগো শুনছ' বলাটা তারকের মুদ্রাদোষ।

আর তার ঐ রকম জবাব দেওয়াটা তারকের স্ত্রী মনিকারও এখন মুদ্রাদোষেই দাঁড়িয়েছে।

তারক খবরকাগজখানা পাশে ফেলে একটু হেসে বল্লেন, 'কি বলছি তা না জিজ্ঞেস করেই যে হু বল ?'

দরজার পাশে একটা খস খস শব্দ হল, পর্দাটা নড়ে উঠল, সুপ্রিয়া ডাকলে 'দাদা'। তার হাতে দু' তিনখানা চিঠি, মুখে ওদের কথা শুনতে পাওয়ার মত অপ্রস্তুত হাসি। তার গম্ভীর দাদা এবং বৌদির [illegible]কমভাবে তরল আলাপের ধরনও একদিনো দেখেনি।

অনেক লোক থাকে যেমন বর্ণচোরা আমের মত, বাইরে নিতান্ত ভালমানুষ নিরতিশয় সাদাসিদে ধরনের লোক ; কাব্য কল্পনার ধার ধারে না, রহস্য-পরিহাস

মনে হয় যেন তারা করতে জানেই না। নিতান্ত সোজাসুজি, যে কাজে ব্যবসায়ী তাই দিনের পর দিন করে যায়, তারি মাঝে সংসারধর্ম বেশ ভালভাবেই প্রতিপালন করে। সংসার অতিশয় সহজভাবে মেনে নেয়। তারা তর্ক করে না, আলোচনা করে না, গল্প-গুজবে তাদের বিশেষ তৎপরতা ধরা পড়ে না। কিন্তু তাদের সঙ্গোপন জীবনের কোণে উঁকি মেরে যদি কেউ দেখে, হঠাৎ দেখতে পায়—তারা রসজ্ঞও, বুদ্ধিমানও, ভাবগ্রাহিতাও তাদের কম নেই; শুধু তারা আপনাকে প্রকাশের সঙ্কোচে কেমন নিরীহ হয়ে থাকে।

তারক ছিলেন এই ধরণের। তাঁর বয়েসের ছেলেরা সব তরুণ দলের, তাঁর দলের ছেলেরাও তরুণ ভাবের; তারকের নিরীহতা সংগুপ্ত রসবোধ তাদের কাছে হাসি-রহস্যের বিষয় ছিল।

কাজেই বোনেরা দাদাকে প্রায় ঠাকুর্দার মত সম্মান করত। আর ঘরে লেখাপড়া শেখা নিতান্ত ঘরোয়া বৌদিকেও গৃহিণীর সম্মানই দিত, সমবয়স্কের বা সম্পর্কের মত সঙ্গিনীর ভাবে নেয় নি। তাতে অবিবাহিত-বিবাহিতার বাধাও ছিল।

তারকও সুপ্রিয়ার মতনই অপ্রস্তুত ভাবেই বললেন, 'কিরে?' সে বললে, 'তোমার চিঠি এসেছিল তুমি ডাকে বেরিয়ে যাবার পর'—চিঠি খানতিনেক, একখানা কি কাগজ, সুপ্রিয় ফিরে যাচ্ছিল। তারক নাম-ঠিকানা দেখতে দেখতে বললেন, 'ও এটা দেখছি গোপীমোহন বাবুদের আপিসের ছাপওয়ালা খাম', (গোপীমোহন বাবু অজিতের ঠাকুর্দা)। তারপর বোনের দিকে চেয়ে একটু হেসে বললেন, 'তোমার ননদের বিয়ে বুঝি লাগল, স্ত্রীও উৎসুক হয়ে ফিরে দাঁড়াল। সুপ্রিয় সলজ্জ-সঙ্কোচে বেরিয়ে গেল।

বেশ ভারী, চিঠি, তারক সব আগেই সেটা খুললেন, পড়তে অনেকক্ষণ সময় লাগল।

উৎসুক দৃষ্টিতে মণিকা স্বামীর দিকে চেয়ে ছিল।

একবার পড়ে আবার এ-পাতা ও-পাতা করতে দেখে সে জিজ্ঞাসা করলে —'কিসের কথা, কি খবর এত?'

তারক চিঠিখানা তাঁর হাতে দিয়ে বল্লেন, 'পড়'। তিনি অন্য চিঠিগুলোও খুলতে লাগলেন।

চিঠি অজিতের কাকার—ঠাকুমা লিখতে বলেছেন, এইভাবে আরম্ভ এবং মস্ত চিঠি।

যথারীতি বহুদিন যাবৎ সমাচার না পাওয়ার চিন্তা, তারপর উৎকণ্ঠিত কুশল জিজ্ঞাসা,—তারপর নিজেদের বাড়ীর সব আধিব্যাধির ইতিহাস ইত্যাদির পর অজিতের মার বাল্যসখী ও তাঁর মেয়ে এবং তাদের অত্যধিক পীড়াপীড়ি এবং এ-পক্ষ থেকে পুরুষেরা তেমন করে সুপ্রিয়ার কথা জ্ঞাত না থাকায় ঐ সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতিদান,—তাছাড়া ওঁরাও অনেকদিন চুপচাপ ছিলেন (যেহেতু কালাশৌচের পর আরও ছয়মাস গেছে), ইত্যাদি ইত্যাদি,—তাই ওঁরা অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে বলছেন, তারা সুপ্রিয়ার জন্য অনুরূপ পাত্রের সন্ধান করে দিতে চেষ্টা করবেন। আর সুপ্রিয়াকে যৌতুকস্বরূপ কিছু গহনা ব কিছু দেবেন। এতো ঘরেরই কথা, রমারই মত মেয়েইতো। ওঁরা যেন কিছু মনে না করেন, আপনার লোকের মত সহজ ভাবেই নেন। আর পরিশেষে ঠাকুমা ওদের সকলকে আশীর্বাদ করছেন, সুপ্রিয়ারও যাতে ভালো বিবাহ হয় এই ওঁদের কামনা। নিতান্তই এড়ানো গেল না, কথা দিয়ে ফেলে ফেরানোও গেল না। কি আর করা যাবে; এইসব কথা।

তারপরে শেষের একধাপে পুনশ্চ দিয়ে লেখা, নিশীথের সঙ্গে ওঁরা বল্লেই হয়ত বিবাহ হতে পারে,—তাতে ওঁদের কি মত?

চিঠিতে যেমন ভদ্রতা, তেমনি সৌজন্য, তেমনি বুদ্ধিমত্তা; সব সত্ত্বেও মণিকা খানিকক্ষণ উর্দ্দু ভাষার মত কিছুই বুঝতে না পারার মত সেটা হাতে নিয়ে চুপ করে বসে রইল।

তারক কিছুই বল্লেন না আর।

মাঝে মাঝে তারকের হাতের কাগজের খচ্‌মচ্‌ শব্দ হয়। মণিকা অনেক কথাই ভাবছিল, কলিকাতার ঘনিষ্ঠতর আত্মীয়তা রহস্য-পরিহাসের কথা, তারপরেও অজিতের এবারে আসা, বেশী করে আলাপ-পরিচয়।

সুপ্রিয়া কিভাবে নেবে এটাকে?—অজিত কিভাবে নিয়েছে? ওঁদের চিঠির ভাবে তো মনে হল অজিত যেন কোনো আপত্তিই করেনি।—সেই কি সত্য? তবে? তাহলে?

সুপ্রিয়ার বয়স তো প্রায় আঠারো-উনিশ হল, নিতান্ত ছেলেমানুষ নয়তো। —মণিকা ভাবলে, ভালবাসার কথা না হয় থাক যদি বা সেটা থাকে, কিন্তু যে অপমান তাকে করা হল বিমুখ করে,—তার কথাও কি ওরা ভাবেন নি?—যৌতুক গহনা সৎপাত্রের উল্লেখে কি আরও তাকে অসম্মান করা হয়নি?

আবার পুনশ্চ দিয়ে—নিশীথের কথা।—

খোকা মশার কামড়ে ছট্‌ফট্‌ করে, মণিকা উঠে মশারি ঠিক করে দিয়ে শুয়ে পড়ল।

অঘ্রাণের নিস্তব্ধ ঠাণ্ডারাত্রি, চারিদিকে হিমের প্রলেপে কুয়াশা ঘিরে রয়েছে। মণিকা মুড়ি দিল।

তারক কাগজখানা একটার পর একটা পড়ে যাচ্ছেন, শুধু খস্‌ খস্‌ শব্দ হয়। না পড়া হলে দিনের সঙ্গে সম্বন্ধ ওর রাখা যাবে কি করে!

পাশের ঘরে মা আর সুপ্রিয়া শুয়ে।

সুপ্রিয়ার আলোটি তখনও জ্বল্‌ছিল, সেও দাদার মত পড়্‌ছিল, কাগজ নয় অবশ্য—কাব্য!

চিঠির সম্বন্ধে তার কৌতূহল পড়ার বই পড়্‌তে দেয়নি, কেবলি স্বপ্ন দেখাচ্ছিল যেন কত কি আশেপাশে, বন-নদী, শ্যামলা বাংলাদেশে, পরিচিত কতজন কারা।—স্বপ্নেরও সীমা সেই অবধি থমকে যায়, আর এগোয় না। ঘুরে ফিরে আবার তাই ভাবে। পরীক্ষা সন্নিকট হলেও তারপর আর ইতিহাস মুখস্থ করা চলে না।

ও পড়ছিল বই, ভাব্‌ছিল কিন্তু বইয়ের কথা নয়। তবে কবিতার লাইন-গুলো চমৎকার,—

হৃদয়ের সুর দিয়ে নামটুকু ডাকা,—যেন-মনে পড়্‌ল, ওকেও কবে ঐরকম ছোট নামে ডাকাটুকু।

ক্ষতিপূরণ

কিন্তু চুরি করে চিঠি পড়া এই প্রথম।

অত্যন্ত কৌতূহল আর নিজের বিষয়ে কৌতূহলই তাকে এই আশ্চর্য কাজ করিয়েছে।

সকালবেলা মণিকা স্নানের ঘরে। দাদা বাইরে। সুপ্রিয়া দাদার টেবিলের ধারে গিয়ে দাঁড়াল। চিঠি খোলাই পড়ে আছে, যেন ওরা আশ্চর্য হয়ে সেটা খামে রাখ্‌তেও ভুলে গেছে।

ও পড়্‌লে।

খুট্‌ করে শব্দ হল। স্নানের ঘর থেকে মণিকা বাইরে এলো। 'কিরে? কি দেখ্‌ছিস্‌?'

মণিকাও তেমনি অপ্রস্তুতভাবে পিছন ফিরে আলনা থেকে শাড়ী জামা সেমিজ পরতে লাগল।

দিনের কাজ একটার পর একটা করে সারা হয়। মার সঙ্গে কি কথা হতে পারে সে কথা তারক মনিকাকে কিছুই বল্লেন না। অঘ্রাণের রাত্রি খুব শীঘ্র শীঘ্র আসে। সন্ধ্যার পরেই শীতের দেশ, সব ঘরে ঢুকল।

মণিকা একটু অন্যমনে গম্ভীরভাবেই সারাদিন ছিল। যেন সুপ্রিয়ার সঙ্গে কি কথা কইবে ভেবে পাচ্ছিল না।

সন্ধ্যাবেলা ননদ-ভাজে ঘরে বসে কি দুখানা বই পড়ছিল। মা পূজার ঘরে।

সুপ্রিয়া হঠাৎ বল্লে, 'বৌদি দাদা চিঠির কি জবাব দেবেন ঠিক করেছেন?'

বৌদি একটু চুপ করে রইল, তারপরে বল্লে, 'কিজানি, উনি আমায় কিছু বল্লেন নি তো।'

সুপ্রিয়ার যেন আট ঘণ্টায় আট বছরের অভিজ্ঞতা গাম্ভীর্য বৃদ্ধি হয়েছিল।

সেও খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর বল্লে, 'তোমরা কি খুব ব্যস্ত হয়েছ বিয়ে দেবার জন্যে?'

বৌদি কিছুই বল্লে না।

সে বল্লে, 'ওরা আবার পুনশ্চ দিয়ে নিশীথবাবুর নাম লিখেছেন। আর গহনা দেবেনও বোধহয় তোমাদের আমার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ। আমরা ওদের মত বড়লোক নই, গরীব, তাও জানেন তো। তাই ক্ষতিপূরণ দিয়ে বদল দিয়ে ওর খেয়ালছলে যে কথা দিয়েছিলেন, তার দায়মুক্ত হবেন। আর আমিও সোনার কাঠি মতন জাগাতে ছোঁয়ালে জেগেছি, আর ঘুমাতে ছোঁয়ালে ঘুমব।'

'তুমি দাদাকে বোলো আমি ও চিঠি পড়েছি। আর ওদের নির্বাচনে আমার দাদার বোনের বিয়ে দেবার দরকার নেই। কেননা নিশীথবাবু কিম্বা আরও সব সৎপাত্ররাও আমার চেয়ে আরও ভালো ভালো মেয়ে পেয়ে যেতে পারেন, আর তখন আবার হয়ত এইরকম চিঠি তাঁদেরও দিতে হতে পারে। ক্ষতিপূরণ দিতে চেয়ে!—তুমি মাকে আর দাদাকে বোলো, আমি আরও পড়ব, বিয়ে দেবার চেষ্টা এখন যেন না করেন।'

মণিকা একটু থেমে তারপর বল্লে, 'আচ্ছা, বলব। তা তোর তো পরীক্ষাও এলো, যা পড়গে। কেন আর মাথা গরম করিস্।'

সুপ্রিয়া একটু হাসলে, বল্লে, 'না, মাথা গরম নয় তোমরা কি জবাব দেবে আমার ভাবনা হচ্ছে।'

'কিন্তু অজিতবাবু হয়ত জানেনও না। তাঁকে আর কি জিজ্ঞাসা করে চিঠি লেখা হয়েছে?' মণিকা বল্লে।

সুপ্রিয়া উঠ্‌ল। তার মুখ দেখা গেল না। সে যেতে যেতে বল্লে, 'তুমি কিন্তু মা'কে আর দাদাকে বোলো, আমার বিয়ের জন্য ওঁদের মতামত বা যৌতুকের কথার জবাব যেন না দেন।' মনে এলো, অজিতবাবু জান্‌তেও পারেন, না জান্‌তেও পারেন, তাতে কিছু আসে যায় না ওঁদের কাছে, ওঁদের নিজেদের প্রয়োজন হিসেবে মানুষের দাম, মানুষের অন্তরের সম্মান ওদের কিছু ভাব্‌বার নেই। মেয়েদের হিসেবে তো নয়ই। সুপ্রিয়ার জানা হয়ে গেছে। আর বেশী জানবার দরকার নেই।

মা বৌয়ের কাছে মেয়ের কথা এবং ছেলের কাছে চিঠির কথা শুন্‌লেন। চিঠিও পড়লেন। কিন্তু জবাব দেবার কি আছে যে তা আর ভেবে পেলেন না। আশ্চর্য হয়ে কি দুঃখিত হয়েও কিছু বলবার ক্ষমতাও তাঁর যেন ছিল না।

যথারীতি

অজিত আশ্চর্য, অবাক, বিরক্ত হয়ে গিয়ে ঠাকুরমার কাছে দাঁড়াল।

অজিত বললে, 'তবে ওঁদের সঙ্গে কেন কথা কইলে?'

অপ্রস্তুত ভাবে ঠাকুরমা বললেন, 'কথা অমন হয়, বলে লক্ষ কথা হয়।'

অজিত মা'র কাছে গেল।

মা বললেন, 'এ মেয়ে সবদিকে ভাল দেখেই তোমার দাদামশাই কথা দিয়েছেন।'

অজিত বললে, 'ওরা কি অপরাধ করলে?'

মা বললেন, 'অপরাধ আর কি?'

'আমার দিক তোমরা কেউ দেখ্‌বে না'—অজিত আর দাঁড়াল না।

মা বিরক্ত ভাবে স্বগত বললেন ছোট জার কাছে, 'মা-বাপে যার সঙ্গে বিয়ে দেয় তাকে বিয়ে করেই সকলে সুখে-স্বচ্ছন্দে থাক্‌ছে—মন্ত্র পড়ে বিয়ে হ'লে আপনি সব ভালো লাগবে। এতে আবার কথা। আর সুপ্রিয়া এমন কি সুন্দরী!'

বাড়ীর ধরনে সবাই সেকেলে, আচার-ব্যবহারে একচ্ছত্রা জ্যেষ্ঠাধিকার সম্পূর্ণ মাত্রায়; পুরুষরা সকলেই ছোটবড় সবাই পুরো অটোক্র্যাট মেয়েদের সঙ্গে

ব্যবহারে, মায়েরা ছোট ছেলেকেও ভয় করেন, বড় মেয়েকেও যা না করেন; আবার অটোক্রেসী পুরুষদেরও তেমনি সম্পর্ক, মান্যগণ্য হিসেবে কনিষ্ঠ জাতীয় পুরুষদের ওপরও কম চলে না। অর্থাৎ একটি ভাইপো বা ভাগিনেয়কে যাবতীয় কাকা জ্যেঠা মামা দাদা সকলের কাছেই তটস্থ থাকতে হবে। আর অজিতের বাবার জন তিনেক ভাই আছেন।

ভিতরে তবু কিছু বলাও যায়। বাইরে বিপত্তির মাত্রা বেড়ে গেল। শোনা গেল, জ্যেঠামশায় যিনি অজিতকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন, তিনি সস্নেহ হাস্তে অজিতের শ্রুতিগোচর করে নেপথ্যে তাঁর কনিষ্ঠকে অর্থাৎ অজিতের বাপকে বললেন, বিয়েটাকে এখনকার ছেলেরা বোঝে না, ওটা হচ্ছে কনভেন্‌শুন আর কনটেন্টমেন্টে মিশান একটা বিরাট কমপ্রোমাইস্‌ অর্থাৎ একটা জগাখিচুড়ী ব্যাপার আর কি।

সরিৎ এসেছিল বেড়াতে, শুনে সুপ্রিয়ার জন্যে আন্তরিক দুঃখিত হল। কিন্তু তাকে ডাকা হয়েছিল অজিতকে বল্‌বার জন্যই; কেননা তার মতামত কে কেউ মানবে না, বিয়ে করতেই হবে, মাঝ থেকে মতান্তর করে লাভ নেই।

সে বললে, 'ওহে বিয়েটা করে ফেল। ও দিল্লীর লাড্ডুর আস্বাদ পাও, নইলে পৃথিবীতে ঐ বিয়ে আর প্রেম ছাড়া আর কোনো তত্ত্বের সন্ধান পাবেনা।'

অজিত বল্লে, 'তার মানে?'

সরিৎ হাস্‌লে, 'বুঝছ না, বিয়ে না করা অবধি ঐ প্রেম নামক কমলিটি তোমাকে ছাড়ছে না। ওকে নিয়ে বিবাহিত জীবনের ডাঙ্গায় ওঠ, দেখ্‌বে, ও প্রেমও কিছু স্বর্গীয় বস্তু নয়, নিতান্তই সোজা ব্যাপার—আর বিয়েও নিতান্ত প্র্যাক্‌টিক্যাল জিনিষ,—এবং স্ত্রীটিও মোটেই একটি সনেট বা লিরিক্‌ কিছু নয়, কিন্তু ভাল লাগবে এবং দেখবে ক্ষণকালের অদর্শনেই এমনি অসুবিধা হবে, যে 'হিয়া দগদগি' তো কিছুই নয়, 'দিনরাতিয়া' কাটানোই দুঃসাধ্য হবে। এই জামার বোতাম নেই, সার্টের কলার ময়লা, জুতোর ফিতে কাল বাঁধতে ছিঁড়ে গেছে,—কাছাকাছি কোন ফিতেও নেই। খাওয়ার পরে পান নেই—থাক্‌লেও তাতে তোমার পছন্দ মত মশলা নেই। পান না খাওতো দেখবে মশলাতে লঙ্কার বিচি মেথি মেশানো। কত কি। শরৎকালের রাত্রে পরিষ্কার চাদরখানি বিছানায় পাবেনা, শীতের সময় নরম বালাপোষখানি দেখবে খুঁজে পাবেনা, বসন্তকালে মশারী ময়লা,'—

অজিতের পুরোনো তর্ক মনে পড়ে গেল, মৃদুহাস্যে বল্লে,—'তা হলে মানুষতো ঐ স্বাচ্ছন্দ্যের অভ্যেসই সবতো ?'

'আহা ঐ একই কথা। কিন্তু অস্বাচ্ছন্দ্য অনভ্যেস প্রেমতত্ত্ব চর্চার কম্‌লিই কোন্ তোমাকে ছাড়্‌ছে!—অর্থাৎ আমার থিয়োরী হচ্ছে—বিয়ে বিষক্ষয়! অভ্যেস দিয়ে অনভ্যস্ত প্রেমতত্ত্ব চর্চার নেশার কাঁটা তুলে একটু বাস্তব জগতে ফেরো।' অজিত রাগ করে,—কিন্তু নিরুপায় ভাবে হাসি পায়,—বলে, 'তাহলে এবারে রাম শ্যাম যদু হরির মতন ঐ তোমাদের মতে বিয়ে করা বৌ, হুঁকো, খুকি আরাম ব্যারাম এক করে দিন যাত্রা আরম্ভ করি!'

সরিৎ অট্টহাস্যে বল্লে, 'অতটা নয়।—তবে তুমিই বল কি করবে? লয়লা-মজনু হবে, না বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের মতন কবিতা লিখ্‌বে?'

অজিতের মনের আকাশে চকিতে সুপ্রিয়ার সাবিত্রী পাহাড়ে দেখা সিঁদুর টিপ পরা সলজ্জ সঙ্কুচিত মুখখানি ভেসে উঠল। কিন্তু—আর তর্ক কেউ করলে না, সরিৎএর মনেও দুঃখ হচ্ছিল।

যথারীতি শুভকর্মের দিন এগিয়ে এল এবং যথোচিত সমারোহে উভয় পক্ষে আদান-প্রদান চলতে লাগ্‌ল। বিয়ের জিনিষপত্র দেখে সকলেই প্রশংসা করলে।—এমন কি অজিতের বন্ধুরাও।

বরসভায় কে একজন বন্ধু বল্লে,—'না, অজিত তোমার ঠকা হয়নি, সব রকমেই ভালই পেয়েছ।'

নিশীথ চুপচাপ বুকে হাত বেঁধে দাঁড়িয়েছিল। সে একটু হাসলে, 'না ঠকা হয়নি বটে!'

অজিতের দিকে চোখ পড়ল। তার দৃষ্টিতে অজিতের যেন মনে হল, ঠকা হয়নি, কিন্তু ঠকানো হয়েছে।

অজিত

যথারীতি সব শুভকর্ম সম্পন্ন হয়ে যেতে লাগ্‌ল।

বাড়ীর যে আবহাওয়ার মধ্যে অজিত প্রতিপালিত, তাতে যে চিরকালকার মেনে নেওয়া স্বভাব ছিল, সেইটাই ছিল তার স্বভাবে প্রবল, আর শিক্ষায়, আধুনিকতায়, পড়ায়, তর্কে তৈরী আবেষ্টন সে তার চারপাশে রচনা করে—কল্পনা, আর ভাবলোকে, মায়ালোকে বিচরণ করত; যা তাকে নানা বিষয়ে

নানা মত দিতে শিখিয়েছিল ; সেটা ছিল তার নিতান্তই বাইরের জিনিষ—চিনি মাখানো ওষুধের বড়ির মত—যেমন ঘা পড়া ভেঙ্গে চুর হয়ে, সেই বাধ্যতাবাধ্য-বালক অজিত বেরিয়ে এল। তার তর্কের মুখের কথা, আলোচনা, তার মেলামেশা, কারুর যে ক্ষতি ক'রে এল, সেটা দেখতেও তার ভরসা হ'লনা। চিন্তাশীলতাহীন, মেরুদণ্ডহীন, সাধারণ বাঙালীর ছেলের মতই প্রেম, বিবাহ,—বিবাহপ্রথা, নারী, নারীর হৃদয় নিয়ে সে অত্যন্ত অগভীরভাবে ভেবেছিল, আলোচনা করেছিল। সেই আলোচনা যে অল্পবয়সের মনোধর্মের মুগ্ধতার মোহে কারুকে তার প্রতি আকৃষ্ট করতে পারে, সে তার ভাবতে ভালই লেগেছিল। তাতে সাহায্য করেছিলেন বাড়ীর সবাই।—বিশেষ করে সুপ্রিয়াকে তার মাঝে এনে যেন ছোট-বেলায় খেলা-ঘরের পুতুলের বিয়ের গম্ভীর অনুষ্ঠান করা হ'ল। তাতে খেলার ভাবও ছিল আবার সত্য স্বপ্ন দেখার সুযোগও ছিল। গুরুতর ভাবেও যেমনি, আবার অ-সত্য মনে করাবও বাধা ছিলনা এমনিভাব

কাজেই তার বই পড়া তর্কপরায়ণতা, আলোচনা যেমন খসে পড়ল সামনে নতুনতর রোমান্স দেখে,—সে মেয়েদের মতই নতুন আবেষ্টনে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিলে। আর তার সাধারণ বন্ধুরা সাধারণ বিয়ের 'বাজার' ও বাজারদর হিসাবে তার যে কতখানি বস্তুগত লাভ হয়েছে তারই হিসেব করত।

প্রতিভার বাপের দেওয়া কয়েক হাজার জিনিস ধারে সাজাবার টেবিল, চেয়ার আলমারী, পালঙ্ক, সস্তা বিলিতী গালচে সুজনী, তার দাম তার সৌখীনতা, সচরাচর যেমন লোকে আলোচনা করে খুঁটিয়ে দেখে তাই বলত।

অর্থাৎ সেই ঠিক হয়নি যেন পাওয়া আর না পাওয়াটাই বিয়ের ব্যাপারে চরম এবং হিসাব নিকাশ করে দেখলে জিনিসের দাম এবং দর তারই—তত্ত্ব এবং তথ্য যেন বিবাহের প্রধান বিষয়।

থাকতে না পেরে নিশীথ শুধু একদিন বলেছিল, 'যখন শ্বশুরের দেওয়া ঘড়ি আংটি শাল না হ'লে তোমরা পরতে পাও না, আর তত্ত্ব ভাল না হলে বাড়ীর লোকে খুশী হয়না, তখন ঠিক তো হয়নি নিশ্চয়। সব বিষয়ে যখন তোমরা লাভ ক্ষতির কথা ভাব, লেখাপড়ার লাভ কি—বই পড়ার লাভ কি—বড়-লোকের ছেলের শিক্ষায়—মেয়েদের শিক্ষায় লাভ কি, তখন এতবড় একটা বিষয়—তাতে লাভ-লোকসান না দেখে করা তো উচিতই নয়। ঠকবে কেন? ঠিকই তো।' অজিতের বন্ধুরা চুপ করে গেল।

অজিত তিক্ত বেদনায় নিশীথের কথা অনুভব করলে।

মনে মনে নিজের ক্ষতি হয়নি ভাবলেও আর কার যে ক্ষতি হয়েছে, সুপ্রিয়াকে যে অসম্মান করা হয়েছে, সে কথা অন্তরের কোন এক যায়গায় কাঁটার মত বিঁধতে থাকে।

—মনের দিকে কিন্তু সত্যাই কি ক্ষতি কোনোই হয়নি? নিতান্তই কি দেনা-পাওনার লাভ-ক্ষতির ব্যাপার এটা? অজিত ভাবে এক একবার। অবশেষে ক্ষতিপূরণ করে দেবার ব্যাকুল চেষ্টায় পিতামহীর আর প্রস্তাবের মত করেই সুপ্রিয়ার সঙ্গে বিয়ের কথা নিশীথকে বল্লে।

নিশীথ অবাক হয়ে গেল, তারপর বল্লে, 'এখন কি তোমার মতে বিয়ে করাটা বিয়ের নেমন্তন্ন খাওয়ার সামিলই মনে হয়? খুব সহজ এবং সোজা ব্যাপার? তা হলে তোমার মত বদ্‌লেছে।'

অজিত অপ্রস্তুত হয়ে বল্লে, 'না তা নয়—ওঁরাই বলছিলেন তোমার সঙ্গে হতে পারে তাই,'—বাধা দিয়ে নিশীথ বল্লে, 'তুমি বিয়ে করতে পারলে না—তার মানে বুঝি, তোমার বাড়ীর লোকেদের মত নেই। কিন্তু তোমার সঙ্গে না হলেই যে, আমার সঙ্গে হতে পারবে তার কি মানে আছে? আর আমি বিয়ে করব বল্লেই তাঁরা রাজী হবেন কেন? শাস্ত্রে বিকল্পে মধুর বদলে গুড়, অন্নের বদলে চিঁড়ে, দুধের বদলে জল চলে হয়তো, কিন্তু অজিতের বদলে নিশীথ, বন্ধুর বাগদত্তার আর এক বন্ধুকে বিয়ে করা চলে না কি? অত পরোপকার আর করিস্‌নি। তোদের এখন ওর দিক একেবারে না ভাবাই তার পক্ষে বেশী মর্যাদার।'

নিশীথ আর বসলনা, হেসে আস্তে বেরিয়ে গেল।

প্রবাসিনী

আলো প্রচুর ছিল যেমন আগে থাকত, আজমীঢ় মাড়োয়াড়ার প্রান্তরে তার শীত-গ্রীষ্মের সুতীক্ষ্ণ হিম তীব্রদাহ, স্বল্প ঘন বনে পাতা ফুল গাছও তেমনি চুপ্‌চাপ পৃথিবীর দিনযাপন দেখত।

সুপ্রিয়ার একে একে বি, এ, পরীক্ষাও হয়ে গেল। ওদের এদিকে আসা আর হয়নি। মা কেবলই ভাবতেন কত কি। আর গম্ভীর স্বল্পভাষিণী সুপ্রিয়ার মনের কথাও বুঝতে পারতেন না।

মণিকার খোকাখুকি, সুপ্রিয়ার পড়াশোনা,—বিভাসবাবুর মা'র ছেলের বিয়ের ভাবনা এইসব কথা-কাহিনীতে সুপ্রিয়ার মা'র দিন তবু কেটে যায়।

এমন সময় সুপ্রিয়ার দিদির মেয়ের বিয়ের নিমন্ত্রণ এল। সঙ্গে সঙ্গে চিঠি এল। 'মেয়ে যে কত বড় হয়ে উঠল, মা কি সেকথা ভুলে গেছেন? এমন ক'রে মেয়ে রাখলে লোকে যে অনেক নিন্দে করবে। পাত্রের অভাব আছে নাকি বাংলাদেশে? তোমরা একবার এসো, এবারে দিদি চেষ্টা করবেন; 'টাকা ছড়ালে' কিনা হয়? সুপাত্র পাওয়া যায় কিনা?' ইত্যাদি।

সুপ্রিয়া মৃদুহাস্যে বল্লে,—'দিদি যে আশ্বাস দিয়েছেন, আমার কলকাতায় যেতে ভয় করছে।'

ভাজ বল্লে, 'ভালই তো।'

মা বল্লেন, 'হ্যাঁ—' সত্যিই তো!

সুপ্রিয়া একটু হেসে মার কাছে ঘেঁসে বসে বল্লে,—'কেন মা, আমাকে তোমরা না হয় মনে করনা কেন বিধবা মেয়ে?'

'ষাট বালাই! তোদের সব কি মুখ!'

'তা' হলে কুমারী মেয়ে করে রাখ,' তারপরই ছোট ভাইপোকে এমন কাঁদিয়ে ক্ষেপিয়ে এমন ব্যস্ত করে তুল্লে, যে তাকে সে না থামালে আর কেউ থামাতে পারলে না। গম্ভীর আলোচনায় বাধা পড়ায় মা খুব রাগ করে বল্লেন, 'তুই যেন দিন দিন খুকি হচ্ছিস খুসী।'

খুসী সহজ-হাস্যে সাম্‌নে থেকে চলে গেল। পাহাড়ের গায়ের ছোট ছোট সাদা সাদা বাড়ীগুলো বক আর শ্যাওলা পড়া নীল পাহাড়কে নীল জল বলে ভাইপো-ভাইঝিকে দেখাতো।

মণিকা বল্লে শাশুড়ীকে, 'মা ওর অস্বস্তি হয় তাই চলে গেল।' নিজেদের জন্য না হোক, সুপ্রিয়ার জন্য না হোক, দিদির মেয়ের বিবাহে সকলকেই আসতে হ'ল। জীর্ণ-পুরানো বাড়ীখানি আরও পুরাতন হয়ে গেছে—আবেষ্টনও নতুন মনে হচ্ছে। রমাও বাড়ীতে ছিল, ছাদে উঠতেই তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। অপ্রস্তুতমুখে প্রচুর আনন্দের হাসি নিয়ে রমা এসে কুশল জিজ্ঞাসা করলে সখিকে।

শ্রাবণের শ্যাওলা ভরা ছাদে সন্ধ্যেবেলা বেড়িয়ে বেড়িয়ে দুটি পুরানো বন্ধু কত কথা গল্প করলে—ঠিক নেই তার। রমার বুঝি দুটি ছেলে।

সুপ্রিয়া সখিকে সব কথাই জিজ্ঞাসা করলে—রমা কিন্তু সখিকে তার নিজের কথা একটিও জিজ্ঞাসা করতে পারলেনা।

একবার শুধু বল্লে, 'আরও পড়বি?'

সুপ্রিয়া বল্লে, 'ভাব্‌ছি তো।'

তবু পুরোনো দিনের মধুর স্মৃতিতে, স্কুলের গল্পে নিতান্ত শৈশবের গল্পে সন্ধ্যা শেষ হয়ে এল।

রাত্রি হয়ে গেলো।—সুপ্রিয়া নেমে এসে জানালার ধারে শুয়ে পড়ল। পুরোনো শোবার ঘরখানি। মা আর বৌকে নিমন্ত্রণ বাড়ীতে কাজে ডেকেছে, তাঁরা গেছেন। ভাই-এর খোকা আর খুকি তার পাশে ঘুমাচ্ছিল। সে ক্লান্ত বলে যায়নি।

প্রতিভা

প্রেম জিনিষটা যে আসলে কি—মানুষের মনের সঙ্গে এবং বাস্তব জীবনের সঙ্গে এর কতখানি সম্বন্ধ, আর দাম্পত্যজীবনের ধরাবাঁধার মধ্যেই বা সেটা কতটা স্ফূর্তি পায় বা চাপা পড়ে; পূর্বরাগ বা অনুরাগ অথবা সেবা-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যেই বা সেটা কেমনতর ভাবে বেঁচে থাকে; সে সবই আসলে হ'ল তর্কের কথা, অন্ততঃ অজিতের কাছে বিষয়টা তাই ছিল বোধহয়—সুতরাং আর কথা ওঠে না। রাম শ্যাম সকলের মতই—রবীন্দ্রনাথের ভাষায় প্রথমে 'যার অদৃষ্টে যেমন জুটুক তোমরা সবাই ভালো হয়ে' 'সুকুমার রায়ের 'কিন্তু সবার চাইতে ভালো পাঁউরুটি আর ঝোলা গুড়'ই বোধহয় শেষটা দাঁড়াল।

এখন অজিতের কাব্য অজিতের প্রেমতত্ত্ব, অজিতের কল্পনা, ভাবনা, আরও নিজস্ব করে যে আধার পেয়েছে, তাতে জলের ওপর ছায়ার মত তারই মতামত, তারই কথা আলাপ, তারই ব্যক্তিত্ব প্রতিফলিত হয়। অর্থাৎ প্রতিভা সাধারণ বৈশিষ্ট্যহীন মেয়েদের মতই অজিতের কথাই সাজিয়ে-গুছিয়ে বল্‌বার চেষ্টা করে। আর সকলেই এবং অজিতও বাঙ্গালী স্বামীর মতই তার বিদ্যাবুদ্ধির তারিফ করে। যদিও খানিকক্ষণ পরেই সে কথায় আর রস থাকে না, কেননা তখন সেটা প্রতিভার কথা হয়ে যায়।

কিন্তু আসলে প্রতিভার বুদ্ধিবিদ্যার দরকার কার জন্য? কারোরই তো নয়! ও যেটুকু লেখাপড়া জানে, তা' না জান্‌লেও বা কি ক্ষতি, আর জানাতেই বা কি

লাভ? এই যে মতবাদ, এই বিপুল সৃষ্টিভরা জনমত, এর বিরুদ্ধে কার কি বলবার আছে যে, অজিত বল্‌বে? আর কি-বা বল্‌বে? এবং বলাবেই কি করে? যারা চিরদিন সন্তানের মা হবে, সন্তানকে ভালমন্দ যেভাবে হোক্ মানুষ করবে, মেয়েলী ধরনে ছোট-হীন কথা কইবে আশেপাশের লোকদের ওপর, এবং সেজন্য যত পুরুষ আত্মীয়রা স্বামী-পুত্র-ভাই-স্বজনরা তাদের অবজ্ঞা করবে, তাচ্ছিল্য করবে, তা সত্ত্বেও তারা কিছুদিন বেঁচে থেকে তারপর যথাকালে বিধবা হবে, কিম্বা সন্তান হতে গিয়ে মরে যাবে, নিজেদের প্রাকৃতিক কর্ম শেষ করে, এই যাদের গন্তব্য ও লক্ষ্য তারা লেখাপড়া শিখেই বা কি করবে? এবং না শিখ্‌লেই বা কি ক্ষতি হবে?

পৃথিবীব্যাপী এই বিপুল নিশ্চিত জনমতকে অজিতও নিজের অজান্তে সকলের মতই আস্তে আস্তে মেনে নিচ্ছিল।

আর তেমনি সাধারণ সবার মতই সব মেয়েদের মতই প্রতিভাবও তাতে ক্ষোভ বা দুঃখ ছিল না। অর্থাৎ প্রতিভা ধনীর দুলালীর মতই পাশ করেছিল পিতার খেয়ালে। যার আভ্যন্তরিক অর্থ হয় সৎপাত্রে বিবাহ, বাইরের অর্থ হয় সভ্যসমাজের অন্তর্ভুক্ত; শিক্ষাও নয় জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষার উৎকণ্ঠাও নয়

সুতরাং তেমনি ভাবেই প্রতিভা প্রথামত নিয়ম মত অভ্যাস মত সকাল বেলা থেকে সন্ধ্যা অবধি ধনী গৃহের বধূদের মত কাজ করে, সৌখীন সেলাই করে। এবং নিতান্ত রসচর্চা যুক্ত গল্পগুজব করে, সমবয়সীদের সঙ্গে। তারপর রাত্রে যথারীতি শোবার ঘরে গিয়ে পান খায়, পান রাখে স্বামীর জন্য, খোকার ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে জানালা-দরজা বন্ধ করে, এমনি এটা-সেটা করে হয়ত বা গল্প করে কারুর সঙ্গে। নতুন মাসিকপত্র এলে হয়ত গল্পও পড়ে। আর তখন কোন দিন হয়ত কোন বই পড়তে পড়তে অজিতের মনে হয়, কাকে যেন শোনাবে সেটা। আর ওকে শোনায়, কেননা প্রতিভা পাশ করেছিলো।

তা প্রতিভা শোনে—যেমন করে স্বামীর জন্য অতি যত্নে পান সাজে, এবং পানের ভাল সাজার গর্বও মনে রাখে; যেমন করে স্বামীর বালিশের ওয়াড়ে সেলাই করে ফুল তোলে, ঠিক তেমনি ভাবে শোনে। রস-বোধ দিয়ে নয়, মনোযোগ দিয়ে। স্বামী বিদ্বান এবং রসিক বলে খ্যাতি আছে, আর ওকে তিনি শুনতে ডেকেছেন, বলেছেন, এইভাবে নিবিষ্ট হয়ে শোনে। তার একটি লাইনও সে হেসে বা হালকা কথা হলেও হালকাভাবে উপভোগ করে না।

এবং মাঝে মাঝে সেটা মনে রাখারও চেষ্টা করে। কোনো সময় হয়ত গর্বিত-ভাবে সঙ্গিনীদের কাছে কণ্ঠস্থ বলে যেতে পারবে।

আর অজিত শোনায় বটে, আনন্দ পায়না। কিন্তু স্বামীত্বের, অধিকারিত্বের মোহ তো আছে, সে মোহ তো আর অধিকারবাদে কম জিনিষ নয়। প্রতিভা তার জিনিষ, একান্ত তারই, বুদ্ধি আছেই অবশ্য, কেনই বা না বুঝবে!

কিন্তু অজিত সেদিন আর পড়ে না, হয়তো পড়তে ভাল লাগেন। হয়ত তার অজ্ঞাত চেতনায় মনে হয় বা ভয় হয়, প্রতিভা যদি রূপকথা শোনা ছেলের মত বলে, 'আর একটা বলো।'

সেদিন শ্রাবণের রাত্রি। অহেতুকীবর্ষণ মানুষের মনকে অনর্থক উতল করে তোলে। পুরাতন রস মাধুর্যের উপলব্ধির চেতনা জাগাতে তারা অনেকখানি। অজিতের হাতের কাছে ছিল একটা কবেকার মানসী ও মর্মবাণী। পাতা উল্‌টাতেই সে পড়্‌ল একটি কবিতা—রবীন্দ্রনাথের।—

প্রথম ক'লাইনের পর অজিত মুগ্ধ হয়ে বল্লে' 'শোনো শোনো, কি সুন্দর—

'সেদিন বাতাসে ছিল তুমি জানো
আমারি মনের প্রলাপ জড়ানো,'

প্রতিভা একটু হেসে বল্লে, 'কবে?'

অজিত পত্নীর আকস্মিক সরস মন্তব্যে আশ্চর্য ও আনন্দিত হল, জিজ্ঞাসা করলে 'পড়েছ'? এবার প্রতিভা বল্লে, 'না। কিন্তু জানো, ও বাড়ীতে ওরা সব এসেছে—সুপ্রিয়ার গো', তোমাদের ও'নাকি খুব কবিতা বোঝে?' আচমকা অপ্রত্যাশিত খবরে এবং প্রশ্নে অজিত একটু থমকে গেল। প্রশ্নকে এড়িয়ে সে প্রশ্ন করলে, 'কে বল্লে তোমায়?'

'ওই ঠাকুরঝি'র সঙ্গে গল্প করছিল ছাদে, তেমন ফরসা তো নয়, আর কি লম্বা যেন—।' প্রতিভা খোকার বিছানা ঠিক করতে লাগল। অজিত চুপ করে রইল। মনে পড়ল,—সুপ্রিয়া ফরসা নয় তত, রোগা আর লম্বাও।

প্রতিভা সন্তুষ্ট হয়েছিল। এবার বল্লে, 'বিয়েও হয়নি। আর পুরানো ঝি'টা বল্লে কি জানো, বল্লে, আহা দিদিমণির কবে বা বিয়ে হল, কবে বা কি হল। তার মা নাকি শুনে খুব খাট্ খাট্ করেছেন।' প্রতিভা নিজের অজ্ঞাতেই একটু হাস্‌লে। হাসি ওর স্বভাব, ওকে নাকি হাস্‌লে বেশ ভাল দেখায় কে বলেছিল।

অজিত নীরবে পাতা উল্টোতে থাকে। প্রতিভা আপন মনে দু'একটা কথা

কয়। ছেলেকে আদর করে। অজিত চুপ করে বই হাতে শুয়ে শুয়ে ভাবে। প্রতিভা পাশের বিছানায় ঘুমোয়।

হাঁ সে সুপ্রিয়ার চেয়ে ফর্সা, সে দেখতে ভালো, সে ধনী পিতার আদরিণী মেয়েও ; অজিত অন্য মনে তার চিন্তাশীলতাহীন, ভাবহীন, বুদ্ধির দীপ্তিশূন্য, স্বাস্থ্যসম্পন্ন শিশুর মত গোলগাল মুখের দিকে চায়! হাঁ, শিশুর মতই সময় কাটাবার জিনিষ। প্রায় ভুলে যাওয়া আর একটা মুখ মনে পড়ে পাশাপাশি। তীব্র আগ্রহে মনে হয় সুপ্রিয়া কি তেমনি আছে! ওকি সত্যই সুপ্রিয়ার ক্ষতি করেছে!

সঙ্গে সঙ্গে কি এক কষ্টে-বেদনায় যেন মনে হয়, শুধু কি সুপ্রিয়ারই ক্ষতি করেছে! তার ঘুম আসে না। কোমল পল্লব-ঘন দুটি চোখের মধুর সরল দীপ্তি মনে পড়ে। আর সাবিত্রী পাহাড়ের কথা। সুপ্রিয়াকে দেখতে কৌতূহল হয়। কিন্তু ওর আর সুপ্রিয়ার দিকে মুখ তুলে চেয়ে দেখবার সাহস নেই। ঘুরেফিরে যেন মনে জাগে, কবেকার কোন্ কয়েকটা দিনের কথা। কয়েকটি দিন মাত্র, কিন্তু তার গাঁথুনি কি জমাট, নিরেট, মনে আছে আজও।

বাইরে অন্ধকার, পৃথিবী ভরে বৃষ্টি পড়তে থাকে।

শ্রাবণের বর্ষণ, মনের প্রলাপ, ভাবনা, পুরোনো স্বপ্ন মিলিয়ে কেবলই মনে আসে ;

'সেদিন বাতাসে ছিল তুমি জানো
আমারি মনের প্রলাপ জড়ানো।'

বোঝা যায়না, সেদিনের প্রলাপমুগ্ধ মন সত্য, না আজকের সংসারযাত্রা-তৃপ্ত হৃষ্ট অজিত, অথচ এই ব্যাকুল অজিত সত্য? আলো নিভিয়ে অজিত শুয়ে পড়ল। অর্ধেক ঘুমে-জাগায় ভোর হয়ে গেলো!

স্তিমিত আলো, ভোরে ঘুম ভাঙতে উঠেই চোখে পড়ল পাশের বাড়ীর জানালায় বসে একটি মেয়ে। নীচু মুখে পথের দিকে চেয়ে আছে। আধখানি মুখ, স্নিগ্ধ ঈষৎ পাণ্ডুর উজ্জ্বল শ্যাম রঙটি, পরিষ্কার কপালখানির আধখানা তার-উপর রাত্রের এলোমেলো চুল দু'একটা পড়েছে, নত চোখের পাতা-গালের ওপর ঘন ছায়া রচনা করেছে।

সে সুপ্রিয়া—

অজিত ব্যাকুল হয়ে সরে গেল, সে দেখতে পায়নি। কর্মময় সকাল, কলকাতার একঘেঁয়ে বিশ্রী সেই সকাল, সেই খবরের কাগজওয়ালার বিচিত্র

উচ্চারণ, চন্দ্রপুলিওয়ালার, খাবারওয়ালার একসুরে ডেকে চলে যাওয়া, ছোট-ছেলেদের মিষ্টিমধুর কোলাহল সকলবাড়ির বারান্দায় রকে, কলের জলের নিরবচ্ছিন্ন শব্দ, রকের ওপর সংবাদপত্রের পাঠক-সভা, সব অতিক্রম করে অজিতের থেকে থেকে সুপ্রিয়াকে মনে হতে লাগল। ও যেন তপস্বিনী উমা, ললিত দীর্ঘাঙ্গী, কৃশতনু দেহখানি যেন একটি প্রদীপের দীর্ঘ শিখা। ও যেন সাধারণ নারী নয়। নিতান্তই খেলা করার মত, অবজ্ঞা করার মত, অবহেলা করার মত নারী নয়। ওকে অপ্রাপ্য প্রিয়া দয়িতা মনে করে ধ্যান করা যায়, কিন্তু ওর তপস্যা ভঙ্গ করা যায় না। ও যেন নিজেও পূজারিনী, আবার পূজা করতেও হয়।

সুন্দরী হৃষ্টপুষ্ট দেহ, লঘু হাস্যমুখী প্রতিভাকে নিয়ে ঘর করা চলে, কিন্তু সুপ্রিয়া ?

না, সুপ্রিয়া যেন আরতির মন্ত্রের ছন্দ। সন্ধ্যার ঘনিয়ে আসা অন্ধকারে গোধূলি আরতির জন্য জ্বালা কর্পূরের শিখার আলো। ও যেন ধ্যানের জন্যই। অভিভূত মোহ বেদনায় অজিত ধ্যান করে।

দিদি

নিজের কন্যাদায় মুক্তির পর নিশ্চিন্ত নিঃশ্বাস ফেলে সুপ্রিয়ার দিদি সন্ধ্যাবেলা মা'র সঙ্গে পরামর্শ করছিলেন।

দিদি বল্লেন, 'এ মাসে আরও চারটে বিয়ের দিন আছে। এই একুশে, পঁচিশে তারপর আটাশে আর বত্রিশে। এর মধ্যে মা, আমি খুসীর বিয়ের সব ঠিক করে দিচ্ছি।'

মা আশ্বস্ত হচ্ছিলেন এবং সুপ্রিয়া হাসছিল।

দিদি বল্লেন, 'আমার ননদের একটি ভাসুরপো আছে এইবারে এম, এ, পাশ করেছে একবার তার খোঁজ নিয়ে দেখি। তার পছন্দ করবে মেয়ে, খুসী এখনো বেশ ছোট আছে।'

সুপ্রিয়া মৃদুহাস্যে বল্লে, 'দিদি আমি যে আসছে বছর এম, এ, দেব। আমি যদি তাকে পছন্দ না করি ?'

তারক হাসছিলেন। ছোট বোনটির অমনি খেয়ালখুশী মত কথা শোনা তাঁর অভ্যাস ছিল। সবগুলো সভ্য হোক্ আর না হোক্। দিদি চোখ কপালে তুলে বল্লেন, 'শোন কথা! তুই পছন্দ করবি কি রে ?'

'হ্যাঁ দিদি, এবার আমি তাদের জিজ্ঞাসা করব। কত মাইনে পায়; কেমন স্বভাব সব!'

মা বল্লেন, 'খুসী, থাম্ দিকি বাছা!'

সুপ্রিয়া একটু হেসে উঠে গেল।

দিদি বাংলা দেশের নানাবিধ সুপাত্রের যথোচিত গুণ ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। ভালো ছেলের অভাব তো নেই-ই, উপরন্তু তারা 'পণ' কম নিয়ে বিয়ে করতে পারে। যদি দিদি আর 'ইনি' অর্থাৎ দিদির স্বামী চেষ্টা করেন।

সুপ্রিয়া ঘরে যেতে মণিকা এদিক-ওদিক অনেক কথার পর জিজ্ঞাসা করলে, 'আচ্ছা ঠাকুরঝি একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?'

'বলনা, কি এমন কথা, যে অনুমতি চাচ্ছ?' সুপ্রিয়া হাসলে।

'তোর কি সত্যিই অজিতবাবুকে ভাললেগেছিল' অনেক ইতঃস্তত করে ভাষাটিকে সাজিয়েগুছিয়ে মণিকা প্রশ্ন করলে।

সুপ্রিয় চুপ করে রইল একটু। মণিকা একটু অপ্রতিভ হয়ে বল্লে, 'তুইকি—'

এবার সুপ্রিয় চমকে উঠল, একটু অপ্রস্তুত ভাবে হেসে বল্লে, 'না, না, আমার কোনো অমনতর অদ্ভুত জিনিষ মনে নেই। তবে অজিতবাবুকে ভাল-লাগা? হয়ত ছোট ছিলাম, তেমন দেখিয়েছিলেও, তাই একটু ওসব ধরনের স্বপ্ন দেখেছিলাম। সে তো আমার মনেও নেই। কিন্তু এখন? না, আমার কিছু ভাববার নেই।'

মণিকা বল্লে,—'তবে তুই বিয়ে কর এবার, আর কতদিন এমনি করে থাকবি।'

'কেন বৌদি, কি মন্দ আছি? বিয়ে করলেই বা আমার কি চতুর্বর্গ লাভ হবে?'

মণিকা—'করতে তো হবে একদিন।'

'তা হয়ত হবে, কিন্তু এখনি কি তাড়া। আমি এম, এ, দেব না।' মণিকা হাসলে, 'পাশ করলেই বা তোর কি চতুর্বর্গ লাভ হবে? আমরা তোর জন্যে নিশীথবাবুদের সঙ্গে কথা কই?' সুপ্রিয়ার কান লাল হয়ে উঠল, একটু থেমে তারপর বল্লে, 'অর্থাৎ নাকের বদলে নরুন তোমাদের চাই-ই। যেন তেন প্রকারেণ তোমরা রাজপুত্র, কোটালপুত্র করে সকলেরই বিয়ে একটা দিয়ে নটে গাছটি সুখে স্বচ্ছন্দে মুড়োতে চাও-ই।' মণিকা অপ্রস্তুত হয়ে গেল কিন্তু তার কথায় হেসে বল্লে, 'তা নটে গাছ মুড়োতে হবে বৈকি। আর কোটালপুত্র হলেনা, ভালই হবে করে দেখ। ওকে তুই তো দেখেছিস?'

সুপ্রিয়াও হাসলে, 'হ্যাঁ আমি তো করে দেখি। আর ফিরবে, না তো, তখন? হ্যাঁ আমি অজিতবাবু, নিশীথবাবুকে দেখেছি এবং আরও অনেক বিয়ের বর আর সৎপাত্রের কথা শুনেছি। তারা ভালো এবং ভালো ছেলেও, আর অনেক ভালো ভালো মেয়েও তাদের জন্য আছে। তারা বিয়ে-থাওয়া করে সংসারের নটে গাছ স্বচ্ছন্দে মুড়িয়ে দিতে থাকুক, আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আমাকে তারা স্বচ্ছন্দে রাখতে পারবে না? সে রিস্কে আমারো কাজ নেই।'

'তা হলে তোর মতটা কি?' মণিক জিজ্ঞাসা করলে।

'মত আমার বিশেষ কিছুই নেই। তবে আমাকে আর তোমরা সাজিয়ে-গুজিয়ে কনে দেখিয়ে কিংবা বড়লোক গহনাগাটির লোভ দেখিয়ে, বাংলাদেশভরা এই রকম সৎপাত্র দেখিয়ে বিয়ে দিতে পারবে না। আমিই যদি কোনদিন বিয়ে করি, ও রকম সৎপাত্রকে করব না, পুরুষ মানুষকে করব!' মনিক হাসলে, 'মানে? ওরা কি সব মেয়েমানুষ?'

সুপ্রিয়াও হাসলে, বল্লে, 'না তার চেয়ে বেশী, ওরা ছেলেমানুষ। ওরা এখন স্বপ্ন দেখুক, আমি ওদের ভাবনা ভাবতে পারবনা। থাক বৌদি—আর কথা আছে?'

মণিক দুঃখিত ভাবে বল্লে, 'না'

সুপ্রিয়ার কাজ

সুপ্রিয়া পাঞ্জাবের কোনো এক কন্যা গুরুকুলে কাজ নিয়েছে। মা'র মত একেবারে না থাকলেও, মা বুড়ো হয়েছেন এবং যত বয়স বাড়ছে, তার ততই দুঃখও বাড়ছে। এ কি 'ন দেবায় ন ধর্মায়' হয়ে রইল সুপ্রিয়া। ছুটিতে সে আসে আর শুনে হাসে। সে বলে, 'মা কোনটা দেবায় আর কোনটা ধর্মায়?'

মা আগে রাগ করেন। স্পষ্টই বলেন, বুড়ো হলে পাকাচুলের কথা বুঝবি। আর বিভাসবাবুর জননীর কাছে তাঁর ছেলের আর নিজের মেয়ের ভারতছাড়া একগুঁয়েমীর কথা বলেন এবং মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর অনেক দোষ দেন। বিভাসবাবুর জননীরও অনেক দুঃখ। ছেলেমেয়ে যেমনই মানুষ করা হোক না, বিয়ে দিতে না পারা কি কম দুঃখ? বিভাসের কি অভাব? ওদের

অবিবাহিত থাকার কোন মানেই হয় না। সুপ্রিয়ার কিন্তু মনে হয় সে বেশ আছে!

কন্যা গুরুকুলের বিশেষ ধরনের পড়া, নানা জাতীয়া ছাত্রীমণ্ডলী, তার মনে পড়ে সেই ঈর্ষাকৌতূহল ভরে অজিতের বর্ণনায় কবেকার শোনা মেয়েদের কথা। পাঞ্জাবী, শিখ, ক্ষেত্রী, রাজপুত, ভাটিয়া, বেনিয়া, ব্রাহ্মণ, কাশ্মীরী নানাবিধ উচ্চ-অনুচ্চ বর্ণের ঘরের বালিকা, সেই সব নিয়েই তার কাজ। উজ্জ্বলবর্ণ, দীর্ঘ ছন্দ তনুশ্রী, দীপ্তদৃষ্টি, অশতিপক্ক স্বভাবা, সরল তেজস্বী মুখ, অজানা ভাষা-ভাষিনী নানাবিধ শ্রেণীর বালিকা তারই ছাত্রী আজ। মনে মনে সে অজিতের কথা সমর্থন করে এখন।

এরা যেন সব গৌরী-পার্বতীর দল। বিবাহের বাজারের জন্য মা-মাসী-পিসিদের বা অন্য স্বজনদের সহায়তায় এদের একাধারে বিরুদ্ধ, অবিরুদ্ধ, প্রয়োজনীয়-অপ্রোয়জনীয় নানাবিধ বিদ্যায়—সেলাই, গান, রান্না, বাজনা, লেখাপড়া, নাচ এবং অন্য অনেক রকম ন্যাকামিতে সুদীক্ষিত পারদর্শিনী করে তোলা হয় নি। কচি কচি কিশোর মুখগুলি আজও যেন কুমারী গৌরীর মত অপরূপ ভাবে আছে। যেন সব দুহিতা। দায়গ্রস্তের কন্যাভার নয়।

এই একরাশ কমলা, কৌশল্যা, সুমিত্রা, সুশীলা, লছমী গৌরীর দল নিয়ে তার কাজ।

মিষ্ট সুরে তারা হাসে। অজানা অতিজানা ভাষায় তার কথা কয়, লঘু চঞ্চল আনন্দ লীলায় ঘুরে বেড়ায়। সুপ্রিয়ার তাদের ওপর মোহ স্নেহের অবধি ছিল না। যেন মনে হয় ঐ এক একটি মেয়ে তারই কোন বিশেষ আপনার আত্মীয়; তারই অভিভাবকতায়, তারই দায়িত্বে, তারই হাতে মানুষ হয়ে উঠ্‌বে। সঙ্গে সঙ্গে কোন্ অজ্ঞাত মধুর স্নেহ রসে বেদনায়—কুমারী নারীর অজানা মোহে তার অন্তর ভরে ওঠে। ঝগড়া করে তারা ওকে অভিযোগ জানায়, খুব ছোটরা এসে জড়িয়ে ধরে আদর করে, অন্যকে আদর করলে অভিমান করে। সুপ্রিয়ার সমস্ত ধ্যান আর কাজ যেন এক হয়ে ওঠে তাদের নিয়ে। পুরুষদের মত অবসর কালের জন্য মোহকে মমতাকে কাজের সময় নিতান্তই কাজকে, বাস্তব কর্মদক্ষতাকে, প্রয়োজনের জন্য প্রয়োজনকে, সে পৃথক করতে পারলে না। তার নারীর মধুর মন, যা নিতান্ত শুকিয়ে যায়নি, গভীরতর হয়ে অন্তরের মাঝে সংগুপ্ত হয়েছিল, সেটা যেন অকস্মাৎ কুমারী কন্যাদলের মধ্যে খানিকটা মোহ,

খানিকটা স্নেহ, খানিকটা আপনার কিশোর স্বপ্নের আকার ধরে ওকে ওদের মাঝে মিশিয়ে দিলে।

স্কুলের কন্যারা অসুস্থ হ'লে পীড়িত হ'লে ও দেখ্‌তে যায়, খবর নেয়, তারা ওকে ভালবাসে। তাদের মধ্যে কৌশল্যার পিতামহী ওকে খুব স্নেহ করেন। নানারকম কথা সেকেলে গৃহিণীর মত জিজ্ঞাসা করেন। কি জন্য কাজ নিয়েছে, মা বাবা আছেন কিনা, ভাই আছেন কিনা, সাহায্য কর্‌তে হয় কিনা—বাঙালীর আচার-ব্যবহার কিরূপ ইত্যাদি।

হাতীর দাঁতের মত সাদা রঙ একমাথা পাকাচুল, এক হাতে কিসব গহনা, পারিবারিক কোন শোকের চিহ্ন স্বরূপ, অন্য হাত খালি ; ক্ষেত্রাণী বুড়ী সুবিধা পেলেই দেখা হলেই বসে বসে অনেক কথা কয়। বাঙালী ঘরের অজানা দেশের এই শ্যামা তরুণীটিকে নিয়ে তার কৌতূহলের অবধি ও স্নেহের অভাব ছিল না।

সুপ্রিয়া তাদের ঘরের শিশুদের নিয়ে আদর করে, খেলা দেয়। বুড়ী হাসে। নানা কথা কয়। বলে, 'তোমার মা তোমাকে অমন করে ছেড়ে আছেন, কিছু বলেন না?' সুপ্রিয়া হাসে জবাব দেয় না। হঠাৎ বুড়ী বলে বসে, 'বেটী, সাদি নেই করোগী?'

সুপ্রিয়া লাল হয়ে ওঠে, ওদের ভাষায় বল্লে, 'না সে কথা ভাবিনি। বুড়ী হেসে চুপ করে যায়। আবার বলে, 'বয়স কত?' সেকেলে মানুষ লজ্জা সঙ্কোচ করে না। সুপ্রিয়া বলে, 'পঁচিশ।'

বুড়ী বলে না আর কিছু, ওর ভাবটা এই যে তা হলে তো বড় হয়েছ। স্বামী-সন্তান-পুত্র-পৌত্রাদি পরিবৃত সংসার-যাত্রার মধুরতা-তিক্ততা থেকে যে নারী দূরে রইল, তার জন্য তার সহানুভূতির অন্ত নেই,—তার মা কেমন?

ছুটির দিনে সে আজমীড়ে যায়। মার অনুযোগ-অভিযোগ অভিমান-স্নেহে ভাইয়ের ভাজেদের আদরে দিন কেটে যায়। বিভাসবাবুর মা'ও নেই, তাই আরও দুঃখ।

বিভাসবাবু ভর্তি হয়েছেন কাছাকাছি কোন ক্যান্টনমেন্টের হাসপাতালে। মাঝে মাঝে এক-আধদিন এসে তাঁরা ওদের ওখানে অতিথি হয়ে কাটিয়ে যান। বিভাসবাবু সোজাসুজি অর্থাৎ কাঠখোট্টা মানুষ। অত সম্ভ্রম, কাবা, সমীহ-সঙ্কোচের ধার ধারেন না। ঈষৎ শিথিল পর্দা; প্রবাসে খুব সম্মান করে মেয়েদের আপনি বলে কথা কন, অথচ ছেলেমানুষের মত কথাবার্তা। মল্লিকা হেসে স্বামীকে বলে, 'ডাক্তার বাবুটি তোমার বেশ লোক।'

বিভাসবাবু কি কাজে এদিকে এসেছেন। বর্ষার রাত্রি। পাহাড়ী-নদী-নগরী-প্রাণী পৃথিবীর অস্তিত্ব শুধু গুটিকতক দূর আলোয়—বাড়ীর আলোয় পর্যবসিত। সবটা অন্ধকার। বিভাসবাবুর মাও এসেছেন। দুই জননীতে অন্তঃপুরের মাঝে বসে সুখ-দুঃখের চিরন্তন কাহিনীর কথা কইছিলেন। মণিকা আর সুপ্রিয়া নিজেদের বসার ঘরে সেলাই আর ছেলে মেয়েদের নিয়ে। পাশের ঘরে রাত্রে কাজ ফেরৎ তারক আর বিভাসবাবু দুজনেই সেই ঘরেই তাস নয়ত দাবা নিয়ে একটু বসেন। দাবার গজ বাজী বাজা মন্ত্রী সমারোহের মাঝখানে একবার হঠাৎ মুখ তুলে তারক জিজ্ঞাস করলেন, 'খুসী, তোর স্কুল কবে খুলছে রে?'

সুপ্রিয়া ভাইঝির গল্প থামিয়ে দরজার পর্দা সরিয়ে এসে দাঁড়াল, 'সেপ্টেম্বরে, কেন দাদা?' দাবার চাল থেকে মুখ না তুলেই তারক বল্লেন, 'মা'র মত নয় তুই আর যাস্, এবার বিয়ের ব্যবস্থা করবেন বলেছেন।' তারকের মনে নেই সামনে আছেন বিভাসবাবু।

অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে সুপ্রিয়া বল্লে, 'সে কি দাদা?'

মণিকা এসে দাঁড়াল।

বিভাসবাবুও চুপ করে অবাক হয়েই একটু সুপ্রিয়ার দিকে চেয়েছিলেন। এতটা হৃদ্যতা ওদের সঙ্গে হয়নি বটে, খানিকটা আছেও বটে, কিন্তু তবু বিয়ের কথা। আর কিনা সুপ্রিয়ার

মণিকা কি বলতে গেল তারক সে কথায় মনোযোগ না দিয়ে বল্লেন, 'মা-বলছিলেন, আর ওর দিয়ে কাজ নেই—বিয়ের ঠিক কর।' সুপ্রিয়া লজ্জিতভাবে হাসলে, বল্লে, 'বিয়ের দরকার কি দাদা? বেশ তো দিন চলে যাচ্ছে।'

দাবা থেকে মুখ না তুলেই দাদা বল্লেন, 'মা বুড়ো হয়েছেন।'

'তাতে আর কি দাদা? আমার জন্যে আর কি ভাবনা,—খাওয়া-পরার তো কোন অভাবই নেই।' সুপ্রিয়া অপ্রস্তুত ভাবেই হাসছিল।

এবার তারক, মণিকা, বিভাসবাবুও হাসলেন।

মৃদু হাস্যে মণিকা বল্লে, 'বিয়েটা খাওয়া পরার জন্যেই—না-রে?'

মৃদুহাস্যে সুপ্রিয়া বল্লে, 'নয়ত কি। তোমরা তো তাই বল, দেখবে কে—চিরদিন খাওয়াবে কে?' ঈষৎ হাস্যে এবার বিভাসবাবু বল্লেন, 'অর্থাৎ আপনার মতে বিবাহের প্রয়োজন অন্নসমস্যার মীমাংসার জন্যই?'

সুপ্রিয়া একটু লজ্জিত হ'ল। কিন্তু কথাটা দাদা এমন অবুঝের মত বাইরের

লোকের সামনে হঠাৎ আরম্ভ করে দিয়েছেন যে, আর পাশ কাটাবার উপায় নেই।

কিন্তু ঈষৎ হাস্তে অপ্রতিভভাবে সে বল্লে,—'অনেকটা তাই। কেননা দেখতে পাই আপনারা চিরকাল আমাদের অন্নদানের পুণ্য সঞ্চয় করেন, আর আমারা প্রাণধারণের ঋণ সঞ্চয় করি। আর অনেকটা সেই জন্তই তো আমাদের নিয়ে, রকম রকম দায় আর বিপদের সীমা থাকে না—আত্মীয়দের।'

সকৌতুকে বিভাসবাবু বল্লেন, 'তাই বলে আপনি বিবাহটা সবটাই একেবারে দান ঋণের ব্যাপারই মনে করেন না নিশ্চয়।'

সহাস্যে মণিকা বল্লে, 'না সবটা নয়, একটু খানি মহাজনী গোছ ব্যাপার মনে করা যায় আর কি। এই যেন আপনারা সবাই কো-অপারেটিভ ঋণদান সমিতি খুলে বসেছেন, আমাদের মত দিন-মজুরদের হিতার্থে—'

মণিকা স্বামীর দিকে চেয়ে একটু হাসলে। বিভাসবাবুও হাস্‌লেন।

সুপ্রিয় একটু হেসে বল্লে, 'আর আমরা চক্রবৃদ্ধিহারে সুদের ভারে পুত্র পৌত্রাদিক্রমে চিরঋণী হয়ে থাকি মাথা থেকে পা অবধি বিকিয়ে।'

বিভাসবাবু, তারক ও মেয়েরা সকলেই হাস্‌লেন, কিন্তু বিভাসবাবু বল্লেন, 'এটা কিন্তু অবিচারে বলা হচ্ছে, অন্যায় হচ্ছে।'

তারক শুধু হাসলেন। অকস্মাৎ এবার তাঁর মনে পড়ে গেল, বিভাসবাবুর সামনে কথাটা বড় বেশী হয়ে গেল।

অতিথির চলে যাবার ক'দিন পরে রাত্রে খাবার সময়ে মণিকা আর সুপ্রিয় গল্প করছিল।

মণিকা হঠাৎ প্রশ্ন করলে, তোর কেমন লাগেরে ওখানে?

'কেন, বেশ।' সুপ্রিয় অবাক হয়ে জবাব দিলে।

'না, সে বেশ বলছি নে, ফাঁকা ঠেকে না?'

'মাঝে মাঝে কি রকম মনে হয় বৈকি। এই পুরোনো মেয়েগুলো যখন বিয়ে হয়ে সব চলে যায়, তখন ভারি মন কেমন করে। এই সেদিন কৌশল্যা বলে একটা মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল। মেয়েটির যেমন রূপ তেমনি গুণ।' সুপ্রিয়া থালার ওপর জলের আঁক কাটে। দুজনে খাওয়া আর তার পরের ছোট ছোট কাজ সেরে ঘরের দিকে যায়।

মণিকা আবার বল্লে, 'মেয়েদের তুই খুব ভালবাসিস্ না?

এবার সুপ্রিয়া বল্লে, 'খুব। যেন মনে হয়, ওরা আমার ভারি আপনার।' বলেই, নিজের উচ্ছ্বাসে একটু লজ্জিত হয়ে থাম্‌লে।

মণিকা একটু হেসে বল্লে, 'তাই তোর অত মন কেমন করে! তারপর আবার বল্লে, তা, কিন্তু এবারে তুই গিয়ে চাকরী ছেড়ে দিয়ে আয়'।

'কেন বৌদি?' একটু অশান্তির ভাবে সুপ্রিয়া প্রশ্ন করলে।

'আর পরের ছেলেকে আদর করে—পরের মেয়ের জন্যে মন কেমন করে কত কাল কাটাবি?'

সুপ্রিয়া চুপ করেই রইল।

মণিকা খানিক চুপ করে থেকে আবার বল্লে, 'দেখ ঠাট্টা করে যা বলিস 'খাওয়া পরা' বল্। কিন্তু ঘর-সংসার-স্বামী-সন্তান ঠিক ভালো-মন্দের মাপ কাঠিতে বিচার করা যায় না। খাওয়া পরাও নয়। কোনোখানে বা একটু সত্যি আছে, কোনখানে বা নেই। অবিশ্যি হয়ত দুঃখের গ্লানি আছে, ভাবনা কষ্টের বোঝাও কম নেই, চোখের জলও অজস্র আছে হয়ত; অনেক জায়গায় অবিচারও আছে; কিন্তু সংসারকে একেবারে বাদ দিয়েই বা কি আছে? আমার অবিশ্যি তোব মত বুদ্ধি-বিদ্যে নেই'—মণিকা কি বল্‌তে গিয়ে একটু থাম্‌লে।

সুপ্রিয়া অন্যমনে শুন্‌ছিল, একটু হাসলে।

মণিকা বল্লে, 'আর একজনের অভদ্রতায় কি সবাইকে অবিচার করে সন্ন্যাস নিয়ে থাক্‌বি?' কথাটা বলে মণিকা যেন একটু অপ্রতিভ হয়ে গেল।

সুপ্রিয়া চুপ করে উদাসীন ভাবেই রইল।

মণিকা আবার বল্লে, 'এখনো ঠিক বুঝতে পারবি নি, কিন্তু একটা সময় আসে, আমাদের যখন আর সামনে সংসারের পথ থাকে না।—পুরুষদের যা হয় না। একেবারে পূর্ণচ্ছেদ পড়ে যায়।'

সুপ্রিয়া আচম্‌কা শেষ কথার পর বল্লে, '—বৌদি থাক্, ঘুম পাচ্ছে।'

'যাচ্ছি! শোন্—বিভাসবাবু এঁকে তোর কথা জিজ্ঞাসা করেছেন।'

এবার সুপ্রিয়া অভিভূতের মতন চেয়ে রইল। তার ঘুম, তার ক্লান্তি কোথায় মিলিয়ে গেল। সে অবাক হয়ে মণিকার দিকে চেয়ে রইল।

'হ্যাঁ, আশ্চর্য্য হবার কথা। ওঁরা ব্রাহ্মণ। কিন্তু উনি নাকি সত্যি করেই বলেছেন—'

সুপ্রিয়া মা'র ঘরে এসে শুয়ে পড়ে।

অভিভূত মনের ভেতর জটপাকিয়ে অতীতে বর্ত্তমানে মিশিয়ে কি হিজিবিজি লেখা হতে থাকে! পড়তে পারা যায় না, বুঝতেও হয়ত না। শুধু অকারণে চোখ ঝাপসা হয়ে ওঠে। না, জননীর বুকের কাছের আশ্রয়ে সে বাল্যের মত সান্ত্বনা মেলে না। মা'র ঘুম ভেঙ্গে যাবার ভয়ে দূরে বিছানা করে শোয় সে। বই পড়তে ইচ্ছা হয় না, কঠোর জ্ঞানের সাধনায় সে ডুবে যেতে পারে না। কাব্য? না। এই নিরতিশয় নির্মম বেদনা-বোধের মাঝে কোনখানে তার কিছু সান্ত্বনা নেই। সে অধীর হয়ে ওঠে।

বিভাসবাবু কি বলেছেন? মন একেবারে সঙ্কুচিত লজ্জিত হয়ে ওঠে। কি? কি বলেছেন? আবার ওকে নিয়ে ওঁরা কথা কয়েছেন? না, থাক্ ওর সামনের কিছু, না থাক্ ওর পেছনের সঞ্চয়। না, না, না, ওঁরা যেন আর ওকে দয়া করতে না আসেন। তার চোখ জলে ভরে ওঠে।

কেউ কি ওকে সামান্য শান্তিতেও থাকতে দেবে না? এটুকুই ওর প্রয়োজন, জীবিকা ওর চলে যাবে। ও আর কারুর মুষ্টিভিক্ষা চায় না। ওর বেদনাময় অভিজ্ঞতার পৃথিবী ওর বুকের ভেতরে লুকোনো থাক্; ও সেখানে কারুকে চায় না, ও জানতেও দিতে চায় না কারুকে, কোনদিন জানতে দেবেও না। পুরুষ-মানুষের শ্রদ্ধা, দয়া, মুষ্টিভিক্ষার প্রসাদ, নিত্যকার গ্রাসাচ্ছাদন ও চায় না। ওর তাদের দেওয়া ঐশ্বর্যের ওপর লোভ নেই, তাদের অর্জ্জিত ধনের বিলাসশালার বিলাসের ওপর মোহ নেই, স্বজনরচিত পান্থশালায়—সম্পর্কের—পদভেদে কর্তৃত্বের মোহও ওর নেই। ওকে শুধু ওরা শান্তিতে থাকতে দিক্। ওর মানবাত্মার—ভিক্ষার দয়ার অপমান অনেক হয়েছে, আর কাজ নেই।

সুপ্রিয়ার চোখ ছাপিয়ে আসে।

ওকে যেন আর কেউ কিছু না বলে। ওকে সতীধর্ম রক্ষার জন্য, সামাজিক প্রথার নিয়মের জন্য কারুর রক্ষণাবেক্ষণ করতে আগলাতে হবে না; ওকে কোন স্বজনের অন্ন দিতে হবে না; বেঁচে থাকবার মত জীবিকার উপায় ও নিজেই পারবে।

সুপ্রিয়া উঠে জল খায়। বেরিয়ে আসে একবার।

দাদার ঘরের মৃদু আলো জানলার পর্দার আড়াল থেকে দেখা যায়। দাদার ভারি গলায় হাসি শোনা যায়, আর বৌদির মিষ্টি সুরের মৃদু হাসির শব্দ।

বাইরের অন্ধকার তখনও তেমনি ঘন হয়ে আছে।

সামনের রাস্তায় আলো, আর ছাউনির দিকের বৃষ্টিতে ঝাপসা আলোগুলো সমান জ্বলছে।

কি বেদনায় উদাসীন চোখে সে অন্য মনে চেয়ে থাকে।

হঠাৎ মনে হয়, 'কি বলেছেন বিভাসবাবু?' এবার আর অত রাগ হয় না, যেন কৌতূহল হয় শুনতে। বিভাসবাবুর সেদিন সরল সকৌতুক দৃষ্টিতে 'বিবাহটা তাই বলে আপনার মতে সবটাই অন্নসমস্যা নয়?' একথাও মনে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে আরও কবেকার অনেক কথা মনে পড়ে যেন, স্বপ্নের বিভীষিকার মতন, মৃদু ভয়ের মতন কি রকম।…না, না, ওদের কথা আর নয়। ওরা সবাই এক।

সুপ্রিয়ার ছুটি শেষ হয়ে যায়। গুরুকুলের কন্যাদের মাঝে দিন কাটে আবার।

বুড়ি কৌশল্যার ঠাকুমা, গঙ্গার মা, কাবেরীবাঈয়ের দিদি, সবাইয়ের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয় আবার। কৌশল্যার দিদির সঙ্গে আলাপ হয়। অত্যন্ত সুশ্রী সুন্দরী। দু'টি সন্তানের মা। কন্যাগুরুকুলে সেও নাকি কিছুদিন পড়েছিল। কৌশল্যাও বেশ বড় হয়েছে মনে হল। বৌদির আলোচনা হবার পর এবারে সকৌতূহলে, সকৌতুকেও বটে—সুপ্রিয় ওদের দেখে। কৌশল্যাকে তার বেশ ভালই লাগে। পুরাতন ছাত্রীর প্রতি মোহ-মায়া স্নেহ সমানই থাকে।

তার দিদি? যেন প্রতিমা। যেমন উজ্জ্বল রং, তেমনি সুশ্রীমুখ, বর্ষায় আনন্দিত নতুন লতার মত তেমনি পল্লবিত তনুশ্রী। কিন্তু সুপ্রিয়া যেন আরও কি খুঁজছিল। বুদ্ধিতে প্রতিভায় দীপ্ত একখানি মুখশ্রী, যে তেজস্বিতা ওদের মুখে বালো থাকে, যা ওদের জাতের প্রায় সকলের মুখের ভাবে আছে, সেটি কোথায় গেল? ব্যক্তিত্বহীন, দীপ্তিহীন অতি সাধারণ মুখভাব, ঐ অত্যন্ত অসাধারণ রূপের সঙ্গে যেন মানায় না।

সুপ্রিয়া ভাবে, সংসার যাত্রার সঙ্গে ঐ দীপ্তির ঐ প্রতিভার কি এতই বিরোধ? যেন অত্যন্ত হৃষ্ট অলস বিলাসী জীবনযাত্রা। বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, গাম্ভীর্য ভবিষ্যৎ-স্বপ্নের ধ্যানমগ্নতা? না, কিছুই নেই। মাধুর্য নিতান্তই দৈহিক, সূক্ষ্মতা অথবা মানসিকতা শূন্য। ওর বেশী করে কথা কইতে ইচ্ছা হয়, কথা কয়, আলাপ করে। ভুল হয়েছে ভাবে। কিন্তু হাঁ, নিতান্ত হৃষ্ট পুষ্ট, তৃপ্ত জীবন। স্বামী সন্তান, স্বাচ্ছন্দ্য সংসার যাত্রা, অর্থ, তার ছোট সুখ তৃপ্তি,—অন্ত পরিজন তাদের সঙ্গে প্রত্যহের সংঘাত, তাদের কথা—ইত্যাদি। লেখাপড়া? হাঁ, সে জানে।

সে 'সরস্বতী' পড়ে, 'মাধুরী' পড়ে। তাতে গল্পও থাকে। আর কি কাজ? আর কি? কি দরকার আর তার?

সুপ্রিয়া চুপ করে যায়। তারা 'বেবীউইককে'ও যায় প্রতিবৎসর। সুপ্রিয়া অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। এরই জন্যে বৌদি বলছিল? কি নষ্ট করবে সে? কি ক্ষতি হবে তার? ওরা যা নিয়ে আছে, তা' ওর মনেই লাগে না। কৌতূহল ভরে যে পরিবারেই সে যায় সকলের পানেই চায়।

তার মনে আছে, দিদির মেয়ের বিয়েতেও সে ঐ রকম অনেক মেয়ে দেখেছিল। ওর যাদের দেখে মনে হয়নি, বুদ্ধি বা দীপ্তি তাদের কোনোদিন ছিল বা কখনো দরকার আছে। তারা কথা কয় নিশ্চিন্ত লঘুভাবে, অতি অনাবশ্যক বিষয় নিয়ে। তাই নিয়ে তর্ক—তারপর মনোমালিন্য করতেও তাদের বাধে না; সে জন্য দুঃখিত বা লজ্জিতও তারা হয় না, কোন ভাবনাই তাদের নেই। তাদের—তাদের মা'দের—তাদেরও আত্মীয় স্বজনদের সকলেরই একই ধরনের কথা আর তার আলোচনা আবৃত্তি করে বেশ সংসার যাত্রা চলে যায়। তারো চেয়ে যারা একটু সম্বৃদ্ধ তারা শাড়ী গহনা, মোটর, সেলাই আলোচনা নিয়ে দিন কাটিয়ে দেয়। মানসিকতার গভীর আলোচনার সভায় তারা কেউ নয়, রসজ্ঞতার ধার ধারে না, চিন্তাশীলতা তো দূরের কথা, চিন্তা করতে জানে কিনা সন্দেহ হয় সুপ্রিয়ার—

আর পুরুষরা তাদের নিয়ে ঘর করে, পুতুলের মত সাজায়; প্রয়োজন মনে করলে আবার নিরাভরণ করে দেয় একটু বড় শিশুদের মত ওই ওদের—সমক্ষেত্রে নিজেদের নামিয়ে এনে ওদেরই মত হাল্কা কথাও কয় মাঝে মাঝে। কিন্তু শ্রদ্ধা কোথা? সম্মান কোনখানে? সম্ভ্রম কই?

এই ঘর করণা, এই সংসার, এই ছেলেখেলার খেলনা হয়ে থাকবার জন্য মা ওকে বলেছেন, বৌদি ওকে বলে, আর দাদার ভাবনা। এই না হ'লে ওর জীবন বৃথা হয়ে যাবে? ও কি নিয়ে থাকবে? ওদের অস্তিত্বের স্থূল অংশ নিয়েই যে জীবন যাত্রা,—যারা খেলা করবে—আর বাকিটা লুপ্ত করে দিতে চেয়ে অবজ্ঞা অশ্রদ্ধা করে; তাদের একজনকে নিয়ে ও জীবনকে সার্থক করে তুলবে?

এই আপনার প্রতি শ্রদ্ধাহীন অস্তিত্ব?

এই না হলে ওর কি হবে?

না, এর ওপর ওর লোভ নেই।

সবাই করেছে বলে ওকেও করতে হবে?—পুরুষ মানুষের কাপুরুষতা, আর

নারীর ন্যাকামী? ও কাকে শ্রদ্ধা করবে? ওর শ্রদ্ধা আসেই না। যারা পুরুষই নয়, তাদের বলতে হবে পুরুষ, আর যারা পুতুল তারা হবে নারী!

সমস্ত জীবন ওর পরের হাতের খেল্‌না হয়ে থাকতে সাধ নেই।

তবু আশ্চর্য হয়ে সুপ্রিয়া দেখে, ওদের অনেকের মুখে দীপ্তি না থাক্‌, তেজস্বিতা না থাক্‌, আনন্দের আভা আছে। কিসে তারা ওই আনন্দ পেলে? ওই আনন্দ আর বুদ্ধির উজ্জ্বলতা কি একসঙ্গে থাকতে পারে না? সুপ্রিয়া তা' দেখেছে মনে পড়ে না। অনেকের মুখে নীরব বেদনার ইতিহাস আছে, তাতে চিন্তাশীলতার ছাপও আছে!—কিন্তু তাদের আনন্দময়ী মূর্তি কই!

কৌশল্যার দিদির ছেলে-মেয়েকে সুপ্রিয়া আদর করে, খুব ভাল লাগে তার। কিন্তু ওর মনে হয়, যেন দিদিকেও ওদের চেয়ে কিছু বড় মাত্র। ওই পর্যায়েই ফেলা যায়। এক এক সময় ও ভাবে এ কথা। শেষে মনে হয়, এই যখন সাধারণ, তখন এই বোধহয় হয় স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু ওর অন্তর যেন দুঃখিত হয়ে ওঠে সে কথা ভাবতে।

হঠাৎ মনে হয়, একটি ব্যতিক্রম পৃথিবী পরিচালনা করতে পারে। আজ একজন শান্ত-সৌম্যশ্রী অর্ধনগ্ন মহামানব কোটি কোটি লোকের পথনিয়ন্তা নহেন কি? ঐ ক্ষীণ জীর্ণ-শীর্ণ মানুষটি আসমুদ্রহিমাচল বেষ্টিত অগণ্য জনমনের দেবতা; যারা নিজেকে নগণ্য মানুষও মনে করতে সাহস করেনি, নিরীহ গৃহপালিত পশুর মত ভীতত্রস্ত হয়ে জীবন-পথের এক কোণের পথে পড়ে, গড়িয়ে গুঁড়ি মেরে হামাগুড়ি যাত্রা করেছিল, করছে; তাদের মধ্যে যিনি প্রাণ দিতে পারেন, তাদের মনের দেবতাকে জাগিয়ে তুলেছেন, তিনিও তো একজনই! মন্ত্রদ্রষ্টা মন্ত্রস্রষ্টা তো একজনই হয়; সমস্ত জগৎ তাই উচ্চারণ করে কৃতার্থ হয়, আবৃত্তি করে, আরতি করে আপনাকে সার্থক করে।

ব্যতিক্রমই তো সাধারণকে আত্মপরিচয়ে উদ্বুদ্ধ করে।

কিন্তু ও ব্যাকুল হয়ে ওঠে, ওদের মধ্যে সে ব্যতিক্রম সেই চেতনা-আনন্দময়ী কেউ কি আজো আসেন নি? আস্‌বে না? যে দেখাবে নারী শুধু খেলনা নয়, উপকরণ নয় শুধু সংসারের, সর্বশুদ্ধ সম্পূর্ণ মানুষ।

বিভাস

কার্তিকের শেষ। শীত পড়বার আগের রোদ্দুরকে বেশ ভাল লাগেও না, আবার যেন মনে হয় কেমন শীত করছে।

বিভাসবাবুর মা ছেলেকে খাওয়াতে বসে—অনেকদিন আজমীরে যাওয়া হয়নি,—তারকের বৌ'টি কেমন আর ছোট খোকাটি কি সুন্দর যে —ইত্যাদি বল্‌তে বল্‌তে হঠাৎ পুরাতন দুঃখ-কাহিনী বল্‌বার উপক্রম কর্‌লেন।

বিভাস নীরবে স্মিতমুখে চুপ করে মা'র শোচনীয় দুঃখের ইতিহাসের উপক্রমণিকা শুন্‌ছিল, এর উপসংহার কি ত আগেই সে জান্‌ত!

ছেলের খাওয়া হয়ে গেল।

মা খেয়ে বারান্দার রোদ্রে একখানি যোগবাশিষ্ঠ নিয়ে ধর্ম-চর্চার যোগাড় কর্‌ছিলেন।

ছেলে এসে বল্লে, 'মা তোমায় ছোঁবো' ?

মা হাসলেন, বল্লেন, 'হঠাৎ। বোস্‌ন'।'

ছেলে মা'র যোগবাশিষ্ঠখানি মাথায় দিয়ে মা'র কাছে শুয়ে বল্লে, 'মা, তোমার আর আমার জাত আলাদা হয়ে গেছে, না ?'

'কি রকম' ?—মা আবার হাসলেন। ছেলের মাথায় হাত বুলাচ্ছিলেন। 'তুমি তো আমাকেও ছোঁও না, এই বোধহয় এক বছর পরে তোমায় ছুঁলাম। ঐ তোমার ঝি-টা তোমার কাপড় কাচে কাজ করে, তাকেও যেমন তুমি সব ছুঁস্‌নে বল, তেমনি ভাব আমায় আর কি!'

'ষাট্। যাঃ—'

'আচ্ছা মা, তারকবাবুর মা'কে ছোঁও' ?

'ওমা ছোঁব না, আচার-বিচারে মানুষ, বিধবা মানুষ আমায় কত যত্ন করে সব গুছিয়ে দেয় রান্নার।'

'আর বৌ ঠাক্‌রুণ কে ?'

'তা ছুঁই বই কি, সে বলে আমার কত নিষ্ঠা করে কাজ করে।'

'ওর খোকাকে ?' ছেলে মৃদু মৃদু হাস্‌ছিল আর জিজ্ঞাসা করছিল।

'যা, আর কথা পেলে না! ছেলে হ'ল নারায়ণ, ছোঁবো না? তোর দরকারটা যে কী তাই বল্‌ত আগে'! মা রাগ করেন।

ছেলে মার কোলটায় মাথা রেখে হাসে।

'আচ্ছা মা, ওঁরা কি জাত?'

'দেখ্ বিভাস তুই জ্বালাসনে আমাকে। জানিস, তবু—'

'আচ্ছা মা ওঁরা কায়স্থ, ওঁরা কি তোমার মত আচার করেন?'

'ওমা', তা করবে না? বামুন কায়েত বদ্যির ঘরের কি বিচার আলাদা?'

বিভাস হাসে কিছু বলে না।

রৌদ্র গড়িয়ে আসে। প্রাঙ্গণ থেকে প্রান্তরে, তারপরে গাছের মাথায় সবুজ পাতায় চক্ চক্ করে।

ছেলে কি ভাবে, তারপর বলে, 'মা সুপ্রিয়াকে তোমার কেমন লাগে?'

'বেশ মেয়ে, কি বুদ্ধি-বিদ্যে, কি নম্র। আহা, আমাদের জাত হ'ত যদি—' মা চেঁচিয়ে ভাবেন শেষ কথাটা যেন।

এবার ছেলে অনেকক্ষণ চুপ করে, বলে, 'মা নাই বা হ'ল তোমার জাত?' আর বলেনা।

মা অবাক হয়ে ওর মুখপানে চান। ছেলে চুপচাপ মার কোলের ওপর মাথা রেখে শুয়ে থাকে।

মা অনেকক্ষণ পরে বল্লেন, 'তুই সত্যি বল্‌ছিস?'

সে শুধু বল্লে, 'হ্যাঁ মা।'

মা অন্যমনস্ক হয়ে যান। কি ভাবনা—বেদনায় অসহায়তায় মন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। আজকের বিভাস, বহুদিন আগের বিভাস, শিশু কিশোর বিভাস তাঁর মগ্ন চৈতন্য থেকে হঠাৎ বিভাসিত হয়ে ওঠে। অকারণেই তাঁর মন বেদনায় ভরে ওঠে যেন।

হয়ত মনে হয়, গুছিয়ে নয়,—অনুভবেই মনে হয় হয়ত,—আজ আর ও তাঁরই একান্ত করা সম্পদ শিশু-বিভাস নয়; ছোট করে আদর করবার—নিষেধ বিধি দেবার—স্নেহ করবার সন্তান নয়। ও আজ পৌরুষের মহিমায়, গৌরবে, তেজস্বিতায়, প্রতিভায় মানবজাতির একজন। একদিন ও তাঁর সন্তান ছিল। আজ? আজ হয়ত কেউ নয়! ভবিষৎ-পুরাণ সৃষ্টি করবে ও। সেই ওকে কোনো কিছুতে সম্মতি-অনুমতি দেবার উনি কে? মা চুপ করে কি ভাবেন।

বিভাস মার মুখ দেখ্‌তে পায় না।

অনেক পরে সে বল্লে, 'তোমার মত না থাক্‌লে আমি কিছু করব না মা।'

মা'র চমক ভাঙে। কিন্তু জবাব দেবার মত কিছুই মনে আসে না।

বিভাসের মা দুদিন চুপচাপ রইলেন অন্যমনেই। অবশেষে একদিন রাত্রে

ছেলের ঘরে এসে বস্‌লেন। তারপর বল্লেন, 'আমার মত আছে বিভাস।' ছেলে কি পড়ছিল, সে বল্লে, 'কিসে মা ?'

মা বল্লেন, 'তোর বিয়েতে—'

বিভাস অবাক হয়ে জননীর দিকে চাইলে। আনন্দ বিস্ময়ে হয়ত সংশয়ময় অনুভূতিও কেমন একটা মিশ্র মনোভাবে সে মা'র দিকে চেয়ে রইল। তারপর একটু সম্বরণ করে বল্লে, 'মা, ওরা কায়স্থ, সুপ্রিয়ার কথা বল্‌ছো তো ?' হয়ত জননী বুঝতে পারেন নি, কিম্বা ওই ভুল বুঝেছে মনে হচ্ছিল। তার মার ব্রাহ্মণ্যসংস্কার জাতি-সংস্কার তো ছিল। তিনি তো আধুনিক সংস্কারকভুক্ত দলের কেউ নন। ভুল নয় তো।

মা শুধু বল্লেন, 'হাঁ বাবা।'

ছেলে মার ইজি চেয়ারের পাশের মাটিতে বসে তাঁর কোলের পাশে বসল। তারপর বল্লে, 'আর তোমার মনে কিছু কষ্ট হবে না মা ?'

মা বল্লেন, 'না, বাবা।'

মৌন নির্লিপ্ত বেদনায় তিনি ছেলের মাথায় হাত রাখেন। ওকে আজ আর সেই ছোট শিশুর মত কোল ভরে হৃদয়-অন্তর পূর্ণ করে পাওয়া যায় না। কবে একদিন জন্মমরণের শঙ্কা সমস্যায় দ্বন্দ্বের মাঝখানে যে অমৃতকে, যে সম্পদকে লাভ করেছিলেন, বহু দুঃখ বেদনা, সাধনা, পরিমাণ—সীমাহীন মমতা, আনন্দ-গর্ব-গৌরবে যাকে সমস্ত মন ইন্দ্রিয় প্রাণের শক্তি সেবা দিয়ে গড়ে তুলেছিলেন এতটুকু থেকে, রক্তমাংস মা থেকে, তারপর যাকে অনেক বেদনায় অনেক গৌরবে বড় করে তুলেছেন, দুজনের ইতিহাস কাহিনীর কথা যা তাঁর একলারই ছিল এবারে তাতে সমাপ্তির রেখা টেনে দিতে হবে।

ওর নতুন যাত্রার পথে তিনি আজ আর কেউ নয়। তিনি দর্শক মাত্র! ওরা অনেকদূরে এগিয়ে আছে। ওদের আপন করবার অধিকার আর তাঁর নেই। টেনে রাখবার ক্ষমতা নেই, আকাঙ্ক্ষাও নেই। ভবিষ্যৎ যুগের কালের অঞ্চলে তাঁর কনকাঞ্জলি আজ দেওয়া হয়ে গেল। জীবনের ঋণ তাঁর শোধ করে দেওয়া হয়েছে। তাকে বাধা দেবার উনি কে ?

সকলে মেয়েরই কনকাঞ্জলি নেয়, আজ তার মনে হল সেটা ভুল। ছেলেরও কাছে বিদায় গ্রহণ করতে হয়। ছেলের মাথায় হাত রেখে মা বল্লেন, 'তুই এবার শো।' মা চলে গেলেন।

মার মনের ভাব কেমন ধরনের বিভাস বুঝতে পারে নি। কিন্তু তার যেন নিজের আনন্দের সঙ্গে মা'র কি একটা কষ্ট হয়েছে মনে হচ্ছিল। ও ভাবলে, মা'র

হয়ত জাতের সংস্কার, হয়ত সামাজিক লজ্জা। মার মনের নির্লিপ্ত মিশ্রভাব বোঝবার মত অনুভূতির অভিজ্ঞতা তার নেই। সে অনুভূতি শুধু জননীরই। সেটা নব-জাগ্রত উদ্ভাসিত অন্তর বিভাসের চোখে লাগল না।

কিন্তু হিসাবে ভুল হয়েছিল। বিভাসের মনে হয়েছিল, সাধারণ সকলের মতই যে তার নির্বাচন সকলেই মেনে নেবে। এবং সেটাতে হয়ত সুপ্রিয়ারা সকলেই কৃতার্থ হয়ে যাবে। অবশ্য এত ভাবেনি, অজানুতেই ধারণা ছিল তার।

তারকের সঙ্গে দেখা হল। তারক ওকে একখানি সুপ্রিয়ার চিঠি দিলেন।

এদিক-ওদিক অবান্তর কথার পর সুপ্রিয় লিখেছে—"তুমি জিজ্ঞাসা করেছ, বিভাসবাবু সম্বন্ধে আমার কি মত, আর ওখানে যদি আমার আপত্তি থাকে, তাহলে অন্যত্র তোমরা চেষ্টা করবে কি না। বিভাসবাবুকে আমি জানিও না, এমন কোরে ওঁর কথা ভাবিও নি। কাজেই আমার ওঁর সম্বন্ধে কোনো রকম ধারণাই নেই। তবে অন্য সবায়ের কথা। তোমাকে তো বৌদি আমি আগেই বলেছি, আমাকে বাংলাদেশের পাত্রদের—সৎ পাত্রদের কাছে দেখিয়ে বিয়ে দিতে আর পারবে না! আমার মনে হয়, যাদের সঙ্গে তোমরা আমাদের বিয়ে দাও, ওরা পুরুষ মানুষ নয়। ওরা মা'র কোলে জন্মায় বিয়ের পাত্র হয়ে, আর তার পরে হয় পিতা, অর্থাৎ পাত্র ও পিতা এই দুটো মাত্র অবস্থা ওদের, সুতরাং আমরাও থাকি পাত্রী, তারপর হই ছেলের বা মেয়ের মা। আমার পক্ষে ঐ ধরনের পাত্রীত্ব বা মাতৃত্ব দু'এর একটিও আর সম্ভব হবে না। কেনন আমি মন যোগাতে পারব না আর তা ছাড়া মানুষের মন যে এমন একটা জিনিষ তা' দেব কাকে? ওরা তো মনের কিছুই বোঝে না। নিজেদের মনের দারিদ্র এত বেশী যে, ধন দিয়েই ওরা তা পূর্ণ করতে চায়। তারপর সত্যি কথা বলি একটা, চুপিচুপি, ভাই, শুধু তোমাকে, আসলে আমার মনে হয় কি জান, মেয়েমানুষকে বিশেষ করে একেবারে নিছক মেয়ে (মানুষ নয়) বানাবার সাধনাতে সমস্ত জাতকে জাত—দেশকে দেশ—শতাব্দীর পর শতাব্দী এমন করে সেজেছিল যে আজও ওরা সেই কাঁচপোকা তেলাপোকার মতন প্রায় সকলেই মেয়েলী হয়ে উঠেছে। (মেয়ে হয়েই উঠবে হয়ত)। তুমি ভেবে দেখ ভাই, সত্যি কিনা? আর সেই মেয়েমানুষকেই কি করে মেয়েরা ভালবাসবে বলত? (দোহাই ভাই দাদাকে বাদ দিয়ে বলছি) কিন্তু সত্যি সত্যি, নিজেদের ছোট ছোট সুবিধের খাপে দেশশুদ্ধ মেয়েকে মেপে মেপে মানিয়ে দিতে গিয়ে ওরা এতই মেয়েদের মেয়েত্বর কথা ভেবেছে ধ্যান করেছে যে, নিজেদের কথা ওরা যুগ যুগান্তর ধরে

ভাববার সময় পায় নি ; কাজেই ওদের পৌরুষও দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে পথ পায় নি।

মীরাবাঈয়ের কথা শুনেছি যে, সনাতনকে বলেছিলেন, 'এ বৃন্দাবনে কি শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আর পুরুষ আছে?' আমি তাঁর মত ভক্ত নই, কিন্তু কথাটা বেশ লেগেছে আমার। আমার মনের বৃন্দাবনে আমি যার অভিসারে যাব, যাকে ভালবাসব ; আমার মনে যে ঘুমন্ত রাজার মেয়ে আছে তার ঘুম ভাঙ্গাবে যে তাকে আমি আজো দেখিনি। ঠাট্টা থাক ভাই। সত্যি কিছু বোলো না আর আমায়। তুমি বলেছ, কৌশল্যার দিদির ছেলের এত প্রশংসা করেছিস্, নিজের ছেলে মানুষ কর। দেখবি কত ভাল লাগবে বেশী। সে জানিনা এখন, কিন্তু কৌশল্যার দিদির ছেলেদের মত ছেলে যদি একটা অমনি অমনি পাই তো মন্দ লাগে না। অন্তত তাকে পুরুষ মানুষ করে মানুষ করি। বাংলাদেশের একটা মেয়েও যেন তার পৌরুষকে শ্রদ্ধা করতে পারে, আমার সে ছেলেকে ভালবাসতে পারে।"

চিঠি পড়া শেষ হয়ে গেল। বিভাস চিঠিখানা তারকের হাতে ফিরিয়ে দিলেন। তার মুখে একটা সকৌতুক অথচ গম্ভীর হাসির আভাস ফুটে উঠল।

সে কোন্ বিচিত্র নারী, যে আজো তার মনের বৃন্দাবনে পুরুষ দেখেনি? দেশসুদ্ধ পুরুষকে যে মেয়েলী বলে অনায়াসে। তার মনের আদর্শ কেমন? কিন্তু কথাগুলো গায়ে বাজে। যেন মনে হয়, এই সুপ্রিয়া যেন বাংলাদেশের উপেক্ষিতা অবজ্ঞাতা চিরন্তনী নারীর আত্মা, আর সে নিজে যেন এই পৌরুষহীন হীনজ্ঞান ও সংস্কারমুগ্ধ দেশের লোকের প্রতিনিধি। ওদের পৌরুষকে এই যে ধিক্কার এই যে বিদ্রূপ এতো ওদের প্রাপ্যই।

অন্য মনে দু'চারটি কথা কয়ে ঘোড়ায় ওঠে।

পার্বত্য পথে অনেকদূর যেতে হবে।

পুরুষদের উদার স্নিগ্ধ কৌতুকে, কৌতূহলে সুপ্রিয়াকেই মনে হয়। সুপ্রিয়ার রূপের কথা মনেই হয় না, হয়ত আছে নয়ত কম আছে। কিন্তু মনে হয় সে বুঝি অপরূপা।

কিন্তু চিঠিখানি? বুদ্ধিমত্তা আর অনুভব শক্তি? ঠিকই বলেছে, বোধহয় সমস্ত বাংলাদেশটা যেন পাত্র ও পিতা!

কিন্তু ও কেন ভাবলে ওরা সবাই ওই রকম? এভারেজ করে? কিন্তু রাগ

হয় না, আশ্চর্য হয়ে লজ্জিত হয়ে, হাসি পায়। পৌরুষ লোপ পাওয়ার তথ্য নিরূপণটি সুপ্রিয়ার ভালো, ওর ওপরে প্রবন্ধ লেখা যায়।

মা কিন্তু যখন শুনলেন, সুপ্রিয়া বিভাস সম্বন্ধে কোন আগ্রহ দেখায় নি, পুত্র-গৌরবে তাঁর আঘাতও যেমন লাগল, তেমনি তিনি বিভাসকে বার বার দেশে যাওয়ার কথা বলতে লাগলেন। বিভাসের মত ছেলে, তায় ব্রাহ্মণ-কায়স্থ বিবাহ, তাতে মেয়েই বা কি এত সুন্দরী, তার এত অহঙ্কার।

মা অগ্রাণের মাঝে বিবাহ দিয়ে দিবেন, যেমন করেই হোক। বিভাস হাসে। মা'র রাগ হয় আরও।

কিন্তু বিভাসের মনে ঐ বিজয়িনীকে বিশেষ দেখবার কৌতূহল, পরাজিত করবার লোভ যায় না। ও কেমন মেয়ে যে সকল পুরুষের পৌরুষকে ধিক্কার দেয়, লজ্জা দেয়। বিভাসও তে ওদের সামিল। কিন্তু কি অপূর্ব বিচিত্র ওই নারী। বিভাস ওকে যদি শ্রদ্ধা না করবে তো কাকে করবে? আর ওকে, ওই বিজয়িনীকে শ্রদ্ধা পৌরুষে প্রেমে যদি জয় করতে না পারে—তো বৃথাই সে পুরুষ। সে ওকে জানেনা বলেছে বটে, কিন্তু পৌরুষহীনতাকে ধিক্কার তো ওর কথা চিঠিতেই দিয়েছে।

বিভাসের লাগে, আর কথাটি মন থেকে মুছতে চায় না।

বিভাসেরও অহঙ্কার ছিল। অন্যকে বিবাহ করার খেলো অহঙ্কার নয়,—নিজের পৌরুষের দীপ্ত-তেজস্বী উদার অহঙ্কার। সুপ্রিয়ার শ্রদ্ধা আকৃষ্ট করবে এই তার পণ।

বিজয়িনী

সুপ্রিয়ার বড় দিনের ছুটি।

পৌষের সন্ধ্যা। রোদ্র নেই, হিম বেশ। সুপ্রিয়া আর মণিকা বাড়ীর সামনের নির্জন ছোট বাগানে ঘুরছিল। ফুলগাছগুলো শীতে যেন মূক হয়ে গেছে। তারক বেরিয়েছেন কাজে।

মা অন্তঃপুরে। চারিদিকে কনকনিয়ে আসছে। প্রান্তর-বন একেবারে ধূসর। আনাসাগরের জলের উপর উজ্জ্বলতা নেই, শান্ত ধ্যানে মগ্ন যেন।

মণিকা বল্লে, 'তুই জানিস তোর মনে কোনদিন অভাব হবে না'?

'তা কি জানি?' সুপ্রিয়া অন্যমনে জবাব দিলে।

'বিভাসবাবুর মা কত দুঃখিত হয়েছিলেন, তাই ছেলের বিয়ে দিতে ও মাসে দেশে নিয়ে গেলেন, অঘ্রাণ মাসেই যাতে হয়।'

লজ্জিত ভাবে সুপ্রিয়া হাসলে, বল্লে, 'ও। কিন্তু তোমরা কেন ওদের বল্লে? আমি তো কোন একজন কারুকে বলিনি, আমি সবসুদ্ধ বলেছিলাম।'

'কি জানি ইনি কি ভেবে বিভাসবাবুকে চিঠি দিয়েছিলেন, ওঁর যে ভারি ঝোঁক হয়েছিল তোর উপর।'

সুপ্রিয়া আশ্চর্য হয়ে অপ্রস্তুত ভাবে বল্লে, 'আমাকে ওঁরা দেখলে কবে?'

'তা কেন দেখবে না—তুই কি একটা এমনি যা' তা' নাকি?'

সুপ্রিয়া অপ্রতিভভাবে হাসলে। যেন মনে হচ্ছিল বিভাসবাবুকে, অবিচার করা হয়েছে।

অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে এখন ভাল করেই। ঘোড়ার পায়ের শব্দে ওরা চকিত হয়ে উঠল—তারক আর বিভাস। ওরা অবাক হয়ে দেখবার আগেই ওরা নাবল।

'একি আশ্চর্য আপনি কোত্থেকে'? মণিকা অবাক হয়ে বিভাসকে প্রশ্ন করলে।

সুপ্রিয়া অত্যন্ত লজ্জিত আর অপ্রস্তুত হয়ে—আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বিভাস সহাস্যে দুজনকে নমস্কার করে বল্লেন, 'এই কাল এসেছি।'

'মা কোথা। বিয়ে হয়ে গেছে'।—মণিকা সহাস্যে প্রশ্ন করলে, 'বৌ এনেছেন তো?'

বিভাস ঘোড়ার ভার সহিসের উপর দিয়ে গভীর দুঃখের সুরে বল্লেন, 'কেউ দিলে না বিয়ে। বৌ-ঠাকরুণ সে কী দুখের কথা বলব আর!'

মণিকার চোখ একবার চকিতে সুপ্রিয়ার দিকে পড়ল। সুপ্রিয়ার মুখটা সাদা হয়ে গিয়েছিল, অকস্মাৎ সমস্ত কান-মুখ রক্তোচ্ছ্বাসে ভরে উঠল।

মণিকা হাসলে, 'যান্'। তারকও হাসলেন, এবং বল্লেন, 'এখন না'বার আর খাবার ব্যবস্থা কর দিকি।'

পৌষের কনকনে ঠাণ্ডাটাও মন্দ লাগছিল না বাইরে।

মণিকা আর সুপ্রিয়া রোদ্দুর পোয়াতে বসেছিল বই আর সেলাই নিয়ে।

বেলা আস্তে আস্তে পড়ে এলো। প্রান্তরে গাছের বিবর্ণ সবুজ পাতায় খানিক রৌদ্র চকচক করেই হঠাৎ পাহাড়ের চূড়োর ওপর উঠে গেল—তারপরই ঘন ধূসর সন্ধ্যায় মাটি আচ্ছন্ন হয়ে এলো।

বেলা পড়ে গেল দেখে মণিকা উঠল।

সুপ্রিয়া অন্যমনে মাটিতে আসন্ন অন্ধকার আর অস্তমান সূর্যের আলোর আভাসের মাঝে বসেছিল। লোকের সঙ্গে থাকলে সেলাইটা মন্দ লাগেনা। এবং একলার জন্য বই। এখন কিন্তু না ছিল বইয়ে মন, না ছিল সেলাইয়ের ইচ্ছে। পেছনে জুতোর শব্দ হল, তারক আর বিভাস।

ভাই বল্লেন 'কিরে—তোরা এখানে?'

সুপ্রিয়া বল্লে,'হ্যাঁ, বৌদি ভেতরে গেছেন। আসবেন এখুনি। তোমরা বস্‌বে?'

'বস্‌বতো ভাবছিলাম। আমায় আবার একবার বেরুতে হবে, নইলে আজ তোদের নিয়ে একটু বেরুতাম। একটা লোকের আসবার কথা রয়েছে।'

দুটো মোড়া আর চেয়ার টেনে নিয়ে ওঁরা বসলেন।

যে সুপ্রিয়া চিঠিতে অত নিজের মতামত প্রকাশ করেছে, সে যেন এ নয়। এ যেন আধুনিক হিন্দু ঘরের আর চিরকালের সঙ্গে মিশ্র ভাবের কিছু কুনো, একটু অপ্রস্তুত, লজ্জিত মুখ মেয়ে—যেন সাহস আছে প্রগল্‌ভতা নেই; দীপ্তি আছে প্রকাশ নেই।

বিভাস তারকের সঙ্গে কথা কইতে কইতে ওকে দু'একবার দেখলে। ওর হাতের কাছে বই খানা কি?

'আপনার কাছে বইটি কি?'

সুপ্রিয়া একটু অপ্রস্তুত ভাবে বল্লে, 'একটা কবিতার।'

'দেখব?'

'নিন।' 'বই খানা ডি, এইচ, লরেন্সের ছোট কবিতার বই।'

তারক বল্লেন, 'ওহে কাব্য এখন রাখ। আমি বেরুচ্ছি একটু খানি। খুসী তোরা সব ঠিক থাকিস, এক সঙ্গে রাত্রে বেরুব। তোর সঙ্গে থাকাও হয় না, বেরুনোও হয় না।'

'সুপ্রিয়া বল্লে, তাহলে তুমি শীগগির এসো।'

মণিকা এলো। 'তোমরা বেরুচ্ছ?—ফিরবে কখন?'

'আমরা না—। বিভাস থাকলো, আমি শীগগির ফিরছি, তোমরা ঠিক থেকো। তারক চলে গেলেন।'

মণিকা ছেলে মেয়ের জিনিস গুছিয়ে নেয় হাতে। বল্লে, তাহলে একটু বসুন, আপনার দ্বিতীয় পেয়ালা চায়ের ফরমাস দিয়ে আসি। একটু ভেতর ঘুরেই আসছি।

অন্ধকার স্তূপে স্তূপে গাছ তলায় নাবতে লাগল। সুপ্রিয়ার ক্ষতি ছিল না তাতে, যদি একলা থাকতো। তার আধ অন্ধকার গাছের তলায় জমাট ছায়ার মাঝে বসে থাকতে ভালই লাগে। কিন্তু কি বিপদই হল যে। এ অন্ধকারে ডি, এম, সি, আর ডি, এইচ লরেন্স দুয়ের কিছুই কাজে লাগবে না, অস্বস্তি ভাবে সুপ্রিয়া বসে রইল। পশ্চিম দিগন্তে এক ফালি কুমড়ার মত পঞ্চমী না ষষ্ঠীর চাঁদ—একটি তারা কোলের কাছে নিয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সন্ধ্যা বেশ ঘন হয়ে এলো। কিন্তু বিভাস বসেন নি। মণিকার ছেলেরা খেলায় মেতে ছিল। বিভাস তদের খেলা দেখছিলেন তাদের কাছে দাঁড়িয়ে।

সুপ্রিয়া ওর দিকে চাইলো—অতিশয় সাধারণ দেখতে। বইয়ে পড়া বর্ণনার মতন সাহেব বলে ভ্রম হয় না, বরং বেশ বাঙ্গালী বলেই বোঝা যায়। রঙ ফর্সা তো নয়ই, পীতাভ মলিন। সাধারণ বাঙ্গালীর ছেলেদের চেয়ে একটু বেশী দীর্ঘাকৃতি। চোখ-মুখ পুরুষমানুষের মত। এর বেশী রূপ বর্ণনা সুপ্রিয়ার মনে জাগেনি।

কিন্তু আশ্চর্য তার মনে হল বিভাস দেখতে মন্দ নয় তো। ভালই যেন!

অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। বিভাস এসে ওর সুমুখে দাঁড়ালেন। ঘরের মাঝে আলো জ্বলছে, ছেলেরা ভেতরে গেল।

'আপনি বসেবেন আর?' বিভাস জিজ্ঞাসা করলেন।

সুপ্রিয়া দ্বিধাভরে বল্লে, 'আমার এই ঠাওটা বেশ লাগে। আর বৌদি এখনি আসছেন।'

'আমি বসলে কি আপনার অসুবিধা হবে?' —বিভাস জিজ্ঞাসা করলেন।

সুপ্রিয়া বল্লে, 'না না, সেকি!'—

পায়ের তলায় মৃদুবর্ণের জ্যোৎস্নার আল্পনা লেখা ফুটে উঠেছে—সুপ্রিয়া জুতো থেকে পা বের করে নিয়ে তার ওপরে ওপরে আঙ্গুল বুলোয়। মনে মনে একটু বেশী অস্বস্তি হয়। বৌদি করছেন কি? যদি খামখা বিভাসবাবু চিঠির কথা তুলে বসেন!

কি বিপদেই ফেলতে পারেন বৌদি! ও কি জানতো, ওঁর সঙ্গে ওর চাক্ষুষ দেখা হবে!

আসলে সুপ্রিয়ার পড়া বা চিঠিতে নিজের মতবৈশিষ্ট থাকলেও তার কথা কইবার দরকার কি? কথা কইতে সে বড় অপ্রস্তুত দলের। [illegible]বিশ্রী বিপদ।

কিন্তু আশ্চর্য। বিভাসবাবু কোনো ব্যক্তিগত কথা তুল্লেন না। উনি তুল্লেন, ওর পাশের কবিতার বই এর কথা।

সুপ্রিয়া মনে মনে আশ্বস্ত হল এবং ভাবলে লোকটি ভদ্র এবং বুদ্ধিমানও। মানসিক প্রশংসা পত্র দিয়ে নিজেরই হাসি এল। কিন্তু আশ্বস্ত মৃদুহাস্যে বল্লে, 'আধখানা চাঁদের আলোয় তো বই পড়া যাবে না।"

বিভাসবাবুও হাসলেন, বল্লেন, 'না।'

তারপর কথা উঠল, ওই বইটার কবিতা, ওই লেখকের কবিতা আধুনিক কবিতার ধরন, বাংলা অতি-আধুনিক কবিতা, সাহিত্য। সুপ্রিয়ার সঙ্কোচ হচ্ছিল, ও সংক্ষেপে জবাব দেয়। ওর ওই লেখকের লেখা ভাল লাগে, আধুনিক কবিতা ওর ভালই লাগে কিন্তু—

'কিন্তু? কি বিষয়ে?' বিভাস উৎসুক হতে চান। ও ঠিক করে বলতে পারে না। ওর মনে হয় পুরুষ মানুষের প্রকৃতির একটা প্রচণ্ড প্রকাশ বা একান্ত মুক্ত প্রকাশ আছে, যেটা স্পষ্টতার জন্য ভাল লাগলেও সব সময় ভাল বলা যায় না। ও সে কথা এড়িয়ে যায়

নিরাপদে সে তোলে মেয়েদের কবিতার কথা, রচনার কথা, বিভাসবাবু চুপ করে থাকেন।

এক কথায় ও বলে, 'মেয়েরা লিখতেই পারেন না।'

বিভাসবাবু অবাক হয়ে যান, 'সে কি? আপনাদের এত লেখা—এত লেখিকা। বলেন কি না লিখতে পারেন না।'

সুপ্রিয়া হাসলে, সঙ্কোচ কমে। এবার বল্লে, 'অত্যন্ত জোলো অগভীর খেলো ভাবপ্রবণতা দিয়ে ওরা লেখেন।'

সুপ্রিয়া খানিকটা বলে, খানিকটা ভাবে আর বাকির পায় না সন্ধান, চুপ করে যায়। এবং আত্মপক্ষের দোষ বর্ণনাকে সমর্থন করা অপর পক্ষের ভদ্রতায় বাধে।

বিভাসবাবু বল্লেন, 'আছে বইকি ভালো। অতটা নয়, একটু বেশী বলছেন আপনি। আর কদিন বা আপনারা শিক্ষা পেয়েছেন, আমরা তো চেপেই রেখেছিলাম। ক্রমে ক্রমে হবে।'

এবারে সুপ্রিয়া সহজভাবে হেসে ওঠে। বিভাসও একটু হেসে ওর দিকে চাইলেন। ওর হাসিটা বেশ ভাল লাগল যেন।

'আপনি আশ্বাস দিচ্ছেন।' সুপ্রিয়া বলে।

'কিসের কথা তোমাদের?' মণিকা এলো—সঙ্গে বিভাসের জন্য চা নিয়ে চাকর।

সুপ্রিয়া ফিরে তাকায়—'কি শীগগীরই এসেছ!'

বিভাস বল্লেন, 'উনি স্বজাতির নিন্দে করছেন, আমি তাই বল্লাম, ক্রমে ক্রমে উন্নতি হবে।

মণিকাও হাসলেন। 'কিন্তু ঠাণ্ডা পড়ছে। আমার শীত করছে, রান্নাঘর থেকে এলাম, ভেতরে আসুন।'

সুপ্রিয়া বল্লে, 'যাই।'

বিভাস বল্লেন, 'চলুন চা-টা খেয়েই যাচ্ছি।

মণিকা এগিয়ে গেল।

বিভাস বল্লেন, 'আমি কিন্তু ঠিকই বলেছি বোধহয়।'

সুপ্রিয়া মৃদুহাস্যে মাথা নাড়লে, 'তা নয়। আমরা পারি না। আপনাদের মত হয় না—এইটেই ঠিক। দেখুন না মেয়েদের লেখা ওদের দেশেই—বিদেশী সাহিত্যেই, কোনো শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের পর্য্যায়ে পড়ে না। অথচ শিক্ষা যদি বলেন কত অশিক্ষিত কবি কেমন সুন্দর লেখেন নি? অবশ্য কালচার হলে সুন্দর হতে পারে, বলতে পারেন। কিন্তু সৃষ্টিশক্তি আসলে আমাদের নেই। তার চেয়ে না লেখা ভালো।'

'কি অন্যায়—লিখবেন না কেন? সাধনা করতেও দেবেন না? আপনি তো বেশ। কেন, এই তো য়ুরোপে মেয়ে লেখিকারাও কেউ কেউ নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন—'

ও হাসলে, 'হ্যাঁ তা হোক। কিন্তু তা সাহিত্য হিসাবে আপনাদের মত হয় নি। আর সাধনা করতে করতে হবেও না—ওর জন্যে দরকার অন্য কিছু;' সুপ্রিয়া অনেকখানি মতামত প্রকাশ করে ফেলে একটু অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল যেন।

বিভাসের বেশ কৌতুকও বোধ হচ্ছিল, আর কৌতূহলও, কথার সূত্রটা ছাড়তে না দিয়ে বলেন, 'কি বলুন তো?'

একটু ইতস্তত করে সুপ্রিয়া বলে, 'আপনারা যেমন সহজে জীবনকে গ্রহণ করতে আর বিমুখ করতে পারেন, ভোগ করতে ও ত্যাগ করতে পারেন কেমন একটা প্রকৃতিদত্তই যেন অপরিমিততা নিয়ে। কাজেই তাতে আপনারা যা কিছু বলেন বা করেন, যেন নিজের জন্যই মনে হয়—চেষ্টা নেই মনে হয়। আমরা

যেন সেখানে কেবলি চেষ্টা করে দেখতে চাই। মনে করি, কে কি বলবে। আর তাই,'—সুপ্রিয়া হাসলে। তারপর বলে, 'উঠি এবার।'

বিভাস বল্লেন, 'চলুন, কিন্তু থামলেন যে।'

সুপ্রিয়া খুব আস্তে পা ফেলে এগিয়ে চলে। নির্গন্ধ মরসুমী ফুলগুলি যেন হিমে একেবারে 'অসাড় নিঝুম হয়ে গেছে। ও একটু দাঁড়ায়। ঝাপ্‌সা জ্যোৎস্নায় ওর মুখ দেখা যাচ্ছিল। বিভাস চুপ করে চেয়ে থাকেন ওর দিকে। এই অপূর্ব্ব মেয়েটি কি করে এমন একগুঁয়ে জেদী হল।

আর সুপ্রিয়া একটু থেমে বল্‌লে, 'আর তাই সেটা যেমন কিছুই হয় না, তেমনি কেউ ফিরেও দেখে না। তারা দেখে আমাদের প্রসাধন, মন নয়। অর্থাৎ অস্তিত্বটাই তাঁরা দেখেন—অন্তর নয়।

সুপ্রিয়া একটু এগিয়ে যায়। সে যা বল্‌লে না অথচ ভাব্‌ছিল, তা হচ্ছে যে, আর তাই নিয়েই আমাদের গর্ব। শাড়ী, জামা, গহনা, গায়ের রং।

বিভাসও আস্তে আস্তে আসছিলেন। তার ওকে ঝাপসা জ্যোৎস্নায় স্বপ্নে দেখা অস্পষ্টরূপ নারীর মত মনে হচ্ছিল এবং মনে হল সেটা ওর রূপের ঐশ্বর্য।

সুপ্রিয়ার কথা কওয়ার বিশেষত্ব সহজ অথচ স্বচ্ছ মতামত, নির্মল বুদ্ধি বর্ষার দিনে গাছতলায় আসন্ন সন্ধ্যার ছায়ার মত ঘন পল্লবিত চোখের সহজ-স্বচ্ছ দৃষ্টি, তার যেন মনে হল, ও একজন বিশেষ—সকলের মত নয়। তার মনে হল যে আমাদের যে অপরিমিততা, যে প্রাচুর্য্যের ঐশ্বর্য্য, মনোভাবের স্পষ্টপ্রকাশ তোমাদের বিস্ময় জাগায়, আশ্চর্য্য করে দেয়, ওগো রহস্যময়ী, তোমাদের ঐ অপ্রচুর প্রকাশ, তনুমনের রহস্যময় ভীরুতা, অস্বচ্ছ গভীরতা, আমাদের যে কতখানি মোহের মাঝে টেনে নিয়ে যায়, ভোরের লঘু কুয়াশার মত মধুর আলোয় মুগ্ধ, দৃষ্টিহীন করে দেয়, তোমাদের কে বলবে? ভাগ্যে তোমরা আমাদেরই মত নও। তোমাদের কাছে আমাদের মত হওয়াটা হয়তো খুব বেশী মনে হতে পারে, কিন্তু আমাদের কাছে তোমরা তোমাদের মত থাকাই অপরূপ। একটু হাসেন মনে মনে, হাঁ অস্তিত্বই বটে, এবং প্রসাধনই। কেন না আমরা যা কিছু সৃষ্টি করি তোমরা নিজেরাই তো তারি অঙ্গ—সৃষ্টির রূপ। তোমরা যেন মায়া, আমাদের চোখে তোমরা যেন মায়া রূপ—ঐশ্বর্য্যশালিনী রাত্রিময়ী, অন্ধকার পৃথিবী তাকে যেমন সূর্য্যের ব্যাকুল মুগ্ধ আলো তার সমস্ত অঙ্গ-তনু-মন সন্ধান করে ফিরে সমস্ত দিন ধরে আলোর আলিঙ্গনে ঘিরে রাখতে চায়, সারাদিন আপনাকে দহন করে ও দেখেও তার পিপাসা মেটে না, আমাদেরও

তোমাদের ক্ষণে ক্ষণে রঙিয়ে রঙিয়ে নানা রূপে দেখার তৃষ্ণার আদি-অন্ত হয় না।

বিভাস ভাবেন, কিন্তু সেকি শুধু প্রসাধন রূপ?

কিন্তু মেয়েদের মুক্ততা অত্যন্ত ভীরু। আর পুরুষের সব কিছুর মতই মুক্ততা ও মুক্তি চায়। কোনোখানে কোনো বাধা তারা সহ্য করতে চায় না।

সুপ্রিয়া ভাল লাগলেও বিভাসকে এড়িয়েই চলে। বিভাস হয় তো ভাল লাগবার মত হলেও হতে পারে; কিন্তু এর ভাল বল্‌বার মত নয়। সুপ্রিয়া ওদের বাদ দিতে চায়।

ভোরের নতুন আলোর সঙ্গে ছেলেদের ভয়ে মণিক ওঠেন, তারকও না, বরং তাদের সেটা গল্পের সু-অবসর।

সুপ্রিয়া উঠে শিশির ভেজা ঘাসের ওপর, মাটির ওপর গায়ে একটা শাল জড়িয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। দূরের ঘনশ্যাম বন, অনুদিত সূর্য, বেগুনী-নীল রংয়ের পাহাড়ের ঢেউ খেলানো শিয়রের নীচে ছোট শহরখানি যেন কোন কল্পপুরী মনে হয়। শিশিরে মাথার চুল ঠাণ্ডা হয়ে যায়, জুতো ঘাসের ওপর ভিজে চপ্ চপ্ কর্‌তে থাকে—ওর মনেও হয় না।

মেয়েদের সম্বন্ধে ওর ভাবনার শেষ নেই ওর মনে হয়, ওরাও যেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের ভাষায় 'আত্মবিস্মৃত জাতি'। ওদের অতীতের কোনো ইতিহাস নেই, কোনো ভবিষ্যৎ নেই, কোনো স্বপ্ন নেই। ওরা হাত ধরে দাঁড় করালে দাঁড়াবে, কথা কওয়ালে কথা কইবে, নইলে মাটিতে পড়ে থাকবে। ওরা কি করে যে নিজেদের জাতের স্বার্থ দেখবে, নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন আনবে জ্ঞানের সাধনা করবে। কি করে এই স্বজন নামক বন্ধুদের শেকল বাঁধা পরম করুণার প্রসাদ থেকে বাঁচতে শিখবে। যেন এসব ওরই ভাববার বিষয়। সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গোপন মনের ভেতরের কোনখানে কিসের স্বপ্ন উঁকি মারে। কিন্তু সুপ্রিয়া কেবলি ভাবে এই সব। আর ওর এসব কথা বলতে ইচ্ছে করে না। ঐ আধ ফোটা ফুল আধ ফোটা আলো, ভোরে ময়ূরের ডাক পাখীর ডাকা সুরে, সিক্ত গাছপালা ঘাসে ছায়াসুপ্তি-মগ্ন গিরি-পর্ব্বতের মাঝে, দূরদিগন্ত ধাবিত আঁকা-বাঁকা পথের বুকে চেয়ে সে যেন ঐ আপনাদের আত্ম-বিস্মৃত জাতের ভবিষ্যৎ স্বপ্নের যাত্রা-পথের চিহ্ন অন্বেষণ করে। এই মনের সমস্যা আর জীবনের সমস্যা কোন দিগন্তপথে মিলে এক হয়ে যাবে! না, ওরা দুইই পথের দু'পারের মত অমনি সমান্তরাল ভাবে চিরদিন চল্‌বে!

বিভাস নেবে আসেন—ভাবনায় বাধা পড়ে! কথা কইতে হয়। কিন্তু তাই বলে তো এই চিন্তা-সম্পদহীন জাতের মনের সব দুঃখের কথা তো তাদেরই গর্ব্বিত প্রতিপক্ষের কাছে বলা যায় না।

কিন্তু কথাসূত্রে দুঃখের কথাও ওঠে। 'মেয়েদের শিক্ষা বৃথা,' 'তাদের নিজেদের জাতি-স্বার্থবোধ বলে কিছুই নেই।'

সুপ্রিয়া মৃদুহাস্যে বলে, 'দেখুন এরা এমন যে আত্মানং সততং রক্ষেত। আপনাদের মত নয়!'

বিভাসের ওর বিশ্লেষণ ভাল লাগে। হেসে বল্লেন, 'অর্থাৎ জাত হিসেবে আমরা স্বার্থপর এই তো। আপনি বড় নিষ্ঠুর সমালোচক—তা মহৎ অবশ্য—'

সহাস্যে সুপ্রিয়া বল্লে, 'আপনারাই।'

তারক এলেন বেরিয়ে। বাগানে নেমে এসে বলেন, 'বাঃ তোমরা তো বেশ ঠাণ্ডা পোয়াচ্ছ। আমার ভোরে ওঠা পোষায় না। খামকা ভোরে বিছানা ছেড়ে উঠে জগতের কি মহৎ কাজ সাধন হয়েছে বলতে পার?' তারক হাসেন।

ওরাও হাসে।

'কত যে ভাবি মনে করে রাখবে, অনেকগুলো বিখ্যাত লোকের বেলায় ওঠার কথা। তা মনে থাকে না। খুসী, মনে রাখিস্ তো। নজীর থাকবে।' একটু হেসে বিভাস বলেন, 'তার মানে বড় লোকের বেলায় ওঠেন না, ওঠেন কুঁড়ে লোকেরা!'

তারক খুশী হয়ে অট্টহাস্যে বল্লেন, 'ঠিক বলেছ।'

সুপ্রিয়া হাসে। বেড়িয়ে তার জুতো ভিজে গেছে একেবারে, ভোরের পৃথিবী ওর রহস্যপুরী আর সুপ্রিয়ার ভবিষ্য-পুরাণের ছায়াপথ মায়ারূপকে কোথায় লুকিয়ে ফেলেছে। সামনের পথে ষ্টেশনযাত্রী গাড়ী, লোকজন ব্যস্ততাময় কর্মজগৎ ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠেছে, পাহাড়ের ওপারের কুয়াশার কোল থেকে সূর্য্য কখন উদয় হয়েছেন, আকাশে রৌদ্র ঝলমল করছে। সবাই ঘরে উঠে যায়।

সন্ধ্যা শেষ হয়ে গেছে। সুপ্রিয়া একলাটি সামনের বাগানে সন্ধ্যাবেলা পথে বেড়াচ্ছিল।

তারক আর বিভাস এক সঙ্গে বেরিয়েছেন। মণিকা ভেতরে। পেছনে পায়ের শব্দ হল।

সুপ্রিয়া পেছনে চাইলে। বিভাস এগিয়ে এলেন। বল্লেন, 'আপনি এখানে? আপনার বুঝি শীত করে না।'

'গায়ে শাল আছে যে!' সুপ্রিয়া বল্লে, 'আপনারাও তো বাইরে থাকেন।'

'আমাদের গায়ে তো সবই গরম। তারপর ঘোড়ায় এলাম। গরম আর ধূলায় গা ভরে গেছে।'

'দাদা আসেন নি?'

'না তাঁর অন্য জায়গায় কাজ পড়ল বিভাস চুপ করে রইলেন। সুপ্রিয়া একটা বেঞ্চিতে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল।

তার অস্বস্তি হতে লাগল, বল্লে, 'নাইবেন? গরম জল দিতে বলব?'

'নাইব। গরম জলও নোব। সে সব দেবে'খন আপনাদের চাকররা।' একটু থেমে বিভাস বল্লেন, 'আমি কাল ভোরে যাচ্ছি, আমার ছুটি শেষ হল। একটু বসবেন?' সুপ্রিয়া বসল।

বিভাসও একটু চুপ করে রইলেন।

'আমি আপনার দাদাকে যে কথা বলেছিলাম সেটা শুধু মুখের কথা নয়। আপনার সেই কথার মত আপনার খাওয়া-পরার ভার নিয়ে আমি আপনাকে ঋণী করব, কৃতার্থ করে দোব, এ মনোভাবও আমার নয়।'

বিভাস একটু থামলেন।

সুপ্রিয়া অপ্রতিভ হয়ে গেল, অতটা প্রস্তুত হয়েও ছিল না। বিভাস ওর সুমুখে এগিয়ে এলেন। 'আপনি চিঠিতে যা লিখেছেন আমি দেখেছি। আপনি জানেন হয়ত—'

সুপ্রিয়া আরও লজ্জিত হয়ে উঠল। একটু সামলে নিয়ে এবার বল্লে, 'সে তো আমি আপনাকে বলিনি—'

বিভাস ঈষৎ হাস্যে ওর সুমুখে দাঁড়ালেন, 'তাহলে আমি ছাড়া আর সকলকে বলেছেন তো?'

সুপ্রিয়া অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে এবারে উঠে দাঁড়াল, বল্লে, 'চলুন ভেতরে যাই বড় শীত এখানে—'

ধূলোয় ভরা জুতো, পরিধেয়, প্রায় ছ'ফুটের কাছাকাছি দীর্ঘদেহ ওর পাশে পাশে আস্তে আস্তে চলতে লাগল। কথা একটিও কেউ বলছিল না।

সঙ্কুচিত সুপ্রিয়ার মনে হচ্ছিল, ওরা কি বিরাট। কি বড় এদের চেয়ে। ওরা যেন আশ্চর্য অদ্ভুত, একটি কথাতেই ইচ্ছে করলে এদের যেন লজ্জায় চুরমার করে দিতে পারে! তাই কি ওদের এত গর্ব্ব। তাই জন্যেই কি মেয়েরা এত ছোট, এত নিরর্থক হয়ে রইল সৃষ্টিতে? শুধু ওদের হাতের খেলনা

হয়ে, পুতুল হয়ে থাকবার জন্যে। তাই আজো ওরা কোন কিছু নিজেরা করতে পারলে না।

দালানের আলোতে বিভাসের ধূলি-ধূসরিত দৃঢ়দেহ হঠাৎ আরও স্পষ্ট হয়ে ওর চোখে পড়ে।

স্নান সেরে বিভাস যখন বসবার ঘরে ঢুকল, তারক তখনও ফেরেন নি। ভেতরের ঘরে মণিকা ছেলেকে ঘুম পাড়াচ্ছে। সুপ্রিয়া সেখানে নেই।

সামনে দালানের পাথর গাঁথা চওড়া নীচু রেলিংয়ের ওপর একটা থামে ঠেস দিয়ে বসেছিল।

কোলাহলহীন শীতের রাত্রি আপনার কুয়াশার গুণ্ঠনে সমস্ত দৃষ্টি আবৃত করে নিস্তব্ধ হয়ে কি ভাবছে যেন

সুপ্রিয়া ভেতরে যেতে পারে নি, কেন তাও নিজেই জানে না। গুছিয়ে ভাবতেও কিছু পারছিল না। ওর যেন মনে হচ্ছিল, এতদিনের এত স্বাতন্ত্র্যের, নিজের জাতের, নিজেদের বৈশিষ্ট্যের সাধনা, এত চেষ্টা, সমস্তকেই চিরন্তন বন্ধনের মধ্যে পরানুগত্যের স্বজনানুগত্যের মাঝে নিঃশেষ করে দেবে? আর আশ্চর্য্য এই যে, ওর মন এত দুর্বল। ওর তো বিমুখ করে দেবার ইচ্ছে হচ্ছে না। কিন্তু ওরা ভেবেছিল কত! কতখানি! একটি একটি করে হাজারে একটি শতকে একটি, করে মেয়েদের মনকে জাগিয়ে তুলবে। তারা যেন মেয়েদের সমস্ত হীনত্ব-দীনতার লাঞ্ছনা অখ্যাতি থেকে মুক্ত হয়ে নতুন নারীর নবজাতি সৃষ্টি করে। কিন্তু—কিন্তু ও জানতে না ও এতখানি আকৃষ্ট হয়েছে। এত দুর্বল ও! শুধু মোহ না আকর্ষণ না সত্যই কিছু এটা? ওর হঠাৎ মনে পড়ে, অজিতকে লজ্জায় বিতৃষ্ণায় ও দুহাতে মুখটা ঢেকে নেয়।

বিভাস এসে দাঁড়ালেন ওর পাশে। ও জানতে পারল না। একটু চুপ করে থেকে তিনি বল্লেন, 'আমি যদি কাল যাই আর তো দেখা হবে না।' সুপ্রিয়া চমকে চাইল। কাছে একটা মোড়া পড়েছিল, টেনে নিয়ে বিভাস বল্লেন, 'আমি এখানে একটু বসব কি—আপনার অসুবিধে হবে?'

চাঁদের আলোয় সুপ্রিয়ার মুখটির আধখান দেখা যাচ্ছিল। ওই তনু দেহখানি, ওটার মাঝে একটি অতিশয় স্পর্শভীরু অভিমান মধুর দুর্বল অন্তর, তার মনে এত ক্ষমতা যে নিজেকে দূরে রাখবে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আকর্ষণ থেকে, সমস্ত উপেক্ষা করে যেতে পারবে। বিভাসের কৌতুক বোধ হয় এবং কেন কে জানে, অত্যন্ত মায়া হয়, মনে হয় ওরা কি ছেলেমানুষ, ওরা কি

ক্ষীণ, আর তবু ওরা চায় এদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে। পারে কি? হয়ত পারে। কেননা ওদের ছুঁতে ভয় করে। যেন এখুনি ভেঙ্গে ঝরে পড়বে। মাটিতে মিশে যাবে। ওই কি এদের শক্তি?

তাই ওদের ছোঁওয়া যায় না। অথচ আশ্চর্য্য যে ওরা তা জানে মনে হয়। এই প্রবল শক্তি গর্ব্বিত বলিষ্ঠ জাত ও ওদের মত ক্ষীণ স্বল্প প্রাণদের ভয় পায়!

আরও আশ্চর্য্য যে ঐ শক্তি নিয়ে বিরোধ করবে। বিভাসের হাসি পায়। ওর মনে হয়, এই ওদের দুর্ব্বল প্রবলের বিরোধ যেন অবনম্র প্রেমের সঙ্গে অহঙ্কৃত শক্তির বিরোধ। কিন্তু এর কি খুব বেশী দরকার ছিল? দুটো কি এক জিনিষ? কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তবু তর্ক হবেই।

কিন্তু এ'সব যাক্, যা হয় হোক, তার পুরুষের মন অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে।

সুপ্রিয়া হঠাৎ মুখ তুল্লে, বল্লে, 'দেখুন আমি ভেবেছিলাম যে এমনিই থাকব। সবাই তো এই করছে অন্তত: আমরা দু'একজনও ক'টি মেয়েকে মানুষ করে তুলি।'

বিভাস হাসলেন, বল্লেন, 'বেশ তো। কিন্তু কিছু মনে করবেন না।—পৃথিবী 'ইউটোপিয়া' হবে না। সে চেষ্টার ত্রুটি এযাবৎ কাল হয় নি!'

সুপ্রিয়াও হাসলে, বল্লে,—'কিন্তু আমি কাজ ছাড়্‌ব না। অর্থাৎ আপনি আপনার কাজ ছাড়বেন না, এবং আমি আমার নয়।'

বিভাস মৃদুহাস্যে বল্লেন, তা হ'লে রবিবাবুর 'শেষের কবিতা'র মত একটা বিশেষ কিছু করতে হবে বলুন! এ মন্দ পন্থা নয়!'

'না আমি ঠাট্টা কর্চ্ছি না! আমার মনে হয় আপনারা আমাদের ভার নিয়ে যে কৃতার্থ করে দেন—তা' এই আর্থিক স্বাধীনতা থাকে না তাই!'

বিভাস একটু অপ্রস্তুত হলেন, একটু দু:খিতও। একটু চুপকরে থেকে বল্লেন, 'আমি কিন্তু গোড়াতেই বলেছিলাম কারুকে কৃতার্থ করে দিতে আমি চাই না। যাক্, একথা তা'হলে থাক্।'

অকস্মাৎ সমস্ত লঘু আকাশ বাতাস যেন আড়ষ্ট হয়ে গেল। ওরা চুপ হয়ে গেল। ঘড়িতে মিনিটের কাঁটা টিক্ টিক্ করে ঘুরে যেতে থাকে। সময় মন্থর হয়ে চলে যেন।

খানিক পরে তারক এসে পড়লেন। তৃতীয় ব্যক্তির আসায় ওরা সহজ হয়ে বাঁচল। ভেতর গিয়ে সহজ নিশ্চিন্ত ভাবে সুপ্রিয়া শুয়ে পড়ল। মনে হল যেন বেশ ঠিক হল সব! কিন্তু ঘুম আসে না আর। তার কেবলই মনে

হতে লাগল, যেন কি ভুল হল। ভুল যে কোন্‌খানে কোন্ যুক্তির দিকে সে কিছুই খুঁজে পায় না। সে তো ঠিকই বলেছে। আর্থিক অধিকারের, স্বাধীনতার দাবী সব মেয়েরই থাকা উচিৎ, কমই হোক আর বেশীই থাক। ওদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরের জন্যই না ওরা এত অপমান সহ্য করে। [illegible] পারে উনি বা ওঁরা কেউ একজন দু'জন কৃতার্থ করে দেন না অথবা কৃতজ্ঞতার বোঝা মাথায় তুলে দিয়ে চলেন না। কিন্তু এরা তো ল[illegible]ত হয়ে থাকে, কৃতার্থ হয়ে থাকে। ওর মনে হয় যে যত বেশী স্বাচ্ছন্দ্য-দাতার স্ত্রী সে তত বেশী ঋণী হয়, মাটী হয়ে থাকে। অবশ্য ও ঠিক জানেনা হয়তো, কিন্তু ওর মনে হয় যেন নিতান্ত এই রকমই ধরণ। সুপ্রিয়া কেবলি যুক্তির [illegible]জালে আপনাকে আপনার বলা কথাগুলোকে ঘিরে ঘিরে বেশ করে সাজাতে থাকে সমস্ত ঠিক থাকে, ভুল একটুও নেই কোনোখানে। একেবারে ঠাস বুননী যুক্তি।

কিন্তু ছোটদের বইয়ের হেঁয়ালীর পথে যাত্রার সমস্যার মত কোনখা[illegible] দিয়ে সূক্ষ্ম অদৃশ্য একটা পথে সংসুপ্ত বেদনাময় উদাস মন ব্যথাময় [illegible] পথে চলতে থাকে—তার একটা গন্তব্য যেন কোথায় আছেই। [illegible] সেটা এটাও নয়, আর কোথায় যেন আছে।

সুপ্রিয়া আবার ভাবে নারীর অস্তিত্বের এই হীনতা, অবস্থার দীনতা, নিত্যকার লাঞ্ছনা—অবমাননা, অপ্রতিকৃত অসম্মান, লজ্জা তার [illegible] দেহ, তার দাম্ভিক স্বজন, কিংবা ক্রেতা এই সবজনিত তার [illegible] সঙ্কীর্ণ হীনবুদ্ধি—এর প্রতিকার করতে হবে ওকে, ওকেই ভাবতে হবে। হঠাৎ সমস্ত যুক্তির অন্তরাল থেকে তার বিভাসের সাকৌতুক সহজ কথা, আর স্বচ্ছ হাসির ধরণ মনে পড়ে। ভাবনার মোড় ফিরে যায়—মন আকাশ-পাতাল ভাবে, ওর অনিচ্ছাতেই!

শুধু ভাবে ওরাই কি তারা? যারা নারীকে শ্রদ্ধাহীন ব্যবহারে ক্ষুদ্র, দীন, সঙ্কুচিত করে রাখে, হীন করে রাখে। বিভাস কি এই দলের?

ও ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তা হলে এই? এই আকর্ষণ, মোহ এই পথের শেষও গোড়াও। তারপর পরিণাম গন্তব্য সবারি মত সেই-সেই এক। মন যেন কোথায়ও কূল পায় না।

অবসাদে আচ্ছন্ন মন ভাবে 'ভালই করেছে সে'। এ আদর্শও দেখানো তো দরকার। এর চেয়ে কিবা আছে! কিন্তু আনন্দ হয় না। কি যেন অভাবে মন অভিভূত হয়ে থাকে। তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবেই রাত্রি শেষ হয়ে যায়।

পুরাতন পৃথিবী

ভোর হয়ে যায়। তারকের নির্দ্দেশমত চাকর বিভাসবাবুকে চা দিয়েছে। জিনিষপত্র ঠিক করে দেয়। শীতের ভোর। বাড়ীর সকলেই ঘুমায়। আকাশে তখনো তারা অনেক। সুপ্রিয়া উঠে পড়ে। তাকে জিজ্ঞাসা করে, সব ঠিক করে দিয়েছে কিনা? যেন ঐ জন্য উঠেছে। সে অলক্ষ্যে বাগানে নেমে আসে। ঘাসের ওপর পাতা বেঞ্চিতে বসে। বেরুবার কাপড় পরে বিভাস বেরিয়ে এলেন। পূর্ব্বদিকে আলোর আভাস চোখ মেলছে। বিভাস সামনের পথে নেমে এলেন। গায়ে গরম কোট।

তিনি এসে ওকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। 'আপনি এই ভোরে। পায়ে জুতো নেই, গায়ে মোটা কাপড় নেই। আশ্চর্য্য। আমাকে তো চাকর সব ঠিক করে দিয়েছে। কি খেয়াল। অসুখের ভয় নেই?' ও মুখ তুলে জবাবের মত একটু বল্‌বার চেষ্টা করলে। কিছু বল্‌বার আগেই বিভাস এগিয়ে এলেন, সহজ ভাবে হেসে বল্লেন, 'যান ভেতরে, গায়ে কাপড় দিয়েই আসুন। কিন্তু—আপনার অসুখ করেছে নাকি? মুখ এমন দেখাচ্ছে কেন? দেখি আপনার হাত?'

সুমুখে এসে হাতটা ধরতেই সুপ্রিয়া নীচু হয়ে অন্য হাতে ঢেকে নিল বিভাস অত্যন্ত আশ্চর্য্য আর অপ্রতিভ হয়ে হাতটা ছেড়ে দিলেন। একটু পরে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার শরীর ভাল নেই?'

সুপ্রিয়া কিছুই জবাব দিলে না। মুগ্ধ বেদনাব মোহে তার আতপ্ত আনম্র অন্তর বিকালবেলার পদ্মের মত প্রেমের অন্ধদেবতার পায়ে নুয়ে পড়েছিল যেন ইতস্তত: ভাবে একটু দাঁড়িয়ে থেকে বিভাস বেঞ্চিটিতে বস্‌লেন। সুপ্রিয়ার আনমিত দেহ, মুখ ঢাকা, হাতের সরু লম্বা আঙ্গুলগুলির পাশে তার কপালের ওপরের চুলের সীমানা, মাথার ওপর কাপড নেই, সোজাসুজি জড়ানো রাত্রিবেলার শিথিল একটি খোঁপা। হঠাৎ বিভাসের চোখে যেন ওর মন সবটা স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ল।

আকাশ থেকে শেষ তারাটাও মিলিয়ে এলো। নির্জ্জন, পথ তেমনি নির্জ্জন, মাঝে মাঝে দূরের পথে একটা করে এক্কা কি গাড়ী যায় শুনতে পাওয়া যায়। এবার বিভাস ওর কাছে এসে বল্লেন, 'সুপ্রিয়া ওঠো। আমার যাবার সময় হয়ে এলো।' সুপ্রিয়া অপ্রতিভ ভাবে মুখ তুলে। বিভাস ওর বাঁ হাতখানা

মুঠো করে নিলেন। শুধু বল্লেন, 'তোমার হাত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।'—দু'জনেরই মুখে কথা আর এলো না। বিভাসের মনে কি হয়েছিল, কি রকমের, কেমনতর সুপ্রিয়ার সে কথা বিশ্লেষণ করে দেখ্‌বার ভাববার ক্ষমতা ছিল না। তার নিজের নতুন উপলব্ধির মাঝে যুক্তিতর্ক, অধিকার, দরকার, গোপন মনের বিরোধ অকস্মাৎ সব কোথায় মিলিয়ে গেল।

দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায় তার চোখে 'আকাশ সেদিন বড়ই নীলা দেখালো। পৃথিবী শ্যাম, আলো মধুর, পশ্চিম দিগন্তের ছায়া ঘন অন্ধকার, অতুল প্রেমের মত গভীর অতল দেখালো—' আর তার সহজ চোখের দৃষ্টি, কৃশ মুখ, পাণ্ডুর রং কেমন করে কখন উজ্জ্বল হয়ে উঠল, তা সুপ্রিয়া জান্‌লো না, বুঝ্‌তেও পারলে না। কিন্তু সমস্ত সকাল, ভোরের পৃথিবী আকাশ অরণ্য, জড় জগত, যেন অবাক হয়ে বিভাসের চোখের চেয়ে ওকে মুগ্ধ হয়ে দেখ্‌লে। সুপ্রিয়া তো এত সুন্দর ছিল না, কবে হল? কি করে? সুপ্রিয়াও জান্‌লে না, চেতনায় যে আনন্দ ফোটে নি, মগ্ন চৈতন্যে তার এত প্রকাশ কোন্ অনির্ব্বচনীয়ের প্রসাদে তার প্রাণের অঞ্জলি পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে

অধিকারবাদের গোড়ার কথা, নারীর অবমাননার প্রথম কথা, জীবন ও সমাজ-বিজ্ঞান এবং যাবতীয় সমস্ত দুঃখের কাহিনী—যতই দূর-বিস্তৃত ঊষর প্রান্তরের মত হোক, বহু দূরব্যাপী হোক, এই উপলব্ধি এই নতুন অনুভূতি এত গভীর সমুদ্রের মত নিতল যে সুপ্রিয়া আর ভাবতেও পারছিল না ও সব। সে নিঃশেষে মগ্ন হয়ে গিয়েছিল যেন বিভাস বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

বড়দিনের ছুটী সুপ্রিয়ারও শেষ হয়ে এল ফেরবার সময় হলো। যাবার সময় মল্লিক চুপি চুপি স্বামীকে বল্লে, 'তোমার মনে আছে, সেই বেজ্জ ঠাকুরাণী ব্রজেশ্বরকে জিজ্ঞাস করলেন 'বেজ, এখন কেমন খাস' ?'

ব্রজেশ্বর বল্লে, 'ভাত'

বেজ্জ ঠাকুরাণী আবার জিজ্ঞাস করলেন, 'গরুর দুধ কেমন ?'

বজ বল্লে, 'বেশ'

ভাজ ননদের দিকে চায়—বলে, 'না ভাই ? মনে আছে তোর ?'

সুপ্রিয়া অপ্রস্তুত হয়ে হাসে। তারক প্রথমটা অবাক হয়ে যান, শেষে অট্টহাস্যে বলেন, 'মা শোনো একবার। তুমি থাকতেই কিনা ও ননদকে কথা শোনায় !'

সেকালে মুনি-ঋষির প্রেমের অস্তিত্বকে স্বীকার করতে চাইতেন না আর

করলেও সেটা মায়াস্বরূপ মনে করতেন ; একালেও বিলিতী পণ্ডিতরা প্রেমকে প্রেম নামে স্বীকার করতে চান না অনেকেই, তাঁদের বিশ্লেষণে মনের সে আত্মীয় নয় সে শরীরের বিষয়। অথবা শরীর-বিজ্ঞানের মাঝে তার স্থান, কামনা তত্ত্বের একটা ভাসা ভাসা উপরিচর অংশ ইত্যাদি। কেউ বল্লেন তাকে মাদকতা, কেউ সৃষ্টিধারা ; অতি আধুনিক কেউ আধুনিক মতকে মেনে নিয়ে তার স্বরূপের আদর্শ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন, যে সেকালে এই প্রেমটা ছিল একটা অহোরাত্রি সাধনার বিষয় ; (A whole time job) এখন, সেটাকে শরীর-বিজ্ঞানের এলাকায় এনে লোকে খুব সহজ ও প্র্যাক্‌টিক্যাল করে নিচ্ছে সেটা। অধিকারবাদীরা আবার তাকে অধিকারবাদের কোঠায় এনে ফেলে কাট ছাঁট করবেন।

সুপ্রিয়া মুনি-ঋষিদের কেউ ছিল না, বিলিতী দর্শনের কামনাতত্ত্বের পাকও ঘাঁটে নি। প্রয়োজনবাদের কথা ও বেশী ভাবে নি, ওর পোঁচা ছিল মনের মাঝে বোধহয় পীড়িত বেদনায় যার জন্ম বাংলাদেশের মেয়ে, তাকে কেন ও জানত এবং তার পর ও দস্তুর তার প্রেম ও প্রথা দেখে কিন্তু যাই হোক, প্রেম যখন যাকে ছোঁয় শ্রীরাধার মতই তাকে দেশ কুল মন অহোরাত্রি সবই সবশুদ্ধই ভাসিয়ে নিয়ে যায়, যাচ্ছে—চিরকালের মতই। সুপ্রিয়ারও প্রেমতত্ত্বের স্বাভাবিক নিয়মে মনে হল বিভাস অপরূপ। এবং বিভাসই একমাত্র সেই মানুষ যাকে ও ভালবাসতে পারে এবং সকলেই ভাল না বেসে ভাল না বলে পারে না। অবশ্য ও কিন্তু সকলকেই ভালবাসতে দিত না, কিন্তু গর্ব্বিত তো হত। এমন আর কারোকে ও দেখে নি। কবির কথায় ও যেন 'জনারণ্যে হারানো' সম্পদ ফিরে পেল। যার নিঃশ্বাসের আভাসেই এর চরাচর মূর্চ্ছাতুর হয়ে গেছে, না জানি।—সে থাক্। আপাততঃ নানা মতের নানা ভাষণ অকস্মাৎ পথ হারিয়ে ফেল্লে : এবং যতটুকু জানাই হোক্ এবং বৌদির সব্যঙ্গ পরিহাস হাসি ওর ভালই লাগল

ব্যক্তিত্ব ও প্রেম

দোলনা ধরে খুব জোরে দোল দিলে সেটা দুদিকেরই দিক্ সীমা প্রান্তে পৌছয়। সুপ্রিয়ার হল তাই। প্রেম যতটা তার অনাবশ্যক নিষ্প্রয়োজন মনে হয়েছিল, ততটা তার সমস্ত ব্যক্তিত্বকে সে গ্রাস করলে। এবং স্বাধীনতার

স্বপ্ন দেখা মন যেমনি তর্ক করে অমনি সেটা অপর প্রান্তে এসে পৌঁছায়। সুতরাং বিবাহও হ'ল এবং গুরুকলের কাজও তার রইল। এবং বিয়ের পর যেমন ছুটী শেষ হল, সুপ্রিয়া যাবার ঠিক করলে। বিভাস ভেবেছিলেন বুঝি সাধারণ মেয়ের মতন বিয়ের পর ও নিজেকে বেশ মানিয়ে নেবে। এবং সেটা হয়ত খুব সহজই। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যদাতা স্বামী, ও তার অর্জ্জিত অর্থ, তার অবসর মত সোহাগ, মেজাজ মত শাসন, সবাই তো সবই সমানভাবে সহজ-ভাবে নেয়, তখন—সুপ্রিয়ার যাবার কথা শুনে বিভাস একটু দুঃখিত হলেন, 'তোমার আর যাবার কি দরকার খুব? তোমার কি এখনে অসুবিধা হচ্ছে?'

সুপ্রিয়া বল্লে, 'না অসুবিধা নয়। কিন্তু আমি তো আগেই বলেছিলাম কাজ ছাড়ব না আমি।'

'কিন্তু সে দরকার তো নেই।'

'আর্থিক দরকারের হিসেবে বলিনি, আমার মনে হয়'—সুপ্রিয়া চুপ করলে।

চৈত্রের অন্ধকার রাত্রে ছাতের ওপর সতরঞ্চি পেতে ওরা শুয়ে ছিল। শিরীষ ফুলের গন্ধে সমস্ত আকাশ বাতাস রাত্রি উতলা হয়ে উঠেছিল যেন পার্ব্বত্য প্রদেশের শুকনো গাম্ভীর্য্যের মাঝে তার গন্ধ কোন মধুর নব বসন্তের আগমনীর মত মনে হচ্ছিল।

বিভাস চুপ করেই ছিলেন তারপর বল্লেন, 'কি মনে হয়?'

'আমার মনে হয় আমার নিজস্ব উপায় থাকা উচিৎ।'

এবার বিভাস সপরিহাসে বল্লেন, 'আমার নিজস্বও বুঝি তোমার নয়?'

পরিহাসকে এড়িয়ে সুপ্রিয়া বলে, 'আমি আসব'খন এই শীগগীর ... শ্রাবণে। আমাদের ওখানে বর্ষার ছুটি হয়।' সুপ্রিয় চুপ করলে

অন্ধকার ছাতে বিভাসের মুখ দেখা যাচ্ছিল না। সুপ্রিয়া নীচু হয়ে দেখবার চেষ্টা করে! দেখা যায় না। চুপ করে থেকে বিভাস বল্লেন, 'বেশ। কিন্তু আমার ধারণা ছিল তুমি বিয়ের পর অন্ততঃ আমার কথা বুঝবে।' সুপ্রিয়া একটু অবাক হয়ে বল্লে, 'আমারও তো বলা ছিল তোমাকে।'

'সে কথা আলাদা। বিয়ের পর এরকম ভাবে দূরে থাকা মানে বিয়ের কোনো অর্থই হয় না। তাছাড়া আমার যখন তোমার উপার্জ্জনে দরকার নেই।'

সুপ্রিয়া আরও একটু আশ্চর্য্য ভাবে বল্লে, 'তার মানে তোমার দরকার আর তোমার মতই আমাকে মানতে হবে, এই তো?'

অদ্ভুত উত্তরে বিভাসও আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন, বল্লেন, 'না তা নয়। যাক্ আমি তর্ক করব না।'

দুজনেই চুপ করে রইল। খানিক পরে বিভাস বল্লেন, 'শোবে' ?

ও বল্লে, 'শোব'খন, এখন পড়ব।'

বিভাসের মনে হল এই লেখাপড়ার ফল। নিরর্থক স্বাতন্ত্র্যবাদ! সুপ্রিয়ার মনে হল, এই বিয়ের অর্থ। এই মেনে চলা! ওর প্রয়োজন ওর মত কিছু নয়, বিভাসেরই সব। ওর নিজের প্রয়োজনের কথাই বড়।—সুপ্রিয়ার প্রয়োজন আছে কিনা সে কথা সুপ্রিয়া ভাবে না।

সুপ্রিয়ার যাবার দিন এসে পড়ল। যথা সময়ে বিশুষ্ক মুখে নব দম্পতী ষ্টেশনে এলো। টিকিট কিনে গাড়ীতে তুলে দিয়ে বিভাস ওর বেঞ্চিতে একধারে বসলেন। ও নীচু মুখে অন্য কি গোছাতে লাগল।

বিভাস ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। এই ক'দিনে আরও রোগা হয়েছে ও। কেমন সুন্দর কোমল শ্রী, কিন্তু আশ্চর্য্য অবাধ্যতা। গাড়ী ছাড়বার সময় এলো। বিভাস বল্লেন, 'তাহলে চলি।' ও একবার মুখটা তুল্লে, মনে হল যেন মুখটা কি রকম হয়ে গেছে।

বিভাস ওর দিকে চাইলেন ও মাথা নীচু করে নিলে। বিভাস নেবে গেলেন। জানালার পাশে হাত রেখে ও বসেছিল, সেখানে এসে দাঁড়ালেন। বেশ সহজ সাধারণ ভাবে যেন বন্ধু—বল্লেন, 'পৌঁছে খবর দিও'।

সুপ্রিয়া মাথা নীচু করেই ঘাড় নাড়লে। ট্রেণ ছেড়ে দিল। বিভাসের মনে হল, ওর চোখ ছলছল করছে কিন্তু কিছু বল্‌তে ইচ্ছে হল না। সুপ্রিয়ারও মুখ তুল্‌তে ইচ্ছে হল না

ওরা চিঠি দেয়। বেশ নিয়মিত। যেন মাসিকপত্রের ভ্রমণকাহিনী। কোথায় কবে কে কি করলে, গেল, কার লেখা বই পড়্‌ল। উচ্চাঙ্গের সাহিত্য—আলোচনায়, সৌজন্যে, ভদ্রতায় সে রচনা অপূর্ব্ব। ভাষা, ভাব হিসাবে সাহিত্যও তাকে হয়ত বলা যায়। কিন্তু নিতান্ত সাধারণ সকলেরই জানা সেই সঙ্গোপন ব্যাকুল মোহ, আকাঙ্ক্ষা, অনির্ব্বচনীয় বেদনা বিরহের আভাস, অত্যন্ত তুচ্ছ সোজাসুজি ভালবাসা তাতে থাকে না। ওই সাধারণ বিষয় ছাড়া আর সব গুরুতর, গম্ভীর বিষয় তাতে থাকে। এই নারীস্বাতন্ত্র, প্রতিভা ইত্যাদি।

বিভাসের মনে হয়, বিলিতী বইয়ের আলোচনা, স্বাধীন ও সখ্য বিবাহ কি এই ?……

কিন্তু যেন একটা সর্ব্বগ্রাসী অবসাদে দেহমন আচ্ছন্ন হয়ে আসে। বিভাসের খুব অভিমান হয়। অথচ দুজনেই ভয়ে ভয়ে নিয়মিত চিঠি দেয় পাছে এই মধুরতার সূত্রটুকুও ছিঁড়ে যায়।

ওখান থেকে [illegible] খবর পেয়ে লিখলেন, 'তুমি কি হে? খুসী গেল যে। তোমার বৌ-ঠাকরুণ বল্‌ছেন, তুমি ওকে একটু দাবিয়ে রাখ্‌তে পারলে না? মা বেজায় রাগ ক'রেছেন।'

বিভাস জবাব দেন, 'ওকে দাবিয়ে রাখার কোনো প্রয়োজন দেখি নি। ওর যদি আমার কাছে থাকার অসুবিধা হয় ও যদি না চায়, আমার দিক থেকে কিছু বল্‌বার নেই। আমি ওকে জোর করে তো চাই নি, আমার মত করে ও আমায় চাইবে এই চেয়েছি।'

দাক্ষায়ণী—আধুনিক

শ্রাবণ এলো। আরাবল্লীর রুক্ষ শিখরে শিখরে ঘননীল মেঘের ছায়া ফেলে, ঊষর প্রান্তরের বন অরণ্যে শ্যাম স্নিগ্ধতা ফুটিয়ে প্রকৃতিকে আনন্দে ভরে সে এলো। পাহাড়ের ওপর আলোছায়ার সলীল খেলা চোখে পড়ে। মেঘের শ্যাম, নীল জটার দিকে চেয়ে মনগুলো অধীর হয়ে ওঠে। তাদের ক্রমাগত কেবলই দিগন্ত সীমায় বনের শিখর ঘিরে ঘিরে যেন আরও মেঘ ঘনিয়ে পড়ে। ঠাণ্ডা বাতাস, স্বল্প শ্যাম বন প্রান্তর, শুষ্ক মরু তটিনী ভরে ঝম ঝম করে বৃষ্টি নামে।

কি রকম কেমন একটা অবসাদে নিরানন্দতায় বিভাসের অন্তরের প্রান্ত যেন আচ্ছন্ন হয়ে যায়। ওর চিঠির জবাব আরও সংক্ষেপ হয়ে যায়। এক একবার মনে হয়, থাক্, আর কাজ নেই। কোনো সম্পর্কেরই দরকার নেই।

তার পুরুষের অন্তর নির্বস্তু ধ্যান করতে চায় না। সে ওকে পরিপূর্ণ ভাবে অধিকার করে, আবৃত করে,—আচ্ছন্ন করে লুপ্ত ক'রে দিতে চায়—আকাঙ্ক্ষা দিয়ে, আশ্রয় দিয়ে, কামনা দিয়ে।

মেয়েদের মত অবাস্তব ধ্যান করে আদর্শ লোকে জীবনযাপন করায় বিভাস অধৈর্য্য অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। চিঠিতে সুপ্রিয়া কবে আসবে তা লেখে না। বিভাসও প্রশ্ন করেন না। কিন্তু তার মনে হয় ও আর পারে না। এই অভিনয় শেষ হোক্। কিন্তু কি ক'রে? সাধারণ লোক কি করে? সাধারণ পুরুষ কি করে? দাবী? শাসন? ভৎর্সনা? ওর হাসি পায়। তবে?—তবে কিছুই নেই।—ও

সুপ্রিয়াকে চায় সবশুদ্ধ। তার মুক্ত ব্যক্তিত্ব, তার মধুর মন, গভীর ভালবাসা তার বিশেষ ও সমগ্র অস্তিত্ব নিয়ে। দাবী ও করবে না—ও কিছুই বলবে না।

তারকের চিঠি এলো।—'খুসী দেখছি এখানে এলো। মানে?—অর্থাৎ আমরা কিছু বুঝলাম না। তুমি আনতে গেলে না কেন? ওই বা গেল না কেন?—ও বল্লে, ওর আমাদের জন্য মন কেমন করছিল! ওর বৌদি বল্লেন, শোনো একবার।—কিন্তু তোমাদের এই কাব্য আর প্রেম নিয়ে আমরা সাধারণ ভাল মানুষরা গেলাম। মা বল্লেন, ওই জন্যেই সেকালে মেয়েদের লেখাপড়ার চলন ছিল না। (মার সেকাল অবশ্য)। তোমার বধূ ঠাকুরাণী বল্লেন, বিভাস বাবুকে লেখ, অত মহৎ ব্যক্তি না হয়ে একটু সোজাসুজি চলনসই স্বামী হন ওদের কাছে নাকি যত্ন সেবা কেড়ে নিতে হয়। ওদের অতি আধুনিক মেয়েদের খোলস নাকি কিছু বেশী শক্ত। অত্যন্ত আধুনিক make (মেড ইন্ কোথায় তা বলতে পারলেন না। জ্ঞান তো তাঁর বিদ্যে)। এবং বল্লেন কিন্তু ওদের ভিতরেও সেই অভিমানিনী 'দাক্ষায়ণী'ই আছেন। আমি নিতান্ত নিরীহ ভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, তা ওপরের সেই শক্ত খোলাটা কি করে ভাঙতে হয়, উনি কিছু জানেন না কি? উনি অত্যন্ত রাগ করে বল্লেন, হাতুড়ি দিয়ে।

ভেবে দেখ, না হয় ভাল মানুষ—সেকেলে মানুষ জিজ্ঞাসাই করেছি, তাই বলে কি অত রাগ করতে হয় আমার বোনের ওপর আর যেন আমাদের বুদ্ধিকেও ইঙ্গিত করা হল। কিন্তু সে যাক তুমি একবার এসো। ওর শরীরও তেমন ভাল মনে হল না। এবং টীকাকারিণীর সাহায্যে বুঝলাম, এই 'মন কেমন' কার জন্য।

সামান্য ইতস্তত: করে বিভাস এলেন। খানিকটা কৌতূহল, খানিকটা সান্নিধ্যের ইচ্ছা, খানিকটা কৌতুক সবই ছিল।

মা এসেছিলেন খুব রাগ করে বল্লেন, 'বৌমাকে নিয়ে আসিস। তোদের সব উল্টো ছিষ্টি।' আরও সব মন্তব্য মা করতেন, কিন্তু করলেন না। শুধু রাগই করলেন।

বিভাস যখন ওদের বাড়ী এলেন তখন ঘন শ্রাবণের সন্ধ্যায় সমস্ত নিষ্প্রালোক। সকালে খুব বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। মাটি, বালি তখনও কিন্তু সিক্ত। বালির

বুকের অনেকখানি ভেজা। পাহাড়ের ওপরে স্তরে স্তরে মেঘগুলো শ্যাম হয়ে আসছে। ধূসর বালি, সবুজ গাছ, পরিম্লান শ্যাম সন্ধ্যার আঁচলের ছায়ার মাঝে সুপ্রিয়া ছেলে নিয়ে পাশের বাগানে গল্প করছিল।

ওকে দেখে সুপ্রিয়া অপ্রস্তুত হয়ে উঠল, আর মাণিক আনন্দিত হয়ে এগিয়ে এলো। যথারীতি কথা কয়ে সে বল্লে, 'বসুন আমি মাকে বলে আসি।'

ভিজে মাটির খেলনা গড়ে খেলা ছেড়ে দিয়ে ছেলেরা উঠে দাঁড়িয়েছিল, এখন অত্যন্ত উল্লাসে মার সঙ্গে ভেতরে গেল। পিতামহীর কাছে খবর দিতে।

সুপ্রিয়া অপ্রতিভ ভাবে দাঁড়িয়েই রইল। সাদা একখানি শাড়ী, খালি পা, কি একটা ঘোর রংএর খদ্দরের জামা গায়ে। মাথায় কাপড় কুমারী মেয়ের মত খোলা, তেমনি একটা হাতে জড়ানো এলো খোঁপা। তার চারিপাশ ঘিরে শ্রাবণের অতি সাধারণ একটি সন্ধ্যা,—কিন্তু বিভাসের মনে হল যেন অনির্ব্বচনীয় দৃশ্য। মরুভূমি বলেই কি শ্রাবণের এত রূপ। মনে হল সুপ্রিয়া রোগা হয়ত হয়েছে, কিন্তু সঙ্কুচিত লজ্জার আভাসে তাকে স্বাস্থ্য-সম্পন্নের মতই দেখাচ্ছে। বিভাস দাঁড়িয়ে রইলেন। ও অপ্রতিভভাবে বল্লে, 'বোসো।' ওর পাশের বেঞ্চির ওপাশের দিকে বিভাস বসলেন। সুপ্রিয়ার কিন্তু অকারণেই কি রকম একটা অভিমান হল। ও বসে অন্যদিকে চেয়ে রইল। মনে হল, এই আসা যেন ইচ্ছা করে ওকে লজ্জিত করা। বিভাস ওর দিকে চেয়ে রইলেন চুপ করে। তারপর বল্লেন, 'তুমি যে যাবে বলেছিলে গেলে না?'

সুপ্রিয়া সাধারণ মেয়ের মতই অভিমান করে মনে মনে বল্লে, 'নিজে থেকে বাব কেন?' কিন্তু ব্যক্তিত্ববান হিসেবে আধুনিক ভাবে সেটাকে বুঝে একটু চুপ করে রইল। তারপর বল্লে, 'যেতাম।'

'কবে?'—উৎসুক কৌতূহলে বিভাস জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাজ ছেড়েছ?'

'না, কাজ ছাড়ি নি তো।' একটু অপ্রস্তুত ভাবে ও জবাব দিলো।'

'তবে?—বেড়াতে যেতে?—ও: তা যেয়ো। একটু আগে খবর দিও সব গুছিয়ে রাখ্‌ব!'

অকারণে রাগে সুপ্রিয়া অন্যদিকে চেয়ে বসে থাকে। একটু হেসে বিভাস ওর সুমুখে এসে দাঁড়ালেন। 'তোমার শরীর শুনলাম ভাল নেই। কেমন আছ?'

সুপ্রিয়া জবাব দিলে না। ওর মনে হল, নিরর্থক জিজ্ঞাসা।

বিভাসের মনে হচ্ছিল তারকের চিঠির অভিমানিনীর গভীর কথা। ও মাথায় কাপড় তুলে দিতে পারে নি। বধূর শান্ত-লজ্জার চেয়ে কুমারী মেয়ের

সঙ্কোচ-লজ্জার ভাব তার বেশী হচ্ছিল। বিভাস ঈষৎ হাস্তে বল্লেন, 'এর চেয়ে এক কাজ করা যাক্। আমিই কিছুদিন করে ছুটী নিয়ে ওখানে গিয়ে থাক্‌ব ?— তাহলে তোমাদের অধিকার সমস্যা আর আমার বিরহ সমস্যা দুইয়েরই সমাধান হয়। কি বল ?'

এবার ও রাগ করে বল্লে, 'হ্যাঁ।'

'একটী কবিতা মনে পড়্‌ল। বেশ ভালো, শুনবে ?'

রাগ করে একটু চুপ করে থেকেও কৌতূহল হল, ও জিজ্ঞাসা করলে, 'কার ?'

একটু হেসে বিভাস পাশে বসলেন, 'তোমার ডি, এইচ, লরেন্সের। যে বইটি ওখানে ফেলে এসেছ, আমার কাছে, তার সেই 'These clever Women'টা —সেই "Close your eyes my love, let me make you blind।"

সুপ্রিয়ার কান মুখ লাল হয়ে উঠ্‌ল।

'তার পর মনে আছে ?'—"They have taught you to see only problems—"

সুপ্রিয়া বল্লে, 'আর বল্‌তে হবে না।'

স্মিত মুখে বিভাস বল্লেন, 'আচ্ছা থাক্। কিন্তু শোনো মা এসেছেন। আমার ওপর খুব রাগ করছেন। ভাবছেন তাঁর ছেলে তার আধুনিক স্ত্রীকে যথোচিত মান্য করতে পারে নি। তাই—'

'হ্যাঁ তাই ডেকেছেন।' সুপ্রিয়া রাগ করলে, 'তাঁর তো আর কাজ নেই।'

'সত্যি। আরো কত কি—তারপর বল্লেন, তোমাদের সব স্ত্রীদের বাপের টাকা চাই, স্ত্রীর টাকা চাই। আমি বল্লুম, 'না মা ও সব কিছু নয়। ওটা আমাদের সঙ্গে তার সার্ব্বজনীন বিরোধ।'

অপস্তুত ভাবে হেসে সুপ্রিয়া বল্লে, 'হাঁ মা বলেছেন।'

'শোনো না, মা বল্লেন,—সে আবার কি ?' আমি বল্লুম, 'এই কথামালার মেষ শাবকের আর ব্যাঘ্রে মঙ্গল আর কি। যে অন্যায় আমি করি নি, তার শাস্তি আমাকে ভোগ করতে হচ্ছে।'

সুপ্রিয়া হেসে ফেল্লে, বল্লে, 'এত বানিয়ে বানিয়ে বক্‌তে পারো।'

বিভাসও হাসলেন, বল্লেন, 'বানাইনি। সত্যি সত্যি—কিন্তু কি ঠিক করলে বল তো ?'

'কিসের ?' সুপ্রিয়া জিজ্ঞাসা করলে।

'তোমার কাজের, চাকরীর। সে কথা তো কিছু বল্‌ছ না?' বিভাস ঈষৎ হাস্যে প্রশ্ন করলেন।

সুপ্রিয়া চুপ করে রইল।

'আচ্ছা, তাহলে এক কাজ কর না? নিরীহ আমাকে বাদ দিয়ে সার্বজনীন ভাবে আমাদের সঙ্গে ঝগড়া কর, আমি ঠিক তোমাদেরই মত স্বজাতির বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করব। এমন কি তোমার জন্য নজীর লেখা সব সংগ্রহ করে দেবো। তোমাদের আন্দোলনের চাঁদা তুল্‌ব। বিশ্বের লোক দেখ্‌বে, শুধু মেয়েরাই পতিপ্রাণা পতিব্রতা হয় না। আমরাও,—কিন্তু কি ভাষাটি হবে?'

এবার সুপ্রিয়া খুব রাগ করে বল্লে, 'যাও।'

'সত্যি বল্‌ছিলাম। বিশ্বাস করবে না? আচ্ছা, তাহলে ওসব থাক্‌। কিন্তু কাল চল দুজনে তোমার ওখানে গিয়ে একটি ইস্তফার চিঠি দিয়ে তারপর মার কাছে যাব। যাবে?'

পরিশেষ

আকাশে মেঘ আবার এসে অনেকক্ষণ থেকে জমছিল, অন্ধকারে কারুকেই দেখা যাচ্ছিল না। দুজনে চুপ করতেই হঠাৎ ওদের মনে হল ভিজে মাটির গন্ধ আর বাগানের কোন কোণের বকুলের রজনীগন্ধার গন্ধ ওদের নিঃশ্বাস আর শ্রাবণের রাত্রিকে অভিভূত আচ্ছন্ন করে তুলছে কতক্ষণ থেকে। দিনের আলোয় খুঁটিনাটি খাঁজ কাটাকাটা খণ্ড খণ্ড সমস্যা, সমাধান, প্রয়োজনাদি, পার্থক্যকে অতিক্রম করে যেন একটি পরিপূর্ণ অবিচ্ছিন্ন অরূপ পৃথিবীর মাঝে শুধু ওরা একা। অখণ্ড সুরভিত অন্ধকার, স্নিগ্ধ শ্রাবণ ওদের বেষ্টন করে আছে।

সমাপ্ত

বৈশাখের
নিরুদ্দেশ মেঘ

মা'র শ্রীচরণে—

শ্রীজ্যোতির্ময়ী দেবী

বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ

১

বনেদী ঘরের ছেলে। সেকেলে বংশ, মধ্যকালের সমৃদ্ধি, একালের শিক্ষা। তিনের সংমিশ্রণে তারা বনেদী শব্দটাকে অতিক্রম করে যেতে চায়। তাই কথায় কথায় এরিস্টোক্র্যাসী অথবা অভিজাত কথাটাই ব্যবহার করে। ছেলেরাই বেশী করে। বুড়ো কর্ত্তারা খেটে-খুটে রোজগার করেছেন, তাঁদের ছেলেরা স্বদেশেই বিদ্যালাভ করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে পিতৃ-মহিমায় বড় বড় কাজ পেয়েছেন ; তাদের ছেলেরা বিদেশে গেছে, বিলেতে গেছে, বিপথেও গেছে কেউ বা। এক কথায় তারা প্রকৃতই অভিজাত হয়ে উঠেছে—বেপরোয়া লক্ষণে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় আভিজাত্যের কোনো লিখিত ধারা তো নেই। যদি কোনো লেখা, নিয়মাবলী থাকত তার পরিমাণ নির্ণয়ের, নিখুঁত বিলাতী চালে থাকাতেই বা কতটা আভিজাত্য কিংবা একান্ত খদ্দরেই বা কতটা অথবা সেকেলে বনেদীয়ানাতেই বা কতটা অভিজাত হওয়া যেতে পারে এবং বহির্বাস নয়, আবাস আসবাব প্রতিবেশ অর্থাৎ বালিগঞ্জের কাষ্ঠময় অত্যাধুনিক সভ্যতায়, ভবানীপুরের পুরানো, বালিগঞ্জের নির্লিপ্ত দূরত্বময় দেশী-বিদেশী মিশ্র সভ্যসমাজের আর খাস কলকাতার সেকেলে সদর, অন্তঃপুর, তাম্বুল-তামাক জরী-জড়োয়া রৌপা-স্বর্ণময় বনেদীয়ানারই বা কতটা অভিজাত মূল্য, তা হলে হয়ত তর্ক আলোচনার একটা শেষ ওরা খুঁজে পেত।

নীতিশের বন্ধু প্রতুল চক্রবর্ত্তী বলে, 'অভিজাত বলতে যা বোঝায় তার জন্য চার পুরুষ অপেক্ষা করা চাই। তুই হয়তো বুঝলেও বুঝতে পারিস, আমার বোঝা হবে না। কেননা আমার বাবা গরীব গেরস্থ মাত্র, আমার পৌত্র হয়ত বুঝলেও বুঝত যদি আমি বড়লোক হই।'

নীতিশ বলে, 'অর্থাৎ ?'

প্রতুল বল্লে, 'অর্থাৎ প্রথম পুরুষে তোর ঠাকুদার বাবা হরিশ চাটুয্যে ছিলেন যাকে বলে শ্রমিক। চাষ-বাস দেখতেন, ঘন্টা নেড়ে পূজো করতেন, চাল কলাতেই যথেষ্ট তুষ্ট হতেন। নিতান্তই গল্পের দরিদ্র ব্রাহ্মণ, যাঁদের অনায়াসে রাজসভায় ভিক্ষে করতে পাঠানো চলত। দ্বিতীয় পুরুষে তোর ঠাকুদা কলকাতায় এসে পড়লেন। তখনকার দিনে লেখাপড়া শেখাটা এখনকার মত এমনি 'অনর্থকর' নিষ্ফলা ছিল না অর্থাৎ তাতে সদ্য ফললাভ হত। তিনি সরকারী বড় কাজ পেলেন, বিস্তর টাকা উপার্জ্জন করলেন, জমালেন, কিন্তু খরচ করলেন না বিশেষ। এই হচ্চে তোদের বংশের বৈশ্য যুগ। তারপর তিন পুরুষে তোর বাবা থেকে হল আভিজাত্যের আরম্ভ অর্থাৎ খাঁটি রাজসিকতার, ক্ষত্রিয় আর কি। তিনি সেই সঞ্চয় দু'হাতে ব্যয় করলেন নিজের জন্য, পরের জন্য, খেয়ালের জন্য, খুসীর জন্য। পৃথিবীকে অবজ্ঞা করলেন, মানুষকে আরও বেশী। এক কথায় অভিজাতের কিছু কিছু দুর্লক্ষণ লোকে যাতে মুগ্ধ হয় তা তাঁর ছিল।'

প্রতুল হাসলে, বল্লে, 'ঠিক তো, দেখ ?'

নীতিশও হাসলে, বল্লে, 'তা হলে তোর মতে আমি ওর ব্রহ্মণ্য সীমায় পৌঁছেচি।'

প্রতুল বল্লে, 'অনেকটা। কিন্তু জ্ঞানী আর ভিখারী একসঙ্গে হলে। না হলে আর ব্রহ্মণ্য কোথা।'

তারপরের কথা থাক। আগে নীতিশের বংশ পরিচয় দিই।

তখনকার আধুনিক বয়স দরিদ্র ব্রাহ্মণের ছেলে নীতিশের ঠাকুদা দুর্গাদাসবাবু যখন কলকাতায় আসেন, কলকাতায় তখন পাল্কী-ছ্যাকড়া গাড়ী ছাড়া যানবাহন ছিল না, ঘোড়ার ট্রামগাড়ী উপক্রমণিকায়। পশ্চিমের অনেক সহরের মত খোলা নর্দ্দমা, তার জন্য প্রচুর মাছি মশা, ততই দুর্গন্ধ, অপরিচ্ছন্ন গলি, অপরিসর অন্ধকার পথ, মোহহীন, উৎসবহীন, সমারোহ শ্রীহীন সহর তখনকার বারমাসে তের পার্বণের পল্লীগ্রামের ছেলের চোখে মোহের অঞ্জন লাগায়নি।

কিন্তু মনে পরিবর্ত্তন এনেছিল। তখন ব্রাহ্ম সমাজের নবযুগ। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের, কেশব সেনের প্রভাব সমাজের ওপর পড়েছে। তিনি হিন্দু কলেজে পড়লেন, হেয়ার সাহেবের স্নেহ ও ডিরোজিওর প্রভাবে বড় হওয়া ছাত্রদের কথা

গল্প শুনলেন। রামমোহন রায়ের শাস্ত্র-বিচার পড়লেন। রাজনারায়ণ বসুর 'সেকাল একাল' বক্তৃতা শুনলেন। আদি সমাজের উপাসনা ও গান শুনলেন, কেশব সেনের বক্তৃতা শুনলেন। মনে কিছুটা ভাঙন ধরল। অর্থাৎ না রইলেন পুরোহিত হিন্দু, না হলেন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম। ভরসার অভাবেই হোক বা প্রেরণার অভাবেই হোক ব্রাহ্ম হলেন না। ফলে আচার রইল হিন্দুর, উপাসনা হ'ল ব্রাহ্মের মত।

প্রতুলের হিসাবে তিনি শ্রমিক বা শূদ্র যুগ থেকে বৈশ্য যুগের সৃষ্টি করেছিলেন বটে ওদের পরিবারে। কিন্তু মনে মনে সত্য জাত তাঁর বৈশ্য ছিল না।

একদিকে আত্মবিস্মৃত, বিজাতি-সভ্যতা-সাহিত্য-মুগ্ধ বীর কবি মধুসূদনের, অন্য দিকে জাতির মন্ত্রদ্রষ্টা নব ব্রাহ্মণ রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বঙ্কিম-ভূদেবের আবির্ভাব সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্মের নব জন্মোৎসবের উচ্ছ্বসিত সমারোহে সমস্ত বাঙলা দেশের শান্ত বাল্যকালে যেন অকস্মাৎ নবজাগরিত বিস্ময়ানন্দে অভিভূত কিশোরকাল এসে উপস্থিত হল। সেই মহামানবদের কল্প মন্দাকিনীর ত্রিবেণী ধারায় সেদিনের তরুণ সম্প্রদায় যেন তাদের অন্তরের আনন্দপ্রবাহিনীর গতি খুঁজে পেয়েছিল। শিশুবোধ শুভঙ্করী পড়া পল্লীগ্রামের সেদিনের কিশোর বালক দুর্গাদাসের চোখেও নূতন মানসিকতায় অপূর্ব্ব গৌরবময়, পরম ঐশ্বর্যশালী এক 'আনন্দময় ভুবন' জেগে উঠল যার পুরাতন কোনো ইতিহাস ছিল না, ধারা প্রবাহ ছিল না।

দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর পরে বিংশ শতাব্দীর প্রথমে পিতামহের সমৃদ্ধ প্রাচুর্য্যময় অট্টালিকার স্বচ্ছন্দ কোলে জন্মগ্রহণ করে তার সন্ধান নীতিশরা পেয়েছিল কি না বলা যায় না।

নীতিশ ছিল তাঁর ছোট ছেলের একমাত্র সন্তান। নীতিশের পিতা নরেশের উপরে তাঁর আরও তিনজন ছেলে ছিলেন, কয়েকটি মেয়েও ছিল। বহুজনের কোলাহলে, বহু চিত্তের আনন্দের চিন্তার উচ্ছ্বাসের কল্পনার আদানপ্রদানে,— আর বহু মনের গ্লানি দৈন্যে সংকীর্ণতায় সে সংসারের প্রতিদিনের রথযাত্রা মুখরিত ছিল।

মা নীতিশের শৈশবেই গত হয়েছিলেন। পিতা ছিলেন কিছুদিন কিন্তু তাঁরও বাল্যকালে মৃত্যু হয়। বাড়ীতে পিতামহ-পিতামহী, তিন জ্যেঠা-জ্যেঠিমা আর বহু সম্পর্কীয় ভাই বোনের মাঝে পরিজনদের সতর্ক প্রশ্রয় আদর আর অসতর্ক উপেক্ষা ছিল নীতিশের নিত্য ও নৈমিত্তিক পাওনা। শান্তভীর

প্রসাদ লাভেচ্ছুক বধূরা দেবর পুত্রকে প্রতিযোগিতা করে যত্ন করবার চেষ্টাও যেমন করতেন, শাশুড়ীর চোখের আড়ালে বিপুল উপেক্ষায় অন্যমন হতেও তাঁদের দেরী লাগত না।

একান্নবর্তী সচ্ছল পরিবারের আভিজাত্যের প্রসাদ নীতিশ আর সব ভাই বোনের মতই পেত, যদিও জ্যেঠামশায়ের সাদা ঘোড়ার জুড়ী গাড়ীতে উঠে পাশের দিকে বসবার অধিকার তার ছিল না। মেজ জ্যেঠার মোটরে উঠে কিছুতে হাত দিলে ড্রাইভারের কাছেও খেয়েছে তিক্ত ধমক। অন্য ভাই বোনদের যেখানে কিছুই শাসন হয়নি। তবু সে বাড়ীতেও প্রচুর দুষ্টুমি করেছে, গাড়ীতেও দাঁড়িয়ে থেকেই পথের নানা দ্রষ্টব্যতে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে—যেন কিছুই মনে লাগেনি। ভিতরে ভিতরে অপমান সইবার শক্তি যেন আভিজাত্যের গৌরবের সঙ্গে ওর ছিলই।

ওর বড় জ্যেঠা গিরীশ ছিলেন অবসর-প্রাপ্ত ডিপুটী ম্যাজিষ্টেট মেজ জ্যেঠা হরিশ ছিলেন উকীল। সেজ পরেশ ছিলেন এটর্নী। ওর পিতা ছিলেন ডাক্তার এবং অল্প বয়সেই তাঁর মৃত্যু হয়।

সরকারী খেতাব চিহ্নিত চাকুরে গিরীশ ক্রমে বড়লোক হয়ে ওঠা বাপের ছেলেরা যেমন হয় তেমনি ছিলেন। তাঁর অযত্নকৃত সৌজন্য, সুপরিমিত শিষ্টাচারের প্রসাদ সকলেই পেত কিন্তু তার সীমানার গণ্ডি অতিক্রম করে তাঁর মনের অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে কেহই সহজে পারত না। ভাইয়েরা সকলেই এবিষয়ে বড়কে অনুসরণ ও অনুকরণ করতেন। আসলে আভিজাত্যের যে একটা দিক নিজেকে দূরে রাখতে চায় সকলের থেকে, সেটা ওদের বাড়ীতে স্পষ্টভাবেই ছিল। সৌজন্য শিষ্টাচারের অন্তরালে যে প্রচ্ছন্ন একটা অহঙ্কার ও অবজ্ঞা তাঁদের থাকত সেটা তাঁদের সন্তানদের মাঝখানে এতই পরিস্ফুট হয়ে দেখা দিল যে তাদের সহজ ব্যবহারটাও ছিল অবজ্ঞাময়। মেয়ে তাঁদের বাড়ীতে একেবারে শাস্ত্র সংহিতার দুহিতা অর্থাৎ একান্ত করুণার পাত্রী।

সেকেলে গ্রামের যে দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ জমিদারদের বনেদীয়ানাতে একমাত্র কর্ত্তাই সত্য আর সব মিথ্যা বা তিনিই মানুষ আর সকলে হেয় জন ভাব ছিল; এদের নতুন জাতকদের মধ্যে সেই ভাবটাই ফুটে উঠেছিল। কিন্তু ব্যক্তিতন্ত্রে নয়, বংশে বা দলতন্ত্রে।

জ্যেঠিমারা ছিলেন খানিকটা সেকেলে অন্তঃপুরিকা। রান্নাঘর ভাঁড়ার ঘর শোবার ঘর ছাড়া তাঁদের আর অন্যত্র গতিবিধির অবসরও ছিল না, সখও ছিল

না। তাঁদের সংসার যাত্রাটা ছিল এমনি একটা নিরবচ্ছিন্ন জিনিষ, যে, তার বাইরে ভিতরে আঙিনাটার ওপারে একটা বহিপ্রাঙ্গণ আছে, তারও ওপারে একটা বাইরের জগত আছে, যার সম্বন্ধে তাঁদের না ছিল কৌতূহল না ছিল প্রয়োজন। প্রয়োজনের ছুনিয়াটা তাঁদের ঐ চার পাঁচটি কেন্দ্রেই নিবদ্ধ। ছেলে মেয়েরাও তার ওপারে গেলে তাদের নাগাল না পাওয়াটাই যেন তাঁরা অভ্যাস করে নেন। বাড়ীর পুরুষদের সম্বন্ধে তাঁদের ছিল প্রচুর প্রশ্রয়। আরামের বিরামের প্রয়োজনের এতটুকু ক্রুটী তাদের এই বিপুল স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাঁদেরই হাতে। আর ছিল পরম ভয়, পাছে এই আয়োজনে অনুষ্ঠানে ক্রুটী ঘটে, তাঁরা বিরূপ হন।

ছেলেরাও ছিল তাঁদের 'ক্রোড়-দেবতা'। পূজার দেবতা ও মানুষের মাঝখানে যদি কোনো মহিমা ও মোহময় স্তর থাকে সেখানে ছিল তাদের বাড়ীর পুরুষদের সিংহাসন।

নীতিশের বড় জ্যেঠিমা এবিষয়ে ছিলেন পুরা সেকেলে বধূ। আচার বিচার, রান্না ভাঁড়ার, লোক-লৌকিকতার আয়োজনে ও আড়ালে সারাটা দিন কি শীত কি আষাড়ান্ত বেলা কোথা দিয়ে চলে যেত। সেকেলে মেয়ের মতই সংযম সম্বরণ ছিল। অধিকারের ধার ধারতেন না, কিন্তু ভাঁড়ারের কর্ত্রীত্বের ভূমি সূচাগ্র কারুকে ছেড়ে দিতেন না। স্বামী তাঁর সংসারের দশজনের একজনের মত। স্বামীর জন্য তিনি সংসারের কাজের নেশা ছাড়তে পারতেন না, এমনি তাঁর ছিল কর্ত্তব্যের মোহ। নিজের একটু বড় ছেলেমেয়েরা চাকরের কাছে দাসীর কাছে স্নান করেছে, তৈলাক্ত গায়ে জামা পরেছে, তেল গড়ানো চুলে স্কুলে গেছে, কি মাস্টারের কাছে পড়তে বসেছে, খাওয়ার সময় পরিজনদলের সঙ্গে বসে খেয়েছে, যে যে দিন না খেয়েছে সেদিন জননী জেনেছেন সে অসুস্থ বা অনুপস্থিত। মোটের ওপর ঐ বিরাট সংসার যাত্রার মধ্যে জ্যেঠিমার সময় ছিল না একটুও। তাঁর ছেলে মেয়ে ছিল আটটি। বড় মেয়ে বিধবা হয়ে বাপের ঘরে ফিরে আসে নিজের দুটি সন্তান আর একটি পিতৃমাতৃহীন ননদ নিয়ে।

এই বড় দিদির ছেলে মেয়েরাই নিতীশের সমবয়স্ক।

আর আর সব জ্যেঠিদের ছেলে মেয়েরাও তার চেয়ে বেশী ছোট নয়।

এই বিরাট পরিবারের আওতায় মুক্ত অথচ অচ্ছেদ্যভাবে বাঁধা যেন স্বপ্নাভিভূত

জীবন যাত্রার কোলে নীতিশের যখন দশ বছর বয়স তার পিতামহের মৃত্যু হ'ল।

বালক নীতিশের মনে হ'ল, এটা যেন মৃত্যু নয়, কিসের একটা সমারোহ।

সহসা লোকজন আত্মীয়-কুটুম্বে বাড়ী ভরে গেল। খিয়াট ক্রিয়ায় দানের ভোজের তালিকা হতে লাগল, এক পিতামহী ছাড়া সকলেই নানা কর্ম্মে কোলাহলে ব্যস্ত। আযোজনে অনুষ্ঠানে আচারে নিয়মে নিরবসর দিনগুলি ডানা মেলে দিক্ দিগন্ত থেকে কাজ আহরণ করছে। সকল ঘরের বন্ধ দরজা জানালা খোলা, সকল আলমারী সিন্ধুকের অজানা কোণ থেকে সতরঞ্চি, জাজিম, গালিচা, আসন, বাসন, তৈজস, বহু জিনিষপত্র মুক্তি লাভ করেছে। চেনা অচেনা আহুত অনাহুত মানুষেরও যেন সীমা সংখ্যা পাওয়া যায় না। বৈঠকখানায় ফরাসের ওপর বালিস মাথায় দিযে তাকিয়া কোলে নিয়ে কত অজানা মানুষ নির্লিপ্তভাবে বসে শুয়ে আছে। অন্তঃপুরে সিল্ক মখমলে কাজ কর জামা কাপড় পরা ছেলের দল, ডুরে শাড়ী পরা ছোট ছোট মেয়েতে, রঙীন কাপড় পরা বৌ-মেয়েতে, যাত্রার দলের নিকষা জননীর মত স্থবির শ্রীহীন বহু বিধবা বৃদ্ধা প্রৌঢ়াতে বাড়ী ভরে গেছে

পরিচয় প্রণাম আশীর্ব্বাদও যেমন, হাসি, রহস্য শ্লেষ বিদ্রূপ তর্ক বিতর্ক কম ছিল না। যেন একটা প্রকাণ্ড গোলমেলে স্বপ্নের মত দিনগুলো উলটে পালটে একইভাবে ভোজ ও ভোজ্য আর লোকজন নিয়ে যাচ্ছে আর আসছে।

তারপর সহসা একদিন ঐ গতি-চক্র থেমে গেল।

সেদিন সন্ধ্যার পর পিতামহীর ঘরে শুতে এসে নীতিশের মনে হ'ল, বাড়ীর একটা অংশ যেন একেবারে খালি হয়ে গেছে।

সন্ধ্যার দিকে অবসর মত ছেলেরা জননীর কাছে এসে বসলেন।

চারিদিকে ঘুরে ঘুরে দেখতে দেখতে হঠাৎ গিরীশ জননীকে বল্লেন, 'মা তুমি কি আর খাটে শোও না?'

জননীর মাটীতে একটা কম্বল পাতা বিছানা ছিল। মা বল্লেন, 'না বাবা, বড় গরম হয়।'

পিতার শ্বেত পাথরের টেবিল, দামী কাঠের পালঙ্ক, মূল্যবান ঘড়ি, এদিক ওদিক বহু জিনিষ গিরীশ ধীরে ধীরে পর্য্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। কিসে কিসে ধূলো পড়েছিল একটু কোঁচার কাপড়ে ঝেড়ে নিলেন।

আর ভাইয়েরা জননীর কাছে বসে নানা বিষয়ে কথা কইছিলেন।

রাত্রির আহারের আহ্বান এলো।

গিরীশ নেমে যাবার সময়ে বল্লেন, 'কাল তা হলে মা বাবার খাটটা আমি নিয়ে যাব ও ঘরে। আর তোমারটাতে 'নিতে' শোয় নাকি?'

জননী বল্লেন, 'হাঁ, নিতু আর নলিন ওটাতে শোয়।' নলিন রমার ছেলে।

'তা ওটা তবে থাক। আর এই ঘড়িটাও খারাপ হয়ে যাবে ঠিক সময়ে দম না পড়লে—ওটা বৈঠকখানা ঘরে পাঠাতে হবে।' জ্যেঠামশাইরা নেমেই গেলেন।

ঠাকুমার পাশে নিতু আর নলিন এতক্ষণ চুপ করে শুয়ে ছিল। এইবার তারা বিছানায় উঠে গিয়ে চুপি চুপি গল্প করতে লাগল। ঠাকুমা নীরবে কর জপ করতে লাগলেন। রমা দরজায় ঠেস দিয়ে চুপ করে বসে রইল।

বাড়ীতে তিনজন মাস্টার ছিলেন ছেলে মেয়েদের। এক শিশুগুলিকে খোঁয়াড়ে রাখবার জন্য ও একটু তার বড়দের বর্ণপরিচয় ও নামতা গলাধঃকরণ করে দেবার জন্য, আর একজন তারপরের একটু বড যারা তাদের ক্লাস প্রমোশনের নম্বর পাইয়ে দেবার জন্য; এবং অন্যজনটি মেয়েদের, মেয়েলি মাত্রায় বিদ্যা শিক্ষা দেবার জন্য।

দুজন তার মধ্যে গৃহপালিত। বিলিতী সমাজের 'ওয়ান্টেড ক্লার্ক'দের বিজ্ঞাপনে যেমন দেখা যায়, আহার ও আশ্রয় এবং "অলফাউণ্ড" কিঞ্চিৎ দক্ষিণা সহ তেমনি এই দু'জন মাস্টার মশাইও সব পেতেন ছাত্র অনুপাতে যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা-সহ। কেননা যতটা দরদস্তুর ও ব্যয় সঙ্কোচ করা যায়—মাস্টারদের দক্ষিণাতে, এমন আর কোনো প্রয়োজনে, বিলাসে বাসনে কোনো কিছুতেই চলে না।

ছোট 'অলফাউণ্ড' মাস্টার মশাই নানাবিধ বয়সের বাড়ীর যাবতীয় শিশু ও বালক বালিকাদের বর্ণপরিচয় ফার্স্ট বুক থেকে বোধোদয় অবধি পড়াতেন। এক কথায় সারা সকাল ও বিকাল নানাবিধ বয়সের ছাত্রগুলিকে নিয়ে একটি গোয়ালে বসতেন। তার মাঝখানের সময়টা ভদ্রলোক নিজের কলেজ ও পড়াশোনা করতেন।

কিন্তু প্রোমোশন পাইয়ে দেবার ননী মাস্টার মশাইয়ের সে অবসরটুকুও মিলত না। তিনি ছিলেন নীতিশদের কয়জন বড় ছেলেদের সর্ব্বক্ষণব্যাপী মাস্টার।

হঠাৎ কেমন করে নীতিশের মেজ জ্যেঠামশাই হরিশের মনে হয়ে গেল গুরুগৃহে বাস করলে বা ছেলেদের বোর্ডিংএ রাখলে বেশী নিয়ম অভ্যাস হয়,

বাড়ীর মত খেয়ালখুসী চলে না। কিন্তু যখন গুরুগৃহ এখনকার দিনে নেই এবং বোর্ডিংয়ে থাক্‌লে স্বাধীন মতামত গড়ে ওঠবার স্বার্থপর হবার সম্ভাবনা আছে—তাতে গুরুজনদের সকলের সমান মত নেই, তখন গুরুকেই গৃহে বাস করিয়ে খানিকটা গুরুগৃহ ধরণের ব্যাপার করে তোলার চেষ্টা করা হল। সুতরাং সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরের মত এই সর্ব্ব মুহূর্ত্তব্যাপী ননী মাস্টার মশাই সকালে ঘুম ভাঙানো দাঁত মাজানো কাপড় বদলানো থেকে নিয়ে পড়ানো, বেড়ানো, খেলা শেখানো, সাপ্তাহিক নখকাটা ময়লা কাপড় ছাড়া সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করবার ভারগ্রস্ত হলেন।

ভদ্রলোক ছাত্র ভাল ছিলেন। এক সময়ে পড়াশোনার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল, আশাও ছিল কিছু হবেন। কিন্তু মা দিলেন সকাল করে বিবাহ, আর বাপের হল অকালমৃত্যু, কাজেই বি, এ, পড়ার মাঝেই এই সর্ব্বশরণংদাতা চাকরী নিতে হল। কিন্তু গুরুগৃহে গুরুকর্ত্তা হতেন, তাঁর কেউ উপরওয়ালা থাকত না। পুরাকালে দেখা গেছে তিনি ছাত্রদের নিয়ে সমাদর অনাদর উপেক্ষা ইচ্ছা মত করতে পারতেন। ননী মাস্টার মশাই তো তা হলেন না, উপরন্তু তাঁর উপর জননীর কর্ত্তব্য ভৃত্যের কর্ত্তব্যের দায়ও পড়েছিল। কাজেই গুরুগৃহে সর্ব্বেসর্ব্বার সুখ তো হল নাই, নিজের পড়ার বা কোনো ব্যক্তিগত কাজের খেয়ালের অবসর লাভও তাঁর দুর্ঘট হয়ে তাঁর মেজাজ তিক্ত বিরক্ত হয়ে গেল। কোনোক্রমে ছাত্রদের পড়িয়ে প্রোমোশন পাইয়ে দিতে পারলেই তিনি তাদের বাপ জ্যাঠাদের হাত থেকে কর্ত্তব্যের দায় থেকে মুক্তি লাভ করতেন

চারদিকে একটা বিরক্ত গাম্ভীর্য্যের পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে তিনি নীতিশ নলিন প্রবীর মনীশদের পড়াতেন যা জানতেন তার উত্তর দিতেন, যা জানতেন না তার উত্তরে ধমক দিতেন, অথবা টিটকারী দিতেন, বিদ্রূপ করতেন, এই ছিল তাদের নকল গুরুগৃহের আবহাওয়া

প্রবীর ছিল মেজকর্ত্তার আহ্লাদের ছেলে, প্রতিদিনের ঘটনা কেমন করে সে খাবার সময় বা কখনো মা বাপের কাছে পৌছে দিত। কে ভাল পড়ে, কাকে মাস্টার মশাই আজ বকলেন, ভাল বললেন কাকে, কাকে কি বললেন বিদ্রূপ করে, প্রবীরকে এই সব জন্য তাঁর ভাল লাগত না। মনীশ মন্দ নয়, সে বড়কর্ত্তার মেজ ছেলে। সে পড়াশোনার জন্য মোটেই উদ্‌গ্রীব নয়, কোনোদিন কোন বিষয়ে তাকে উদ্যোগী হতে দেখা যেত না, না খেলাতে না পড়াতে না কিছুতে। খেয়ে ঘুমিয়ে বেড়িয়ে খেলা করে যে অবসর পাওয়া যেত সেটুকুও

সে পুরা পড়াতে দিতে পারত না ; তাকে প্রোমোশন পাইয়ে স্কুলের ক্লাশে তুলে দেওয়ার যত কিছু সাধনা ও সাধ্য সবই মাস্টার মশাইয়ের দায় ছিল।

রমার ছেলে নলিন চুপচাপ গম্ভীর প্রকৃতির, তার মাথায় ঢুকেছিল পড়তে তাকে হবেই, মানুষ হতে হবেই। প্রশ্রয় স্নেহ সমাদর সে কারুর কাছেই পেত না বরং বাড়ীশুদ্ধ গুরুজনের চাঁদা করা উপদেশ পেয়ে বড়দের ভয়ই করত। তার নিজের পড়া ও কাজ নিয়মিত ভাবে করে নিত। আর নীতিশ পিতামহীর আদুরে নাতি। বুদ্ধি ছিল এবং দুষ্টবুদ্ধিও ছিল। কিন্তু ঠাকুমার এত অবসর ছিল না তার কথা শোনার বা ভাবার, তিনি সময় মত আহার নিদ্রার ব্যবস্থা নিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন।

ননী মাস্টার মশাইয়ের প্রবীরের ওপর রাগ ছিল, কারণ যখন তখন মেজ কর্ত্তার কাছে নানা কৈফিয়ৎ তলব হ'ত প্রবীরের কথা সূত্রে। আর মনীশের সম্বন্ধে ছিলেন নির্লিপ্ত।

রমার ছেলে তো 'ফাউ ছাত্র', কাজেই সে তাঁর কাছেও দয়ার পাত্র। এবং দেখতে পাওয়া যায় এক দয়ার পাত্র তার নীচের করুণাভাজনকে করুণা করে না, পারলে অপমানই করে। নলিনের ভাগ্যে ননীমাস্টারের সহায়তার চেয়ে অপমানই জুটত

নীতিশকে তাঁর ভয় করবার দরকার হত না, কেননা তার কারু কাছে কোনো কথা বলবার অভ্যাস ছিল না। কখনো উদাসীন ভাবে তিনি চারটি ছাত্রকে, কখনো নিজের মেজাজ অথবা তাদের অভিভাবকের মেজাজ অনুযায়ী পড়াতেন।

দীর্ঘকাল পরে নলিন ও নীতিশের মনে হয়েছিল পারলে তিনি সেকালকার গুরু আয়োদধৌম্যের মত ছাত্রকে বনের পাতা-লতা খাইয়ে অন্ধ করে রেখে দিতে পারলে হয়ত সুখী হতেন।

পিতামহের মৃত্যুর কিছুকাল পরে জ্যেঠামশাইরা আবার হঠাৎ মত বদলে ফেললেন। ননী মাস্টার মশাই প্রথম শ্রেণী থেকেই দ্বিতীয় মাস্টার মশাইয়ের পদে অবতারিত হলেন।

মেজ কর্ত্তা বললেন, 'ও একটা খোঁয়াড়ে সব কটা বাছুর বেঁধে রাখার মত এতে কিছু লাভ হচ্ছে না। আমি প্রবীরের জন্য আলাদা মাস্টার রাখব। ওকে বিলেত পাঠাব, মানুষ করা চাই তো।'

বেশী বেশী মাহিনা দিয়ে ভালো মাস্টার অঙ্কের ও ইংরাজীর জন্য এলো। শুধু একলা প্রবীর পড়বে।

বড় কর্তা গিরীশও হঠাৎ বুদ্ধিমান হয়ে গেলেন, তিনিও নিজের ছেলেদের জন্য মাস্টার নিযুক্ত করালেন একটু কম দামী। নলিনও চিরকালের মত মামাদের প্রসাদী পাঠ নিতে লাগল।

শুধু বন্ধ হয়ে গেল মাস্টার নীতিশের। অপ্রতিভভাবে বালক নীতিশ নলিনের সঙ্গে মনীশের ঘরে গিয়ে বসে। নতুন মাস্টার মশাইরা একজনের জায়গায় একসঙ্গে তিনজনকে দেখে বিরক্ত হন।

অতিশয় দীন মুখে ভিক্ষার্থীর মত এরা দু'জনে বসে থাকে, যদি একটুও সাহায্য পায় পড়ায়। মাস্টার অভ্যস্ত পাঠ কোন মতেই স্বকীয় পথ খুঁজে পায় না। কয়েক মাসের মধ্যেই প্রোমোশন হয়ে গেল স্কুলের। নলিন নীতিশ সোজা-সুজী পাশ করেছে, মনীশ মন্দ নয়। প্রবীর ভালো।

মনীশের পিতা গিরীশবাবু পড়ার ঘরে এসে বললেন 'তোমরা এক ঘরে সবাই বসলে পড়া ভাল হয় না বলেই আমি আলাদা ব্যবস্থ করেছিলাম। তোমাদের আলাদা মাস্টারের ব্যবস্থা করব।'

আরক্তিম মুখে নীতিশ মাথা নীচু করে বসে রইল।

তারপর দিন থেকে নীতিশ পৃথক্ পড়তে বসত। নলিন সভয়ে মামার ঘরের একপাশে বসে থাকত

দীর্ঘকাল পরে পিতামহী জানলেন নীতিশের মাস্টার নেই এবং তাঁর পুত্রের নিজ নিজ সন্তানের পৃথক ব্যবস্থা করেছেন। যেদিন নীতিশ ভাল করে ম্যাট্রিক পাশ করেছে খবর পেল সেইদিন ননী মাস্টার মশাই প্রবীরদের ওপর বহুদিনের হিংস্র বিরাগকে খানিকটা চাপা দিয়ে নীতিশের প্রশংসা আর মাস্টার না থাকার কাহিনীর গৃহিণীর গোচর করে গেলেন।

২

অনেকগুলো বছর কেটে গেছে পড়া, পরীক্ষা আর পাশের বার্তা বহন করে নীতিশদের।

নীতিশ এসে পিতামহীকে প্রণাম করে বললে, 'ঠাকুমা, আমি ফার্স্ট ক্লাস অনার্স পেয়ে পাশ করলাম।' নলিনও সঙ্গে ছিল, মেজ জ্যেঠার ছেলে প্রবীর সেও পাশ করেছে। সকলেরই দীপ্ত হাসি মুখ।

ঠাকুমা একটু হেসে সকলকে আশীর্ব্বাদ করলেন, 'বেঁচে থাক, খুব ভাল হও' ইত্যাদি।

'ওসব নয় ঠাকুমা, তুমি যে বলেছিলে ভাল করে পাশ করলে বিলেত পাঠানোর কথা বলবে।' বহুদিন পূর্বের অন্য-মনে-দেওয়া প্রতিশ্রুতি পিতামহী ভুলে গেছেন, কিন্তু নীতিশের মনে আছে।

'ওমা তাই তো। তা বিলেত না গেলে কি লোকে মানুষ হয় না? এই তো তোর জ্যেঠারা যায় নি, তা কি কম কিছু হয়েছে?'

প্রবীর বল্‌লে, 'ওসব সেকেলে দিন এখন আর নেই ঠাকুমা, আমরা বিলেত না গেলে আমাদের কিছুই হবে না। না ভালো চাকরী, না পড়াশোনার দাম।'

নীতিশ বল্‌লে, 'আর মেজ জ্যেঠামশাই তো প্রবীরদাকে বিলেত পাঠাবেন ঠিকই করেছেন। ঐ সঙ্গে তুমি আমারো কথাটা ঠিক করে দাও।'

নলিন বাড়ীর দৌহিত্র। দয়ার অতিরিক্ত তার পাওনা নেই। পড়া হচ্ছে—এই যথেষ্ট, বাড়ীর লোকের প্রচ্ছন্ন মনের ভাব এইরূপ। তার ওসব স্বর্গের কল্পনার ভরসাও নেই, অধিকারও নেই। একটু অপ্রস্তুত অথচ খুসী ভাবেই সে শুধু হাসছিল। পাশ সকলেই করেছে—এক একজন এক এক বিষয়ে। ভাল করে অবশ্য নলিন আর নীতিশই। কিন্তু তার মধ্যে—প্রবীরের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সব কল্পনাই প্রবীর জানে। বিলেত গিয়ে তাকে মানুষ হয়ে আস্‌তে হবে এবং তার জন্য যা খরচ হবে তা তার বাবার আছে। এবং সে বিষয়ে সে যেমন অহঙ্কৃত, তেমনি স্বতৃপ্ত। নিজের কথা ছাড়া আর কারু কোনো কথা যে ভাববার আছে, মনেও করে না। তার অধিকার বোধ হয় খুব সীমানা-ঘেরা। সুখের সৌভাগ্যের অধিকার যার আছে, তার আছে। যার নেই, তার ভাগ্যে নেই, তারা আশা করাই অন্যায়, বা ভুল। এই তার মত।

নলিন তার কাছে কৃপার পাত্র। কেন তা সে নিজে ভাবে না, শুধু জানে শিক্ষালাভের নানাবিধ ব্যয়সাপেক্ষ আধুনিক উচ্চাকাঙ্ক্ষায় নলিনের অধিকার নেই। ভাল করে পাশ করেছে তাই ভালো। ভালো পাশ না করলেও নলিনদের চেয়ে তার নিজের দাম অনেক বেশী সে জানে।

স্কুলে-পড়া মেয়েও ক'জন তাদের মাঝে এসে বসেছিল। নীতিশের মেজ জ্যেঠার মেয়ে প্রবীরের বোন ইলা, বেলা। আর রমার মেয়ে বুলু, টুলু। তারা আনন্দিত গর্ব্বে নলিনের, প্রবীরের, মনীশের, নীতিশের সাফল্যের বার্ত্তা শুনল। ইলার গর্ব্বটা সাফল্যের ছাড়াও বেশী কিছুর, অর্থাৎ তার দাদা বিলেত যাবে।

ইলা তার সুন্দর গর্ব্বিত মুখে বললে, 'হ্যাঁ, দাদা তো ডাক্তারী বা অন্য কিছু বিষয়ে পড়তে যাবে ঠিকই রয়েছে, এর সঙ্গে নিতুদাকে ঠাকুমা, পাঠাবার ব্যবস্থা করে দাও, ভালই হবে।'

ঠাকুমা হাসলেন। কিছু বললেন না। ইলাদের ছোট মুখে বড় কথা তার শোনা অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল।

তার ভাই প্রবীর বললে, 'তুই থাম, তোর গিন্নিপনা করতে হবে না।'

রমা নিজের ছেলের অপ্রতিভ মুখের দিকে চেয়েছিলেন। বুলু একবার জননীর মুখের পানে তারপর টুলুর পানে চাইল।

টুলু তার মায়ের ভাগীদার, ভায়ের স্নেহের অংশীদার, নিতুমামাও তাকে ভালবাসে—বুলু তাকে দু'চক্ষে দেখতে পারত না। কিন্তু আজ হঠাৎ তার মনে হল টুলুও খুব দুঃখিত হয়েছে তার মতনই নলিনের জন্য কেউ কিছু না বলাতে।

যাই হোক প্রস্তাবটা ঠাকুমার দরবারে পেশ করে ছেলেরা উঠে গেল অন্যত্র।

বুলু আর টুলু—বহুদিন পরে পাশাপাশি চুপি চুপি গল্প করতে লাগল। বুলু সুন্দর দেখতে, জেদী একগুঁয়ে মেয়ে। তার খামখেয়ালের অন্ত ছিল না, মেজাজ ভাল থাকলে সে যেমন উদার, মেজাজ বিরূপ হলে তেমনি নির্মম। তার মেজাজের অত্যাচার ভীরু শান্ত প্রকৃতি কালো টুলুকে প্রায়ই সহ্য করতে হ'ত। সেজন্য নলিন-নীতিশের তার ওপর একটু সহৃদয় স্নেহ ছিল।

আজ বুলুর মন টুলুর প্রতি উদার হয়ে উঠেছে—টুলু পরম কৃতজ্ঞ ও কৃতার্থ হয়ে গল্পের অংশীদার হ'ল।

পুত্রদের রাত্রির আহারের সময় ঠাকুমা নীচে এসে বসলেন।

কিছু মিষ্টি বেশী এসেছে, হরির লুটের বাতাসা সন্দেশও এসেছে নীতিশের মেজ জ্যেঠিমা সন্দেশ রাবড়ি দই আনিয়েছেন অনেকটা। এই অল্পক্ষণের মাঝেতে আর উৎসব ভোজের আয়োজন হয় না, সেটা সময়মত সকলের ছুটির দিন দেখে, তখন হবে। আজকে খানিকটা মিষ্টি মুখ হোক। রমার সামান্য হরির লুট মানা ছিল, মাত্র সওয়া পাঁচ আনার, তারই বাতাসা আর বরফি ঠাকুমার সামনে রাখা ছিল। নিতুর জন্য ঠাকুমার পাঁচ সিকির হরির লুট মানা ছিল—এ ছাড়াও স্বগত অনেক মানসিক এখনো আছে—সে সব পরে হবে। ভোজের উৎসবের কথা ঠাকুমা বললেন না কিছু। তার অন্তরে তার একান্ত অনাথ

আত্মীয়-হীনতার কথাই জাগছিল। তার জন্য কারুর কোনো কামনা আশা উদ্বেগ ছিল না, এখনো গর্বিত উৎফুল্ল আনন্দের প্রচার নেই।

বধূরা অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে শাশুড়ীর সামনে নিজের নিজের মিষ্টান্নাদি রেখে গেলেন।

গিরীশ সহাস্যে বল্‌লেন, 'এসব বুঝি আজ এদের পাশের মিষ্টি মা? মেজ বৌমাকে বল শুধু মিষ্টিতে আমরা সেকেলে বামুন পণ্ডিতের মতন সন্তুষ্ট হচ্ছি নে।' বুদ্ধিমতী মেজ বৌমা শাশুড়ীর পিছনে জনান্তিকে বল্‌লেন, 'সে তো বট্‌ঠাকুরই খাওয়াবেন সবাইকে।'

শাশুড়ী মৃদু হেসে সেটা জানিয়ে দিলেন পুত্রদের। বড় ছেলে সন্তুষ্টভাবে হাসতে লাগলেন 'বেশ বেশ' বলে।

রমার সলজ্জ সঙ্কুচিতকায় বাতাসা থেকে তার মেজ খুড়িমার গর্বিত পুষ্টদেহ 'আবার-খাব' সকলের পাতে পরিবেশিত হল। রাত্রে বড়দের সঙ্গে ছেলেরা খাবে এই ছিল বাড়ীর নিয়ম, কিন্তু কথা বড় বেশী তারা কইতে পারত না। অবশ্য বড় দাদারা কইতেন কথা। তবু সকলে যেন সকলের সঙ্গ পেত।

'তা হলে তারপর এবারে কি পড়া-টড়া হবে, না চাকরীতে ঢুকবি সব, কি ঠিক হচ্ছে?' গিরীশ সন্দেশের খানিকটা ভাঙতে ভাঙতে জিজ্ঞাসা করলেন।

নীতিশ পিতামহীর মুখের দিকে চেয়ে কি এক উৎসুক আবেদন জানালে যেন।

মেজ ভাই হরিশ বলেন, 'আমি তো ভাবছি প্রবীরকে বিলেত পাঠাই ইঞ্জিনিয়ারীং পড়তে।'

'বেশতো ভাল বুদ্ধি করেছ, তাই দাও। আর নলে, তোর তো এবারে চাকরী করা দরকার, নয়?' মাতামহ এবারে দৌহিত্রকে প্রশ্ন করলেন।

মেজকর্ত্তা বল্লেন, 'ওর কিন্তু রেজাল্টটা খুব ভাল হয়েছে—ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছে, ফিজিক্সে। স্কলারশিপ পাবে মোটা। পড়লে ভালই হবে, পড়ায় কি আপনার মত নেই? না পড়লে স্কলারশিপটা পাবে না।'

'স্কলারশিপ পায় তো পড়বে বৈকি—পড়ুক।' গিরীশের আহার হয়ে গেল।

এবারে জননী বল্লেন, 'আর নিতুর কি ব্যবস্থা করবি?'

'নিতুর জন্য একটা চাকরী দেখছি। তা ছাড়া ও কম্পিটিটিভ্‌ পরীক্ষা দিক্‌ না, তাতে তো ভাল চাকরী হবে।'

জননী সসঙ্কোচে বল্লেন, 'ও যে প্রবীরের সঙ্গে বিলেত যেতে চাচ্ছে।'

তিন জ্যেঠা এক সঙ্গে অবাক হয়ে জননীর দিকে চাইলেন, তারপর চারিদিকে চাইলেন অর্থাৎ নীতিশ কোথায়!

জননী অপ্রস্তুত হয়ে জিজ্ঞাসু ভাবে চেয়ে রইলেন। নীতিশ মাথা নিচু করে থালা দেখতে লাগল।

গিরীশ একটু হাসলেন। তারপর বল্লেন, 'বিলেত যাওয়া কি সোজা কথা মা, না সোজা খরচ? সে কোত্থেকে হবে?' আহার শেষ হয়ে গিয়েছিল।

জননী সঙ্কুচিত ভাবে চেয়েই রইলেন।

এবার গিরীশ আসন ছেড়ে উঠতে উঠতে বল্লেন, 'ওকে বিলেত পাঠাব আমাদের এত পয়সা কোথায় মা, ও এখানেই পড়ুক বা চাকরীর চেষ্টা দেখুক।'

কথা যেন সমাপ্ত হয়ে গেল। আর কিছু জিজ্ঞাসা করবার ভরসাও জননীর হল না। অথচ কেন যে প্রবীর যেতে পারে—আর নীতিশ একেবারেই কিছুতেই পারে না এটা নীতিশের বোধগম্য হ'ল না।

নীতিশের বিলাতে যাওয়ার কথা চাপা পড়ল, কিন্তু তার বড় জ্যেঠামশাইয়ের মেজ ছেলে মনীশের প্রবীরের সঙ্গে যাবার ঠিক হয়ে গেল। সে ভাল করে পাশ করেনি বটে, পড়ায় মনও নেই কিন্তু যাক্ বিলাত, সেখান থেকে ব্যারিস্টারীটা চেষ্টা করে পাশ করে আসুক—তা না হলে এখানে ওর কিছুই হবে না।'

জ্যেঠতুতো ভাইয়ের বোনেরা সকলে মিলে অতি উৎসাহের সঙ্গে বাইরের পড়বার ঘরে এই সব কথা আলোচনা করছিল। টুনু বুনু নলিন নীতিশও ছিল। একটু বিমনা ভাবে।

প্রবীর উৎসাহিত ভাবে বললে, 'আসল কথা কিন্তু সবের আগে টাকা। বাবা তাই বলছিলেন, যতই ভাল করে পাশ কর বা লেখাপড়া শেখ, টাকা না থাকলে কিম্বা টাকা না ঢাললে কিছুই হয় না।'

নলিন মৃদু প্রতিবাদ করলে, 'মানে তুমি বলতে চাও মানুষ হতে গেলে গোড়াতে তার টাকা থাকা চাই বা বড়লোকের ছেলে হওয়া চাই? তা হলে এত লোক যে ছোট থেকে বড় হয়েছেন তা কেমন করে হ'ল?'

'ওসব 'এক্সেপসন্' ব্যতিক্রম। দু-একজন অমন হয়। নইলে দেখ না, লেখাপড়া ভাল করে করলে অথচ চিরকালই কোনো রকমে জীবন কাটাচ্ছে তাদের টাকা নেই তাই কিছুই করতে পারল না।'

নীতিশ বললে, 'তাহলে তোমার মতে টাকাই সব চেয়ে বড় জিনিষ। তবে

টাকাওয়ালা বেনে, ব্যবসাদার, জমীদারদের চেয়ে বিদ্বান জ্ঞানীর আদর বেশী হয় কেন?'

মনীশ চুপ করে ছিল, এবারে বললে, 'সে ক'টা? বড় বড় কলকারখানাওয়ালা, ব্যবসাদার, বেনে, মাড়োয়ারী ঐ সব তোমার বিদ্বানদের কিনে নিতে পারে তা জানো? ঐ ওদের কাছেই চাকরীর জন্যে তোমার বিদ্বানরা স্কলাররা ঘুরে বেড়ায় না কি?

নলিন বললে, 'তার কোনো মানে নেই। টাকা থাকলে অনেক কিছু করা যায় বটে কিন্তু শুধু টাকার জোরেই সব হয় না। বিদ্বানদের কিনে নিতে পারে হয়ত, কিন্তু বিদ্বান খুঁজতেও তাদের হয় নাকি তাদের বিশেষ বিদ্যার জন্যে? শুধু টাকার জোরেই তো কারখানা চলে না।'

প্রবীর বললে, 'তা হয় বটে, কিন্তু কারখানার গোড়ার কথাই মূলধন অর্থ, নয় কি?'

নীতিশ বললে, 'সঙ্গে সঙ্গে পরিশ্রম বুদ্ধি ধৈর্য্যও। বড় বড় ব্যবসার গোড়ায় মূলধনের চেয়ে বুদ্ধি ধৈর্য্য শ্রমই বেশী দেখতে পাবে। বিদ্যার ছাপ না থাক, জ্ঞানকে বাদ দিতে পার না। শুধু টাকায় হয় না কিছু।'

প্রবীর উষ্ণভাবে বললে, 'সে কথা যাক্। আমার কথা হচ্ছে এই টাকা না থাকলে তোমাকে কেউ চিনবে না, মানবে না। সমাজের মাথার ওপর দাঁড়াতে গেলে, আভিজাত্যের শিখরে পৌঁছতে গেলে আগে দরকার টাকার।'

নীতিশের বন্ধু প্রতুল এসেছিল, সে শুনছিল। সে একটু হাসলে, বললে, 'হয় তো খানিকটা তাই। কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ—সমাজকে বা মানুষকে যারা চালায় বা তার শিখরে থাকে তারা সকলেই ধনী নয়। প্রথমেই ধনী ছিলও না। তুমি মহাত্মা গান্ধী, বিদ্যাসাগরমশাই, বিবেকানন্দ কত লোক কারুকেই টাকায় বড়লোক বা ধনী বলতে পার কি? তুমি যে অভিজাত বা আভিজাত্যের কথা বলছ তা তো হচ্ছে, অতি সাধারণ বড়লোকীয়ানা। জিনিষে-পত্রে, গাড়ী-বাড়ীতে আরামে-স্বাচ্ছন্দ্যে অভিজাত নামে জীবন-যাত্রার নির্বাহ। সেটা কি মনের আভিজাত্য, না, সমাজের শিখরে, মানুষের মনে পৌঁছন হয় তাতে?'

মনীশ বললে, 'তা হলে কি আপনি বলেন বড়লোকের আভিজাত্য মনের আভিজাত্য নয়?' প্রতুল হাসলে, বললে, না আমি তা কিছু বলছি না, আমি বলছি এই, আভিজাত্যের গোড়ার কথা শুধু টাকা নয়।'

প্রবীর বললে, কিন্তু টাকা না থাকলে যে আভিজাত্য দাঁড়ায়ই না, বিলেতেই

বা কি এখানেই বা কি, দেখেন না ? শুধু অবাস্তব মন নিয়ে তো আর দুনিয়া চলছে না। যেখানে যেখানে ধনী অভিজাত সম্প্রদায় তার চারদিকে, তাকে ঘিরেই কি জ্ঞানী গুণীদের সমাবেশ হচ্ছে না ?'

নলিন বললে, 'কিন্তু ধন-ঐশ্বর্য্যহীন জ্ঞানী, গুণী, সাধু, মহাত্মাদেরও তো ঐ রকম অভিজাত ধনীরা ঘিরে থাকে দেখা যায়।'

এবারে মনীশ বিরক্ত হয়ে বললে, 'সাধারণ মানুষের সঙ্গে তো আর অসাধারণের তুলনা চলে না। এই তো নিতু, তাহলে সাধু মহাত্মাই হোক না, বিলেত যাবার জন্যে নেচে উঠেছে কেন ?

আকস্মিক ব্যক্তিগত আক্রমণে সকলেই আশ্চর্য্য হয়ে গেল। নীতিশ জানত সে যেতে পাবে না, সেজন্য মনে মনে খুবই ক্ষুণ্ণ হয়ে ছিল কিন্তু সেটা নিয়ে তাকে যে সাধু মহাত্মা হওয়ার কথা বলে শ্লেষ করা হবে, এটাতে সকলেই অবাক হয়ে গেল।

নীতিশের কান লাল হয়ে উঠল। নলিন বললে, 'এ তোমার ব্যক্তিগত করে কুতর্ক মেজো মামা।'

মনীশ বললে, 'তা তোমরা তর্ক করছ তার উত্তরে যা বলা যেতে পারে আমি বলব। কুতর্ক সুতর্ক আবার কি ?'

মনীশ উঠে গেল।

বিরাট অট্টালিকাতে যদি নিজের ঘরখানি একেবারে শেষ সীমান্তে হয়, তাতে পৌঁছবার আগে অনেক ঘর অনেক জন অতিক্রম করতে হয়, হয়ত কিছু কথা বলতে হয়, কাজও করতে হয়, বড় বাড়ীতে বহু পরিজনের মাঝে মানুষ হওয়া নীতিশের তেমনি নিজের ভাবনা ভাবার আগে বহু স্বজন বহু সৌজন্য আলাপ পার হয়ে যেতে হয়। নিজের কথা ভাববার বলবার মত স্থানই যেন নেই, থাকলেও এতই অনভ্যস্ত যে মন যেন কোথায় সঙ্কোচে লুকিয়ে পড়ে।

আর বড় পরিবারে কথার আঘাত তো একটা লীলার মত। প্রতি নিয়তই শ্লেষ-বিদ্রূপ, হাসি-রহস্য, সুখ-দুঃখ-বেদনার তরঙ্গভঙ্গ চারিদিকে বয়ে যাচ্ছে।

তবু যে কথা অনুচ্চারিত থাকে সে কথা যে লুকোনো থাকে তা নয়।

নলিন অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হ'ল। তার নিজের মামা মনীশ কিন্তু নীতিশ যেন বেশী আপনার তার। দারিদ্র্য ও দয়ার পাত্র হিসাবে তারা এক।

ওর মা রমাও নীতিশকে খুব স্নেহ করে। নীতিশের জননী আর রমা সমবয়স্ক, বন্ধুর মত ছিল। তা ছাড়া পিতৃমাতৃহীন নীতিশ আর পিতৃহীন রমার ছেলেমেয়েদের যেন একটু কোনখানে বিশেষ মিল ছিল এই সংসারে। সে মিলটা অন্যদের গর্বিত অবস্থার এক স্তরের মাঝে ওদের বেশী এক করে দিয়েছিল যেন।

যাই হোক, তর্কের সারাংশ কেমন করে বুলু টুলুর মারফৎই হোক বা প্রবীরের মার বোনের কাছ থেকেই হোক অন্তঃপুরে এসে পৌছল।

বৈকালে জলযোগের সময় ছেলেরা কেউ কেউ একবার মার কাছে আসেন।

সেদিন জননী গিরীশকে বল্লেন, 'মণি যাবে, প্রবীর যাবে বিলেত, তা নিতু যাক্ না, তিন ভাই এক সঙ্গেই যা পড়তে চায়, পড়ে আসুক না?'

গিরীশ বল্লেন, 'প্রবীরকে তার বাপ পাঠাচ্ছে, মনিকে আমি পাঠাচ্ছি, নিতুর খরচের টাকা কই?'

হরিশ বল্লেন, 'আমি পিবের জন্য অনেক দিন থেকে টাকা রাখছি। এখানে লেখাপড়ার আর দাম কই।'

মা বল্লেন, 'সেই জন্যেই তো নিতুও ব্যস্ত হচ্ছে, তা ওর কি কোনো টাকা নেই?'

গিরীশ বল্লেন, 'ওর টাকা আর কই? ওর বাপ তো গান বাজনার সখে বড বড় ওস্তাদ পুষে, দেশ বিদেশে ঘুরে বহু টাকা নষ্ট করেছে। বাবা অনেকই ওকে দিয়েছিলেন নষ্ট করতে। তারপর যা ছিল সামান্য—ওকে তো মানুষ করতে হচ্ছে।'

বধূমাতারা এসে স্বামীদের চা খাবার ইত্যাদি দিয়ে গেলেন। তিনজন ছেলে খেতে লাগলেন। রমা পান আর জল নিয়ে এলো।

বাইরে বৃষ্টি এলো গুঁড়ি গুঁড়ি।

মা চুপ করেই বসেছিলেন। বলবার কিছু ছিল না তাঁর।

এবারে গিরীশ বল্লেন, 'তা ছাড়া বাবা তো উইল করে যাননি। উইলে নীতিশকে কিছু দিলে নীতিশ পেতো। আমাদের সঙ্গে এক ভাগ ওর হতে পারত।'

এবারে উৎসুকভাবে জননী বল্লেন, 'সে তো ওর পাবার কথাই, আমি সেই কথা, সেই টাকর কথাই জিজ্ঞেস করছিলাম।'

গিরীশ বল্লে, 'সে যদি বাবা উইল করে দিয়ে যেতেন, ও পেতো। কিন্তু সে ব্যবস্থা বাবা তো কিছু করেননি কাজেই সেটা আইনতঃ আমাদের তিন ভাইয়ের মধ্যে তিন ভাগ হয়ে গেছে। সে টাকা থাকলে ওর বিলেত যাওয়ার খরচ থাকত। কেননা সেটা থোকে খানিকটা টাকা কিনা। নরেশ অনেক নষ্টও করে ছিল, তাইতেই আর নিজেকে এখন আমাদের দিতে পারা শক্ত।'

মা চুপ করে রইলেন। তার মনে হতে লাগল আইনত না পেলেও কি পাওয়া উচিত ছিল না? ধর্মত সে তো একজন পাবার অধিকারী। কত নষ্ট করেছিল সে, যত পরিমাণ এরা পেয়েছে তত কি? ব্যয় ও অপব্যয় তো সকলেই করেছে। কিন্তু কিছু বলতে পারলেন না।

হরিশ বল্লেন, 'বাবার ওটা না করা ভুল হয়েছিল, উইল করা থাকলে সবই ঠিক করা যায়।'

সেজ ছেলে বল্লেন, সেকালের লোকদের ঐ রকম বুদ্ধি ছিল। উইল করলেই তো মানুষ মরে যায় না, এই তো সাহেবরা কত শীঘ্র ঠিক সময়ে উইল করে রাখে।'

এই মন্তব্যে সাহেবদের বুদ্ধির ওপর মার হয়ত একটু শ্রদ্ধা হল। অবশ্য তিনি বুদ্ধিমান হলে যে এ ক্ষেত্রে ছেলেদের সঙ্গে নিতুর ভাগ সমান হ'ত একথাও জননীর মনে হল। যাই হোক, ওরা তো দুটো সুযোগ পেল—তাঁর নির্বুদ্ধিতার ফল সম্পত্তি বিষয়ও, তাঁকে নির্বোধ বলারও। ত তিনি হয়ত বুঝলেন না।

তিনি বল্লেন, 'তাহলে নিতুর কিছুই নেই? এই সব ভাগের মাঝে? বাড়ীতেও ভাগ নেই?'

গিরীশ বল্লেন, 'কই আর। ঐ সামান্য কয়েক হাজার টাকা ওর বাপের লাইফ ইন্সিওরের আছে—আর ছোট বৌমার গহনা তোমার কাছেই আছে।'

নিতুর পিতামহী নীরবেই রইলেন

ছেলেরা জলযোগ শেষ করে নিজের নিজের ঘরে অথবা বেড়াতে চলে গেলেন জননী ভাবতে লাগলেন, তাঁর নিজের গহনা টাকা কি আছে? কি আছে? কতটুকু সে? বৃহৎ পরিবারের বহু জনকে দেওয়ার পর আর কতটুকু আছে।

বারান্দায় প্রবল সমারোহে কোরাসে তখন বালক-বালিকাদের বৃষ্টির আহ্বান চলেছে—

"আয় বৃষ্টি হেনে
ছাগল দোব মেনে
ছাগলের মা বুড়ি,
দু'খান কাপড় পেলি,
দু'বৌকে দিলি
আপনি মরিস জাড়ে,
কলা গাছের আড়ে"—

উৎসুক নীতিশ কাছাকাছি কোন খানে ছিল, জ্যেঠা মশাইদের দরবারের 'রায়' কি হল জানবার জন্য, সে এসে দাঁড়াল। 'কি হল ঠাকুমা যেতে পাব ?'

'নারে—তোর কোনো টাকা নেই, ওরা বল্‌লে।'

'কেন ? দাদার টাকা নেই ? সেই টাকাতেই তো প্রবীর যাচ্ছে, মনীশদা যাচ্ছে।'

ঠাকুমা বল্লেন, 'না, সে টাকা উনিতো উইল করে যাননি, সেই জন্য সে টাকায় তোর ভাগ নেই।'

নীতিশ অবাক হয়ে গেল, বল্লে, 'বাবার ভাগ আমার নেই ?'

ঠাকুমা বল্‌লেন, 'আইনে নাকি নেই। ত' ওরা বল্‌লে বিলেত না গিয়ে কি আর মানুষ হয় না ? তা নাইব গেলি ?'

নীতিশ ম্লান ভাবে একটু হাসলে।

ঠাকুমা ভাবতে লাগলেন। আছে কি ? তাঁর কি আছে ? কত টাকা হলে নিতুর বিলেত যাওয়ার খরচ কুলোয় ? জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোর কত টাকা লাগবে রে, আমার তো সামান্য হাজার দুইয়ের গয়না, আছে, তাতে হয় ? আর সব তো সব বৌ ঝিকে আশীর্বাদ করে দিয়ে ফেলেছি। টাকা তো আগেই ছেলেরা নিয়েছে, আমার আলাদা টাকার কি দরকার বল্‌লে, দিয়ে দিয়েছিলাম তখন।'

নীতিশ হাসলে, বল্‌লে, 'না ঠাকুমা, ওতে কিছুই হবে না, তা ছাড়া ও তোমার গহনা, ও নেওয়া যায় না।' দুজনেই চুপ করে রইলেন।

বাল্য মেঘদূতের কোরাস গানের শেষ লাইন তখন স্পষ্ট হয়ে কানে এলো—

"আপনি মবিস জাড়ে
কলা গাছের আড়ে,
কলা পড়ে টুপ টাপ,
বুড়ো খায় কুপ কাপ।

নীতিশের মুখে একটু অন্য রকম মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠল। মনে হল, এই ছেলে ভুলানো ছড়াটির রচয়িতার বেশ রসবোধ ছিল। একটু স্থূল তবু চমৎকার। কিন্তু ঠাকুমা ছড়া শুনছিলেন না, ভাবনায় নিমগ্ন ছিলেন।

নীতিশ উঠে গেল। প্রবল বেগে বৃষ্টি এলো।

আগস্ট অর্থাৎ ভাদ্র মাসে বিলাত যাত্রার সময় সাধারণত। ইতি মধ্যে পাশ করার, তারপর বিলাত যাওয়ার বিদায়ী-ভোজের সমারোহ পড়ে গেল।

যাঁদের বিবাহযোগ্যা মেয়ে ছিল, যাঁরা মনে মনে আঁচ করে রেখেছিলেন, মুখেও আভাস দিয়েছিলেন, ছেলেদের মা বাপের কাছে, তাঁরা এই বিদায়ী ভোজের অন্তরালে একটা কথা পাকা করে নেবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠলেন।

সুবোধ মুখুয্যে ব্যারিস্টার, হরিশের বন্ধু, আর বিবাহযোগ্যা মেয়েরও বাপ, এবং তাঁর ছেলেরাও ওদের সঙ্গে পড়ে, পৈত্রিক ও স্বোপার্জিত সম্পত্তিও প্রচুর আছে, মেয়েদের চেহারাও ভালো, আবার লেখাপড়াও করছে; এ সুযোগ তিনি ছাড়লেন না।

এতদিন অবধি নীতিশই তাঁর "চাঁদমারি" ছিল। এক ছেলে, বিষয়ের ভাগী কেউ নেই তাই। এখন হঠাৎ দৃষ্টি অন্যত্র গেল, নীতিশ বিলাত যাবে না শুনে।

কিন্তু নিমন্ত্রণ তে তিন জনকে করতে হয়। সুতরাং সকলেই একটা দেশী-বিদেশী মিশ্রিত ভোজে নিমন্ত্রিত হল।

পিতার সম্পত্তি নীতিশ পায়নি বটে কিন্তু গান বাজনার পৈত্রিক ঝোঁকটা পেয়েছিল। বাঁশী বাজাত চমৎকার, বেহালার হাতও মন্দ ছিল না।

মুখুয্যে সাহেবের বড় মেয়ে সুমিত্রার সঙ্গে তাদের কারো একজনের বিবাহের সম্বন্ধ হচ্ছিল, এর আভাস তারা পেয়েছিল।

কে যে পাত্র তা পাত্ররা জানত না। মনীশ ভাবত সেই পাত্র, প্রবীরও ভাবত হয়ত তাই। নীতিশও আভাস পেয়েছিল দিদির কাছে—নীতিশই ওই পাত্র, ঠাকুমার কাছে প্রস্তাব এসেছে।

যাই হোক, মেয়ে মুখুয্যে সাহেবের চারটি, সুমিত্রার পর উর্মিলা আছে, দেখতে সবাই ভালো এবং নৃত্য গান-বাজনা পড়ায় ঠিক আধুনিক।

নীতিশের বেহালা ও বাঁশী বহু জনমনকে আকর্ষণ করেছিল, তার মধ্যে বাড়ীর টুলু বুলু আর বাইরের সুমিত্রা উর্মিলাদের। ভাইদের বন্ধু হিসেবে নীতিশের যাতায়াত ছিল, গান-বাজনা শোনার সুযোগও ছিল।

সুমিত্রার গান হল। উর্মিলাও কি দুএকটি গান গাইলে।

এবারে মুখুয্যে সাহেবের এক ছেলে নীতিশকে বাঁশীতে "কূল হতে মোর গানের তরীটা" বাজাতে বললে। গানের পর বাজনা আবার গান, অবশেষে আবার বাঁশী

বাড়ীর সামনের বাগানে বর্ষার সন্ধ্যা শেষ হয়ে গেল।

নীতিশ বাঁশীটা রেখে ঘরের খোলা জানালার কাছে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে দাঁড়াল।

পাশের ঘরের জানালা থেকে কানে এলো, 'ওই ছেলেটি ? চেহারাটি বেশ ভাল, বুদ্ধিমান চেহারা। বাঁশী বেশ বাজালো।'

'না, ওটি নয়, আগে ঐটিকেই ঠিক করেছিলাম, এখন শুনছি ওর কিছু নেই। ওর ঠাকুর্দা ওকে কিছুই দিয়ে যেতে পারেননি, উইল করেননি। খুব ভাল ছেলেটি কিন্তু এখন মনীশ ব'লে ছেলেটির সঙ্গেই সুমিত্রার ঠিক করে ফেলেছি। যদিও অনেক দিন আগে থেকেই এর সঙ্গে কথা কয়ে রেখেছিলাম, মেয়েও তাই জানত।'

জবাব হ'ল, 'তাতে কিছু হবে না, আলাপ করতে দাওনিত ?'

নীতিশ সরে যেতে পারল না, কি একটা উন্মুখ কৌতূহল তাকে ধরে রাখল সেখানে।

'না তা দিইনি, তবু বড় হয়েছে, চেনা পরিচয় আছে দু' বাড়ীতে।'

'তা বটে। আর এই ছেলেটি কি বল্‌লে নাম নীতিশ না কি ? এটিকে ওদের সকলের চেয়ে বুদ্ধিমান আর গভীর প্রকৃতি মনে হয়। পাত্র হিসেবে ভালো হত।'

'তা হলে কি হয়, একটা ভিখিরীর সঙ্গে তো বিয়ে দিতে পারি না। কিছু নেই ওর, ওর জ্যেঠারাই বল্লে সেদিন।'

'কিন্তু দিদি একদিন বলছিলেন আমাকে, এরই ওপর মেয়েদের ঝোঁক। তা তুমিতো মেয়েদের অনেক টাকা দিচ্ছ, তাতে কি ওর বিলাত যাওয়া হয় না ?'

'বিলাত যাওয়া হবে না কেন, তারপর কিছু হয়ে আসেন তো ভাল, না হলে 'অন্যভক্ষ্যাধনুর্গুণের' ঘরে আমার মেয়ের কি সুখ হবে।'

'তা হলে কিন্তু তোমার আজ একে নিমন্ত্রণ না করা ভাল ছিল! ভাল করনি এটা।'

'তা' আর কি করে করি, ওদের এক বাড়ী, চিরকাল যাওয়া-আসা করছে। তা ছাড়া ছোকরা গান-বাজনায় ভাল, একটা সকলের 'এনটারটেনমেন্ট' হবে। বেশ বাজালো বেহালা বাঁশী, নয় ?'

অনিচ্ছাতেও সব কথা কানে গেল। নীতিশের কান দুটি গরম হয়ে উঠল —এন্‌টারটেনমেন্ট! ঐটিই বাকি আছে—মনোরঞ্জক তারপরে কি বিদূষক ? বিয়ের কথা বা কল্পনা নীতিশ করেনি কিন্তু বয়সের ধর্ম, সুমিত্রাদের প্রশংসমান দৃষ্টি সেগুলোও কম নয়। তারপর ভিখিরী 'অন্যভক্ষ্যাধনুর্গুণ'। ক'দিন আগে মনীশরা বলেছে সাধু মহাত্মা হতে। নীতিশ আস্তে আস্তে বাগানে নেমে গেল। সহসা দেখল একেবারে পথে বেরিয়ে এসেছে।

ঘনীভূত শ্যামল ভাদ্রের সন্ধ্যায় কারো চোখ পড়লনা, ঘরে তখন আর কার গান সুরু হয়েছে।

বন্ধুহীন নিঃস্ব নিঃসম্বল সমবেদনাহীন অদ্ভুত জগত যেন ডিমের খোলার মত কঠোর আবরণে তাকে ঘিরে নিয়েছে। মা নেই, বাবা নেই, ভাই-বোন, স্বজন কেউই নেই।

৩

তেতালার চিলেকুটরীতে বসে বসে টুলু আর বুলু পড়ছিল। রাত্রি অনেক হল, বুলু ঘুমুলো সেইখানেই কিছুক্ষণের মত

টুলুরও অনেক পড়া হয়েছে—সে ছাতে বেরিয়ে এলো। বৃষ্টিহীন মেঘলা আকাশ, থমথম করছে, আলো নেই, রূপ নেই, আকর্ষণ নেই। যেন ঘোলাজলভরা বন্যাপ্লাবিত শ্রীহীন দেশ টুলুর মনে হচ্ছে যেন ওটা আকাশ নয়।

টুলু ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। সহসা ছাতের এক কোণের কাছে কে যেন সোজা হয়ে দাঁড়াল এতক্ষণ টুলুর চোখ পড়েনি।

টুলু চমকে বল্লে 'কে?' তার পরেই বল্লে, 'নীতুদা? এতরাত্রে ছাতে দাঁড়িয়ে আছ? কেমন নেমন্তন্ন খেলে? এক বললে তোমাকে ওরা দেখতে পায়নি? কোথায় ছিলে এতক্ষণ?'

নীতিশ বল্লে, 'আমি একটু অন্য জায়গায় বেড়াতে গিয়েছিলাম।'

'সেকি?—ওখানে যাওনি?'

'একটুখানি ছিলাম ওখানে।' অকস্মাৎ একটু অদ্ভুতভাবে হেসে বল্লে, 'বাঁশী বাজিয়ে ওদের অভ্যাগতদের 'এনটারটেন্' করে এলাম। বিদূষক হয়ে ওঠার আগের অবস্থা এখন।'

বুলুর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, কখন নিঃশব্দে সে এসে ওদের পিছনে দাঁড়িয়েছিল। সে বল্লে, 'ও তাই মেজমামা বলছিল, নিতুর বাঁশী বেহালার খুব সুখ্যাতি হ'ল।'

নীতিশ সেই রকমই হেসে বল্লে 'ও, বল্লে বুঝি ওরা। একটা সার্টিফিকেট

বুলু টুলু ঠিক বুঝতে পারল না ওর কথার ধরণটা।

হঠাৎ যেন অসহিষ্ণু হয়ে উঠল নীতিশ, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তার মনে হল ওদের বলে, 'তোমরা যাও, চলে যাও তোমরা, কেন দাঁড়িয়ে আছ ভাল বাঁশী-বেহালার প্রশংসা শোনাতে। আমি শুনতে চাই না, চাই না। তোমাদের কথা তোমাদের প্রশংসা, তোমাদের বাড়ির লোকজন, তোমাদের বাড়ীর ইটকাঠ দেওয়াল ঘর সমস্ত আগুনের মত গরম হয়ে উঠেছে। তার মনে হতে লাগল সমস্ত বর্ষার ঘোলা আকাশ যদি তার সব জল নিয়ে ভেঙে পড়ে এখনি, প্লাবিত করে দেয় ওদের, তবু যেন ওই আগুনের গরম কাটবে না। নীতিশ ছাতের ও-প্রান্তে গিয়ে আলিসার ওপর ঝুঁকে দাঁড়াল—মানুষের সঙ্গ তার যেন অসহ্য হয়ে উঠেছে বুলু-টুলুর কি এমন বুদ্ধি নেই যে সে কথা বুঝতে পারে? বুলুরা কিন্তু নিঃস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। শান্ত নিরীহ গভীর প্রকৃতি নীতিশকে ওরা চেনে, এই তীক্ষ্ণ রূঢভাষী নীতিশকে তারা চেনে না। ভয়ে কুণ্ঠায় তারা চুপ করে স্থাণুর মত সেখানে দাঁড়িয়েই রইল।

এতক্ষণে ঘোলা আকাশে যেন একটু চিড় খেয়ে বিদ্যুৎ চমকে উঠল। তারপরে নিঃশব্দে বর্ষণ সুরু হয়ে গেল

ছাতের দু'কোণে তিনটি প্রাণী আকাশের মতই অ-স্বচ্ছ অদ্ভুত চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে সেই নিঃশব্দ বৃষ্টিতে ভিজতে লাগল, যেন আর কোনো কিছুই আজ তাদের করবার নেই এই ভেজা ছাড়া যে ভেজা অন্যদিন তাদের গল্পের গানের আনন্দের কাহিনী বহন করে আনে, দুজনে শেওলা পড় ছাতে ঘুরে ঘুরে ভিজে বেড়ায়, কখনো কখনো নলিন নীতিশও আসে, কখনও অন্য মেয়েরা। আজকে সে আনন্দ বা সে গান কিছুই নেই, গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টিতে তাদের মাথা ভিজে গেল, কাপড় সেঁতিয়ে ভিজে গেল কিন্তু তাদের যেন নড়বার শক্তি ছিল না

সহসা সিঁড়ির ওপরে রমাকে দেখা গেল। টিনের ঘরে উঁকি মেরে তিনি দেখলেন একবার, কেউ নাই। ছাতের ওপরে উঠে এলেন।

'তোরা ভিজছিস্, মাথা খারাপ হয়ে গেছে? ঘরে আলো জ্বলছে আর তোরা এখানে। আর নিতু এখনো ফেরেনি?'

ওরা নীতিশের দিকে তাকালে জননীর চোখও সেদিকে পড়ল। এক নিমেষে সমস্ত রূঢ়তা তীক্ষ্ণতা আত্মস্থ করে নীতিশ এগিয়ে এল। রমা বল্লেন, 'এত রাত হ'ল তোর? ওখানে যাসনি?'

নীতিশ বল্লে, 'হাঁ, গিয়েছিলাম বইকি।' তারপর একটু উন্মনভাবে বল্লে, 'দিদি একটু চা খাব কি? মাথাটা ধরেছে।'

'এত রাত্রে? কেন কিছু খাওয়া হয়নি বুঝি তোর? তাই মণিরা বল্লে তোকে ওরা ওখানে দেখতে পায়নি। যা টুলি, চায়ের ঘরে পাঁউরুটী মাখন আছে ওকে দিগে। এত রাত্রে কিন্তু স্টোভ জ্বাল্‌লে দাদা, বৌর ঘুম ভেঙে যাবে, বিরক্ত হবে। স্টোভ জ্বালিস্ নি, নীচে রান্না ঘর থেকে জল গরম করে নে।'

স্টোভ জ্বলল না; দোতলার সিঁড়ির পাশে চায়ের ঘরে টুলু দাঁড়িয়ে রুটী কাটছিল, নীতিশ চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল, বুলু জল গরম করতে গিয়েছিল। বুলুর বড় মামী নিঃশব্দে এসে এক মুহূর্ত্ত দাঁড়ালেন, 'এত রাতে রুটী কাটছ টুলু কে খাবে, নিতুর অসুখ করেছে? আমার সকালের পাঁউরুটী উঠিয়ে দিয়ো না সব।'

টুলু অপ্রস্তুত হয়ে চমকে ফিরে চাইল, তারপর নীতিশের দিকে চাইল। নীতিশও অপ্রতিভ হল্লে, 'না বৌদি, অসুখ করেনি।' কিন্তু রুটী মাখন চা খাওয়ার কৈফিয়ৎ এত রাত্রে আর কিছু মনে বা মুখে এলো না আর কিছু বলবার আগেই বৌদি নিঃশব্দে ফিরে গেলেন। বুলু গরম জল নিয়ে উঠে এলো। বুলুর কানে পাঁউরুটীর কথা গেল।

টুলু অপরাধিনীর মত পাঁউরুটীর দিকে চেয়েছিল। ওটা খাদ্য বটে কিন্তু কাকে দেবে ও কার খাবার টুলু তা যেন বুঝতে পারছিল না। বুলুও জানে সেকথা কিন্তু সে তো বাড়ীর মেয়ে—সে চা এবং রুটীর টুক্‌রা ক'টা নিতুর সামনে দিল।

নিতু চায়ের পেয়ালাটা শুধু হাতে করে নিল। মাখন মাখা রুটী দু'খানা টেবিলের ওপর প্লেটে ঝিকমিকে ছুরীর পাশে শুয়ে রইল যেন বৌদির ধারালো মন্তব্যের পাশে টুলু-বুলুর মত।

নিতু পিছনে ফিরে জানলা দিয়ে বাইরের বৃষ্টি ও অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইল। তার কানের কাছে বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে বিকালের শোনা কথার সঙ্গে, বৌদির রুটীর মন্তব্য, সেদিনের 'মহাত্মা' হবার কথা যেন কুইনাইন খাওয়া জ্বরবক্তের মত নানা সুরে গুঞ্জরিত হতে লাগল। অকস্মাৎ যেন সে বুঝতে পারল তার পায়ের তলার মাটী তার নয় এবং সুমুখের স্লাইস কাটা রুটীতেও তার কোনো দাবী নেই। মাটিতে সে শুধু দাঁড়িয়ে আছে এবং রুটী সে পায় তাই খায়।

বুলু অনেকক্ষণ পরে বল্লে, নিতু মামা তুমি খাও। আমরা কাল সকালে রুটী খাব না। তাহলেই কম হবে না।'

টুলুর কথা বলার সাহস নেই, সে নিতুর চেয়ে অক্ষম স্তরের জীব—এ বাড়ীর

দৌহিত্রীর পিসী। সে তার কালো মুখে সুন্দর কালো চোখ দুটি মেলে স্থির ভাবে চেয়েছিল। কি ভাবছিল ওরা, তা কেউ জানে না। হয়ত নিতুর খাওয়ার কথা ভাবছিল, নয়ত বৌদির নির্লিপ্ত অথচ দৃঢ় কর্ত্রীত্বের দাবীর ঘোষণা তাদের অন্তরকে পীড়িত কচ্ছিল কিম্বা কিছুই নয়। কিন্তু তাদের অজ্ঞাতেই তাদের শান্ত মুখে যেন আশ্রয়হীন অন্নহীনের লাঞ্ছিত অবমাননার চিরন্তন কাহিনী ফুটে উঠেছিল।

অবশ্য কাল তারা আবার সব খাবে, হাসবে আবার গল্প করবে এবং এই বাড়ীতেই এখনো বহুদিন হয়ত থাকবে—তবু। সহসা ওরা পেছন ফিরে দেখল নিতু ঘরে নেই।

দেখতে দেখতে বিলাত যাত্রার দিন ঘনিয়ে এলো 'সী অফ' করতে হবে অর্থাৎ পৌঁছতে যেতে হবে কিন্তু ইংরাজীতে না বলে বলেই সুখ নেই তাই সকলেই বলে 'সী অফ'। যাক্, কিন্তু পৌঁছানোটা বোম্বাইয়ে নয় এখানেই হাওড়া ষ্টেশনে। শুধু প্রবীরের মা বাপ বোম্বাই যাবেন। বড় গিরীশবাবু সেকেলে ধরণের লোক, বড় গৃহিণী ততোধিক অনাধুনিক। বিলাত যাত্রার ভালো মন্দ দূর নিকট তাঁর নিতান্ত সোজা জ্ঞান। বিলাত থেকে ফিরে লোকে খুব ভাল চাকরী পায় অথবা প্রচুর উপার্জ্জন করে এই ভালো। দূরত্বও তাঁর সাগর পার জ্ঞান মাত্র। এই মানুষকে নিয়ে তো আর সভ্যতাবে রুমাল উড়িয়ে পৌঁছে দেওয়া চলে না।

সুতরাং মনীশের মা পূজা-অর্চ্চনা হরির লুট সত্যনারায়ণের সিন্নি এই সব মানসিক ও বিমনভাবে যাত্রার আয়োজন করতে লাগলেন। শুধু তাঁর মন কেমন করে মনীশের খাওয়ার জিনিষ নিয়ে। প্রতিদিনই তাঁর রান্নার আয়োজন বিরাট হয়ে যায়, আর মনীশ বলে, 'মা কি ফাঁসীর খাওয়া খাওয়াচ্ছ।'

মা অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে ষাট্ ষাট্ বলেন।

নীতিশ সহসা সকলের থেকে যেন অনেক দূরে চলে গেছে। বিশেষ কোনো কথাই সে কারু সঙ্গে বলে না। একটা কি-ভাবে মুখ প্রসন্ন করে রাখে। বুলু-টুলু নলিনের সঙ্গে গল্প করে—একই রকম। প্রবীর মনীশের অহঙ্কৃত কথাবার্ত্তা আর করুণা-মিশ্রিত কথা গায়ে মাখে না। ওদের সঙ্গে বাজার করে, দরজির দোকানে যায়, প্রয়োজনীয় জিনিষ কিনে আনে। সহজভাবে গল্পে যোগ দেয়।

সদাশয় ভাবে মনীশ বলে, 'আমি ব্যারিষ্টার হয়ে ফিরে এসে তোকে পাঠাতে বাবাকে বলব।'

প্রবীর বলে, 'আর এক উপায় করাও যায়, সেদিন শুনছিলাম ঐ প্রবোধ মুখুয্যেদের একটা কালো মেয়ে আছে, তারা নাকি জামাইকে মানুষ করে দেবে। যা চায় তাই দেবে। সেদিন বাবা বলছিলেন, ওসব সুন্দর মেয়ে লেখাপড়া জানা মেয়ের রোমান্স রেখে ভবিষ্যতের জন্য নিতের, নলের ঐ রকম মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া উচিত।' বাবার ভাষাই ব্যবহার করলে সেও।

নীতিশের মুখ লাল হয়ে উঠল, কি যেন জবাব মুখে এলো কিন্তু কিছু বল্লে না।

মনীষের ভাই সুধীর একটু অবাক হয়ে সকলের দিকে চাইলো, তারপর বল্লে, 'বিয়ের নির্বাচনটা অন্তত নিতুদার নিজের থাক।' সে নীতিশকে অত্যন্ত ভালবাসত এবং এও জেনেছিল যে, সুমিত্র উর্মিলা, মনীশ প্রবীরের জন্য বাক্‌দত্ত হয়েছে কয়েকদিন আগে। এদের একজন নীতিশের জন্যই ছিল। এবং নীতিশ আর এ-বাড়ীর এ সম্পর্কের কেউ নয় ঘটনাচক্রে সে নলিনের মতন প্রসাদজীবী

ছোট বেলার লাঞ্ছন অপমান অ বাত ব ববার ফিরে ফিরে এসেছে এক এক বার এক এক রূপে। কোনোটার সঙ্গে সঙ্গে কোনোটা মেলে না। ছেলেবেলায় যেটা ক্ষীরের বাটী, মাছের মাথা, মিষ্টান্নের ব মাংসের মুলত ব অধিকার নিয়ে মনে হয়েছে, পরে আর সে দুঃখ মনে থাকেনি গাড়ি তে ওঠার, পাশে না বসতে পাওয়ার লাঞ্ছনাও আর পরে মনে থাকেনি। তারপর এল নকল গুরুগৃহে বাসের যুগ। সে যুগের অকারণ অবমাননা বালক কিশোর মনে কম আঘাত করেনি মাতৃহীন পিতৃহীন বালক বিমূঢ় ভাবে বিমনা ভাবে ঘুরে বেড়িয়েছে, কোনো কূলে তার টলমলে মন আশ্রয় পায়নি। এই সময় থেকেই জ্ঞান যুগের সুরু।

শুধু সেদিন অবধি নীতিশের জানা ছিল না সে একেবারে নিঃস্ব, দীন। এই বিষয়টা যেন তার এবাড়ীর সম্বন্ধের শিকড়টাকেও উৎপাটিত করে দিয়েছে মনের ভিতরের সমস্ত কোমলতা মধুরত সহসা যেন পাথরের মত হয়ে গেল।

অকস্মাৎ যেন সে জানতে পারল সে কেউ নয়, কোনো সম্পর্কের দাবী নেই, কোনো অধিকার নেই এবং কোনো বন্ধনও নেই। কেউ তার শুভাশুভের কথা ভাবে না। ভাববার প্রয়োজন আছে মনে করে না। গৃহপালিত জীবের মত শুধু আহার আশ্রয় দিয়েছে মাত্র।

সেদিন রাত্রের পাঁউরুটীর কমের কথার ঘটনার পর সে যেন আরো বুঝতে পারল নলিন বুলু টুলুদের মতই সে। হয়ত আরও খারাপ অবস্থা—ওরা একদিন

এবাড়ী থেকে সহজেই চলে যাবে নিজের পরিজনদের মধ্যে। আর ও ?—ও কোথায় যাবে ? কার কাছে ?

এরপরই সে আকস্মিক ভাবে একেবারে আত্মস্থ হয়ে গেল যেন। তার কথা, তার তর্ক, তার আশা, আনন্দ, কল্পনা, একেবারে নিঃস্ব নিরাশ্রয় হয়ে গেছে, যেন জীবনের পথ হারিয়ে ফেলেছে। কোনো কালো মেয়ের প্রতি তার ঘৃণা ছিলনা, সে জানে, বড় লোকেব কালো মেয়ের স্থানও তার চেয়ে অনেক ঊর্দ্ধে। কিন্তু তার মন, তার ভবিষ্যৎ, সেটা তো তার নিজেবই। সেটা গুরুজনের আলোচনীয়ও নয় অপরের কাছে, তবে কাছে বলা যেত। তাতো বলেননি। মেজ জ্যেঠা মহাশয়রা খরচ করতে পারবেন না স্বাভাবাবিক। কিন্তু ?—তাঁদের মুখে ? নীতিশের কান গরম হয়ে যায়। বহু কষ্টার্জিত অপমান সহিষ্ণু সৌজন্যময় হাসি যেন ঠোঁটের প্রান্তে আড়ষ্ট হয়ে যায়।

মনীশ হঠাৎ একটু উদার হয়ে উঠেছে, সে বল্লে, 'হ্যাঁ, বিয়ে ব্যাপার সে নিতে নিজে বুঝবে। কারণ বিয়ে করবে যাকে খাওয়াতে পারে কিনা দেখুক'

সান্ত্বনা দিতে গিয়ে মনীশ আবার একটা কথার আঘাত দিল।

এবারে নীতিশ সহজভাবে হেসে বল্লে, 'হ্যাঁ সত্যি কথাই তো। তা তোমাদের আর কি বাজার বাকি, চল যাই।'

মনীশ প্রবীর সুধীশ সকলে বেশ খুসী হয়ে উঠল যেন, নীতিশের এত সহজ হওয়াতে। সুধীশ ভাবে, তবে কি নিতুদার আর সেরকম মনোভাব নেই ? অপমান লাগে না অপ্রস্তুত হয় না ? সুধীশ সন্দিগ্ধভাবে নিতীশের পানে চায়।

যাই হোক কয়েক দিনের মধ্যেই যাত্রাব দিন এসে পড়ল।

মায়েরা দিলেন দেবতার নির্মাল্য প্রসাদ, আর প্রচুর স্থায়ী অস্থায়ী আহার্য্য—পথের ও পরের। পিতারা বিমনাভাবে স্টেশনে গিয়ে দাঁড়ালেন, পুত্র গর্বে গর্বিত আবার শঙ্কা আকাঙ্ক্ষায় বিচলিত ভাবে।

বন্ধুরা নিয়ে এলো ফুলের মালা, নানাবিধ প্রয়োজনীয় ছোটো-খাটো জিনিষ।

সুমিত্রাদের বাবাও এসেছিলেন দুই কন্যা নিয়ে। এবারে দূর থেকে ঘনিষ্ঠতর ভাবে জানা হোক, চিঠিপত্রও লিখিতে দেওয়া যেতে পারে।

মনীশের বড ভাই সতীশ, আরও বহু জনের, স্বজনের মধ্যে নলিন নীতিশ প্রতুলও দাঁড়িয়ে ছিল।

সহসা সুমিত্রার বাবার দৃষ্টি পড়ল সেদিকে। তিনি না দেখার মত মনীশের গাড়ীর জানালায় দাঁড়ালেন।

মনীশ প্রবীর নেমে এলো বন্ধুদের মাঝে, নীতিশ প্রতুল নলিনও পাশাপাশি ওদের কাছে দাঁড়াল।

সহসা যেন জ্যেঠারাও অপ্রতিভ হয়ে গেলেন। নীতিশ কি ক্ষুণ্ণ হয়েছে?

তাতো মনে হয় না। তা ওঁরা আর কি করে ওর জন্য এত খরচ করতে পারেন। বুদ্ধিমান ছেলে ক্ষুণ্ণ নিশ্চয় হবে না। যাক্, দেখা যাবে। বড় জ্যেঠা বল্লেন মেজকে, 'ওকে একটা ভাল চাকরী করে দিতে হবে।'

মেজ বল্লেন, 'হ্যাঁ। কিন্তু ও আজ এলো কেন, বলত?' গিরীশ কিছু বল্লেন না' তাঁর যেন কেমন সঙ্কোচ হচ্ছিল।

মনীশ প্রবীরও যেন কোন্‌খানে নিজেদের অপরাধী মনে করছিল।

ঊর্মিলা একটি দুটি কথা নীতিশের সঙ্গে কইল। সুমিত্রা নীরবে অন্যত্র চেয়ে রইল। সহসা গাড়ীর বাঁশী বেজে ওঠায় সকলে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন।

স্কুলের গরমের বন্ধ তখনও হয়নি। বুলু টুলু বেলা ইলা প্রায় সকলেই কাছাকাছি ক্লাসে রয়েছে, ম্যাট্রিক ক্লাসের, সেকেণ্ড ক্লাসের ছাত্রী।

নলিন নীতিশ এম-এস-সি পড়তে ঢুকেছে—সিক্স্‌থ ইয়ার প্রায় শেষ। ওখানে মনীশের ব্যারিস্টারীর একবার হয়েছে পরীক্ষা, একেবার দেয়নি। প্রবীর বেশ পড়েছে নিয়মমত।

পাশাপাশি পড়ার ঘরে কারুর বা মাস্টার এসেছে কারো বা নিজেই পড়ছে।

বলু এসে দাঁড়াল ভাইদের কাছে, মামাদের কাছে জিজ্ঞাসা করতে।

পড়া শেষ হলে, বল্লে, 'জানো নিতুমামা, আজকে ভারি অপ্রস্তুত হয়েছি।'

'কেন কিসে?' নীতিশ বই থেকে মুখ না তুলেই জিজ্ঞাসা করলে।

'আজকে আমাদের ইংরেজী পড়াবার সময় মিস্ চোপ জিজ্ঞেস করলেন, 'জালিয়ানওয়ালাবাগে যে ঘটনা ঘটেছে সে বিষয়ে আমাদের কি মনে হয়?' জালিয়ানওয়ালাবাগ কোথায় তাই জানিনা। তা তার ঘটনা। অবাক হয়ে চুপ করে রইলাম। মেম অবাক হয়ে বল্লেন, 'তোমরা জানোনা কিছু?' হঠাৎ দেখি প্রবোধ মুখুয্যের সেই কালো মেয়েটা উঠে দাঁড়িয়েছে। মেম তার দিকে তাকালেন। সে একটু থমকে গেল, তারপর বল্লে, 'যদি সত্য হয়, আমার বাবা বলেছিলেন, এই ঘটনা ব্রিটিশ ভারতের বিশ্রী কলঙ্ক।'

মেমের মুখ কাল হয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি জানো সব ঘটনা?'

বীণা বল্লে, 'হ্যাঁ, আমি যেটুকু কাগজে পড়েছি জানি।'

নীতিশ গল্পের আরম্ভেই মুখ তুলেছিল। নলিন সুধীশ প্রবীরের ভাই সুবীর গল্পের গন্ধে সকলে এসে দাঁড়িয়েছিল। টুলু বেলা ইলাও এলো।

নলিন শুধু বল্লে, 'মেয়েটা তো খুব খোঁজ খবর রাখে।'

নীতিশ বল্লে, 'তোরা কিছু পড়িস্ না? খবরের কাগজও না মাসিক পত্রও না? প্রবাসীতেও কিছু দেখিস না।'

একটু হেসে সুধীশ বলে, 'হ্যাঁ পড়ে বই কি, শুধু গল্প।'

নীতিশও হাসলে, এবারে বল্লে, 'পড়ে তো! তা যাই পড়ুক।'

নলিন বল্লে, 'মেম বীণার কথার জবাবে কি বল্লেন?'

বুলু বল্লে, 'আর কিছু বল্লেন না। আমাদের ক্লাস শেষ হলে আমরা বীণাকে জিজ্ঞাসা করলাম সব। মেয়েটা অনেক খবর জানে, খুব পড়ে। আমরা তার কাছে মুখখু।'

ইলা এতক্ষণ চুপ করে ছিল। সে বল্লে, 'কালো মেয়েগুলো একটু পড়া শুনা বেশীই করে।'

নলিন অবাক হয়ে তার দিকে চাইল। তারপরেই তার টুলুর দিকে চোখ পড়ল।

সুধীশ একটু বিরক্ত ভাবে বল্লে, 'তার কি মানে!' তারও টুলুর দিকে চোখ পড়েছিল। টুলুও যেন অভ্যস্ত ভাবে চুপ করে ওদের দিকে চেয়েছিল।

একটু চুপ করে সুধীশ বল্লে, 'কালো রং হ'লে পড়া-শোনা করলেও গায়ে কালো দাগই লেগে থাকে। জালিয়ান-ওয়ালাবাগে যাদের সাদারা মেরেছে তাদেরও রং কালো বলেই মেরেছে।'

এক মুহূর্ত্তে ঘরের হাওয়া তিক্ত হয়ে গেল। সকলেই চোখে নামিয়ে নিলে। কালো মেয়ে টুলু না থাকলে হয়তো কথা বলা যেত, হয়ত তর্ক বিতর্ক হ'ত, কিম্বা ইলাকে অপ্রতিভ করা যেত। এখন আর কোনো কথাই কারুর মুখে এলো না। ভারতবর্ষের কোটী কোটী কালো মেয়ে যেন টুলুর চোখ দিয়ে ওদের পানে চেয়ে রইল।

জালিয়ানওয়ালাবাগের কালো ভারতবাসী, প্রবোধ মুখুয্যের অবজ্ঞাত কালো মেয়েটা আর নিজের বঞ্চিত অন্তরাত্মায় 'নিত্য চিত্ত ক্ষোভ' সব যেন একসঙ্গে মিশে গিয়ে নীতিশের মনের কোন কোনে বাসা বেঁধে নিল।

কালো মেয়েকে কালো বল্লে তার সহসা মনে হয় সে যেন টুলুর মত দেখতে

সেই মেয়েটাকে দেখতে পাচ্ছে। আর সে শুধু একলা নয়, তার সঙ্গে অসংখ্য কালো মুখ মিশে গেছে। আর যে দেশ দেখেনি সে দেশের অধিবাসী-অধিবাসিনীর সেই হত্যার কাহিনীও সমস্ত পড়া থেকে একটা রূপ নিয়ে তার মনের মাঝে জেগে উঠতে চায়, যদিও রূপ ফোটে না।

কিন্তু নিজের সমস্ত চিত্তক্ষোভ হঠাৎ অনেকখানি, বহু বিস্তৃত অনেক গভীর স্থান পেল যেন মনের কোন্ অজানা অচেনা অদ্ভুত অস্পষ্ট লোকে।

বহুদিন ধরে যে অসহায়তা, যে গ্লানি, যে অভিমান ক্ষোভ নীতিশের মনে জমে উঠেছিল, কিছু-বা তার জ্ঞাতসারে, কিছু-বা অজ্ঞাতে—যা সহসা প্রতিহত হয়ে গিয়েছিল স্বজন গুরুজনদের ব্যবহারে, হতবুদ্ধি হয়ে আত্মস্থ হয়ে গিয়েছিল—তা' আজ যেন অসংখ্য লাঞ্ছিতের মাঝে নিজেকে দেখতে পেল। নীতিশ ভাবে, এই কি আমি 'বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই বঞ্চিত করে—বাঁচালে মোরে' কিন্তু এই কি 'বঞ্চিতের নিত্য চিত্ত ক্ষোভ'। নীতিশের চোখের সুমুখ থেকে যেন তার বাইশ বছর বয়স নিজের রাত্রি দিনের সীমানা অতিক্রম করে কত দূরে চলে যায়। সমবয়স্ক সমস্ত বন্ধুবান্ধব যেন তার কাছে সহসা অনেক ছোট বয়স মনে হয়। বহুদিনের আঘাতে ছোট ছোট কথা, অবমাননার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইতিহাস তার অগোচর মনের কোনখানে জমেছিল এবং তা জানা ছিলনা, এখন যেন সহসা তারা তার মনের গোচর জগতে উঁকি মারে, অস্পষ্টভাবে কত কি বলে যায়। যেন মনে হয় কেউ নেই তার, কেউ ছিলনা কখনো। ঐ ফুটপাতে শোওয়া মুটেমজুর ভিখারি দীনদুঃস্থ ওরাও যে স্তরের সেও ঐ স্তরের। অট্টালিকাবাসী সুখাদ্যপুষ্ট উচ্চ-শিক্ষাপ্রাপ্ত তার স্বজনদের যেন আজ আর আপনার মনে হয়না। কোথায় যেন বিরাট ব্যবধান আছে, সেটা শুধু কৃপারই নয় কি ?

আর হাতের কাছে আপনি মন সংগ্রহ করে কোথা হতে হান্টার কমিটির রিপোর্ট, রাউলাট কমিটির ইতিহাস। আর সঙ্গে সঙ্গে নতুন স্কীমের কত ভালো ভালো চাকরী সংগ্রহের আশার কথা ও বিবরণীসহ বাড়ীতে গুরুজনদের হাত থেকে ওদের ঘরে এসে পড়ে। এবং তারি সঙ্গে মন্থরগতিতে বছর ঘুরে যেতে থাকে। সহসা ডাক আসে জ্যেঠামশায়দের ঘরে বৈঠকখানায়।

বড জ্যেঠামশাই বললেন, 'শুনলাম তোমরা নাকি কলেজ যাচ্ছ না, ইউনিভার্সিটি যাচ্ছ না ?'

ছাত্রদল, নলিন নীতিশ সুধীশ আর দলের অন্য সবাই চুপ করে রইল। 'বড়রা তোমাদের অবশ্য না গেলে, কোন ক্ষতি নাই। কেননা এবার তো

তোমাদের কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় পাঠাব, তার জন্যে তৈরী হয়ে নাও ভালো করে।' নলিনের দিকে চেয়ে তারপর বল্‌লেন, 'কি রকম তৈরী হবে মনে হচ্ছে? সাবডেপুটীগিরি জুটিয়ে নিতে পারবে তো? আর তুমি? নিতু, কি করবে?'

এ বাড়ীর বড়রা যখন বড় ছেলেদের সঙ্গে কথা ক'ন কদাচ 'তুই' বলে স্নেহমধুর স্বরে কথা বলেন। বেশ যেন দূরত্ব রেখে 'তুমি' বলে সম্বোধন করে কথা ক'ন।

নীতিশ বল্‌লে, 'আমি রিসার্চ্চ করছি, সেটাই করব ও সব পরীক্ষা আমি আর দোব না।'

মেজজ্যাঠা হরিশ খবরের কাগজ পড়ছিলেন অর্থাৎ মুখের সামনে কাগজখানা ছিল। তিনি সেটা রাখলেন, বল্‌লেন, 'ও তুমিই বুঝি নন্‌কো অপারেশন-এ মেতেছ? আজকালকার দিনে নতুন স্কীমের সরকারী চাকরী আর কম্পিটিটিভ পরীক্ষার দাম কত জানো? স্বদেশউদ্ধার তোমার দ্বারা না হলেও চলবে। আগে নিজেকে সামলাও। খাবে কি? চাকরী যদি না কর? চিরকাল জ্যেঠারা খাওয়াবে না।'

গুরুজনের ওপর কথা বলা অভ্যাস নেই। কিন্তু নীতিশের নলিনের সুধীশের মুখ লাল হয়ে উঠল সমবেত অপমানে। কাকে বলা হ'ল আর কে-বা বাদ গেল তা বোঝা গেল না।

মধ্যম ভাইয়ের মত কটু কথা স্পষ্ট করে বলতে অনভ্যস্ত গিরীশ বল্‌লেন এবারে, 'আর নলিন কি ভেবেছে তার মা বোন আর পিসির ভাবনা চিরকাল আমি ভাবব? সেও কি নন্‌কোঅপারেশন্ করছে নাকি।'

ওদিকে বসেছিলেন গিরীশের বড় ছেলে মনীশের দাদা সতীশ, একটু হেসে তিনি বল্‌লেন, 'আর তোমরা পরীক্ষা দেবে না নন্‌কোঅপারেশন্ করে বসে থাকবে। ওদিকে সকলেই সব করবে, সরকারী কাজও করবে, তোমরাই বোকা বনে যাবে।'

সমবেত গুরুজনেরা ঈষৎ হাসলেন।

এবারে গিরীশ বল্‌লেন, 'তোমরা তৈরী হও সব ভাল করে। ওসব হুজুগ আমার বাড়ীতে হয় আমি পছন্দ করি না।'

নলিন নীতিশ সুধীশ নত মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। নলিনের মা আছে, বোন আছে—আর টুনু আছে। ও কি সে কথা ভুলে গিয়েছিল? এক মুহূর্ত্তেই একটি কথাতেই সে সমস্ত দেখতে পেল যেন স্পষ্ট করে। অনাথ অন্নহীন আশ্রয়হীনের আবার মতামত কি? নীতিশের চোখের সামনে যেন তার

ভেসে আসে অসংখ্য নিরীহ দীন লাঞ্ছিত বঞ্চিত দেশবাসীর মুখ, যারা বারবার উৎপীড়িত হয়েছে, যাদের অনাহারে মৃত্যু হয়েছে, যাদের নিরস্ত্র মরতে হয়েছে প্রবলের হাতে, যাদের ওপর কোন অত্যাচারের কখনো প্রতিকার হয়নি, হয়ত কোনো দিন হবে না। আর তারাও কি তাদেরই একজন নয়? শুধু অভিজাত ঘরের সম্পর্কীয় মাত্র।

যাই হোক, উপরওয়ালার হুকুম বা গুরুজনের আদেশ। যন্ত্রের মত ওদের স্নান হয়ে গেল। কলেজের বেলা হয়েছে খেতে গেল ভিতরে।

নানাবিধ মন্তব্য ও শ্লেষ উপদেশের কণিকা অন্তঃপুরেও ছড়িয়ে গিয়েছিল। কোঅপারেট পুত্রকে দেখে রমা আশ্বস্ত হলেন। বুলু টুলুরও কলেজের বেলা হয়েছিল। যাবে কিনা স্থির করতে পারছিল না।

উপর থেকে শোনা গেল নলিনের বড় মামার গলা 'তোমরাও বুঝি নন্-কোঅপারেশন্ করছ? তা ভালো। তা আর একেবারেই যেও না। পড়ে শুনে যা সব শ্রী হচ্ছে? কালো, কোলকুঁজো, মুখের হাড় বের করা। ছেড়ে দাও পড়াশোনা। নইলে ও রূপ দেখলে জন্মে কেউ বিয়ে করবে না।'

বুলুর মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। সে 'কোলকুঁজো' 'কালো' নয় বটে, কিন্তু টুলু যে কালো আর রোগা, মুখের হনুর হাড় উঁচু। টুলুর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। বুলুর মনে হল যেন এর চেয়ে ওরা বুলুকে দুটো অপমানের কথা বললেন না কেন কলেজের কাপড় পরে তারা নিঃশব্দে নেমে এলো। রমার কানেও সব কথা পৌঁছল কিন্তু সকলেই নির্বাক হয়ে রইল।

নীতিশের মনে হল সাদার কাছে, গোরার কাছে, শাসকের কাছে পরাধীন অন্নহীন আশ্রয়হীন কালোর লাঞ্ছনা কি এরো চেয়ে বেশী হয়? না হয় তারা কখনো কখনো গুলি মারে, বেত মারে। এদের সঙ্গে তো আমাদের রক্ত সম্পর্ক আছে, দেশের সম্বন্ধ আছে, চিরকালের একত্রবাসের সম্বন্ধ রয়েছে, তবু কি ওদের চেয়ে এদের ঘৃণা এই নিঃস্ব দীন দরিদ্রের ওপর কম?

অনেকদিন আগে তাদের আভিজাত্যের বিচারের অহঙ্কৃত তর্ক করার কথা মনে হয়। যে দিন তাদের মনে ছিল তারা অভিজাত, তারা শিক্ষিত, তাদের রুচি সাধারণের চেয়ে উন্নতস্তরের এবং তাই নিয়ে তাদের গর্ব গৌরব আর আলোচনার শেষ ছিল না।

আজ মনে হয় তার, আভিজাত্য বা অভিজাত যাকে তারা বলে, তাদের অহঙ্কারের সীমা নেই। তাদের রুচির অহঙ্কার, সৌজন্যের অহঙ্কার, শিক্ষার

গর্ব্ব, সংস্কৃতির গৌরব সবই তাদের কারুর সঙ্গে মেলে না। তাই জনসাধারণ তাদের অবজ্ঞার পাত্র, অশিক্ষিত অথবা দরিদ্র স্বজন করুণার পাত্র এবং শিক্ষিত স্বজন প্রতিদ্বন্দ্বিতার পাত্র। তাদের অভিজাত-মনে মমতা নাই, প্রেম নাই, কোনো ত্যাগস্বীকার নেই, শুধু আছে অপরিমেয় অহঙ্কার! তাকে দুঃখেসুখে প্রেমে করুণায় সকলের সঙ্গে এক করে নিয়ে একত্র বসা যায় না। এক কথায়, সে তার অহঙ্কারকে নিয়ে সর্ব্বত্যাগী হয়েছে তার বিলাস, তার আনন্দ, তার লীলা শুধু নিজেকে নিয়ে। তাই তারা অনায়াসে মানুষকে ঘৃণা করে ও করুণা করে। এই অভিজাত মনে অহঙ্কারের যার সীমা হয়না। প্রেমহীন নিষ্ঠুর অহঙ্কার!

কিন্তু এমনি কঠোর অভিজাত মনের অহঙ্কৃত গড়ন তাদেরও, যে তারাও নতমুখে নিঃশব্দে প্রত্যাহের মতই ডাল-ভাত মেখে খেয়ে উঠে গেল। টুনুর চোখে এক ফোঁটাও জল পড়লনা, নলিন নীতিশের মুখের একটি রেখাও কুঞ্চিত হ'ল না।

শুধু মনে মনে নলিনের স্থির হয়ে গেল যে, পরীক্ষা দেবে, আর পাশ করবে, আর যে চাকরী বললেন বা পাবে তাই করবে।

কয়েক দিন পরে যখন সুধীশ জিজ্ঞাসা করলে, 'নলিন কি পড়ছিস ভাই? পরীক্ষা দিবি নাকি চাকরীর?'

নলিন শান্তভাবে বল্লে, হ্যাঁ ভাই, চাকরীই করব ভাবছি, তাই ভালো করেই পড়া ভালো।'

আভিজাত্যের ছোঁয়াচ লাগা যদি গর্ব্ব থাকে তা ওদের মনে ছিল, যা কারো সহায়তা চায়না, সমবেদনা নিতে সঙ্কোচ বোধ করে, আপনার দুঃখের কথা বলতে চায়না কারুকে। আর শামুকের মত এক শক্ত খোলায় সমস্ত অন্তর আবৃত করে রেখেছিল তাদেরও।

৫

প্রতুল দেশে নেই। নলিন পড়ার সমুদ্রে আকণ্ঠ ডুবিয়ে রেখেছে, পাশ তাকে করতেই হ'বে। এবং চাকরী। যে কোনো চাকরী, সংসার প্রতিপালনের মূল্য পেলেই হবে। লেখাপড়ার বা অন্য আদর্শের কোনো কথা তাদের জন্য নয়। তাকে অন্ন সংগ্রহ করে পরিবারের মুখে দিতে হবে। নলিন যেন কোথায় নিজেকে লুকিয়ে ফেলেছে, অতি ভদ্র শান্ত মুখে অন্ন ও উপদেশ গলাধঃকরণ করে।

আগেকার টেনিস র‍্যাকেটধারী দেশী ও বিদেশী আধুনিক সাহিত্যের মলাট এবং বিক্ষিপ্ত পত্র আলোচনাকারী, সাহিত্যিক নামাবলী মুখস্ত করা বন্ধুর দল, যখন নীতিশ বড়লোকের ছেলে ছিল, অর্থাৎ উত্তরাধিকারত্ব পাবার আশা ও আভাস ছিল তারা আপনিই কি রকম করে নীতিশের নলিনের কাছ থেকে সরে গেছে।

অভিজাত নামাধেয়দের কাছে নলিন নীতিশ সমান অপাংক্তেয়।

নীতিশের নিজের চোখে পড়ে সে একেবারে একা যেন। আর শুধু সে নয়, এই মস্ত বড় একান্নবর্ত্তী পরিবারের শিশুর দল, বালকের দল, কি অদ্ভুত একটা আভিজাত্যের নিষ্ঠুর সঙ্কেতে একেবারে একা। ঐ বাড়ীর আশ্রিতদের শিশুরা চেঁচিয়ে কাঁদে না, বড়র বকেন। খায় তারা মাথা নিচু করে, খেলা তারা চেঁচিয়ে করে না, উচ্ছ্বাস তাদের নেই। উৎসব আনন্দ তাদের এমন সংযত যেন ড্রিল করতে দাঁড়িয়েছে। আভিজাত্য বোধহীন অন্য বালক-বালিকারা আশ্রিতদের সঙ্গে থেকে ঠিক ঐভাবেই সংযত-ভীত হয়ে গেছে।

সেই অদ্ভুত জগতে দু'একজন যারা ভাগ্যবান তারা মা বাপের ঘরে শোয় এবং মার হাতে খাবার পায়। অন্য সকলে মা বাপ থাকলেও বিচ্ছিন্নভাবে ঘুরে বেড়ায়, খেলা করে, পড়ে।

তারি মাঝে সহসা কেমন করে ছোট ছোট বন্ধুর দল গড়ে উঠেছে। ধনী দরিদ্রের ভেদহীন পরম মমতায় তারা পরস্পরকে আপনার করে নিয়েছে।

সুধীশ বড় কর্ত্তার ছোট ছেলে কেমন করে এই আশ্রিত অনাথ বুলু টুলু নলিন নীতিশের দলে আশ্রয় নিল। তার ঢিলা প্রকৃতির জননী তাদের লালন করেছেন শিশুকালে, কিন্তু পালন করতে পারেননি, কাজের, কর্ত্তব্যের ও সেকালের বধূ-ধর্ম্মের খ্যাতির পরম মোহে ঐ বিরাট সংসার যাত্রার ভাঁড়ার ঘরের সীমানা ছাড়িয়ে আর বেরিয়ে কোনোদিক দেখেননি। ফলে ছোট ছোট ছেলেরা বড় ভাইদের কাছে চাণক্যের 'তাড়য়েৎ দশ বর্ষাণি' নীতি সম্পূর্ণ পাঁচ বছর ভোগ করেছে অথচ পরেও 'মিত্রবৎ' আচরণ পায়নি।

অর্থাৎ ও বাড়ীতে সেকেলে শিক্ষাও ছিল, আধুনিক দূরত্ব রাখার সভ্যতাও এসেছিল।

সুধীশ সকলের কাছে তাড়া খেয়ে দিদি আর দিদির ছেলেমেয়ের দলে মিশে গেল।

হেনকালে আকস্মিক কি অসুখে নীতিশের পিতামহীর মৃত্যু হ'ল।

দিনান্তে বা সপ্তাহান্তে সকলের একটা ঘরে একবার জড় হওয়ার উপলক্ষ যে

জননী ছিলেন ; যে ঘরে সেকেলের মত রূপকথা শোনা বালকবালিকা, কিশোর বয়স্ক ছেলেমেয়েরা ও কর্ম্মনিরত বা শাশুড়ীর আদেশ উপদেশজিজ্ঞাসু বধূরা মাঝে মাঝে জড় হতেন ; সেই সন্ধ্যা মধ্যাহ্নের মিলনের, সহজ গল্প ও আলাপের 'দেশকাল ও পাত্র' যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে ভোজ-বাজির মত মিলিয়ে গেল। ছোট ছোট কেন্দ্রে তারা হয়ত বন্যার ডোবা চরের মত অন্যদিকে জেগে উঠল। কে জানে সে কথা।

আর ঠাকুমার ঘরটা যেন কার ভাগে পড়ে গেল। এবং নীতিশের মনে হ'ল ঠিক যেন এই সময়েই এইটা দরকার ছিল, এমনভাবেই সমস্ত সংসার-যাত্রাটা সেই মানুষটাকে একেবারে নির্ব্বিকার হয়ে বিস্মৃত হয়ে গেল।

আর বাড়ীর সমস্ত কিশোর ছেলেরা যারা রবীন্দ্রনাথের 'ছুটী' গল্পের ফটিকের মত সেই বয়সের কিছু ঊর্দ্ধে-বা কমে, আসলে অবস্থা একই প্রায়—শুধু পড়ার ঘরেই আশ্রয় পেল। গোঁড়া অভিজাত-বুদ্ধিহীন সেকেলে নির্ব্বোধ পিতামহীর সেকালের কথা বল', রূপকথা বল', পুরাণের গল্প বলা আসর আর বাড়ীতে কোনোখানে নেই।

নীতিশের নতুন অভিজ্ঞতা হ'ল এই মৃত্যুর পর। পিতামাতার মৃত্যুর সময় সে ছিল বালক, সেদিনের বাড়ীর কোনো কিছুই তার মনে খুব স্পষ্ট ছিল না। আজকে ঘাত-প্রতিঘাত আশা-নিরাশায় জগত তার কাছে আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে চারদিকে। যেন প্রতি মুহূর্ত্তে বাড়ীর আবহাওয়া নিঃশব্দ ইঙ্গিতে জানিয়ে দেয়—কোথায় কার সীমানা, কোথায় মাত্রা লঙ্ঘন হ'ল কার।

আশ্রিত দলের অধিকারহীন সকলের অন্তর যেন চকিত হয়ে থাকে ত্রস্তভাবে, কোনদিন 'মুক্তি' মেলে—'অপমানের ঢাকে ঢোলে বাজি'।

হেনকালে প্রতুলের চিঠি এলো কিষণগড় থেকে। সে সেখানকার একটা কাপড়ের মিলে উইভিং মাস্টার হয়ে গেছে। লিখেছে, 'এখানে যে রকম গরম তাকে অসহ্য গরম বলা যায়। ভোর পাঁচটায় সূর্য্যোদয় আর রাত্রি আটটায়ও সন্ধ্যার আলো থাকে। একবার এই পনের ঘন্টা দিনের ও প্রচুর ধূলো ও মাছির দেশ দেখে যা। বাংলা দেশের ছেলে হলেও মন্দ লাগবে না। তুই এলে তখন না হয় আরো একটু দীর্ঘ দিনের দেশে গিয়ে জালিয়ানওয়ালাবাগটা দেখে আসব।'

পনের ঘন্টা দিনের দেশে সূর্য্য তখনো অস্ত যায়নি। নীতিশ পৌঁছল পাথরের তৈরী ছোট স্টেশনে।

পানের পিক ফেলার দাগ, ধুলোয় ধূসরিত লম্বা প্ল্যাটফরমে প্রতুল দাঁড়িয়ে আছে দশ বছরের ছোট বোনের হাত ধরে।

উদ্ভাসিত আনন্দে থার্ডক্লাসের যাত্রী, অপরিচ্ছন্নবেশী নীতিশের ধুলায় ধূসর মুখ ভরে গেল। ট্রেন ভ্রমণের তৃতীয় দিন যেন আর কাটছিল না। সাদা তুলোর গুঁড়ো ভরা সুতার কুটো লাগা মিল থেকে সদ্য প্রত্যাগত প্রতুলেরও মুখ হাসিতে হাসিতে বিভাসিত হয়ে উঠল।

দূরে দূরে নীলরংয়ের পাহাড় শ্রেণী—অদ্ভুত রকমের অসমতল পথ দিয়ে টাঙ্গা চলেছে, আগের পথিক গাড়ীখানা যেন গড়ানে পথে দূরে একেবারে মিলিয়ে যাচ্ছে, আবার উঁচু পথে উঠছে দেখা যাচ্ছে।

সহরের তিনদিকে পাহাড়ের সারি। পাহাড়ের কোলে ছোট ছোট গ্রাম, দূরে দূরে ভুট্টা বাজরা যবের ক্ষেত ; প্রকাণ্ড কূয়ো—বলদে জল টানা।

আর মিলের সামনেই প্রতুলের বাড়ী। ছোট ছোট ভাই বোন দুটি আর মা।

শুকনো দেশ, রৌদ্র ঝলমল ভোর থেকে—আলো ভরা দেশ। সত্যই প্রচুর মাছি ও ধূলা।

প্রতুলের মা বোন ভাইরা কোনোকালেই বড়লোক নয়, নিতান্ত গৃহস্থ পরিবার। বিলাসের প্রয়োজনবোধহীন মন তাঁদের। বহু জিনিস যা দরকার লাগে নীতিশদের বাড়ীতে মনে করা হয়, তা তাঁদের নেই। জানেনও না হয়ত। দেখেনই নি, অথবা দেখেছেন হয়ত কিন্তু প্রয়োজন বোধ জাগেনি।

ছোট ছোট খান তিনেক ঘর। রান্না ঘর, নীচু আঙিনা বাটীর—সামনে ছোট হাত। সারাদিন মা কাজ করেন, বোন জননীর সঙ্গে হয়ত কিছু করে—আসন দেওয়া, জল দেওয়া, আলু ছাড়ানো, রুটি বেলা হয়ত।

আর সারাদিন নীতিশের সঙ্গে গল্পের তাদের শেষ নেই।

মিলের মাঝের প্রকাণ্ড পুকুর, মিলের কর্তা সাহেবের প্রকাণ্ড কুকুর, আর দূরের নীল পাহাড়—তার পাথরগুলোর রংয়ের কথা, এই তাদের গল্পের বিষয়। পুকুরের মাঝে সব সময় জলের বুদ্বুদ ওঠে, এটা একটা মস্ত সমস্যা ওদের। ওতে কি মাছ আছে? তাই? অথবা কিষণলাল বলেছিল একটা দৈত্য আছে আর দাদা বলে মিলের জল এসে পড়ে—কোন্‌টা সত্য?

আর মাছ যদি থাকে তো কি হয়? দৈত্য কি খেয়ে ফেলেছে? এখানকার লোকেরা তো মাছ খায় না কিষণলাল বলে।

দাদার কথাটা ওদের বিশ্বাস হয়, কিন্তু কিষণলালের কথাটাও অবিশ্বাস করা যায় না, সে যে বলেছ দৈত্যকে সে দেখেছে।

এবং 'নীল পাহাড়ের এক টুকরা পাথর যদি নীতিশ দাদা এনে দেন। কি চমৎকার নীল রং!'

মিনু আর বিনুর গবেষণার শেষ নেই। মিনতি হল প্রতুলের বোনের নাম, আর বিনয় ছোট ভাইয়ের নাম।

আর মিলের মাঝখানে যেখানে চাকা ঘোরে, প্রকাণ্ড একতলা সমান উঁচু চাকা তার কাছে একটা জায়গায় একটা লোহার ডাণ্ডা একবার এদিক আর একবার ওদিকে যায়, তার পাশ দিয়ে দাদা যে কি করে যায়। বিনয়ের তো মনে হয় ওকে এক ধাক্কায় ছিটকে ফেলে দেবে বড় চাকার গর্তয়। ওরা কত বার মাকে বলেছে, যদি দাদাকে ধাক্কা দিয়ে দেয় লোহার ডাণ্ডাটা। দাদা হাসে। দাদা যায়, কিষণলাল ফিরোজখাঁ যায়, সকলেই যায় সেইখান দিয়ে।

মিনু বলে, 'আর জানো নিতুদা, বড সাহেবের কুকুরটাকে আমর কি রকম করে পোষ মানিয়েছি?'—

নীতিশ হাসে, বলে, 'কি করে? লজঞ্জুস দিয়ে?'

মিনুও হাসে, বলে, 'না, আমরা ভোরবেলা তো দাদার সঙ্গে ঐ গেট অবধি যাই,—ও আসত তেড়ে আমরা তারপব রোজ ওর জন্যে রুটী নিয়ে যেতাম। মা জানেন না, পাঁউরুটী পকেটে করে নিয়ে যাই। বিনুও নেয় আমিও নিই। আর তারপর আমরা মিলের মধ্যে যাই, ও আর কিছু বলে না।'

প্রতুল সকালে যায়, বারোটায় আসে—খেয়ে আবার যায়, পাঁচটায় ফেরে তুলোয় এবং ধূলোয আপাদমস্তক ভরে।

তারপর দুই বন্ধুতে সাহেবের কুকুর, পুকুরের বুদ্বুদ আর নীল পাহাডের নীল পাথরের গবেষণা হয়। দৈত্যকে ওরা কাছে গিয়ে দেখতে চায় না, তবে এই বাড়ীর জানলা থেকে না আর দাদার সঙ্গে দাঁড়িয়ে দেখতে আপত্তি নেই। যায় দেখা? দাদা দেখেছে কি?

ঐ নীল পাহাড়ের নীল পাথরের টুকরার লোভ আর মিনুর মন থেকে যায় না।

দাদা বলেছে 'ওরে দূর থেকে ও রকম নীল, কাছে গেলে দেখবি সব ধূলোর

মত রং, নয়ত এমনি সব পাথরের মত রং।' দাদা কত পাথর দেখায়। কিন্তু মিনুর সংশয় যায় না! তাহলে কাছে গিয়ে দেখবে।

'দাদার না হয় সময় নেই, নিতুদা একদিন চলুক না, সেতো হতে পারে', বিনু বলে। তাতে মা বলেন, 'ও যে অনেক দূর, ওকি এখানে যে হেঁটে যাওয়া যাবে?'

মা তো যাননি একদিনও কিন্তু কি রকম বলে দেন। দাদাও হাসে, বলে, 'অনেক দূর সত্যিই।'

ওরা শুধু ক্ষেতের ধারে, কূয়োর ধারে, মিলের আশেপাশে ঘুরে আসে।

কলকাতার গণ্ডিঘের বাড়ী আর নানা দলাদলি, পরোক্ষে অপরোক্ষে অহরহ আলোচনা, মন্তব্য, একেবারে শেষ করা নিষ্পত্তি করা মতামত, ভালো মন্দ বিচার লোকের বিরুদ্ধে, সপক্ষে; সমস্তক্ষণ সতর্ক আলাপ—এক কথায় নানা স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের মাঝেও আড়ষ্ট জীবনযাত্রা—এদের ঘরে নেই। নীতিশ ভাবে।

এদের কাছে বসা, গল্প করা যে রকম সহজ, দিদির কাছেই শুধু ও-বাড়ীতে তারা সহজ হতে পেরেছে সে ভাবে।

তবু দিদি আর টুসু বুলু নলিন সেখানে কত শঙ্কিত, সতর্ক। প্রতুলের মা ভাইবোনরা তো তা নন।

প্রতুলকে বলে প্রতুল হাসে, বলে, তাহলেও তোমরা আর ক'জন। আমরাই তো বেশী। স্টেশনের মিলের কোয়াটারে দেখে এসো, সহরের ছোট ছোট বাড়ীতে দেখে এসে। আমরা কতজন। কলকাতায় দেখতে পাওনি, কেনন চিরদিন এক জায়গায় থেকে গিয়েছিলে। আরো আমাদের দেখলে দেখবে, আমরাই সর্বত্র এইভাবে আছি, আদি ও অকৃত্রিম জীবনযাত্রা করছি।

আর আমরাও সব নয়,—আমাদের পরের স্তরও আছে, যারা পথেঘাটে ক্ষেতে খামারে মাটীর ঘরে একখানি মাত্র ঘরে, দুখানি বা একখানি কাপড়ে রয়েছে। এরা তবু গেরস্থ। আরো পরের স্তরও আছে। কিছুদিন আগে আমি মিল থেকে ফিরছি। এখানে এবারে মোটে যব হয়নি, অন্যবার দু টাকা মণ হয় এবার টাকায় আট সের। এদেশের লোক যব আর বাজরাই বেশী খায়, যবটা বারো মাস চলে, বাজরা আর ভুট্টা শীতের সময় ছাড়া খেতে পারে না, সহ্য হয়না। আমি মিল থেকে ফিরে দেখি বাড়ীর সামনে গান গেয়ে জন কতক মেয়ে ছেলে কোলে ভিক্ষে করছে। মাতো তাদের আটা আর রুটী বা সামান্য সম্বল দিলেন। শেষরাত্রে ছোট ছেলের কান্না শুনে চাকরটা উঠল দেখা

গেল একটি বছর দেড়েকের ছেলেকে আমাদের সিঁড়ির উপরে বসিয়ে রেখে কারা চলে গেছে। খোঁজাখুঁজি করা গেল সকালে, বাচ্ছাটাকে তো খাবার-টাবার দিয়ে বসিয়ে রাখা গেল কিন্তু মা বা বাপের কোনো পাত্তা পাওয়া গেল না। কেউ বল্লে, কাল যারা এসেছিল তাদের ছেলে, কেউ বল্লে, না অন্য কারুক।

শেষ অবধি একটা অনাথাশ্রমে দিয়ে এলাম। তাও জানো, মিশনারীদের অনাথাশ্রমেই দিতে হল। দেশী তো নেই, থাকলেও নিত কি না সন্দেহ হয়—কেননা মিলেব কেউ ছুঁলই না—বলে, কি জাত না জানলে ছোঁব না।

এও একটা স্তর যেখানে আমর নাবি না, ওরা উঠতে পারে না। তবে তোরা হয়ত আমাদের দশায় নাববি কেউ কেউ, কিন্তু এদের তুলনা হয়না। আমি তো মিলে কাজ করি, কত রকমের যে দুঃখ দেখি—অন্ন বস্ত্র মান অপমান মার ধোর তাড়ানো কি যে দেখিনি তা জানিনা।

আর জানিস আমরাও কম অত্যাচার করিন, না জেনেই মুখে বড় বড় কত কথা বলিছি, মনে আছে? কাজের সময় চূড়ান্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করি, ঠিক জীব জন্তুকে যা করা হয়। দুঃখ এই, ওরা বুঝতেও পারে না এতই অপমান হতে অভ্যস্ত।

নীতিশ চুপ করে শোনে, মনে লাগে, 'এতই অপমান হতে অভ্যস্ত।' ওরাও তো। নয় কি?'

৬

মণীশ পাশ করে ফিরছে 'তার' এলো।

বাড়ীতে উৎসবের সূচনা সুরু হল। সঙ্গে সঙ্গে তার বসবার ঘর যাকে বিলিতী কথায় 'চেম্বার' বলে—বলছেন সবাই, সাজানো হতে লাগল। ছেলেদের পড়বার ঘর যেটা ছিল সেইটাই মণীশের বসবার ঘর হবে। বিয়ের ঠিক তো ছিলই, এবার বিয়ে হবে, সুমিত্রার বাপও আসা-যাওয়া করতে লাগলেন।

অন্তঃপুরেও ঘরের হিসাব হতে লাগল।

মা মারা গেছেন। ঘর খালি। কিন্তু সেই ঘরে আগে থেকেই রমা রয়েছে—অবশ্য অস্থায়ীভাবে।

হরিশ বল্লেন দাদাকে, 'তুমি মার ঘরে চলে যাও, আর তোমার ঘরটা মণিকে

দাও। আজ বাদে কাল প্রবীর আসবে, তার জন্যে থাকার একটা ঘর দরকার—কি যে করি।'

দাদা চিন্তিত ভাবে বল্লে, 'রমাকে কোথায় দিই?'

হরিশ বল্লেন, 'ওকে নিতের ঘরে দাও, নিতেতো এখন নেই। আর নিতে ওদের ভালবাসে। ত ছাড়া নলের চাকরী হলে তো সে মাকে নিয়ে যাচ্ছে এবার।'

গিরীশ বল্লেন, 'তা নিয়ে যাবে কিন্তু মেয়েটার বিয়ে তো আমায় দিতে হবে। আবার টুলিও রয়েছে রমার গলায়।'

হরিশ বল্লেন, 'বুলুর তো তুমি সম্বন্ধ দেখছ—হয়ত সেখানে হয়ে যাবে। টুলির ভাবনা ওদের জ্ঞাত-গুষ্টিরা ভাবুক, রমা তাদের কাছে নিয়ে যাক্।'

রমার বড় ভাই এসে বসেছিলেন, বল্লেন, 'আচ্ছা, আমি ভাবছিলাম নিতের সঙ্গে টুলির বিয়ে দিয়ে দিলে কেমন হয়?'

হরিশের মুখে একটা সূক্ষ্ম হাসির রেখা ফুটে উঠল, তিনি ভাইয়ের দিকে চেয়ে রইলেন জিজ্ঞাসু চোখে।

গিরীশ বাবু চিন্তিত ভাবে বল্লেন, 'তা মন্দ হয় না কিন্তু নিতু কি রাজী হবে?'

হরিশ বল্লেন, 'কেন হবে না? আর কি ভালো মেয়ে ও পাবে? ওর আছে কি? চাল না চুলো, ওকে মেয়ে যে দেবে ওই রকমই দেবে। তুমি ঠিক করে ফেল মনে মনে। বুলু আর মণির বিয়ে হলেই, ওরও টুলির সঙ্গে দিয়ে দাও। রমা দেশে যায় যাক্, ছেলের কাছেও যেতে পারে।'

নীতিশের আদর প্রশ্রয় আশ্রয়দাত্রী পিতামহী নেই। দীর্ঘকালের সঞ্চিত বিরাগ তাকে নিয়ে সন্তানদের প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে তার পিতৃব্যদের ও ভাইদের কম ছিল না।

নীতিশের এই পারিবারিক, সামাজিক এবং ভবিষ্যতের উন্নতির ক্ষেত্রে পরাজয়ের সম্ভাবনায় হরিশের আর সতীশের মন যেন প্রসন্ন হয়ে উঠল। যাকে বহুদিন ধরে ছোট করতে চেয়েও করা যায় নি, যে পড়া লেখায় নিজের সন্তানদের চেয়ে ভালো, যার বাপও ওদের পিতৃ-মাতৃ স্নেহের সরিক, প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, তাঁকে ভালো লাগেনি কোন দিন ভাইয়ের। তাঁর অকালমৃত্যুও তাদের মনে বিশেষ আঘাত করেনি বরং বৈষয়িক লাভের সম্ভাবনা এনে দিয়েছিল। এখন নীতিশ পিতামহের ভুল বা যে কারণেই হোক সেই সমস্ত জটীল অসুবিধা থেকে ওদের মুক্ত করে দিয়েছে। আরো এখন তার টুলুর সঙ্গে বিবাহ দিলে গিরীশেরও

দায়িত্বভার হাল্কা হয়। আর যদি সে অসম্মত হয়, তাকে এই সুযোগেই অনায়াসে অকৃতজ্ঞ বলা যাবে,—হয়ত তাকে অপ্রতিভ হয়ে অন্যত্র চলে যেতে হবে।

হরিশ ভাবলেন, তা হলে তখন নীতিশের ঘরের ভাগের অংশটা সকলে ভাগ ক'রে নিলে আর ওদের সন্তানদের কোনো অসুবিধা থাকবে না। কেননা ইলার বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে, খুব বড় ঘরের ছেলে। জামাইয়ের জন্য ভাল করে আনা নেওয়ার ব্যবস্থা করা চাই।

পরামর্শ সভা ভঙ্গ হল।

নিজেদের দরকার ও সুবিধা জিনিষটার কাছে সমস্ত বড় বড় কথা হার মানে। ভাইয়েরা খুশি মনে কৃতী পুত্রদের আগমনীর আয়োজনে ব্যস্ত হলেন।

নীতিশ বাড়ী নেই, কোন অসুবিধাই তাতে নেই। যজ্ঞে বলির জন্য পশুর মত নেওয়ার তো প্রয়োজন কখনো দেখা যায় না। বড় বাড়ীর আশ্রিতজন তার চেয়ে উঁচু স্তরের জীব নয়। আইনতঃ যদি দাবী থাকে তাহলেও দরিদ্র দীনের কোনো ব্যবস্থাই সহজ হয় না, যে ক্ষেত্রে কোনো দাবী অধিকারই নেই সেখানে শুধু নীতির বা কর্তব্যের মিথ্যা বিবেকের অথবা তুচ্ছ মায়ার দোহাইয়ের কথা মানুষের ভুলে যাওয়াই ভাল মনে হয়। বেশ আশ্বস্তভাবে মানুষ নিজেকে বলে, এর ওপর কারুর কোনো হাত নেই, ওর তো অধিকারই নেই যখন। ভগবান, ভগবানই তো এই সব থেকে ওদের বঞ্চিত করেছেন। নয় কি? নইলে নীতিশের বাপ বেঁচে থাকত। রমার বৈধব্য হত না। টুলি এসে ওদের বাড়ীতে থাকত না। পৃথিবীর ইতিহাস দেখ, তাই কি নয়?

জন্মান্তরের কত পাপ থাকে তবে তো মানুষ বঞ্চিত হয়। কথায় বলে না,—'দেবতা দিলে ফুরোয় না, মানুষের দেওয়ায় কুলোয় না।' যদিও এসব মেয়েলী কথা, তবু এ সমস্ত কথার দাম আছে, দরকারের সময় ভেবে নেবার জন্য, হয়ত বলবার জন্যও। গুরুজনবর্গ অভিভাবক মণ্ডলীর মনে আর দ্বিধা থাকে না। কিন্তু রমার আনন্দের সীমা রইল না এই প্রস্তাবে। টুলির এত ভাগ্য হবে। হতে পারে? কি অভাবনীয় অচিন্ত্যনীয় সৌভাগ্য টুলির। অবশ্য নীতিশের দিক থেকে তার মন একটু দুঃখিত হচ্ছিল কিন্তু নীতিশ যে তার আরো আপনার হয়ে যাবে এওতো কম কথা নয়।

ইলা বেলা বুলুর অদ্ভুত ঈর্ষায় মন ভরে গেল। বাড়ীতে নিতুদা বা নিতুমামা অদ্ভুত প্রিয় ছিল। তার গান, তার বাঁশী, তার সুন্দর ব্যবহার, প্রিয়দর্শন, সুদর্শন সে, তাকে মোহময় মনোহারী করে তুলেছিল সকল ছেলেমেয়েদের কাছে।

ইলার বিয়ের ঠিক হয়েছিল খুব বড় ঘরে রূপবান পাত্র দেখে। বেলার বিয়ে হয়নি। কিন্তু ভালই বিয়ে হবে ওরা জানে যেহেতু তারা ধনীর দুহিতা। বুলুর বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে, ভাল হোক আর মাঝারী হোক বিয়ে হবেই। শুধু টুলির কেউ নেই তার বিয়েই হবে না অথবা হবে খুব অবাঞ্ছনীয় পাত্রে! এইটেই যেন জানা ছিল ঠিক ভাবেই। ওদের যেন বিরাগের সীমা রইল না টুলুর ওপর। কারণহীন তিক্ত ঈর্ষায় তারা আশ্চর্য্যভাবে ডুবে গেল।

ওদের কারুর সঙ্গে যে নীতিশের বিয়ে হয় না তাও ওরা জানে. তবু ওদের ভাল লাগল না। টুলি ওদেরই বাড়ীতে বধূরূপে আসবে! আর নিতুদার বৌ হয়ে! এমন ভাল নিতুদার ঐ কালো মেয়েটা বৌ হবে। তার চেয়ে সেই প্রবোধ বাবুর মেয়ে বীণা তার সঙ্গে হোক না। তবু তো বড়লোকের মেয়ে, লেখাপড়াও জানে।

ঈর্ষাতুর ইলা প্রকাশ্যেই বীণার কথা বলে ফেল্‌লে। টুলির এ বাড়ীর বৌ হবার কি যোগ্যতা আছে!

যোগ্যতার কথায় বুলুর পিতৃগর্ব, বংশ গর্ব জেগে উঠল। সে ঝাঁঝের সঙ্গে বল্লে, 'কেন আমাদের বাবা ঠাকুদা তো বড় বংশেরই ছেলে ছিলেন। তারা থাকলে টুলির বিয়ে কি ভালই হ'ত না?'

ইলা বেলার মুখে ব্যঙ্গের হাসির একটা রেখা ফুটে উঠল। অপমানিত বুলুর মনের ঈর্ষার ভাবটা যেন মিলিয়ে গেল অনেকটা। তার মন টুলুর দিকেই আস্তে আস্তে ঝুঁকে পড়ল।

ইলা বল্লে, 'আশ্চর্য্য ভাই কিন্তু ওর ভাগ্যটা। কি আছে ওর? না রূপ, না কোনো পরিচয়। নিতুদা বেচারীর জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে।'

সুধীশ এসে দাঁড়িয়েছিল। নিতুদার জীবনের সমস্ত পথ বাধাগ্রস্ত হয়ে উঠুক বড়দের এই মনোভাব সে দেখেছিল, সেটা তার ভালো লাগেনি। কিন্তু অকস্মাৎ টুলুকে নিয়ে ইলার কথায় সে বিরক্তভাবে বলে উঠল, 'তোমাদেরই সব প্রাপ্য হবে পৃথিবীতে, চিরকাল পেয়ে এসেছ বলে, তোমার এই মত, না? কেন টুলুদি কিসে নিতুদার অযোগ্য? শুধু রং নেই? না বাপের টাকা নেই?'

ইলা ওসব কথা এড়িয়ে গেল, কিছু বল্লে না। শুধু একটু অহঙ্কৃত হাসির আভাস তার ঠোঁটের পাশে ফুটে উঠল নিমেষের জন্য। সুধীশরা দেখতে পেল কিনা কে জানে!

৭

টুলু একেবারে আশ্চর্য্য হয়ে গেল।

যে কথা সঙ্গোপন-মনেও কখনও সে ভাবতে সাহস করেনি, কল্পনাতেও আসেনি কারুর, সে কথা আজ যেন বাঁশীর সুরের মত, গানের মত, অপরূপ আনন্দের মত তাকে—তার সমস্ত তনু-মনকে আচ্ছন্ন করে দিলে।

তাদের ছোট্ট গণ্ডিঘেরা জগতের সুন্দর বন্ধু, তাদের সেই পৃথিবীর সুখদুঃখের সাথী, ছোটবেলার খেলার সঙ্গী, বড় বয়সের উপেক্ষা অপমানের লাঞ্ছনার নিঃস্তব্ধ সহচর ;—টুলুর থেকে অনেক সুদূর, টুলুর কেউ নয়, কোনো সম্পর্কের মধুরতা নেই, তবু পরম প্রিয়জনের মত নীতিশ—সে তার সবচেয়ে আপন হবে !

টুলু বুঝতে পারল না যে সে জেগে আছে না স্বপ্ন দেখছে। সত্য, না মিথ্যা, না ভ্রম।

নিজের যোগ্যতার কথা, নিজের কোনো কথাই তার মনে ওঠে না। সে যেন কোন্ স্বপ্নের সমুদ্রে ডুবে গেল। সে ভাবতেও পারল না, নীতিশ কি ভাবে একথা নেবে। হয়ত এ প্রস্তাব মুখের একটা কথা মাত্র এ বাড়ীর।

কিন্তু সহসা টুলুর তরুণ তনু যেন অপরূপ হয়ে বিকশিত হয়ে উঠল। তার কানে ইলার রূঢ় মন্তব্য পৌঁছয়। বড় বৌদির বিদ্রূপব্যঞ্জক হাসি চোখে পড়ে। ননদের উপর তার বিরাগের অবধি ছিল না।

সহসা টুলুর মনে পড়ে যায় নতুন সম্পর্কের আভাসের কথা। বৌদিরও মনে পড়ে। কিন্তু টুলুর জয় হলেও নীতিশের তো প্রচণ্ড পরাভব হবে। পিতামহীর প্রিয় নীতিশ, ছোটদের 'হিরো' নীতিশ, আশ্রিত বুলু টুলু নলিনের বন্ধু নীতিশ—অনেকেরই প্রিয় ছিল না।

এক কথায় বধূ শাশুড়ীকে অতিক্রম করে গিয়েছিলেন এসেই। শাশুড়ী যখন বধূ, তখন থেকেই তিনি বিভাগীয় কর্ত্রীত্বের দণ্ডভার গ্রহণ করেছিলেন জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূত্বের মহিমায়। কর্ম্মভার নয়। ফলে অনাথ আশ্রিত মেয়েদের জন্য লাঞ্ছন অবমাননার যে উত্তরাধিকার পাওনা, যাকে এরাও নিত্য ও নৈমিত্তিক ভাবেই লাভ করতে অভ্যস্ত ছিল।

কিন্তু কথা তার কানে পৌঁছলেও আজ আর মনে পৌঁছল না বা মনে দাগ কাটল না। সে যেন কোন্ স্বপ্নের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে রইল।

অস্পষ্ট আশার অজানা সুখের মোহ তাকে নিবিড় ভাবে ঘিরে রাখল। তার

সে জগতে ছোটবেলার সাথীরা নেই, বুলু নলিন কেউ নেই, মাও নেই! রমাকে সে 'মা' বলত। একান্ত নিজস্ব তার মোহলোক সেটা। অস্পষ্ট নীতিশকে ঘিরে ঘিরে সেখানে মায়ালোক রচিত হচ্ছে একাকিনী মুগ্ধার!

মনীশ এসেছে। মনীশের বিবাহ উৎসব এগিয়ে এলো। বুলুরও। একসঙ্গে উৎসবের অনেক সুবিধা! যেন বড় কারখানার 'উপসম্পদ'। আপনি আপনি লাভের সুবিধার সুযোগ পাওয়া যায়। বড় উৎসবের জন ধন কর্ম থেকে উপচে পড়া উদ্বৃত্ত খুদকুঁড়োতে বুলুর বিয়ে হয়ে যাবে। হয়ত নীতিশ ও টুসুরও। কর্তব্যের দায় মোচন হয়ে যাবে।

নীতিশ এসে পৌঁছল।

বিলেত-ফেরত মনীশের চার পাশ ঘিরে উৎসবের আমেজ তখনো রয়েছে। পরিচিত অপরিচিত প্রশংসায় বিস্মিত দৃষ্টিভরা চোখ তখনো তাকে দেখে যায়। তার উপর বিবাহের সমারোহ এসে পড়ল। তারি মাঝে মাঝে বিলিতী নেশায় মুগ্ধ মনীশের অভিমতের টুকরো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। কি করা উচিত আর কি নয়। সেখানে কত কি ভালো এখানে কত কি তেমন নয়। আবার এখানের কত কিছু যে কেমন 'পূর্ব্ব দেশীয়' রুচিময় রূপময়। ইত্যাদি নানা ধরণের নানা-মুখী অনুকূল প্রতিকূল মত ছিটকে ছিটকে পড়ছে। গুরুজনেরা আত্মীয়জনেরা মুগ্ধ হয়ে শুনছেন সবাই। আজকের সত্য কালকের সত্যের সঙ্গে মেলেনা। কথার, মতের যেন লীলা চলছে মনীশের। আর অভিভূত ভক্তজনের মত স্বজনের প্রীতি স্নেহ গর্বসিক্ত চোখে তাঁদের ক্রোড়দেবতা'র কথা শোনেন। গর্বিত মনীশ শিক্ষিত 'প্রাচ্য' ভাবে ও উদারভাবে ব্রাহ্মণ পুরোহিত নির্দিষ্ট মত নিয়ম পালন করে—অবশ্য কিছু অনুকল্প ও বিকল্পে বিবাহ করে এলো। উলুধ্বনি শঙ্খধ্বনি, পূর্ণঘট, আমের পল্লবের মালা-বাঁধা দুয়ারের সমুখে ভিড়ের মাঝে উপবাসবিশুষ্ক অধর, চন্দন চর্চিত গণ্ড, রক্তাম্বরা, ওদের তরুণদলের এক সময়ের মানসী সুমিত্রাকে নিয়ে মনীশের গাড়ী এসে দাঁড়াল।

সিঁড়ির পাশে দাঁড়ানো অসংখ্য সুবেশ অবেশ শিশু ও বালক-বালিকার মধ্যে সহসা চোখে পড়ল নীতিশকে।

মনীশ আনন্দিত ভাবে জিজ্ঞাসা করল, 'কবে এলি?'

সুমিত্রাও চোখ তুলল। অকস্মাৎ যেন শুভদৃষ্টি হয়ে গেল। সে শুভদৃষ্টি যে কাল মনীশের সঙ্গে হয়নি!

নীতিশ বল্লে, 'কাল।'

সুমিত্রা আর চোখ তুলল না। খ্যাতিহীন, ধনহীন, হয়ত মনীশের চেয়ে স্বাস্থ্য রূপহীনও বলা যায়, তবু সুমিত্রার তার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের কথা, প্রথম আশ্চর্য্য হয়ে আলাপের দৃষ্টি, প্রথম বাঁশী শোনার দিনের কথা, গান শোনার দিনের কথা মনে হয়ে গেল। না, ভোলেনি ওরা! নীতিশকে কেউ ভোলেনি। ওরা তার নাম করেনি। সে বাড়ীতে নীতিশের নাম ওঠেনি আর। সে বাড়ীর কোনো কন্যা বরমাল্য হাতে নিয়ে এই নির্ধন নীতিশের জন্য বসে নেই। কিন্তু স্বয়ংবরার বরমাল্য তারা হাতে নিয়েছিল একদিন, তারই জন্যে যেন। কেউ জানে না। নিজেরাও না। এমন কি সুমিত্রা নিজেকেও বলেনি।

পাশে গাঁটছড়ায় বাঁধা মালা-চন্দনেভূষিত খ্যাতিগর্বিত মনীশকে যেন হঠাৎ সাধারণ বলে মনে হ'ল।

আর তার জন্য বহু যত্নে আহরণ করা, নির্বাচন করা এই সমস্ত সুখ ঐশ্বর্য্যকে তার সহসা অত্যন্ত স্থূল ও গ্রাম্য মনে হল। তার গলা যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল।

দুধে আলতার পাথরে দাঁড়িয়ে লেঠা মাছ মুঠোয় ধরে, মনীশের হাতে করা ধানে ভরা 'রেক' মাথায় নিয়ে বধূবরণ হয়ে গেল।

সুমিত্রার চোখ থেকে দু' ফোঁটা জল পড়ল। উৎকণ্ঠিত হয়ে বরণকারিণীরা জিজ্ঞাসা করলেন, 'মাছ কি হেনে দিল হাতে? চল, চল, দুধ ওথলানো দেখিয়ে বৌ ওপরে নিয়ে তোলো। মু· যে শুকিয়ে গেছে। এখনো কুশণ্ডিকা বাকি।'

তারপর দিন বুলুর বিয়ে। বাড়ীতে ভোজ্য উদ্বৃত্তের সম্ভার সম্পদ প্রচুর। নির্বিবাদে কম খরচে বুলুর বিয়ে হয়ে গেল। পাত্র বিধবা মার সন্তান, চাকরী করেন, ভাই বোন আছে, বি-এ, পাশ করেছিলেন—আরো নাকি পড়েন কি সব। বিবাহের চমক্ নেই, ঝলক্ নেই, শুধু কন্যাদায় মুক্তি আছে।

টুলুর পালা এবার। কিন্তু সহসা বিমূঢ় হয়ে গেল যেন সে সুমিত্রার মুখের পানে চেয়ে। এত রূপ? এত সুন্দর? এরই সঙ্গে কি—?—এর সঙ্গেই না এর বোনের সঙ্গে নীতিশের বিয়ের কথা হয়েছিল?

এ যেন রাজকন্যা। রংয়ের আলোয়, চোখের কালোয়, অলঙ্কারের ঝঙ্কারে, বসনের শোভায় যেন রূপকথার রাজকন্যা।

সুমিত্রাও অবাক হয়ে শুনল কয়েকদিনের মাঝেই টুলুর সঙ্গে নীতিশের বিয়ে।

শুধু নীতিশই জানল না।

গোলমাল কমে এল। বুলু অষ্টমঙ্গলায় পর ফিরল। সুমিত্রার 'ধূলা পায়ে ঘর বসতি' করা হল।

মেজ জ্যাঠা ডেকে পাঠালেন নীতিশকে। বাইরের ঘরে মনীশের 'চেম্বারে' ইন্দ্রের সভার মত কর্তারা পরম খুসী মনে সদাশয়ভাবে বসে আছেন।

হরিশ নীতিশকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন দেশ বেড়ালো সে? চাকরী-বাকরীর সুবিধা আছে কি এবং স্বাস্থ্য কেমন? আরও কত কি!

গিরীশ জিজ্ঞাসা করলেন, 'সে কি করবে, আর কবে করবে?'

মনীশ বল্‌লে, 'তুই না রিসার্চ্চ করছিলি?'

সতীশ বল্‌লেন, 'ওটা তো বাজে কাজে নিযুক্ত থাকার মত হচ্ছে। কিছু করুক অন্য রকম।'

নীতিশ জবাব দিল সব।

দেশটা গরম, কিন্তু ভালো চাকরীর কিছু আশা আছে কি-না জানেনা—কেননা সে খোঁজ করেনি। রিসার্চ্চই করছে, এদিকেই চাকরী পেতে পারে এব প্রফেসার বলেছেন।

এবারে আসল কথায় আগের গৌরচন্দ্রিকা শেষ হয়ে গেল।

গিরীশ বল্লেন, 'আমরা ভাবছি এবার তোমার বিয়ে দোব।'

নীতিশ জিজ্ঞাসুভাবে চাইল, কিছু বল্লে না।

গিরীশ বল্লেন, 'টুলুর সঙ্গে তোমার আমরা বিয়ের ঠিক করছি।'

নীতিশ অবাক হয়ে চেয়ে বল্‌লে, 'টুলুর সঙ্গে?'

তারপরেই মাথা নিচু করে নিলে। অপ্রস্তুতভাবে বল্‌লে, 'আমি বিয়ে করব না।'

গুরুজনেরা তার চেয়েও অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের গলার কাছে বহু রকমের বিরক্ত কথা ভিড় করে আটকে গিয়েছিল। স্পর্দ্ধা। সাহস। আশ্চর্য্য!……

মেজ জ্যাঠা হরিশের মুখের কাছে আসে গুরুজনোচিত দণ্ড প্রয়োগের বাণী।

দাদা সতীশের মুখে আসে, এক পয়সার ক্ষমতা নেই, মতামতের আস্পর্দ্ধা।

গিরীশের মনে কি এলো, মুখে কি বলতে চাইলেন বোঝা গেল না। তিক্ত কঠিন শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বিয়ে কেন করবে না জানতে পারি কি?'

নীতিশ খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। বিয়ে করতে ইচ্ছে নেই, এইটেই সত্য। কাকে করবে বা না করার কারণ কি, এ সব তো ভাবেনি। হঠাৎ মনে হল, তাই তো, চাকরী নেই, রোজগার নেই এই 'অর্দ্ধ সত্য'ও বলা যায়।

বলে ফেল্‌লে সেকথা, 'নিজের পায়ে দাঁড়াই।'

ব্যঙ্গভরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বল্লেন, 'ও তুমি ভাবছিলে তোমাকেই খাওয়াতে হবে তোমার স্ত্রীকে এখুনি!'

ভাইয়ের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে তারপর স্থিরদৃষ্টিতে জ্যেঠার পানে চেয়ে বললে, 'আমি এখন বিয়ে করব না, জ্যেঠামশাই,'—তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তার ঠিক যেন মনে হল চিরকালের মত সেই ঘর, সেই বাড়ী, সেই স্বজন-পরিজন সকলের কাছ থেকে সে চলে এলো এবং শেষ হয়ে গেল তার সব কথা বলা। আর কেউ তাকে ডাকবেন না। চিরকালের মসৃণ পথে একটা প্রকাণ্ড অবাধ্য 'না' একটা অনতিক্রম্য বা দুরতিক্রম্য বাধা সৃষ্টি করে দিল।

টুলুর কানে গেল এ কথা। লজ্জায়, ধিক্কারে,—মনে মনে যদি মৃত্যু হ'ত মানুষের, টুলুর তা হ'ল যে মনের দিকে একেবারে অসাড় নিঃস্ব হয়ে গেল অর্থাৎ সে যেন সবশুদ্ধ নিজে কোথায় হারিয়ে গেল।

বুলুর সমবেদনা জাগে, তার নতুন বিবাহ হয়েছে।

প্রেমের কথা থাক্, প্রতিষ্ঠা সে পেয়েছে। মেয়েদের বিয়ে তো শুধু বিয়ে নয়!

স্রোতের শৈবালের মত সে আর ভেসে বেড়ায় না।

ইলারও দয়া হয়। সে মন জানাতে চায়, সে জান্‌ত, নীতুদা টুলিকে বিয়ে করবে না কক্ষনো।

বৌদি খুসী হ'ন অকারণেই। নীতিশকে দু'একটা নিন্দাজ্ঞাপক কথা বলেন।

সুমিত্রা হয়ত খুসী হয়, হয়ত হয়না। তারও মৃত্যু হয়েছে বারম্বার। প্রতি বাস্তব রাত্রে, প্রতি স্বপ্নাচ্ছন্ন দিনে। চমৎকার কৌচ টেবিল সেটী সোফা চেয়ারে পালঙ্কে পর্দ্দায় ফুলদানিতে চক্‌চকে বইয়ে সাজানো বিলাস ঐশ্বর্য্যময় ঘরে সুন্দর-ভাবে সেজে, সুন্দরভাবে ভূষিত স্বজনের সঙ্গে গল্প করে। সমাগত জনের সঙ্গে সাহিত্য, কলাতত্ত্ব আলোচনা করে, শোনে। মেয়েলী গলায় গান গায়, শেখা গান। রূপগর্বিত পূজাতৃপ্ত হাসি লেগে থাকে তার ঠোঁটে। কিন্তু সে যেন কোথায় একজায়গায় টুলুরই মত দুঃখী, বঞ্চিত নিঃস্ব, তার মনে হয়। হয়ত সেটাও তার মনের বিলাস, তবু মনে হয়।

কিন্তু কালো ভীরু উপেক্ষিত টুলু মরে গেলনা, রোগা হ'লনা, তার মনের কথা কেউ জানল না। দু'মাসের মধ্যেই তার একটা বিয়ের ঠিক হয়ে গেল, ত্রিশ

বিঘা না মানকুণ্ডতে তাদের বাড়ী। ছেলে মালবাবু কিম্বা টিকিট কালেক্টার। আশ্চর্য্য হয়ে টুলু শুভদৃষ্টির সময় দেখল, অত্যন্ত অল্প বয়স একটি শ্যামবর্ণ মুখের দুটি চোখ তার দিকে চেয়ে আছে। সে চোখ বুজলে নির্ভয়ে যেন।

তার পরদিন একখানা ছ্যাক্ড়া গাড়ীর ছাতে একটা তোরঙ্গ ও দানের বাসনের ঝুড়ি বসিয়ে গাড়ীর মাঝে একটি ঝি ও বরবধূকে তুলে দেওয়া হ'ল যথারীতি রমার জননীর হাতে কনকাঞ্জলী নিয়ে। রমা শান্ত মুখে চুপ করে দূরে দাঁড়িয়ে রইলেন। এই মাতৃপিতৃহীনা মেয়েটি তাঁর আরো আপনার হতে পারত, হয়ত সুখীও হত তার মনে হচ্ছিল।

এবং তার বিয়ের আগেই আধা বয়কট করা অর্থাৎ গুরুজনের সঙ্গে আলাপ-কথাহীন অবাধ্য নীতিশ তার বাবার ছেঁড়া সুটকেসে তার সামান্য কাপড়-চোপড় নিয়ে কোন এক জায়গায় তার চাকরী হয়েছে বলে গম্ভীর মুখ গুরুজনদের প্রণাম করে চলে গিয়েছিল।

৮

নীতিশকে স্টেশনে তুলতে এসেছিল সুধাংশ। বাঁধন-ছেঁড়া সুটকেশ, রং ওঠা টিনের একটা তোরঙ্গতে পড়ার বই, ময়লা শতরঞ্চিতে জড়ানো একটা আধময়লা তোষক, তেমনি চাদর, শ্রীহীন বালিস, বিবর্ণ দাগকালের পুরাতন লেপ—এই বিছানা কুলীর মাথায় তুলে দিয়ে নীতিশ টিকিট করতে গেল। একটা ছেঁড়া নেকড়ার পুঁটলিতে সুধাংশের মা বা রমা কে কয়েকখানা লুচি তরকারী বেঁধে দিয়েছিলেন, সেটা সুধাংশের হাতে ছিল। সুধাংশ চুপ করে কুলীর পিছনে দাঁড়িয়েছিল। তার যেন কি অজানা একটা কষ্টে গলা অবধি শুকিয়ে গিয়েছিল। চোখে জল আসার মত, কোমল সমবেদনাজ্ঞাপন করার মত দুঃখ নয়। নিষ্ঠুর নিঃসঙ্গ অবাচ্য দুঃখ। জিনিষগুলোর দিকে সে চাইতে পারছিল না। মনীশ প্রবীরের বিদেশ-যাত্রার জিনিষপত্র সে দেখেছে। আর তার আয়োজন সমারোহও সে দেখেছে। ব্যাকুল অব্যক্ত বেদনায় সে কিছু ভাবতেও চাইছিল না।

নীতিশ ফিরে এলো।

সুধাংশ চারদিকে চাইছিল। বল্লে, 'মেজদা আসবে বলেছিল।'

'ও, তা এখনো তো দেরী আছে। আমার 'বার্থ' না কেউ দখল করে নেয়।

চল্ আগে যাই।' নীতিশ হাসলে হাতের রঙীন ছোট টিকিটখানা সুধীশের হাতে দিয়ে।

তৃতীয় শ্রেণীর পথে ভিড়ের সারির মাঝে সুধীশ নীতিশের সঙ্গে যেতে লাগল। নীতিশের 'বার্থ' দখলের রসিকতায় সে হাসতে পারল না। তার যেন কিসে আকণ্ঠ ভরে উঠেছিল।

গাড়ীর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে সুধীশ বল্লে, 'কেউই এলো না। বুলুর বরও বলেছিল আসবে। মেজ বৌদির (সুমিত্রার) আসবার ইচ্ছে ছিল।'

নীতিশের সব জিনিষ তোলা হয়েছিল। সে শুধু বল্লে, 'কে সুমিত্রা ?'

দুই ভাই উন্মনাভাবে প্ল্যাট্ফরমে ঘোরা-ফেরা করে। গাড়ী ছাড়লে যেন বাঁচে। কথা ফুরিয়ে গেছে। এখন একটার পর একটা যদি কাজ পড়ে বা ঘটনা আসে সমস্ত চোখ কানকে নিঃশেষে নিযুক্ত করে মন বাঁচে নিজেকে লুকিয়ে।

গাড়ীতে ওঠবার সময় দিদি শুধু বলেছিলেন, 'চিঠি দিস্ পৌঁছে।' টুলুর সঙ্গে বিয়ের কথা পেড়ে যেন জ্যাঠামশাইরা দিদিকেও তার কাছ থেকে সরিয়ে দিলেন।

বড জ্যেঠিমা দিলে সোজাসুজি মানুষ, তিনি বল্লেন, 'ওমা তোর চাকরী হ'ল ?' 'মাইনে কত হ'ল ?' 'জানিস না ?' 'তা বেশ' 'তা কিছু খাবি না ?' 'সে কি ?' এক সঙ্গে বহু কথা বলে, অন্যত্র তাঁর—কর্ত্তব্য করতে চলে গেলেন, জবাব না শুনেই।

বাক্যকুশলী মেজ জ্যেঠিমা পরম হাসি মুখে সংলগ্ন বাক্যে আশীর্বাদ করলেন, 'ওমা, চাকরী হ'ল বুঝি. বেশ হ'ল। উন্নতি হোক। এবার এসে বিয়ে কোরো বাবা।' কথায় চিরকাল অপরিমেয় মধু তাঁর, অবশ্য শুধু ঠোঁটে। যেন চাকরীর খবর ও বিয়ের কথা তাঁর জানা নেই।

সুমিত্রা কাছাকাছি কোনখানেই ছিল না। বুলু শ্বশুরবাড়ী. টুলুকেও দেখা গেল না আশেপাশে। অবশ্য তাতে নীতিশ আশ্বস্তই হয়েছিল। কিন্তু সে তো টুলুকে ভালবাসত। সহসা ঘটনাচক্রে যেন রমার কাছে, তার ছেলে-মেয়ের কাছে, টুলুর কাছে সে অপরাধী হয়ে গেল। কোনো সম্পর্কই যেন আর রাখা যাবে না কারুর সঙ্গে। অন্যদের সঙ্গে না থাক সম্পর্ক। কিন্তু যেন নলিনরা. দিদিরা সব দূরে চলে গেল। নলিনও দেশে নেই। কোথায় চাকরীর জন্য দেখা করতে গেছে। ছোট ছোট ছেলেরা সব কাছে এসে ঘরে দাঁড়িয়েছিল, 'নিতুদা কবে আসবে ?' 'বাঁশী আনবে ?' 'আমার জন্য ফানুষ,' 'আমার রেলগাড়ী,' আমার

মোটর দম দেওয়া'। বেলা, ইলা বড় হয়েছে, ধনী দরিদ্রের ভেদ বুঝতে শিখেছে —মাতৃ-মহিমায় বহুদিন ধরে। তবু আজ তাদের ভাল লাগছিল না।

ছুটী নয়, তাই জ্যেঠামশাইরা বাড়ী নেই। সেইজন্য তাঁরা মোটর বা গাড়ী দিতে পারবেন না। অত্যন্ত দুঃখিত তাই। অবশ্য অনেক সময় অন্য তেমন তেমন লোককে দিতে হয়, তা নিতের তো এমন দরকার নেই।

মেজ কর্ত্তা বলেছিলেন, 'একটা ভাড়াটে গাড়ী আনিয়ে নিস্। ট্যাক্সির দরকার কি। একটু আগে যাস্।'

নীতিশ জানে তা, আর সেইজন্যই তার দুপুরের গাড়ী তুফান মেল। কোনো লোকের আপিস বা গাড়ীর সুবিধার প্রশ্নই উঠবে না।

দুই ভাই উল্‌টে পাল্‌টে এই ধরণের নানা কথা ভাবছিল।

গাড়ী ছাড়বার সময় হয়ে এলো। সুধীশ সহসা জিজ্ঞেস করলে, 'নিতুদা চাকরী কোথায় পেলে?' যে প্রশ্ন সে বারবার ভেবেও করতে পারেনি।

'পাইনি তো ভাই।'

'পাওনি?' সবিস্ময়ে সুধীশ জিজ্ঞাসা করলে।

'না ভাই।'

'কোথায় যাচ্ছ তবে?'

'কিষণগড়ে প্রতুলের কাছে।'

সুধীশের চোখের দৃষ্টি ব্যাকুল হয়ে উঠল, কিন্তু চিরদিনের মত নিষ্ঠুরভাবে সমস্ত আবেগ উচ্ছ্বাসকে প্রকাশ না করতে অভ্যস্ত মন আপনাকে সম্বরণ করে নিল।

নীতিশ তার মুখের দিকে চেয়ে তার হাতটা মুঠো করে নিলে।

গাড়ী ছাড়বার বাঁশী বাজল। গাড়ীতে উঠে জানলা দিয়ে নীতিশ খানিকক্ষণ চেয়ে রইল। ভিড়ের মাঝে সুধীশ বিন্দুর মত মিলিয়ে গেল।

সুধীশের চোখের সামনে শুধু ফিরে ফিরে ভাসতে লাগল, ময়লা বিছানা, ছেঁড়া সুটকেশ পুঁটলী-বাঁধা খাবার। না, টিফিন কেরিয়ার বা ডিবে নয়, নীতিশদের তো ও সব ছিল না। তার বাবার কিছু নেই ওরা সবাই জানে। তাই সেজ খুড়িমা বল্লেন, ওই পুঁটলী করে দাও না দিদি, ওতেই হবে। একটা এনামেলের গেলাস ছিল……ওরা কে দিয়েছিল।

রাত্রে খাবার সময় মনীশ বল্লে, 'আমি আর সময় পেলাম না। তা ও জায়গা পেলত?'

'হ্যাঁ, অনেক', সুধীশ বল্লে।

আশ্চর্য্য হয়ে মনীশ বলে, 'কিসে গেল, ইন্টারে?'

'না থার্ডে।'

সুধীশ রুটি ছিঁড়ছিল।

'তবে জায়গা অনেক বল্লি যে—?'

'ওতে যে রকম 'অনেক' পাওয়া উচিত সেই রকম পেয়েছে তাই বল্লুম।'

'তাই বল্।'

মনীশের আর কিছু বলবার বা জিজ্ঞাস্য নেই। সুধীশের পাশেই নীতিশের জায়গা সাধারণতঃ থাকত। আজ সেখানে অন্য ছেলেরা কে বসেছে।

সুধীশের মনে মনে সেই খালি জায়গাটি যেন আর ভরানো যাবে না, মনে হতে লাগল। তারা কেউ চাইল দুধ, কেউ মিষ্টি, কেউ রস, কেউ রুটী কেউ বা লুচি, কেউ বা মাছ-ভাত। সুধীশও সবই খেল, কথাও কইল। নিজেদের শোবার ঘরে গিয়ে শোয়। মনে সান্ত্বনা আনবার চেষ্টা করে। ওদেরও বিছানা শ্রীহীন, বাক্স বেরং। তবু মনে হয় অত খারাপ কি? সুধীশের লুকোনো মন ম্লান গম্ভীরভাবে ভাবে।

তার মনে পড়ে যায় অনেকদিন আগে দেখা নিঃস্ব নিঃসম্বল কোনো এক বিধবা আত্মীয়ার কথা। তাদের বাবার মাসীমা তিনি।

অনেকদিন আগে তিনি কোথা থেকে এসে কয়েক দিন তাদের বাড়ীতে ছিলেন। ময়লা তেলচিটে কাপড় বাঁধা কয়েকটা পুঁটলী, একটা বিবর্ণ ট্রাঙ্ক আর রং ওঠা সতরঞ্চিতে জড়ানো নোংরা দুখানা কাঁথা—এই তাঁর ছিল। রাত্রে তিনি দিদির ঘরে শুতেন, তাতেই তাঁর জিনিষপত্র ওরা দেখেছিল। আর বালকসুলভ কৌতুক করে হাসাহাসি করেছিল সকলে মিলে।

তারপর তিনি একদিন কোন তীর্থ করতে চলে গেলেন। আর ফিরে আসেননি।

ঘর-ভরা অন্ধকারে সে নিঃশব্দে চেয়ে রইল। বিশ্লেষণ করে, বিচার করে বোঝবার মত তখনো তার মন পরিণত হয়নি। শুধু বার বার মনে হতে লাগল তার, তাঁর মত, সেই বাবার মাসীমার মতই নীতিশদা আর হয়ত ফিরে আসবে না।

সহসা তার মনে হল তিনি কি মারা গেছেন?—নেই?

তবে নীতিশও কি সেই রকমই চলে গেছে চিরদিনের মত!

তার কাঁদতে ইচ্ছা হয়, যেন কারো কাছে বলতে ইচ্ছা হয়, আলোচনা করতে

ইচ্ছা হয়। মনে হয় এই নিষ্ঠুর অন্যায় ব্যবহারের কথা চীৎকার করে বড়দের কাছে বলা যায় না কেন? কেউ কেন বলে না? মা, দিদি, অন্য ভাইরা কেউ বলতে পারেন না? কিন্তু তার চোখে জল আসে না, কারো কাছে বলবার মত কে আছে তাও জানে না। পথহীন নিষ্ঠুর অন্ধকারের দিকে চেয়ে সে চুপ করে ছিন্নবিচ্ছিন্নভাবে নীতিশের কথা, পিতামহীর কথা, তাদের তর্কসভার কথা, মনীশ প্রবীরের বিলাত যাওয়ার কথা, আর আজকার এই নীতিশের শান্তমুখে 'চাকরী পাইনি তো ভাই' বলে গাড়ীতে ওঠার কথা ভাবে।

হঠাৎ মনে হয় ছেঁড়া নেকড়ার পুঁটলিতে বাঁধা ঐ খাবারটা নিতুদা সত্যি খাবে? সে তো কেমন সহজভাবে বল্লে 'দেবে? তা দাও, ওই নেকড়া বেঁধেই দাও।' সে কি দুঃখিত হয়নি, কষ্ট হয়নি তার? সে হলে খেত না। খেতে পারত না! কিন্তু নীতিশের হাতে খরচ করবার মত টাকা ছিল কি? সে খাবার কিনতে পারবে তো? ওতো জিজ্ঞাসা করতে পারেনি। আর কেউ তো জিজ্ঞাসাও করেননি সে কথা। তার কলেজের বন্ধু দরিদ্র একটি ছেলেকে তার মনে পড়ে। বই ধার করে পড়ে, দুখানি মাত্র কাপড় তার, একটি বাড়ীতে ছোট ছেলেদের মাস্টারী করে, সেখানে মাইনে পায় দশ টাকা আর খেতে পায়। কলেজের মাইনে আর খুচরো খরচ তাতেই চলে। চা খায় এক বন্ধুর বাড়ীতে— যদি সে ডাকে।

নীতিশের সঙ্গে তার কোনো প্রভেদ আজ আর নেই। সত্যিই কি নিতুদার কিছু টাকা নেই? আর একটু বড় হলে তখন সে জিজ্ঞাসা করবে বাবাকে, কাকাদের—নিতুদার টাকা কেন নেই।

কিন্তু সুধীশের এই বন্ধুটি তো দেশে আছে, আর তাদের বাড়ীর সকলেই সমান। কেউ বড়লোক নয়, অবস্থাপন্ন নয়।

নিতুদা যে কোন্ দেশে চলে গেল। আর বাড়ীর লোকেরা কেউ বারণ করলেন না, জিজ্ঞাসা করলেন না, কিছু বল্লেন না অবধি। তার বন্ধুর তো মা আছেন, ছোট ভাই বোন আছে। ওর কেউ নেই। হঠাৎ তার মনে হয় টুলুর সঙ্গে বিয়ের কথা। কি দরকার ছিল বাবার এই বিয়ের কথা বলবার। কেন শুধু জিজ্ঞাসা করলেন না। কেন বল্লেন, বিয়ের ঠিক করেছি। নিতুদা যেন বাড়ী শুদ্ধ লোকের কাছে, দিদির কাছেও কি রকম অপ্রস্তুত হয়ে গেল। তাই কি চাকরী হয়নি তবু চলে গেল। ওতো কক্ষনো মিথ্যে কথা বলে না।

কিন্তু টুলু তো বেশ মেয়ে, খারাপ তো নয়। সুধীশ নিস্তব্ধ হয়ে ভাবে।

দাবীহীন আশ্রয়হীন দয়ার পাত্রপাত্রীরা নলিন বুলু টুলু দিদির কথা তার মনে পড়ে এবং তাদেরও যে কোনো মুহূর্ত্তে চলে যেতে হতে পারে। তারা এ বাড়ীর কেউ নয়। নিতুদার মতই।

শুধু বুঝতে পারে না, নিতুদা তো বাড়ীর ছেলে, মেয়ে তো নয়, মেয়ের ছেলেও নয়, তবু কেন গেল!

৯

উঁচু-নিচু বন্ধুর ধূলি-ধূসর পার্ব্বত্য প্রদেশের পথ বেয়ে টাঙ্গা এসে দাঁড়াল প্রতুলের বাড়ীর দরজায়।

বাড়ী বড় নয়, কাজেই দরজায় গাড়ী থামলে ডাকার আগেই বাড়ীর লোক চকিত হয়ে উঠে।

মিলফেরৎ প্রতুল জুতো খুলছিল, বেরিয়ে এলো।

আশ্চর্য্য হয়ে বল্লে, 'তুই?'

জিনিষ ক'টি নামিয়ে বারান্দায় রাখছিল নীতিশ, সহজভাবে একটু হাসবার চেষ্টা করে বল্লে, 'হাঁ আমি।'

প্রতুল জিনিষগুলো তুলতে ভৃত্যকে আদেশ করে বল্লে, 'ভেতরে আয়।'

শ্রাবণের গোড়া। জুলাইয়ের শেষ। বিনু মিনুর আনন্দের সীমা নেই নীতিশ দাদাকে পেয়ে। তাদের মাও প্রতুলের মত একটু আশ্চর্য্য হয়েছিলেন কিন্তু সহসা কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না। রাত্রি হ'ল। উঠানে সারি সারি দড়ির খাট পাতা বিছানায় বিনু মিনুকে নিয়ে মা শুলেন। ছাতের উপর দু'খানা খাটিয়ায় দুই বন্ধু শুতে এলো।

প্রতুলের অদ্ভুত সঙ্কোচ হয়। কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারে না। নীতিশও বুঝতে পারে, কিন্তু কি বলবে? আর পড়ব না—সেখানে ভাল লাগল না—জ্যেঠামশাইরা অপছন্দ করলেন—টুলুর সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ করেছিলেন, সে অসম্মত হ'ল তাই—তাই থাকতে সঙ্কোচ হ'ল?—

আবাল্য নিঃসঙ্গ অপমান অভিমান দুঃখ-কষ্ট একলা ভোগ করতে অভ্যস্ত মন সহজে কাউকে অংশ দিতে শেখেনি। শিশুকালে, একদিন মনে আছে—একজন আত্মীয়া নিজের সন্তানদের সমস্ত খাবার দিয়ে তাকে খাবারের 'জালি'

ঝেড়ে ভাঙা গুঁড়ো খাবার দিলেন। নিয়ম মানতে অভ্যস্ত বালক, হাতে করে খাদ্যটা নিলে। তারপর চোখে জল ভরে গেল। একলা ছাতে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। খাবারটা ফেলে দিতে ইচ্ছে হচ্ছিল, কিন্তু অত্যন্ত ক্ষুধার্ত ছিল, ফেলে দিতে পারল না। অনেকক্ষণ পরে যেটুকুতে ধুলো লাগেনি, ক্ষুধার্ত বালক সেইটুকুই খেল। তারপরেও বহু দুঃখের দিন এসেছে। মাস্টার মশাইয়ের কাছে গুরুজনের কাছে প্রহার বা মার নয়। কিন্তু নিষ্ঠুর শ্লেষ, বিদ্রূপ, কঠিন দৃষ্টি বালকের মনুষ্যত্বকে বার বার আহত করেছে, অপমান করে গেছে। পিতামহী ছিলেন। কিন্তু তিনিও মা নন। বাপও ছিলেন না, ভাই বোনও ছিল না। অন্তরঙ্গতাহীন কঠোর নিয়মের মাঝে থেকে আজও সে যেন জানে না, শেখেনি মানুষকে কি করে ভালবাসা যায়, কি করে তাদের সঙ্গে সুখ-দুঃখের কথা বলা যায়। ভাল সে বাসে দিদিকে সুধীশকে নলিনদের। কিন্তু কারুকেই তো সে কোনো দুঃখের কথা, অপমানের কথা বলেনি। বলতে পারেনি। আজ তার মনে হয়—সেদিন যদি সে রাগ করে খাবার ফেলে দিত বা কাঁদত তাহলে কি ভাল হ'ত? হয়ত ভাল হ'ত। মন প্রকাশের পথ খুঁজে পেত একটা যে ভাবেই হোক।

পড়ার অসাফল্যে ছোট বেলায় মাস্টার মশাইয়ের কাছে কথা শোনা, জ্যেঠামশাইদের মূর্খ হাঁদা বোকা বিশেষণ শোনা। তারপর বড় হয়ে ভাল করে পড়াশোনা করেও কোনো উৎসাহ আনন্দের কিছু না শোনা, তারপর বিলাত যাওয়ার আশা; সহসা সুমিত্রাদের বাড়ীর শুনতে পাওয়া কথা মনে পড়ে যায়। নীতিশ যেন নিজের কাছেও নিস্তব্ধ হয়ে যায়। ভাল হয়ত সে কারুকেই বাসেনি। তাদের কিন্তু ভাল লেগেছিল, আশা করেছিল অনেক। কিন্তু এবারে ভাবনার স্রোত ছিঁড়ে গেল।

সহসা সে বল্লে, 'তোদের মিলে আমাদের করবার মত কোনো কাজ নেই, নারে?'

প্রফুলও ভাবছিল অনেক কথা নীতিশেরই। যে কথা কেউ বলে না সে কথাও মানুষ নিজের মন দিয়ে হয়ত বুঝতে পারে। তা ছাড়া বহু তর্কের আসরে বহু আশার দুরাশার বলাই ঠিক—দিনে সে একসঙ্গে ছিল ওদের দলে।

চকিত হয়ে সে বল্লে, 'মিলে? তোর মত কাজ? কেন, তুই পড়া ছেড়ে দিলি?'

'আর কত পড়ব? এবারে কাজ-কর্ম্ম করি।'

'কাজ-কর্ম্ম তো করবিই। কিন্তু পড়াটা শেষ করে নিলে তো কাজ-কর্ম্মের সুবিধাই হ'ত, নয়? রিসার্চ্চ করা শেষ হলে তো ভাল কাজই পেতিস্। প্রফেসররা তোকে তো ভালই বাসেন। ছেড়ে দিলেন?

নীতিশ হাসলে, 'তা হয়ত পেতাম ভাল কাজ কিন্তু কি আর হবে।—প্রফেসাররা জানেন না।'

'তবু একটা সম্মান ভাল কাজের কাছে তো। হয়ত কিছু করতেও পারতিস।'

'আমরা? আমি? কি করতাম? চাকরী ছাড়া আমরা কি বা করতে জানি ভাল করেই পাশ করি আর এম-এস-সি, ডি-এস-সিই হই। আমরা ওরা নই! তা ছাড়া আমিও কদিন ধরে ভাবছি কি করতে পারি আমরা। দেখলাম গতানুগতিক পথেই চলতে শিখেছি।'

প্রতুল চুপ করে রইল খানিক, তারপর বল্লে, 'আমাদের মিলের কর্তার একটা কেরাণী বা টাইপিস্ট দরকার, আর হতে পারে এখানকার স্কুলে কাজ।'

'স্কুলে কাজটা করতে পারি, টাইপরাইটিং তো জানি না, শিখে নিতে পারি অবশ্য।'

'এরা কিন্তু মাইনে খুবই কম দেবে। চল্লিশ পঞ্চাশ-এর বেশী নয়। স্কুলেও কি বেশী দেবে, জানি না।'

নীতিশ বল্লে, 'ওতেই আমার চলে যাবে।' সহসা যেন দু'জনেরই কথাটা কানে বাজল। এরই মধ্যে তার সব আশা কল্পনা শেষ হয়ে গেল? কি তাদের আদর্শ ছিল, কি ভেবেছিল এতদিন?

প্রতুলের যেন মনে কাঁটা ফোটে, কানে বাজে—'ওতেই আমার চলে যাবে।'

নীতিশ কিন্তু হঠাৎ সমস্ত অনিশ্চিত আশা দুরাশা থেকে মুক্তি পেয়ে গেল যেন। না, আর মাথা নিচু করে অপ্রতিভ দীন মুখে অনুগ্রহ গ্রহণ করতে হবে না। কি জন্য কি কারণ জানা নেই কিন্তু অনুগ্রহ করার যেন শেষ ছিল না। আজ সে মুক্ত। দরিদ্র দীন, কিন্তু করুণাভাজন নয়। নীতিশ হঠাৎ নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে যেন সব বিষয়ে। আর অনুমতি নিতে হবে না, উপদেশ নিতে হবে না, এবারে সব বিবেচনা নিষ্পত্তির ভার তার একলারই। অন্যের সঙ্গে সব মিলিয়ে আর নেই।

প্রতুল ঘুমোয়নি। চুপ করেই কি ভাবছিল কে জানে।

নীতিশ বল্লে, 'যদি স্কুলে কাজটা পাই সেইটেই ভাল হবে, না?'

'তোর যা ইচ্ছে। দেখা যাক কোনটা তোর ভাল লাগে।'

পার্ব্বত্য রাত্রি গভীর হয়ে ঠাণ্ডা হয়ে এলো।

দুই বন্ধু এবারে সহজভাবে পুরাতন কথা কইতে কইতে ঘুমিয়ে পড়ল

ভাদ্রের দুপুর। পিতামহীর ছোট পূজার ঘরটা এখন রমার অধিকারে। বুলু এসেছে, টুলুও দু'দিনের জন্য এসেছে। কয়েকখানা বই আর মাসিকপত্র আর ভাগবত নিয়ে রমা বসেছিলেন, ভাগবতখানা ধর্ম্মগ্রন্থ হিসেবে, কেননা সেদিন একাদশী।

সুধীশ এসে বসল, বল্লে, 'অন্ধকার ঘরে পড়া যাচ্ছে?'

রমা হাসলেন, বল্লেন, 'হ্যাঁ, পড়া যায়, একটু আলো আছে।'

সুধীশ ভাগবত নিয়ে পাতা ওলটাতে লাগল, বল্লে, 'এ বই ভালো লাগে তোমার দিদি?'

বুলু বল্লে, 'আজকে মার একটু ধর্মের বই পড়া নিয়ম, ঠাকুমা পড়তেন মনে নেই?'

রমা বল্লেন, 'বকিসনি। প্রায়ই তো নিয়ে বসি।'

বড়বৌ ঢুকলেন দরজা ঠেলে, 'ঠাকুরঝি ওঘরে যাবে? বড় গরম আজ, না?'

'কই ভাই গরম এমন আর কি, রোজ যেমন তাই তো।'

'আজকে ওঘরে গেলে ঘুমুতে পারতে পাখার তলায়'—পরম মিষ্টভাবে বড়বৌ বল্লেন।

সুধীশের ঠোঁটের পাশে একটু হাসি ঝিকমিক করে উঠল। বুলু টুলু নীরবে দুখানা বই খুলে বসেছিল।

রমা বল্লেন, 'আচ্ছা, এখন তো শোব না, পড়ছি পরে যদি শুই তো যাব।'

'বুলু টুলু যাবি ও ঘরে?'—মাতুলানী জিজ্ঞাসা করলেন।

বুলুর মুখে এলো—আমার শ্বশুর বাড়ীতে তো পাখা নেই। আর এমনই তো চিরকাল শুতাম ও পড়তাম,—বলল না কিন্তু, শুধু বললে, 'না মামী, আমার মার সঙ্গে একটু গল্প করছি।' তিনি চলে গেলেন।

সুধীশ অনেকক্ষণ পরে একটু হেসে বললে, 'আজ কাল বুঝি তোমরা একটু পাখার প্রসাদ পাও?'

রমা উত্তর দিলেন না একথার। জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁরে সুধি, নিতুর চিঠি পাসনি?'

সুধীশ বল্‌লে, 'হ্যাঁ কাল পেয়েছি।' বুলু টুলু উৎকর্ণ হয়ে উঠল। রমা বল্‌লেন, 'কেমন আছে? চাকরী করছে?'

সুধীশ বাড়ীতে বলেনি তার চাকরী না পাওয়ার কথা। আজ বল্‌লে, 'তখন সে চাকরী পায়নি। এখন পেয়েছে একটা।'

রমা আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লেন, 'তখন পায়নি? বল্‌লে যে পেয়েছি?'

সুধীশ বল্‌লে, 'উপায় ছিল না। এমন একটা অসুবিধেয় তাকে সবাই ফেললেন নিরুপায় হয়ে দেশ ছেড়ে বাঁচল।'

সকলেই চুপ করে রইলো।

অনেক পরে বুলু বল্লে, 'মা, তুমি কেন দাদামশাইকে বললে না যে, নিতুমামাকে তুমি আগে জিজ্ঞাসা করবে? তাহলে এরকম হ'ত না। নিতুমামা যেন অপ্রস্তুত হয়ে চলে গেলেন।'

রমা টুলুর মুখের দিকে একবার চাইলেন তারপর বল্‌লেন, 'আমি বুঝতেও পারিনি, আর সময়ও পেলাম না—কিছু বলবার। দুটো বিয়ে গেলো তার মাঝে ও এলো আর হঠাৎ কাকারা আর বাবা জিজ্ঞেস করলেন।' বুলু বল্‌লে, 'মেজ মামার বিলেত গেলো, ও যেতে পেলো না। তারপর বড়মা (রমার পিতামহী) মারা গেলেন, ওর মনও খারাপ ছিল। তা ছাড়া ওর কাজকর্ম্মও তো ছিল না। কাজ থাকলে হয়ত অমত করত না।'

রমা বল্লেন, 'অমত করলেও তো দোষ ছিল না। আমার সঙ্গে নিতুর সম্পর্কই আলাদা যে। ছোট খুড়িমার আর আমার একসঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। খুড়িমা যখন এলো বাড়ীতে ছোট্ট কনে বৌটি, কেবল কাঁদত, আমারো শ্বশুরবাড়ী গিয়ে মন কেমন করত। আমাদের দু'জনে যে ভাব হয়েছিল,—সমান ছিল,—সে যতদিন বেঁচে ছিল। ঐ ছেলেকে ছোট ক'বছরের রেখে তো সে গেল।'

সুধীশ জিজ্ঞাসা করলে, 'দিদি, খুড়িমা কেমন দেখতে ছিলেন?'

'খুব পরিষ্কার দেখতে ছিল আর ভারি মিষ্টি স্বভাব ছিল। বেশ গান গাইতে পারত। লেখাপড়াও তখনকার হিসেবে বেশ জানত।'

'কাকা নাকি নিতুদার সমস্ত টাকা খরচ করে দিয়েছিলেন?' সুধীশ জিজ্ঞাসা করলে।

রমা একটু অবাক হয়ে বল্‌লেন, 'কাকা সব টাকা আর কি করে খরচ করবেন। মারাই তো গেলেন খুড়িমা যাওয়ার ক'বছর বাদে। একটু গান বাজনার সখ ছিল, যেখানে ভাল গান হবে শুনতেন সেখানে যেতেন। আর

নিজেও বেশ ভাল গাইতেন। বাঁশী বেহালা নিতুর চেয়ে ভাল বাজাতেন। তাতেই তো সব খরচ হয়ে যায়নি। কাকা মারা গেলেন নিতুর জন্যে কিছু লিখে না রেখেই—তাই নিতুর আজ কিছু নেই।'

বুলু বল্লে, 'ওর মামার বাড়ীতেও কেউ নেই?'

রমা বল্‌লেন, 'আছে খুড়িমার ভাই বোনের' কিন্তু মা বাবাতো নেই, কে আর খোঁজ খবর করে।'

রমা একটু চুপ করে থেকে বল্‌লেন, 'এমন হ'ল যে নিতু যেন অপ্রস্তুত হয়ে চলে গেল। আমিও না পেলাম সময়, না বলতে সাহস করলাম যে আমি কিছু মনে করিনি। টুলুও কিছু মনে করেনি। যদি বিয়ে হ'ত তো সে আমার খুবই আপনার হ'ত। কিন্তু না হলেও তো সে পর হয়ে যায়নি। আর টুলু বুলুরও সে পর ছিল না। এই কথাটাই যদি না উঠত।'

বিবাহিতা টুলু নির্ব্বাক নিস্তব্ধ হয়ে শুয়েছিল। মন যেখানে নিঃশেষ হয়ে গেছে, তারও নীচে যেখানে সচেতন ভাবনা যায় না, সেখানে তার কি প্রশ্ন ছিল, কি ক্ষোভ ছিল, সেখানে নিতু অপরাধী অথবা সে-ই নিতুর কাছে, সকলের কাছে অপরাধিনী হয়ে আছে সে জানে না। শুধু একটা বিষণ্ণ ছায়া চিরকালের মত সেই খানটা আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তার ওপর বাইরে শুধু আছে—'আজ আর তার কিছু ভাবতে নেই'। প্রকাণ্ড সেই 'না' দিয়ে তার মনের আকাশ পাতাল ঢাকা থাকবে চিরকাল।

সুধীশ বুলু একবার চকিতের মত টুলুর দিকে চাইল। কথাগুলো ওর সামনে হওয়া ভালো হল, না ভালো হ'ল না?

রমা ভাগবতের পাতা থেকে নৈর্ব্যক্তিক সান্ত্বনা খুঁজছিলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল 'ওরে ভীরু তোর হাতে নাই ভুবনের ভার'।

১০

টুলুর শ্বশুরবাড়ী। বিধবা শাশুড়ী, খুড়শাশুড়ী ও ছোট ছোট দেবর ননদে ভরা ছোট্ট সংসার। তার সমবয়সী মাত্র একটি ননদ।

নীতিশের মতই আবাল্য মাতৃহীন পরপ্রতিপালিত টুলুর মন যেন বরফে চাপা।

কখন কখন কারুর স্নেহের উত্তাপে সে বরফ গলেছে একটুখানি। কিন্তু ঐ একটুখানিই।

ওদের বাড়ীতে কালো অনাথা টুলু যেন রাজকন্যা হয়ে এলো। বড় ঘরের আওতায় প্রতিপালিত হয়েছে, বড় বংশের মেয়ে,—শাশুড়ী প্রশ্রয় দেন, খুড়শাশুড়ী স্নেহ দেখান, দেবর ননদরা সম্মান করে। স্বামী অনেকখানি সম্ভ্রম করে। তার যেন সমীহ হয়। ঐ সহরে মানুষ হওয়া লেখাপড়া জানা ম্যাট্রিক পাশ মেয়েটির পাশে নিজেকে, নিজেদের অনেকখানি ছোট মনে হয়।

শাশুড়ী ছোট ছোট কাজ করতে বলেন, ভাবেন তার অভ্যাস নেই, কষ্ট হবে।

খুড়শাশুড়ী বলেন, 'কখনো করেনি দিদি, ওকে অত কাজ করতে দিয়ে কাজ নেই।' ছোট ছোট ননদরা দেবররা কত কত কাজ করে। সহসা টুলু সচেতন হয়ে উঠ্‌ল। হাতের কাছে বই নেই, সখের সেলাই নেই, সৌখিন কাজ করা নেই, তাই নিয়ে আস্ফালন নেই। এদের জীবন-যাত্রায় তার জানা কাজ কিছুই নেই। সারাদিন ধরে জল আনা, গোয়াল পরিষ্কার করা, ধান সিদ্ধ করা, গরুর ভাত রান্না, কিষাণদের খাওয়ানো······দেখতে দেখতে তাঁদের তিনটা বেজে যায়।

টুলুও ধীরে ধীরে নিজেকে তাদের কাজের মধ্যে ডুবিয়ে নিল।

শাশুড়ীকে বলে, 'মা, আপনি জিরিয়ে নিন। আমি গরুর ভাত রান্না করছি, ধান সিদ্ধ করছি।'

শাশুড়ী সামান্য আপত্তি করেন, তারপর আঁচল পেতে খোলা দাওয়ায় ঘুমিয়ে পড়েন।

রান্নাঘরের জানলায় বসে থাকে টুলু।

নির্জ্জন গ্রাম্য পথ, আলোয় ছায়ায় ভরা গভীর সবুজ বন, অপরূপ কোমল নীল আকাশ।

কিন্তু তার মন যেন মূঢ় হয়ে গেছে। ভাবনা নেই, বেদনা নেই, ক্ষোভ নেই, আশা নেই। উদাস দৃষ্টিতে সে চেয়ে থাকে। ধান সিদ্ধ হয়ে যায়, ভাত নেবে যায়, কিষাণ ছেলে গরুকে খেতে দিয়ে নিজে খেতে বসে। মাথায় চুকচুকে করে তেল মাখা কালো কিশোর ছেলে বসে বসে পুঁইডাঁটা, কলাইয়ের ডাল আর চুনো মাছের টক দিয়ে প্রচুর ভাত খায়। বাড়ীশুদ্ধ সকলে ঘুমায়। টুলু খাবার দিয়ে—বসে বসে খাওয়া দেখে।—

সহসা তার মনে হয় এত সহজ জীবন কেন তার হ'লনা,—লেখাপড়া শেখা, ওখানে এতদিন থাকাতে তার কি হ'ল!

বুলু মাঝে মাঝে একখানা দুখানা বই পাঠিয়ে দেয়! তার সব বিস্বাদ মনে হয়। কোন্ সুখ-দুঃখের কথা সে পড়চে, কার সুখ-দুঃখ! কার প্রেম! টুলুর মুখে না মনে তার অজ্ঞাতেই একটা হাসির আভাস ফুটে ওঠে।

গভীর অচেতন অন্তরের কোন একখানে যেখানে সকল মানুষের স্বপ্নলোকবাসিনী রাজকন্যা ঘুমিয়ে থাকে, সেখানে টুলুরও ছিল, তার ঘুম কেন ভাঙালো, কে ভাঙালো সে কাকে ভালবাসতে চেয়েছিল?—সে কি ভালবেসেছিল কারুকে?

প্রত্যাখ্যাতা অপ্রতিভ তরুণী নিঃস্তব্ধ হয়ে যায়—আর ভাবতে চায় না। কিন্তু তার চোখে জল আসে না, মনে রাগও আসে না। যেন শুধু অবাক হয়ে—আশ্চর্য্য হয়ে সে চেয়ে থাকে।

পৃথিবীর আর সকলের সব জিনিষ এত সোজা এত সহজ কি করে হয়। ঐ যে কিষাণ ছেলে খাচ্ছে, ঐ রাখাল বালক মাঠে গাছতলায় শুয়ে গান গাইছে, 'ওরে রামশশী যদি কাঁঠাল খাবি তো বিচিগুলো রাখিস্ যতন করে,'—এই যে শান্ত প্রকৃতির দুটি বিধবা নারী সেই যে তার মা (দিদি, নিজের জননীর কথা তার মনে পড়ে না,) তাদের কাছে এই জীবন, এই সুখ-দুঃখ এত সোজা কি করে হয়েছিল! কেন বেলা, ইলা, বুলু কেমন বরের চিঠি, গহনার ডিজাইন, শাড়ীর পাড় আঁচলা নিয়ে কত গল্প করছিল, এই সেদিনও। শুধু সুমিত্রা বৌদি যেন অন্যমনস্ক। তার নীতিশকে মনে পড়ে যায়।

সে চকিত হয়ে উঠে পড়ে। ভাঁড়ারে যায়, মুড়কী, শশা, কলা নিয়ে খাবার গোছাতে বসে—এখনি দেবররা আসবে।

আবার কাজের চাকা জোরে ঘুরতে থাকে। মন্থর দিন শেষ হয়ে এলো। সন্ধ্যার পরই রাত্রি যেন গভীর মনে হয়। সে ননদের পাশে শুয়ে পড়ে।

স্বামী সপ্তাহান্তে বাড়ী আসে। নিরীহ শান্ত গ্রাম্য ভদ্র যুবক, যার মনে কোনোদিন বিশেষ কোনো আশা দুরাশা জাগেনি। কোনো মোহময় দুর্বার প্রেম, কোন গভীর উদ্বেল বিরহ, উদাস কোনো অভাব বেদনার কথা সে জানে না।

শাশুড়ী বলেন, 'বৌমা, নরেনের কাপড় গামছা জল খাবার সব ঠিক করে দিয়ে এসো।'

তন্বী শ্যামা ঈষৎ দীর্ঘাঙ্গী তরুণী মেয়েটি সকলের সমস্ত আদেশ পালন করে।

ননদ বলে, 'মা, বৌদি কত কাজ করে, কাপড় একটু ময়লা হয় না।'

খুড়শাশুড়ী বলেন, 'হাঁ, যেন মনে হয় সেজেগুজে বসেছিল অথচ বিশেষ কিছুই তো পরে না। যা তোরা পরে আছিস তাই পরে।'

টুলুর স্বামীকে জলখাবার চা সব দেওয়া হয়, রাত্রের আহারও শেষ হয়, কিন্তু সেদিন আর তার কাজ শেষ করা হয় না।

শাশুড়ীদের পায়ে তেল মাখাতে বসে, তারপর দেবরদের গল্প বলতে বসে।

অনেক রাত্রে সে ঘরে আসে শুতে। আস্তে আস্তে স্বামীর মাথায় হাত বুলাতে বসে। সে দু'একবার প্রতিবাদ করে তারপর ঘুমিয়ে পড়ে।

সে নিঃশব্দে জানালার ধারে বসে থাকে চৌকার পাশে। বাইরের রাত্রির মত কোন্ গভীর রাত্রি যেন তার সমস্ত জীবন আচ্ছন্ন করে রেখেছে! প্রভাত কি হবে? কবে সূর্য্য উঠবে তার? সে কোন্ সূর্য্য? মৃত্যু, না পরম আনন্দ কোনো? অত কথা সে জানে না। শুধু উদাস চোখে সে চেয়ে থাকে। তার মনে হয় মীরাবাইয়ের কথা। রাজরাণী হয়েও যিনি সংসার ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু সে ত' কৃষ্ণপ্রেমের জন্য চলে গিয়েছিলেন। তার—? তার তো কোনো কিছুই মোহ নেই। ঘর-সংসারের কোন্ লোভ মানুষকে বাঁধে? তাকে কেন বাঁধল না? সংস্কারমুক্ত ব্যাকুল সঙ্কোচে তার মনে হয়,—স্বামীর সোহাগে বাহুবন্ধনে তার মোহ নেই। কোনো মধুর অপরূপ ভবিষ্যতের আশার কথাও তার মনে জাগে না। তার জীবন যেন জীবন নয়, কিন্তু মৃত্যুর কথাও তো সে ভাবে না।

শুধু প্রভাত হোক, প্রভাত হোক, আলো হোক। সকলের ঘুম ভাঙুক। তারপর সে একটানা কাজ করে যেতে পারবে। সেই তার মুক্তি। অনেক রাত্রে ক্লান্ত হয়ে সে স্বামীর পাশে শুয়ে পড়ে। সপ্তাহান্তিক দুর্বহ রাত্রি শেষ হয়ে যায়, দিন আসে। তারপর আবার প্রতিদিনের রাত্রি আসে, দিন আসে।

অকস্মাৎ একদিন আরো কাজ খুঁজে পেল টুলু।

শাশুড়ী বল্লেন, 'বৌমা, ছোট ছেলেদের পড়াগুলো একটু দেখে দাও না বাছা।' আর নিরক্ষর খুড়িমা বল্লেন ওপাশ থেকে, 'আমাদের একটু মহাভারত শোনাও না মা।' এবার দিন অবসরহীন হয়ে ওঠে রাত্রিও নিরবসর হয়ে যায়।

বালকদের আনন্দময় উৎসাহময় কোলাহল টুলুকে যেন কোন্ ছেলেবেলায় নিয়ে যায়। যে ছেলেবেলার কথা সে জানে না, তারা জানে না। এ যেন সহজ সরল রাখাল বালকের বাল্যকাল। এরা ধূলা মেখে হাডুডুডু খেলে, বর্ষার ভয়

দীঘির জলে সাঁতার কাটে, গাছে ওঠে, মাঠ থেকে গরুকে খুঁজে আনে। এদের ভয়হীন ভোগবিলাসহীন একান্ত গ্রাম্য জীবন। এরা ফুটবল জানেনা, স্লিপ জানেনা, ক্রিকেট জানেনা।

মাঝে মাঝে তারা টুলুকে কলকাতার কথা জিজ্ঞাসা করে, তাদের কলকাতার বিলাস প্রাচুর্য্যময় জীবন-যাত্রার ওপর লোভের সীমা নেই, কৌতূহলেরও সীমা নেই। টুলু হাসে।

এবার সহসা লোভ-মোহ-হীন এক দীন অভিজাত দুহিতার মন তাদের সকলের ওপর স্নেহে মমতায় করুণায় ভরে উঠ্‌ল। বহু বিলাসের উপকরণ সেও দেখেছে, বহু আকাঙ্ক্ষা তারও ছিল। প্রয়োজনহীন প্রয়োজনীয় বস্তুতে সে বাড়ী ভরা দেখেছে। তাই নিয়ে প্রতিযোগিতাও দেখেছিল। ক্ষোভও দেখেছে, তার নিজের মনেও কত আশা লোভ ছিল।

আজ গল্প করতে বসে তারি মাঝে কোথায় যেন এক অপরূপ রূপকথা সে খুঁজে পেল। ভয়ে ভীত শাসনে সংযত প্রশ্রয়হীন কোন্ শিশুদলের কথা,—তবু তারি মাঝে সুখে দুঃখে মধুর ছোট বেলার সেই কথায় টুলুর মন অন্যমনস্ক কোমল হয়ে আসে।

শাশুড়ীরা সেই গল্প ও অন্য কত কথা শোনেন। ছেলেরা শোনে, স্বামীও মাঝে মাঝে শোনেন। টুলু এবারে যেন নিজেকে ভুলে যেতে লাগল।—যদি মানুষ নিজেকে ভুলতে পারে।

১১

মিশনারীদের ছোট স্কুল, ছাত্র আছে। কিন্তু মহারাজার অবৈতনিক হাইস্কুলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারে না।

একটি শান্তশিষ্ট গোঁড়া ধার্মিক সাহেবের অধীনে কয়েকজন ক্রিশ্চান মাস্টার আছেন। এম-এস্-সি ডিগ্রীর জোরে, হিন্দী-না-জানা বাঙালী নীতিশের চাকরী হয়ে গেল। অঙ্ক ইংরেজী পড়াবে।

ছাত্ররা বেশীর ভাগই বর্ণহিন্দুর ঘরের নয়। হয়ত কোনোদিন তাদের মাঝে থেকে একটি দুটিও খৃস্টধর্ম্মের ছায়ায় আশ্রয় নিতে পারে এই আশায় মিশন আছে। যদিও বছর পঁচিশ ত্রিশ আগে যেভাবে ক্রিশ্চান হ'ত এখন আর তা

হয় না! তবুও আশা মিশনের আছে। এখন সেই আগের ধর্ম্মান্তরিতদের ছেলেমেয়েরা পড়ে ও পড়ায়। আর সঙ্গে সঙ্গে কামার-কুমোর, মুচি হরিজন নানা জাতির ছেলেরা পড়ে, তাদের মাঝে গরীব ব্রাহ্মণ বেনিয়ার ছেলেরাও আছে, মুসলমানও আছে।

নীতিশের ভালো লাগল। যদিও ধর্মের আশ্রয় নিয়ে কচকচি ভাল লাগে না, তবু মনের কাছে অস্বীকার করবার উপায় নেই, যেভাবেই হোক সব জাতের ছাত্ররাই সমান ব্যবহার পাচ্ছে।

ক্রিশ্চান মাস্টারদের মাঝে একজন সেকালের ধর্মান্তরিত ব্রাহ্মণ খৃস্টান।

একটু আধটু আলোচনা হয়। অদ্ভুত লাগে নীতিশের—খৃস্টধর্মের গোঁড়ামীও যেমন তাঁর, তেমনি পুরাতন ব্রাহ্মণ্যের গর্বও কম নেই।

তাদের বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে আলাপ হয়। যমুনা বাঈ আর গঙ্গা বাঈ, মা আর মাসী। মাসীর একটি মাত্র মেয়ে ডাক্তারী পড়ে কোথায় কোন মেডিক্যাল স্কুলে সেকালকার হিন্দু ঘরের বিধবা, অল্পবয়সে স্বামী মা বাপের মৃত্যুর পর দুই বোনে নানারকম লাঞ্ছনা ভোগ করেছেন। অবশেষে মিশনের এক মেমের প্রস্তাব আসে। খাওয়া-পরা আশ্রয় সম্মান সবের ওপর ছেলে মেয়ে দুটিকে মানুষ করে দেবে ওরা; এই অতি সাধারণ প্রয়োজন অথচ পরম প্রয়োজন, ধর্ম নয়, পরলোকে ত্রাণকর্তার 'সেভিয়রের' আশ্রয় নয়, মানুষের নিত্যকার দরকারের অন্ন-আশ্রয়ের তাড়নায় তারা ধর্মান্তরিত হ'ল।

ছেলেটি মানুষ হয়েছে, স্কুলে মাস্টারী করে। মেয়েটি এখনো পড়ছে।

আর তাদের কি রাগ কি বিতৃষ্ণা পরিত্যক্ত ধর্মের (সমাজের) ওপর। ধর্ম যে কিছু করেনি, সমাজের নিয়মেরই দোষ সেকথা তারা জানে, বোঝে—মাঝে মাঝে কিন্তু ঘুরে-ফিরে বারেবারে বলে, 'তোমাদের সমাজ' আর 'তোমরা' এই করেছ।

নীতিশের মনে পড়ে কালা পাহাড়ের ঐতিহাসিক বিরাগের অভিযান!

আপনার জন যখন পর হয় এমনিভাবেই চিরকালের মত দূরে চলে যায়। নিজের কথাও মনে হয়।

তবু গঙ্গাবাঈ যমুনাবাঈ লোক ভালো। বেশ স্নেহভরে গল্প করেন, পুরাতন ব্রাহ্মণ্যের সংস্কার শুচিতা, খৃষ্টীয় পরিচ্ছন্নতা, সুশ্রী করার রুচির সঙ্গে মিশেছে পুরানো হিন্দুভাবের, সৌজন্যের সঙ্গে এই সমাজের শিষ্টাচার করে আপনার করার চেষ্টা করেন তিনি।

জিজ্ঞাসা করে 'বাবুজী চা খাবেন? না জাত যাবে?'

নীতিশ হাসে, বলে, 'আপনারা মা বহিন, খাবই তো। খোদ সাহেবের কাছে, আসল অখাদ্য খাওয়া সাহেবের বাড়ীতেই চা খেয়েছি।'

ওরা দুই বোনে অখাদ্যের নামে অন্য মনে 'রাম রাম' না 'হারাম' কি বলে—বলে আমরা কিন্তু ওসব খাই না।

ছোট বড় ছুটীতে মেয়ে আসে। মেয়ের হিন্দু নাম ছিল কাবেরী বাঈ, ধর্মান্তরের পর তার নাম হয়েছে ধর্মমাতার নামে—রুথ কাবেরী হীরালাল মিশ্র।

হীরালাল মিশ্র বাপের নাম।

মেয়ে সুশ্রী, ভালো দেখতেই বলা যায়। রং পরিষ্কার, চমৎকার হাসি, ঝকঝকে দাঁত, চোখ মুখ ভালো।

সমাজের কোনো চাপ নেই, ভাবতে পারার আগেই ভাবনার ভার চাপিয়ে দেয়নি কেউ, বলেই বোধহয় ছোট্ট খরস্রোতা পার্বত্য তটিনীর মতই তাকে উচ্ছল আনন্দিত মনে হয়।

আর সে এলে বাড়ীতে আস্তে আস্তে ছোট্ট খৃস্টান সমাজের ছেলের। অনেকেই আসে যায়।

জননীর চা পানের প্রস্তাবে রুথ। তাকে রুথ বলেই ডাক হয়। বল্লে, 'মা যদি এর জাত যায় তোমার দোষ হবে কিন্তু। অবশ্য আমাদের দল ভারী হয়ে ভালই হবে। মনে নেই আমাদের কি করে জাত গেল?'

তার মুখে কৌতুকের হাসি ফুটে ওঠে।

নীতিশ জিজ্ঞাসা করলে উৎসুক হয়ে, 'কি করে গেল আপনাদের জাত যমুনাবাঈ?—কেন, আপনি ইচ্ছে করে ধর্মান্তর গ্রহণ করেন নি?'

যমুনাবাঈ একটু দ্বিধা ভরে চুপ করে রইলেন।

রুথ বল্লে, 'সে এক মজার ব্যাপার—আমি তখন বছর সাতেকের, আর মোহনলাল দাদা আট বছরের। আমরা দুজনেই বাড়ীর কাছে বিনা মাইনের মিশন স্কুলে পড়ি। আমাদের প্রাইজ হল ওদের বড়দিনের আগে। সেদিন মেম সাহেব আমাদের সকলকে বিস্কুট ফুলপাতা দেওয়া চমৎকার কেক দিতে লাগলেন; অনেক ছেলে নিল, খেয়ে ফেলল। বড়রা অনেকে নিল না। আমি আর মোহন ভাইয়া তার পরদিন খাব, আর বাড়ীতে দেখাব বলে—হয়ত আর কারুকে দোবও ভেবেছিলাম, একটু নিয়ে এসেছিলাম।

তারপর আর কি—আমাদের ঘরে ঢুকতে দেওয়া হল না। জিজ্ঞাসা করা

হল ঐ বিস্কুট খেয়েছি কি না। ছোট ছিলাম, প্রথমে সত্যি কথাই বললাম, খেয়েছি। তারপর মায়েরা কাঁদতে লাগলেন, তখন বল্লাম—খাইনি।

যাই হোক, মা'দের ভাইরা এলেন, তাঁদের জেরায় প্রমাণ হ'ল খেয়েছি। একান্নবর্ত্তী 'পল্লীওয়াল' ব্রাহ্মণ পরিবার, মিতাক্ষরার অধীন। কয়েক ঘন্টার মধ্যেই বাপের বাড়ী মামার বাড়ীর সমস্ত আপনার লোকদের সামনে আমাদের দুজনের জাত চলে গেল।'

নীতিশ আশ্চর্য্য হয়ে বল্লে, 'প্রায়শ্চিত্ত করেও নেওয়া হল না জাতে?'

এবারে মোহনলাল বল্লেন, 'সেতো প্রায় কত বছর আগের কথা। তা ছাড়া ভারতবর্ষের সমাজের সকল স্তরে তো একসঙ্গে বিচারবুদ্ধি বা শিক্ষা জাগেনি। প্রায়শ্চিত্ত শুদ্ধি এখন হচ্ছে,—তখন সে কথা জানাও ছিল না, আর ভাবেই বা কে আমাদের জন্য, বাপ তো ছিলেন না।'

নীতিশ আশ্চর্য্য হয়ে বল্লে—'তারপর? খৃস্টান হয়ে গেলেন?'

মোহনলাল বল্লেন, 'না,—তারপর? সবাই কি পরামর্শ করে আমাদের দুজনকে আলাদা করে রাখলেন, বাইরের দিকের একটা চাকরদের ঘরে। আমাদের রুটী তরকারী আসত শালপাতায় আর দোনায় করে। বাসন ক্রমে আলাদা করে দেওয়া হল। মায়েরা এসে রাত্রে শুতেন। তারপর তা নিয়েও কথা হতে লাগল। বোধহয় বাড়ীতে মামী মামারা অপছন্দ করলেন, পাছে তাঁদের ছেলেমেয়ের বিয়ে না হয়। তখন মা আর মাসীমা দুজনে একটা ছোট বাড়ী নিয়ে আলাদা হয়ে রইলেন।

এবারে রুথ হেসে বল্লে, 'আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁদেরও জাত গেল।'

এবারে যমুনাবাঈ বল্লেন, 'তাই বলে আমরা তো আমাদের ধর্ম ছাড়িনি।'

রুথ হাসলে, বল্লে, 'কিন্তু ধর্ম তোমাদের ছেড়ে দিয়েছে।'

গঙ্গাবাঈ এসেছিলেন। তিনি বল্লেন, 'ধর্ম তো মনে। যে ধর্ম লোকের সমাজের, আমাদের গেছে বটে।'

তারপর একটু বিতৃষ্ণা ভরে বল্লেন, 'চিরকাল রক্ষণশীল ব্রাহ্মণের মেয়ে ছিলাম তাই, নইলে মনে হয় যারা আমাদের চাইল না, আমাদের তাদের ছাড়াই ভালো ছিল।'

স্কুলের আর একটি মাস্টার এলেন। কম বয়স। জাতে সূত্রধর। বাল্যকালে পিতৃমাতৃহীন, কেমন করে—এদের আশ্রয়ে এসেছিলেন আর খৃস্টান হলেন মনে নেই। লেখাপড়া শিখেছেন এদের আশ্রয়েই। শিক্ষিত বলা যায়, পড়া শোনাও

করেন মন্দ নয়। রুথের প্রতি একটা মোহ বা ঝোঁক পড়েছে বোঝা যায়। আর সেইজন্যই রুথের মা মাসী তাকে একেবারে পছন্দ করেন না। নাম পল শিউশরণ।

যমুনাবাঈ গঙ্গাবাঈয়ের কথার উত্তরে বল্লেন, 'একরকম তো ছাড়াই হয়েছে, কে আর খোঁজ খবর করে বলো। আর জানো বাবুজী, সেই বালকদের বিস্কুট খাওয়ার অপরাধে আমরা ধর্মচ্যুত হলাম। আর আজ বড় গোবিন্দলাল বিলাত ঘুরে এলেও জাত রয়েছে তার। কাশী উজ্জয়িনী মিথিলার পণ্ডিতদের এনে প্রায়শ্চিত্ত করা হয়েছে। বহু খরচ করেছেন ভাইরা।'

নীতিশ একটু হাসলে, বল্লে, 'বহু খরচ করেছেন তাঁরা সেইটেই তো গোড়ার কথা, আসল কথা। বহু খরচ করবার সামর্থ্য আপনাদের থাকলে আপনারাও প্রায়শ্চিত্ত করে জাতে থাকতেন। টাকা দিয়ে পণ্ডিতদের মতামতও কেনা যায়।'

গঙ্গাবাঈ তিক্তভাবে বল্লেন, 'ঠিক বলেছ বাবুজী।'

যমুনাবাঈ চা দিলেন। অতিথিদের কথার স্রোত অন্যদিকে বইল।

১২

পাঁচ টাকা ভাড়ায় খেলাঘরের মত ছোট জানলা, জালিকাজ করা গবাক্ষ, আর মোলারামের আঁকা ছবির মত উঁচু-নিচু 'ঝরোকা' অলিন্দ হাওয়ালা সেকেলে ধরণের ছোট্ট বাড়ীর একটিতে নীতিশ থাকে। সামান্য মাহিনার একটি মীনা চাকর তার কাজ করে দিয়ে যায়। তার স্ত্রীও কখনো কখনো আসে, স্বামী অসুবিধার সময় না এলে। আর তখন তাদের ছোট ছোট শিশু বালক-বালিকা ছেঁড়া কাগজের ছবি, কাগজ, সিগারেটের রুপালি রাংও, খেলাঘরের অমূল্য সম্পদ, কখনো কখনো দুটো একটা পয়সা নিতে আসে। আর আসে সেই সঙ্গে নগ্নপদ জীর্ণ আঙরাখা ও ধুনুসীপরা কৌপীনবাস ছেঁড়া বস্ত্র খণ্ডে মাথা ঢাকা পাড়ার প্রতিবাসী বালক, নগ্নকায় শিশু, ছেঁড়া ঘাগরা ওড়না জামাপরা বালিকা। বাবুজীকে তারা ভয় করে না। বাবুজীর সঙ্গে বহু রকম গল্প করে তাদের নিজ ভাষায়। ওদের ভাষাজ্ঞানহীন নীতিশ সেই গল্প শোনে, আর ভাষা শেখে নিঃসঙ্কোচে। আর তারাও নিঃসঙ্কোচে তার ঘরের জঞ্জাল আবর্জনা ভাঙা কলম নিব, খালি দোয়াত, ছেঁড়া খবরের কাগজের ছবি, বিলিতি মাসিকের ছবি নিয়ে আসে। প্রাচুর্য্য বিলাসময় পরিবারের আওতায় পালিত, নানা বস্তুতে

লুব্ধ ও মুগ্ধ অথচ বঞ্চিত লাঞ্ছিত নিজের জীবনের কথা নীতিশের মনে পড়ে যায় ওদের দেখে। নীতিশের কি মনে হয়। তার পঞ্চাশ টাকা মাহিনা থেকে মাসের প্রথমে সে নিয়ে আসে সস্তা নানা রঙের লজঞ্জুস বিস্কুট। কখনো বা ছোট ছোট কম দামী দু' একটা জামা। কখনো স্কুলে-পড়া কারুর জন্য সস্তা বিলিতী ছবির বই একটা দুটা। সেদিন তাদের আনন্দময় কলরবের মাঝে সহসা নিজের বঞ্চিত নিষ্ঠুর শৈশবের শিশু নীতিশ যেন তার মন থেকে বেরিয়ে আসে, খেলা করে যেতে চায় সেই দলে। তার মনে হয়, সে আর তারা সবাই এক। কি একটা উন্মন দুঃখে তার মন ভরে ওঠে। যেন মনে হয় কি করা যেতে পারে,—কেন করা যায় না, কেন অতি সামান্য, যৎসামান্য, অতি নগন্য প্রয়োজনও ওদের মেটে না! অতি তুচ্ছ বস্তু পাওয়ার হাসিও ওদের মুখে কেউ ফোটায় না। কুখাদ্য খাওয়া, গাড়ীতে বসতে না পাওয়া, মনীশ প্রবীরদের বাল্য ঐশ্বর্য্যময় খেলাঘরের শুধু দর্শক ও সাথী, অপ্রতিভ লুব্ধ, সেদিনের বহু বঞ্চিত বালক আজকের নীতিশের মনের মধ্যে কি যেন গুঞ্জন করে—যার সেদিন বিস্ময়ের সীমা ছিল না, নির্বাক অভিযোগের শেষ ছিল না, কেন এমন হয়? কেন? কেন?

আজো তার মনের মাঝে সেই মূঢ় দর্শক 'বালক প্রতিকারহীন কোন্ বিচারের' কথা ভাবে।

তারি মাঝে মাস কেটে যায়, বছর যায় ঘুরে। প্রতুলের মা, ভাই বোন, যমুনাবাঈদের বাড়ী, পল সাহেবের বাড়ী ছাড়াও মিলের শ্রমিকদের ভাঙা কুঁড়ে, তাদের জীবনযাত্রা, ও অনাথ আশ্রমের অনেকের মুখ চেনা হয়, যেন পরিচয়ও হয়। আর বড় বড় শেঠদের ও রাজদরবারের চুনোপুঁটী কর্মচারীদের সঙ্গেও চেনা হয়।

ধনী দরিদ্রের, প্রাচুর্য্য অভাবের, সমস্ত ভেদই চিরদিনের মত সমান বার্ত্তাই বয়ে আনে একইভাবে।

সন্ধ্যার পর নীতিশ প্রতুলের বাড়ী আসে।

একদিন প্রতুলের মা বল্লেন, 'আমার এক পিসতুতো বোনের মেয়ে আজমীঢ়ে চাকরী নিয়ে এসেছে কনভেন্টের স্কুলে। সে আজ এসেছে। তাকে হয়তো তোমরা চেন। তোমাদের সুমিত্রা বৌদির বোন হয় সম্পর্কে।

সুমিত্রা বৌদিদের বা তাদের কোনো বোনের জন্য নীতিশের কোনো কৌতূহলই ছিল না আর, বরং যেন কি একটা বিতৃষ্ণা তার লুকোনো ছিল।

সে বল্লে, 'ও।'

বিনু মিনুর তখন গল্প ও খবর জোগাড করার প্রতিযোগিতা চলেছে। পডা খেলা আর সঙ্গীদের কাহিনী।

চৈত্রের সন্ধ্যা। আঙিনায় সতরঞ্চি পাতা দডির খাটে বসে গল্প হয়—মা রান্না করার অবসরে এসে বসেন।

প্রতুল নীতিশ বিনু মিনুব গল্প হয়। কখনো বই, কখনো স্কুল, কখনো মিল, কখনো প্রতিদিনের বাইরের জগৎ—এই গল্প।

বীণা এসে দাঁড়ালো তার মাসীমার পাশে।

প্রতুল বল্লে, 'তোব মনে নেই নিতু, এ সেই বুলুদের ইস্কুলেব বীণা মুখুয্যে।'

নীতিশের মনে পডল, এ সেই বীণা যে জালিযানওয়ালাবাগের কথা বলেছিল এবং যার আর একটা বড পবিচয 'কালো।'

প্রবোধ মুখুয্যের কালো মেয়ে বীণা। তৃতীয পরিচয, মাসীমার বোনঝি।

বিদেশীভাবে পরিচয দেওযা আব পরিচিত কবে দেওযার প্রথা এখনো এদেশে কাগজের ফুলেব মতই আডষ্ট ও মিথ্যেভাবেই আছে। সম্পর্ক দিয়ে পরিচয়ই এদেশে সোজা, আর চলে ভাল। কাজেই বুলুদের ইস্কুলেব বীণা এবং মাসীমার বোনঝি এইটেই সোজা সহজ পরিচয়।

বাংলা দেশের কালো মেয়েটি নীরবে একটি নমস্কার করে মাসীমার কাছে বস্‌ল।

বিনু মিনুর বিশ্রম্ভালাপ, প্রতুল নীতিশেব মদু স্ববে আলাপ আর মাসীমার বীণার ঘরোয়া প্রশ্নোত্তরে সন্ধ্যা শেষ হয়ে রাত্রি হ'যে গেল।

নীতিশ চলে গেল

মাসী বোনঝি আর প্রতুল গল্প করেন।

মেয়েদেব পরিচয়—হয় শুধু সম্পর্কেরই ইতিহাস নয় পরিচয়হীন সম্পর্কহীন রূপবহ্নিবিলাসে পোড়ানো ও পুড়ে যাওযার কাহিনী, এ ছাড়া আর কোনো পরিচয়—মানুষের পরিচয় পৃথিবীর ইতিহাসে স্পষ্ট করে পাওয়া যায় না। চিরকালই হয় তারা সতী সীতা সাবিত্রী, নয়, উর্বশী বসন্তসেনা ক্লিয়োপেট্রার দলে। কিন্তু এই যুগে কোনো কোনো জায়গায় সে যুগ শেষ হয়ে গেছে। সেইখানে আধুনিক ব্যাকুল, আপনাকে খুঁজে ফেরা দু চারটি মেয়ের মাঝে বীণাও যেন একজন ছিল। ধনী দুহিতার সচ্ছল সমাদৃত পরিমণ্ডলে আর অস্পষ্ট ভাবনার, কল্পনার, আশার নীহারিকা মণ্ডলের মাঝে থাকতে থাকতেই তার বাপের মৃত্যু হ'ল।

সম্পর্কের পট পরিবর্তন হ'ল। অকস্মাৎ বীণা দেখতে পেল যেখানে সে নিশ্চিন্ত হয়ে এতদিন দাঁড়িয়েছিল সেখানে পায়ের নীচে আর সোনার বা মাটীর পৃথিবী নেই,—সেটা আকাশ, শূন্য। ভাই বোন আর এক বাপ মার সন্তান নয়, সহসা বাড়ীর আশ্রিত প্রসাদভিখারীর দলের মাঝে সে পড়ে গেছে যেন।

ভ্রাতৃ-বধূদের, তাদের সন্তানদের পাশে এখন বীণা তাদের অনূঢ়া পিসি মাত্র—কালো বলে যার বিয়ে হয়নি।

এম-এ, পাশ বীণা। পিতা বহু অর্থের প্রলোভনে লুব্ধ করে মনের মত জামাতা সংগ্রহের বহু চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তা মেলেনি।

বীণা চাকরী নিল মেয়েদের কোন কলেজে প্রফেসারী।

তাতে বাড়ীতে শান্তি থাকে না, কেননা মান থাকে না ভাইদের।

এতকথা মাসীমাকে বলে না।

তাঁর প্রশ্নের দু' একটা সংক্ষেপে উত্তর দিয়ে বীণা একটু হেসে বল্লে: 'জানো মাসীমা, একটা কালো কুৎসিত ছেলে যদি প্রফেসার হয়, তার দাম কিন্তু বিয়ের বাজারে কম হয় না।'

প্রতুল শুনছিল গল্প, বল্লে, 'বাঃ, বেশ বলেছ তো।'

মাসীমা বল্লেন, 'সত্যি।'

বীণা চুপ করে থাকে। তার মনে হয় দামটা কিসের? টাকার তাহলে কি নয়? একটা ছেলে প্রফেসারের টাকা আর মেয়ে প্রফেসারের টাকার দামের তফাৎটা কি? মেয়েদের দাম শুধু তাকে একজন মানুষের দরকারে? সমস্ত সম্পর্ক অতিক্রম করে মানুষ হিসেবে তার মূল্য নেই? দরকার নেই? পৃথিবীর কোনোখানে চিরদিনের ইতিহাসে একদিনো সে মানুষ হিসেবে পরিচিত হলনা কেন?

মাসীমাও চুপ করেছিলেন, তারপর বল্লেন, 'তা শুনেছিলাম যে নলিনীর কাছে (বীণার মা) তোর নামে অনেক টাকা ও বাড়ী রাখা আছে—বিয়ের জন্য, সেটা তো তোরই ?'

বীণা একটু চুপ করে থেকে তারপর বল্লে, 'জানিনা তো। বাবা তো কিছু বলেন নি।' টাকার কথা সে শুনেছিল আগে। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর জানা গেল সেকথা শুধু কল্পনাতেই ছিল। সে দুহিতা, পুত্র নয়,—দোহনকারিণী এবং অতিরিক্ত! মাসীমা বল্লেন, 'তা এত দূর দেশে চলে এলি কেন, মার কাছে তো বেশ ছিলি?'

বীণা এবার হেসে বল্লে, 'দেখছি সম্পর্কের নাম খ্যাতিকে ছাড়িয়ে গিয়ে আমার নিজস্ব কিছু আছে কি না, আমার দাম আমার কাছে যদি কিছু পাই!' 'মার কাছে'র কথার জবাব দিতে পারল না।

মাসীমাও হাসলেন, 'বেশ বলেছিস্।'

প্রতুল অন্যমনে ওদের কথা শুন্‌ছিল, তার মনে হল, বীণার মনের সঙ্গোপন কোণে সম্পর্কের সম্বন্ধহীন যেন কে একজন একাকিনী নিঃসঙ্গ বীণা আছে—যে শুধু দর্শক। সে অবাক হয়ে সম্পর্কের পটভূমিকায় এই বীণাকে দেখছে। সে বীণা যেন পিতৃমাতৃ স্নেহকে সম্মান করে, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারে না। ভাইবোনের সম্পর্ককে মধুর মনে করতে চায়, কিন্তু সত্য মনে করতে পারে না। সে কি এরি মাঝে অস্পষ্টভাবেই পৃথিবীকে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেছে? মেয়েদের সমস্ত সম্পর্কের নীচে যেন অতল গহ্বর আছে, সত্য কিছু নেই,—জানতে পেরেছে? তাদের জীবন সবটাই প্রসাদ, প্রাপ্য কিছু নেই জানতে পেরেছে? প্রতুল ভাবে, শুধু অর্থার্জনের অক্ষমতাই কি তাদের এত অসহায় করে রেখেছে? পৃথিবীর কোন্ প্রয়োজনীয়তার বিচারশালার মানদণ্ডে কাঞ্চন মূল্যে তাদের মূল্য নির্ণয় হচ্ছে চিরদিন ধরে?

১৩

দেওয়ালীর ছুটি এবং উৎসব এসে পড়ল।

বীণা এলো মাসীর বাড়ী, রুথ এলো নিজের বাড়ী।

শ্রুতি পরিচয় হয়েছে নীতিশ ও প্রতুলের মুখে পরস্পরে। এবারে ভালো করে চেনা শোনা হ'ল দীপাবলির আলো ঝলমল সহর দেখতে গিয়ে। জননীরা বেরুলেন না।

রুথ বল্লে, 'চলুন মিস্ মুখার্জি, আমাদের দেশের দেওয়ালী আপনাদের দেখিয়ে আনি।'

উঁচু-নিচু টিলা ও পাহাড়ে-ভরা ছোট্ট সহরের পথ, ধনী দরিদ্রের মাটীর প্রদীপ ও রঙীন আলোর উৎসবে আর বিচিত্র বসনভূষণে ভূষিত নরনারী বালক-বালিকাতে ভরে গেছে। বাজার দেওয়ালীর ঝক্‌ঝকে বাসন আর রঙীন খাবারে ভরা। দেওয়ালীতে বাসন কেনা আর খাবার ভেট দেওয়া দেশের প্রথা।

রুথ কিনল চামচ, বল্লে, 'মা-রা তো হিন্দু, কিনি কিছু বাসন,—তা চামচই আমাদের দরকার আছে।'

মা-রা হিন্দু শুনে বীণা অবাক হয়ে চুপ করে রইল।

রুথ বল্ল, 'চলুন ফেরত পথে আমাদের বাড়ী। আজ দেওয়ালীর 'গজ লক্ষ্মী' পূজো মাসীমা করবেন, প্রসাদ খেয়ে আসবেন।'

বাংলা দেশের বিজয়ার উৎসবের মত দেওয়ালীতে মিষ্টি খাওয়ানো আর খাওয়া পশ্চিমের প্রথা।

বাহির দুয়ারে বেশী প্রদীপ জ্বলছে না, দুটি মাটির প্রদীপ মাত্র জ্বালা আছে।

অন্তঃপুরে গঙ্গাবাঈয়ের ঘরের পর্দা আজ তোল। নীতিশরা সেখানে এসে দাঁড়াল।

গঙ্গাবাঈয়ের শোবার ঘরের একপাশে একটি ছোট্ট চৌকীর ওপর রেশমের চাদর পেতে লক্ষ্মীর আসন করা হয়েছে চৌকীর মাঝখানে ফুলের মালাতে সাজানো মা লক্ষ্মীর ছবি। দু পাশে দুটি মাটীর সাদা হাতী, তার পিঠে উঁচু হাওদা, হাওদার চারিদিকে ছোট ছোট মাটীর প্রদীপ করা। তাতে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বেলে দিয়েছেন। আশেপাশে দীপ ধূপ জ্বালা, থালাভরা চিনির খেলনা, মঠ কদম, বাতাসা আর বরফি কলাকন্দ চারিদিকে সাজানো। শিউশরণ পল সাহেব, মোহনলাল এবং রুথ এসে দাঁড়িয়েছিল।

গঙ্গাবাঈ পূজা করছিলেন, অনেক লোকের আগমনে একবার পিছন ফিরলেন। মুখের ভাব যেন নির্লিপ্ত কঠিন। পূজারিণীর মত নম্র বা কোমল নয়,—নীতিশের মনে হল।—যেন ভিতরে অশান্ত।

রুথ বীণাদের বল্লে, 'জুতো খুলে আপনারা ভিতরে যান, মাসীমা আমাদের যাওয়া পছন্দ করবেন না।'

নীতিশ বীণা প্রতুল জুতা খুলল, কিন্তু ভেতরে গেল না। সঙ্কুচিত ভাবে সকলেই বাইরে দাঁড়িয়ে রইল।

পূজারীব্রাহ্মণহীন, অঙ্গহীন, আনুষ্ঠানিক পূজো শেষ হ'ল। যমুনাবাঈ চন্দন ঘষছিলেন, মালা সাজাচ্ছিলেন—বোনের পূজোর যোগাড় দিচ্ছিলেন।

এবারে গঙ্গাবাঈ প্রসাদ নিয়ে এলেন। টেবিলের ধারে ছোট ছোট চায়ের প্লেটে বাতাসা, মঠ, বরফি, কলাকন্দ, ঘিওর সাজানো হ'ল। যমুনাবাঈ সকলকে দিলেন।

সহসা পল সাহেব বল্লেন, 'আমার একটু কাজ আছে আমি উঠি।'

মোহনলাল বল্লেন, 'সেকি, একটু মিষ্টি খাও ?'

শিউশরণ বল্লেন, 'মিষ্টি আর একদিন খাব,—আর মিষ্টি আমার ভাল লাগেনা। আজকে দেরী হয়ে যাবে, যাই।'

শিউশরণ চলে গেলেন।

গঙ্গাবাঈয়ের পূজো শেষ হয়েছিল। তিনি এসে দাঁড়ালেন হাতে প্রসাদী ফুলের মালা দুটি। বল্লেন, 'বাবুজী তোমরা ব্রাহ্মণ, আমার মালা দুটি নাও। ভাল হাতে পড়ল মালা।'

রুণু হেসে বল্লে—'মাসীমা, আমরা পাব না ?'

গঙ্গাবাঈও হাসলেন, বল্লেন, 'তোমরা কি ঠাকুর পূজোর মালা ভক্তি করে নেবে ?' তার পরেই টেবিলে চেয়ে বল্লেন, 'শিউশরণ ছিলনা ? কোথায় গেল ? প্রসাদের ভয়ে বুঝি পালালো।'

মোহনলাল বল্লেন, 'সে কি কাজ আছে বলে চলে গেল।'

গঙ্গাবাঈ একটু চুপ করে রইলেন, তারপর বল্লেন, 'সে প্রসাদ নেবেনা বলে চলে গেল। আজকে বাইরের আদর না জানলে পারতে তোমরা। এ পূজো তো শুধু আমাদের দুই বোনের, এতে তো আর কেউ নেই।'

মোহনলাল অপ্রস্তুতভাবে বসে রইলেন।

জননীদের পুরুষানুক্রমিক ধর্ম্ম কলহের পথের সঙ্গে ধর্ম্মান্তর গ্রহণকারী ছেলেমেয়েদের ভক্তি বা বুদ্ধির দিক দিয়ে বিরোধ ছিল কিনা বলা যায় না কিন্তু তারা নীরব থেকে সম্ভ্রমে মায়েদের ধর্ম্মের আচার অনুষ্ঠানকে কিছুটা মেনে, কিছু এড়িয়েই চলত। জননীদেরও যেন নিরুপায় ক্ষোভের অন্ত ছিল না। অসহিষ্ণু গঙ্গাবাঈ মাঝে মাঝেই কঠোর মন্তব্য করতেন ছেলেমেয়েদের ওপর। ভুলে যেতেন এই ধর্ম্মান্তরগ্রহণ তার স্বেচ্ছায় কারনি। যমুনাবাঈ চুপ করেই থাকতেন।

কিন্তু বিপদ এলো যেন ক্রিশ্চান বন্ধুদের নিয়ে। যার ঠাকুর পূজো আর অন্য কোন ধর্ম্মকে নিরপেক্ষ দৃষ্টি ও দরদ দিয়ে মেনে নেয় না। যাদের পরমত সহিষ্ণুতা নেই গঙ্গাবাঈয়ের মতনই।

বাসি দেওয়ালী। সন্ধ্যাবেলায় দু' চারটি করে মাটীর প্রদীপ জ্বলছে সকল ঘরে নিয়ম মত। গঙ্গাবাঈয়ের শোবার ঘরের ওপাশে ঠাকুরের ঘরেও প্রদীপ জ্বলছে।

নীতিশ এলো। বাড়ীতে মোহনলাল রুণু কেউ নেই। প্রভুলও আসেনি।

গঙ্গাবাঈ যমুনাবাঈ পরম স্নেহে ও সমাদরে তাঁদের ঘরে নিয়ে গেলেন নীতিশকে। বল্লেন, 'আসুন বাবুজী আমাদের পূজোর ঘর দেখে যান।'

নীতিশ জুতো খুলে এক পাশে গিয়ে বসল।

ছোট্ট তামার পেটা পেতলের ওদেশী ঘড়ায় বোধ হয় গঙ্গা বা যমুনার জল রয়েছে একটি তাকে। শ্রীনাথজী, গোপালজী, রাধাগোবিন্দ, মহাবীরের, রামসীতার ছবি সাজানো আছে তাকে। পূজোর কোশাকুশী, পঞ্চপ্রদীপ, পানিশঙ্খ পুষ্পপাত্র, ধূপদানী ও পিলসুজও রয়েছে। ঝক্‌ঝকে করে সব মাজা—মনে হয় প্রত্যহ নিয়মিত পূজো করেন। কয়েকখানি বই,—গীতা, রামায়ণ, মহাভারতই বোধ হয়।

'বাবুজী, সরবৎ খাবেন প্রসাদী 'ওলার'?' গঙ্গাবাঈ জিজ্ঞাসা করলেন। 'ওলা' চিনির ডেলা বা নাড়ু।

নীতিশ বল্লে, 'সরবৎ আর সন্দেবেলা খাবন, চা খেয়েছি খানিক আগে।'

গঙ্গাবাঈ বল্লেন, 'প্রসাদে না বলতে নেই, একটু নিন।'

নীতিশ হাতে করে সামান্য ভেঙে নিল। প্রসাদের ওপর নিষ্ঠা তার আধুনিক ছেলেদের মতই নির্লিপ্ত, কিন্তু গোঁড়া হিন্দু বাড়ীর ছেলে বলেই সবই মেনে নিতে অভ্যস্ত ছিল।

হঠাৎ গঙ্গাবাঈ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি শুদ্ধি বিশ্বাস করেন বাবুজী?'

নীতিশ অবাক হয়ে বল্লে, 'শুদ্ধি?'

'হ্যাঁ, এই ক্রিশ্চানের বা ধর্মান্তরিতের আবার নিজ ধর্মে ফিরে যাওয়া।'

নীতিশ একটু চুপ করে রইল, তারপর বল্লে, 'সেতো নিজের ব্যক্তিগত মত গঙ্গাবাঈ। আমি তো ধর্মান্তরিত নই সুতরাং আমি সে মনোভাব বুঝতে পারব না।'

গঙ্গাবাঈ যমুনাবাঈয়ের দিকে একবার তাকালেন, তারপর সহসা বল্লেন, 'আমরা ভাবছি কৃষ্ণকে শুদ্ধি নেওয়াব, আপনার কি মনে হয়?'

নীতিশ আশ্চর্য্য হয়ে গেল। এরকম ঘরোয়া প্রশ্নে তার মতামতের কি দরকার বুঝতে পারে না। সে কি বলবে যেন ভেবেই পেল না, বল্লে, 'সেতো কাবেরীবাঈ সাবালিকা হয়েছেন, বড় হয়েছেন, তিনি বুঝবেন, তিনিই মতামত দিতে পারেন। মোহনলালজী কি বলেন? তিনিও শুদ্ধি গ্রহণ করবেন?'

গঙ্গাবাঈ উষ্ণভাবে বল্লেন, 'না, সে গোঁড়া খৃস্টান, সে শুদ্ধি নেবে না, সে বিশ্বাসই করে না। কৃষ্ণও জানেনা, তবে সে মেয়ে, সে রকম হতে পারে। তাহলে তার বিয়ে আমরা ব্রাহ্মণের ঘরে দিতে চেষ্টা করব।'

সমস্ত কথাবার্তা একেবারে ঘনিষ্ঠ পারিবারিক সীমায় এসে পড়েছে বলে মনে হয় নীতিশের। সে অপ্রস্তুত হয়ে যাচ্ছিল, বল্লে, 'বেশ তো।'

এবারে গঙ্গাবাঈ বল্লেন, 'বাবুজী আপনি তো ব্রাহ্মণ, কিন্তু গোঁড়া নন। আমরা যদি রুথকে আপনাকে দিই, আপনি তাকে গ্রহণ করবেন?'

যমুনাবাঈ অবাক হয়ে বোনের দিকে চাইলেন। নীতিশও হতবুদ্ধির মত ওদের দিকে চেয়ে রইল। তার মুখে যেন কোনো কথাই এলো না খানিকক্ষণ।

তারপর বল্লে, 'কিন্তু আমি যেন শুনেছি শিউশরণজীর সঙ্গে তাঁর বিয়ের কথা আছে।'

গঙ্গাবাঈ তিক্তভাবে বল্লেন, 'সে প্রস্তাব করে যদি তাকে আমরা জবাব দিয়ে দোব। আপনি জানেন তো সে ব্রাহ্মণ নয়? আপনি বিয়ের মত করলে আমরা রুথকে সেই কথা বলে শুদ্ধি নেওয়াব। আপনার কি ওকে ভাল লাগে না? ওতো দেখতেও ভালো।'

নীতিশ অপ্রতিভ লজ্জায় ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌ল, বল্লে, 'হ্যাঁ, উনি খুব ভাল মেয়ে, কিন্তু আমি বিয়ের কথা তো ভাবিনি।'

রূঢ়ভাবে তিনি বল্লেন, 'তাহলে আপনি এখানে আর আসবেন না। আপনি জাত মানেন তাই বিয়ে করতে পারবেন না?

নীতিশ বল্লে, 'জাত আমি মানি কিনা জানিনা কিন্তু বিয়ে করার কথায় আমাকে ক্ষমা করুন।'

নীতিশ নমস্কার করে চলে গেল।

১৫

পরদিন গঙ্গাবাঈ কোথায় বেরিয়েছিলেন অথবা পূজাপাঠে ব্যস্ত ছিলেন। যমুনাবাঈ রুথের কাছে বল্লেন ঘটনাটা।

রুথ অবাক হয়ে চেয়ে রইল। কথাটা যেন বুঝতে তার দেরী হতে লাগল।

যমুনাবাঈ হাতের বোনাটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন। ক'টি ঘর তুলতে হবে, কিম্বা ফেলতে হবে তাঁর মনে হচ্ছিল না ঠিক। অস্বস্তির যেন সীমা ছিল না।

রুথ সাম্‌লে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'মা, আমি কি এখনো ছোট মেয়ে আছি? —হিন্দুঘরের মত সম্বন্ধ করে আমাদের কোনোদিন বিয়ে হবে না, হিন্দুঘরের ব্রাহ্মণের ছেলেকে আমাকে বিয়ে করতে বললেই সে করবে? তোমরা কি

ভেবেছিলে ? ছি ! ছি ! বাবুজীর কাছে আমার মুখ আর রাখলে না। কি রকম সরমে আমাকে ফেল্‌লে বলতো ? আমাকে একবার জিজ্ঞাসা করতে পারতে ?'

যমুনাবাঈ শান্তভাবে বল্লেন, 'আমি জানতামই না একথা উঠবে,—গঙ্গাবাঈ হঠাৎ বললেন।'

রুথ নিষ্ঠুরভাবে রেগে গিয়েছিল, সে বল্লে, 'তোমরা কোনো দিন আপনাদের মধ্যে একথা বলাবলি করনি ? নইলে মাসীজী কেন বলবেন ?'

যমুনাবাঈ অপ্রস্তুত হয়ে বল্লেন, 'বাবুজীকে আমাদের খুব ভাল লেগেছিল, আর ভেবেছিলাম উনি বেশী জাতের বিচার করেন না। তাই নিয়ে আমরা একটু কথাবার্তা কয়েছিলাম কিন্তু এত কথা গঙ্গাবাঈ বলবেন আমি জানতাম না।'

যমুনাবাঈ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বল্লেন, 'পল সাহেবের তোমার ওপর ঝোঁক রয়েছে, সেইজন্যেই বোধহয় বলে ফেল্‌লেন '

রুথ কঠিন মুখে জননীর দিকে চেয়েছিল, বল্লে, 'পল সাহেবকে তোমাদের অপছন্দের কথা আমি জানি। আর উনি যে ব্রাহ্মণ বা উঁচু বর্ণের নন, সেইটেই তোমাদের বাধছে সেও জানি। কিন্তু তাই বলে তো ক্রিশ্চান হয়ে জাত বিচার করা চলে না, কিম্বা শুদ্ধি করে হিন্দু বিয়েও সোজা হবে না। আমি শুধু বলছি, আমার বয়স হয়েছে। আমি যে সমাজের যে ধর্মের আওতায় রয়েছি তাতে তো তোমাদের মতামত পুরো মানা-না-মানা আমারি ওপর নির্ভর করে। তোমরা তোমাদের পছন্দ, ভালো লাগা-না-লাগা আমাকে জিজ্ঞেস করে কথা কইলে না কেন ? আমিও ছোট হয়ে গেলাম বাবুজীর চোখে, আর তোমরাও বড় হলে না। বিয়ের সম্বন্ধ ছাড়া যেন তোমরা আর কোনো কথাই জাননা।'

রুথের রাগে ক্ষোভে চোখে জল এসে গেল। সে নিজের ঘরে চলে গেল। যমুনাবাঈ বোনার কাঁটাতে অনেক ভুল ঘর তুলেছিলেন, খুলতে লাগলেন।

রুথ-ও ঘরে স্যুটকেশ গোছাতে লাগল। তাকে কাল নাসিরাবাদ যেতে হবে। তার ছুটী ফুরিয়েছে।

মোহনলাল আর গঙ্গাবাঈ ফিরলেন।

মোহনলাল জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি যাবার গোছ করছ নাকি ?'

রুথ বল্লে, 'হ্যাঁ ভাইজী।'

ঘরের আবহাওয়া যেন থমথম করছিল। মোহনলাল ভাবলেন যমুনা-বাঈয়ের মন কেমন করছে।

মোহনলাল বোনকে বল্লেন, 'শিউশরণ তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, কি কথা আছে।'

বাইরের ছোট ঘরখানি। মোহনলালের পড়াশোনা বিশ্রাম শোওয়া সব ঐ ঘরটিতেই।

মোহনলাল আর রুথ এসে দাঁড়ালেন।

শিউশরণ জানলার ধারে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। শিউশরণের মুখটা যেন ম্লান চিন্তিত।

মোহনলাল বল্লেন, 'বসুন, পল সাহেব।'

শিউশরণ বল্লেন, 'হ্যাঁ বসি।'

তারপর বল্লেন, 'আমি একটা ভাল কাজ পেলাম বোম্বাইয়ে,সামনের সপ্তাহেই সেখানে যেতে হবে, পরশু যাচ্ছি।'

—'সে-কি?' মোহনলাল আর রুথ দুজনেই অবাক হয়ে এবং খুসী হয়ে বল্লে, 'কবে পেলেন? ঠিক ছিল না? আগে তো বলেন নি?'

'না, অনেক দিন ধরেই চেষ্টা করছিলাম। ভাবছিলাম পাব না, তা পেয়ে গেলাম। সরকারী চাকরী আর সুযোগ না ছেড়ে এখানে শুধু সাহেবকে বলেই চলে যাচ্ছি—ওকে আগেই বলা ছিল। আমার ছুটি পাওনা ছিল কিছু, সেইটেই এই সময়ে কাজে লাগল।'

রুথ মোহনলাল দুজনেই খুব খুসী হ'ল।

মোহনলাল বল্লে, 'আবার ফিরবেন নাকি ছুটী হ'লে-টলে? না একেবারে এ দেশ ছেড়ে দিলেন?'

শিউশরণ বল্লেন, 'হ্যাঁ, আসব বৈকি আবার। দেখি কত দিনে ছুটী দেয়, —আর কোথাও বদলি করে কি না।'

তারপর বল্লেন, 'ততদিনে মিস্ মিশ্র তো ডাক্তার হয়ে বেরিয়ে যাবেন বোধহয়। আপনারাও এ দেশে থাকলে হয় তখন।"

মোহনলাল বল্লে, 'আমি থাকবই বোধহয়। তবে কারেরী তো চাকরী করবে, কি বলিস?'

রুথ হাসলে, বললে,—'চাকরী করবই, প্রাইভেট প্রাক্‌টিস্ করব আমার সে টাকা কই। যাই হোক, আমরা এই আজমীঢ়, মারওয়াড়া, কিষণগড় এইসব জায়গায়ই আছি। খুঁজে পাবেন।'

কথায় কথায় সন্ধ্যা শেষ হয়ে গেল। যমুনাবাঈ একবার এসে দাঁড়ালেন।

বিদেশে চাকরী হয়েছে শুনে যেন খুবই খুসী হলেন। বেচারী পল সাহেব অতটা খুসীর কারণ বুঝতে পারলেন না—ভাবলেন উন্নতির জন্য।

তার পরদিন সকালে শিউশরণকে খাবার কথা বললেন যমুনাবাঈ।

পরদিন যথা-সময়ে সহজ আনন্দে কথালাপে সকলের খাওয়া-দাওয়া আর পল সাহেবের বিদায় নেওয়া হয়ে গেল।

রুথও বিকেলের ট্রেনে নাসিরাবাদ চলে গেল।

পরদিন শিউশরণকে ট্রেনে তুলে দিতে এলেন মোহনলাল। শিউশরণ অন্যমনস্কভাবে কি যেন একটা কথা ভাবছিলেন।

সহসা বল্লেন, 'আপনার কি মনে হয় আমার চাকরীটা ভাল হ'ল—'

মোহনলাল বল্লেন, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়।'

সিগ্‌ন্যাল তখনো পড়েনি, দেরী রয়েছে, হয়ত গাড়ী 'লেট' আসছে।

শিউশরণ বল্লেন, 'আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ভাবি, করা আর হয়নি। আজ তো চলেই যাচ্ছি।'

মোহনলাল বল্লেন, 'কি বলুন না?'

শিউশরণ বল্লেন, 'আমি এ চাকরী নিলাম, এতে পরীক্ষা দিয়ে উন্নতি আছে। অনেকদিন ধরে ভাবছিলাম মিস্ মিশ্রের মাকে জিজ্ঞাসা করব আমার সঙ্গে মিস্ মিশ্রের বিয়ে দিতে পারেন কি না। আপনাকেও জিজ্ঞাসা করব ভেবেছিলাম। কিন্তু স্কুলের চাকরীতে সামান্য মাহিনা, ভরসা করিনি। যমুনাবাঈকে এখন কি বলব একথা? অবশ্য কিছুদিন পরে, কাজটা পাকা হলে বা একটা পরীক্ষা দিয়ে উন্নতি হ'লে—কি মনে হয় আপনার? ওখান থেকে তাহলে চিঠি লিখব?'

মোহনলাল একটু চুপ করে রইলেন, তারপর বল্লেন, 'বেশ তো বলবেন, বলতে ক্ষতি কি।'

'আপনার মনে হয় ওঁরা মত দেবেন? মিস্ মিশ্রকে বুঝতে ঠিক পারি না, তবে তাঁর হয়ত অমত হবে না মনে হয়। কিন্তু আপনার মাকে আর মাসীমাকে আমার ভয় করে।' শিউশরণ লজ্জিতভাবে হাসলেন।

মোহনলালও হাসলেন ভয় করার কথা শুনে। মাকে তাঁরও ভয় কম নেই। রাশভারী, গম্ভীর রাগী মেজাজের জননীকে তাঁরই ভয় করে এখনো। কখন কাকে স্পষ্ট কথা বলে দেবেন বোঝা যায় না, কখন কার উপর কি জন্য রাগ করবেন জানা যায় না। যেন তাঁর মনের মধ্যে সমুদ্র-তরঙ্গ সমস্তক্ষণ তোলা-পাড়া করছে, যার শেষ নেই শান্তি নেই। কিসের এ অশান্তি কেউ বুঝতে পারেনা।

ছোটবেলায মোহনলালও বুঝতেন না, এখন যেন মনে হয় একটু বুঝতে পারেন। সম্প্রতি নীতিশের ঘটনাটা মাসীর কাছে শুনে সব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তার কাছে— কিসের এই দুঃখ, এই বেদনা, এই ক্ষোভ। তাঁদের মনের কোনো আশ্রয় নেই, অবলম্বন নেই। যে ধর্মকে তাঁরা এখনো আঁকড়ে ধরে আছেন সে ধর্ম ও সমাজ তাদের কোনো আশ্রয় দিতে পারেনি। দেবেও না। আজকাল কোথাও কোথাও শুদ্ধির খবর শুনে তাঁদের মনে আশা জেগেছে, যদি আজ শুদ্ধি গ্রহণ করে ছেলেমেয়েকে নিয়ে আবার তাঁরা সমাজ তথা সমাজান্তর্গত সংসার পান। তারপর বহুদিন পরে কালক্রমে হয়ত সকলে ভুলে যাবে এই পুরানো কথা। কিম্বা হয়ত তাদের নিয়েই নতুন সমাজ গড়ে উঠবে। বিলাতফেরৎ আর্যা-সমাজীদের মতই মিশে যাবে। এই হয়ত জননীদের গোপন ও ব্যাকুল আশা। এই জন্যই এই আকস্মিক প্রস্তাব নীতিশের কাছে।

কিন্তু একথা শুধু মোহনলাল ভেবেছেন, তাঁর ওদের ভাই-বোন দুজনকে বলতে সাহস করেন নি। নীতিশ যদি সম্মত হ'ত—তাহলে হয়ত তাঁরা ওদের বলতেন।

শিউশরণও চুপ করে করে ভাবছিলেন। মোহনলাল কিছুতেই একথা বলতে পারলেন না তুমি ব্রাহ্মণ নও, উচ্চ বর্ণের খৃস্টান নও, সেই জন্যই তোমার প্রস্তাব গৃহীত হবে না। আমরা খৃস্টান হলেও আমাদের মায়েদের জাতের মোহ আছে। হয়ত ছোট কথায় বলা যেত, যে মাসীমা রুথের অন্যত্র সম্বন্ধ করেছেন। কিন্তু এতো ছোট বয়সের বিবাহ নয়, আর রুথকে যদি জিজ্ঞাসা করে মত পায় শিউশরণ—।

মোহনলাল একটু হেসে বল্লেন, 'মাকে আমারি এখনো ভয় করে। তা হোক আপনি বলে দেখবেন।'

ট্রেন এসে পড়বার উপক্রম হ'ল। মোহনলাল শিউশরণ কোনখানে কোন ক্লাস দাঁড়াবে কুলীর সঙ্গে তাই নিয়ে কথা কইতে লাগলেন।

শিউশরণকে তুলে দিয়ে ফিরে রাত্রে এসে যমুনাবাঈয়ের সঙ্গে গল্প করতে লাগলেন মোহনলাল। দুই বোনের পুত্র কন্যারই দুই মাসীর সঙ্গে কেমন করে বেশী ঘনিষ্ঠতা হয়ে ছিল। গঙ্গাবাঈ ভালবাসতেন প্রশ্রয় দিতেন রুথকে, যমুনাবাঈ স্বভাবতই শান্ত প্রকৃতির ধীর স্বভাবের, তিনি মোহনলাল রুথকে প্রায় সমানই প্রশ্রয় দিতেন তবু ছেলে বলে যেন বেশী একটু মোহ ছিল মোহনলালের ওপর। দিদির মেজাজের ওপর ভরসা ছিল না কারুরই, ছেলেমেয়েরাও ভয়ে ভয়ে চলত,

যমুনাবাঈও। শুধু রুথই মাঝে মাঝে হেসে হেসে মাসীমাকে সত্যাসত্য দুচারটে কথা বলে দিত। গঙ্গাবাঈও তখন হাসতেন। একবাড়ীর মধ্যেও তাঁদের জাতি-বিচার যেন মোগলবাদশার হিন্দু বেগমের অন্তঃপুরের মত। নানা রকম করে ঠাকুরদেবতা ছোঁয়াছুঁয়ি বিচার করে চল্‌ত। অথচ পরম প্রিয়জন, দুজনেরই একমাত্র করে সন্তান, দুজনেই বিধর্মী। যাদের নিয়ে সব ছেড়ে আসতে হ'ল, সর্বত্যাগী হলেন, তবু ধর্মের প্রাচীর চিরকালের ব্যবধান রেখে দিল যেন।

যমুনাবাঈ কি একটা বই পড়ছিলেন। গঙ্গাবাঈ কোথায় 'কথা' শুনতে গিয়েছিলেন, কার্তিক মাস কোনখানে 'কথা' হচ্ছিল। অনেক দূরে একপাশে কোণের দিকে বসে তিনি কত কথা-কাহিনীর সঙ্গে ভক্ত নর্সীর, যবন হরিদাসের অস্পৃশ্য ভক্তদেব কাহিনী শোনেন ব্যাকুলভাবে যাদের ধর্ম এক করে দিলে, তবু জাত রয়ে গেল। কথক মাঝে মাঝে কবীর দাদুর ভজন গান করেন, শোনেন। বড় বড় মন্দিরের কথার মাঝে গঙ্গাবাঈ যেতে ভরসা করেন না, দূর থেকে দর্শন করে আসেন। নয়ত সামনের সিঁড়িতে বসে থাকেন।

মোহনলাল বল্লেন, 'মা ফেরেননি? কোথায় গেছেন? তুমি যাওনি?'

যমুনাবাঈ বল্লেন, 'নর্সী ভকতের কাহিনী কথা হবে আজ বুড়ো শিব মন্দিরের আঙিনায়। রাত হবে, দুজনে গেলে চলবে না, তাই আমি আজ গেলাম না।'

মোহনলাল এটা-সেটা বই রাখতে গোছাতে লাগলেন।

যমুনাবাঈ হঠাৎ বল্লেন, 'রুথ বলে গেল এবারে বড়দিনের ছুটীতে ও আসবে না, ওর পড়ার চাপ পড়েছে।'

মোহনলাল বল্লেন, 'তাতো পড়বেই, ওর যে এবারেই বেরুবার কথা।'

যমুনাবাঈ বল্লেন, 'হ্যাঁ, তার চেয়ে বেশী হয়েছে ওর রাগ। অপ্রস্তুত হয়েছে। এখানে এলে যদি বাবুজীর সঙ্গে দেখা হয়।'

মোহনলাল বল্লেন, 'হাঁ তাও বটে। তা সবটা শুনলাম না। কেন তোমরা ওকথা বাবুজীর কাছে বললে? বাবুজী কি কিছু বেশী ঝোঁক দিয়েছিলেন রুথের ওপর?'

'না, সেসব কিছুই নয়। বাবুজী জাত-টাত তেমন মানেন না আমাদের এ দেশের মত, আর বেশ ভাল ছেলে। গঙ্গাবাঈ জানতো, শিউশরণকে পছন্দ করেন না মোটে। বাবুজী ব্রাহ্মণও, তাই হঠাৎই গঙ্গাবাঈ কথা বলে ফেললেন।'

'তারপর, বাবুজী কি বল্লেন?'

'তিনি আর কি বলবেন, ঐ জবাব দিলেন, তোমাকে তো বলেছি সেদিন।'

মোহনলাল চুপ করে রইলেন।

তারপর বল্লেন, 'আজকে শিউশরণ যাবার সময় বলে গেল ও তোমাকে চিঠি লিখবে রুথের জন্য। আমাকে জিজ্ঞাসা করল, আমি কি বলি। একবার ভাবলাম বলে দিই, তুমি অন্য জায়গায় ঠিক করছে, তারপর ভাবলাম রুথের মন তো জানি না। বললুম 'লেখ না, দোষ কি?'

চকিত হয়ে যমুনাবাই বল্লেন, 'বললে সে?—আমি জানতাম সে বলবে। কি মুস্কিল হবে বলত, কি বলব ওকে?'

মোহনলাল বল্লেন, 'তুমি কি আর বলবে, রুথকে বোলো সে যা বলে তাই হবে।'

যমুনাবাঈ ব্যাকুল হয়ে বল্লেন, 'সে যদি মত করে?'

মোহনলাল হাসলেন, বল্লেন, 'অনিচ্ছায় ক্রিশ্চান না হয়েও ক্রিশ্চানের মত' হয়ে গেলে। আর কেন ভাবছ কোনো কিছু কি তোমার ইচ্ছেতে হবে না হচ্ছে?'

গঙ্গাবাঈ এসে পড়লেন। জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হচ্ছে কার ইচ্ছেতে?'

মোহনলাল হেসে বল্লেন, 'এই তোমাদের দুঃখের কথ হচ্ছে। কি করে বিধর্মী ছেলে মেয়ে নিয়ে বে-কায়দায় পড়ে গেছ '

মেজাজ ভাল ছিল, গঙ্গাবাঈও হাসলেন, 'তাতে পড়েছিই।'

যমুনাবাঈ এবারে বলে ফেললেন, 'শিউশরণ মোহনকে রুথের কথা বলে গেছে, আমাদের মত চায়। চিঠি দেবে।'

মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। গঙ্গাবাঈ কঠিন হয়ে গেলেন। অনেকদিন ধরে তাঁদের এই ভয়ই ছিল। এখন কি উত্তর দিয়ে এই অবাঞ্ছিত প্রস্তাবকে ঠেকানো যাবে।

মোহনলাল বল্লেন, 'মা, আমি শুনেছি বাবুজীকে বলেছ যা। কিন্তু আমরা ক্রিশ্চান, আমরা জাত মেনে চলব কি করে? তাছাড়া ব্রাহ্মণতো ঐ রামদাস বাবাজীও, ঐযে মন্দিরে জল তোলে, পরিষ্কার করে। ব্রাহ্মণতে সবাই এক রকম নয়। যেমন শিউশরণজী সূত্রধর বলেই সত্যিই একেবারে ওদের জাত-ভাইদের সবারির মত নয়। আমি বলছি না যে ওখানে বিয়ে হোক রুথের, আমি বলছি জাতের মধ্যেও রকমের কথা। ব্রাহ্মণও জ্ঞানী হয়, পণ্ডিত হয়, সন্ন্যাসী হয়; আবার মূর্খ হয়, ভিখারী হয়, নীচ হয়, ছোট কাজ করে, দেখনি কি? ও লেখাপড়া শিখেছে, বিদ্বান্, বুদ্ধিমান। তুমি জাত ব্রাহ্মণ হলেই বিয়ে দিতে কি?'

গঙ্গাবাঈ একটুখানি চুপ করে রইলেন। তারপর তিক্ত নির্লিপ্ত মুখে যমুনাবাঈয়ের দিকে চেয়ে বল্লেন, 'তা বেশ তো ওখানে তোমরা মত দাও।'

পরমুহূর্ত্তেই যেন মনে হল, তাঁর চোখে জল এসে গেল, যে দুর্বলতা তাঁর সহজে দেখা যায় না। তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। নিজেদের জীবন গেছে, সন্তানদের জীবনও অতিক্রম করে কতদূরে সমস্ত চলে যাচ্ছে যেন। যেন তাঁদের সহিষ্ণুতার বাইরে।

মোহনলাল আর যমুনাবাঈ চুপ করে হাতের খোলা বইয়ের দিকে তাকিয়ে বসে রইলেন।

ইচ্ছে করলেই চাকরী ছেড়ে চলে যাওয়া যায় না। তারপর স্কুলের কাজ, অনেকগুলি ছেলে, অনাথ ছেলেরাই বেশী, প্রোমোশন পাবার মুখে পড়ার অসুবিধা করে নীতিশ যাবার কথা বলেই বা কি করে। মোহনলালের সঙ্গে রোজ দেখা হয়—শিউশরণ চলে গিয়ে কাজের চাপও পড়েছে। কিন্তু মনের মধ্যে যেন কি অস্বস্তি ভাব আছে। এখানে তিন মাস, অন্ততঃ জানুয়ারি অবধি কাজ করতে হবে।

নীতিশ ভাবে, তারপর? তারপর কোথায় যাবে? আচ্ছা নই-র গেল। কিন্তু কি করে রুথদের বাড়ী বাদ দেবে। স্কুলের ছেলেগুলির উপর যেন মায়া পড়েছে। বাড়ীর আশপাশের শিশুগুলিও কম টানেনি। তারাই তো ওর সত্যিকারের সঙ্গী। সবাইকে ছেড়ে আবার কোথায় কোন্ কাজে কোন্ দেশে যাবে কে জানে। চুঁড় আডরাখাপরা কজোড়লাল। 'কজোড়' অর্থে ধূলামযলা, 'ঘরমরা' জননী সন্তান বাঁচানোর জন্য ফেলারাম নামের মত কজোড়লাল নাম রেখেছে। ওকে দেখলে ছুটে আসে, 'লজ্জী গোলী' (লজঞ্জুস)। সঙ্গে সঙ্গে পাড়ার ছোট ছোট আরো পাঁচটি ছেলেমেয়ে আসে, জীবজন্তুর মত নাম। মঙ্গলী, বুধী, কালী, গৌরী (ফরসা মঙ্গল মঙ্গলবারে ও বুধবারে জন্মেছে। 'সোমর' সোমবারে কারো বা জন্ম। ভাল ভাল নাম ঠাকুর দেবতার, বা ভাল করে রাখা নাম, শুধু উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ বৈশ্যের ঘরের শিশুদেরই গরীব হলেও দেখতে পাওয়া যায়। সব নামের সবাই আসে, বলে, 'বাবুজী, লাল গোলী দেও।'

নীতিশ অন্য মনে পকেট অনেকগুলি লজঞ্জুস নিয়ে বেরুল।

নিজের ভাবনা মোড় নিয়েছে, কজোড়লাল, মঙলী, সোমর, নানুগাদের (মামার বাড়ীতে জন্মেছে 'নানুগা' তাই) দিকে। পথে নেবে গেল।

প্রতুলদের বাড়ী যেতে আর প্রতিদিন ভরসা হয়না, যদি রুথদের কথা

জিজ্ঞাসা করে। কি বলবে, বলবার কি আছে। যেন ভাল লাগে না। বলা অবশ্য যায় কিন্তু গায়ে পড়ে কি বলা যায়।

শীতের আমেজ দেখা দিয়েছে। ছেঁড়া জামাপরা বালক-বালিকারা বড় হাতের জামা, কেউবা হাতে বোনা সুতার মোটা জামা পরে তাকে ঘিরে দাঁড়াল। বাবুজী কারুকে লালগুলি, কারুকে লাল মাছ, কারুকে লেবু একটা করে দিল।

তারপর স্টেশনের দিকে গেল। স্টেশনে গাড়ী যাওয়া-আসা, লোক নামা ওঠা দেখতে অনেক সময় কাটে। বই, খবরের কাগজ সহজে পাওয়া যায়। এক কাপ চা'ও পাওয়া যায়। কয়েক মুহূর্তের মাঝে অনেকখানি জগতের লোক অনেক স্তরের মানুষ তাদের মান, অপমান, লাঞ্ছনা, খাতির সবই এক সঙ্গে চোখে পড়ে। খানিকটা রাত্রি হলে নীতিশ ফেরে। ভবঘুরের মত উদ্দেশ্যহীন ভাবে ফিরে আসে। মনের যেন সমতা নেই, শান্তি নেই। অথচ তার কোনো দোষ ছিল না কেন যে জড়িয়ে গেল।

টুলুর কথা মনে পড়ে। সেও,—কিব দরকার ছিল ওর সঙ্গে বিয়ের কথা তোলার। আচ্ছা, কে তুলল? দিদি কি? না দিদি বোধ হয় নয়, তবে? জানে না। শুধু ভাবে কেন কথাটা উঠল। আর ও চলে এলে। ও যদি না আসত! তাহলে কি হ'ত? কে জানে, কি হ'ত জ্যেঠ মহাশয় রাগ করলেন তাতে তো ওখানে থাকা যেত না।···আর রুথ? এটা কি আশ্চর্য্য ঘটনা। কেন এমন মনে হয় লোকের। আচ্ছা, মোহনলালজী কি জানেন এসব কথা। শিউশরণ গেল কেন? ওই তো যেন রুথের ওপর আকৃষ্ট ছিল মনে হত। কিন্তু রুথের দিক থেকে তো কোনো রকম ঘনিষ্ঠতা বা নীতিশের দিক থেকেও সে রকম আগ্রহ দেখা যায় নি। তবে কেন এমন কথাটা গঙ্গাবাঈ বললেন

ওকে তাহলে এদেশও ছাড়তে হবে। কিন্তু এখন তো নয়, আরও মাস দুয়েক। তাইতো দুঃসহ হয়ে উঠছে। কিন্তু দুর্জয় শীত। বেলা ছোট্টো, স্কুল থেকে ফিরতেই সন্ধ্যা, কাজেই একটা সুবিধা যে কর্তব্যের দেখাশোনা করবার দায় থাকে না। শীতের সকালও বেলায়, আটটার আগে নয়, সন্ধ্যাও পাঁচটায়।

পোষের সন্ধ্যায় সহসা একদিন স্টেশনে নাবল বীণা। বীণা আশ্চর্য্য হয়ে বল্লে, 'আপনি এখানে? প্রতুলদা এসেছে নাকি? কিন্তু আমি তো খবর দিই নি।'

নীতিশের পরিচয় হয়েছিল, ঘনিষ্ঠতা হয়নি। কিন্তু বেশ ভাল লাগল যেন বাংলা কথা শুনতে, আর বীণার সহজ কথার সুর।

সে বল্‌লে, 'না, প্রতুলতো আসেনি। আমি এমনিই বেড়াতে আসি এখানে। পৌঁছে দোব বাড়ীতে।'

বীণা স্মিতহেসে বল্লে, 'বেশ তো মজা হ'ল। ভালই, চলুন একলা আর যেতে হবে না।'

নীতিশ বল্লে,—'বড়দিনের ছুটি?'

বীণা বল্লে, 'হ্যাঁ, ওদের বেশ ছুটী দেয়, তা দিন পনের। শুধু বসে থেকে কি করব। তার চেয়ে মাসীমাদের কাছে কাটিয়ে যাই। বাংলা কথা না বলে বলে যেন মনে হয় কোথায় রয়েছি প্রায় নির্বাসন।'

নীতিশ হাসলে, বল্লে, 'অনেকট তাই বটে।'

টাঙ্গার উপর জিনিস কটি তুলে ওরা বসে ঘড় ঘড় ছড় ছড় করতে করতে প্রতুলের বাড়ীর দিকে চল্‌ল।

নীতিশ বল্লে, 'ওখানে তো বাঙালী অনেক শুনেছি, আপনাদের আলাপ হয়নি? তাদের মেয়েরা পড়ে না?'

বীণা হাসলে, বল্‌লে, 'আমাদের সঙ্গে আলাপ করে না ওরা, আমরা যে 'টীচার'। সাদা 'টীচারের' সঙ্গে গায়ে পড়েই করে অবশ্য। ওদের বড় লোকদের বড় নাক উঁচু, আর গেরস্থরা ঘোর ভাল মানুষ গেরস্থ। বড়দের মেয়েরা দুটো তিনটে পড়ে আমাদের স্কুলে। 'কন্‌ভেণ্টে' পড়ে 'চাল' দেবে তাই। তাদেরও কম 'নাক' নয়।'

নীতিশ হেসে বল্লে, 'আপনারা ওদের তাহলে কি শেখান? যদি ওদের ঐ রকম মেজাজই রইল?'

বীণাও হেসে বল্লে, 'কিছু না। একটার পর একটা ক্লাস প্রোমোশন পাইয়ে দেওয়া ছাড়া আমাদের কি কাজ? আমর পয়সা নিয়ে পাশ করানো ছাড়া তো আদর্শ প্রচার করতে বসিনি, তাতে আবার বিলিতী স্কুলে। আমরা কিছু শেখাবার আগেই তারা খুব ভাল করে বড়লোক গরীব লোক দিশি স্কুল বিলিতী স্কুলের ভেদ তারতম্য জানে। রাজপুত আছে, শিক্ষিত ব্রাহ্মণ বেনিয়ার ঘরের মেয়েরা আছে, বাঙালীও বন্ধুম গোটা তিনচার। সবাই এক। ভাল করে ইংরেজীটা বলতে শিখবে, তারপর ভাল বিয়ে হবে, বাড়ী গাড়ীওয়ালা ঘরে। তাদের আদর্শের কি দরকার? দেশ বা জাত কিম্বা সমাজ বা অন্ত স্তরের মেয়েদের কথা? নাঃ। মেম সাহেবদের মত ইংরাজী বলা ছাড়া ওদের জীবনে এখন আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। সেইটাই ওদের সবচেয়ে বড় দরকার। তাহলেই

ভাল চাকরী অর্থাৎ ভাল বিয়ে হতে পারবে। ওদের অভিভাবক একজন সেদিন এই কথাই বলছিলেন।'

গাড়ী বাড়ীর দিকের রাস্তায় মোড় ফিরল।

নীতিশ অন্যমনস্কভাবে একটু হেসে বল্লে, 'তাছাড়া করবারই বা আছে কি বেচারীদের!'

তার নিজেদের পড়ার কথা, বিলাত যাবার, আকাঙ্ক্ষার কথা, বড় চাকরী পাওয়ার মোহের কথা মনে হচ্ছিল। তারা কোন্ কথা, কার কথা, কোন্ আদর্শের কথা, সমাজের কোন দুঃখ দারিদ্র্য দৈন্যের কথা ভেবেছিল। আগে কিছুই ভাবত না, মনেও করত না কোনো 'মণ্ডলী' 'এতোয়ারিয়া' 'বুধী' 'সোমারু' 'কজোড়া'দের কথা, যদি না বাড়ী থেকে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত না পেত। তাইবা ভাবতে জানে কতটুকু? দেখতে পায় মাত্র। হয়ত অবস্থার কোনখানে একটু মিল খুঁজে পায়?

হঠাৎ তার মনে হল—এই যে ওদের কথা ভাবা আর মনে করা যে কত ভাবছি, এও যেন শিক্ষিত মনের একটা বিলাস। তার মনকে যেন কে এক ঘা মেরে গেল। নিজেই নিজের কাছে সঙ্কুচিত হয়ে গেল। ওই শিক্ষাহীন অন্নহীন নিরুপায়দের সঙ্গে কারুরই কোনো মিল নেই। ওদের জন্য কিছু করতে না পারলে ভাবাটাও যেন নির্লজ্জ স্পর্ধা তাদের। যদি মহাত্মা গান্ধীর মত সত্যিকার ভাবতে পারত! তার মুখে আর কোনো কথা এলো না। গাড়ী দাঁড়াল প্রতুলদের বাড়ীর সামনে। হঠাৎ গাড়ীর শব্দে বিনু মিনু প্রতুল মাসীমা বেরিয়ে এলেন। বীণাকে দেখে আশ্চর্য্য ও পরম খুসী। নীতিশকে দেখে আরো আশ্চর্য্য হলেন এবং সেই যোগাযোগ সমস্যার ব্যাখ্যা শুনেও খুব খুসী হলেন।

রাত্রে বাড়ী ফিরে নীতিশ টেবিলের ওপর একখানা চিঠি পেল। বুলুর হাতের লেখা। অনেকদিন পরে। অনেক রকম খবর দিয়েছে। অসুখ-বিসুখ, নলিনের চাকরী পাওয়া, বেলা, ইলা, প্রবীর মনীশের খবর। শেষের দিকে একটা লাইন কাটা। তারপর সেইটেই আবার তলায় লেখা।

লেখা, ম্যালিগ্‌ন্যান্ট ম্যালেরিয়া হয়ে টুনু মারা গেছে এক মাস হল। শ্বশুর বাড়ীতেই ছিল।

মর্মছিন্নভিন্নকরা, অস্তিত্ব আশা জীবন ছিন্নবিচ্ছিন্ন করা প্রিয়জনের মৃত্যু শোক নয়, অন্তরঙ্গ পরম প্রিয় বন্ধুবিয়োগ নয়, পরম স্নেহাস্পদ স্বজনবিয়োগ নয়; কিন্তু নীতিশের যেন তেমনই অব্যক্ত বেদনা ক্ষোভের সীমা রইল না। কি যেন এক

অজানা অপরাধের বোঝা তার মনের ওপর পাথরের মত ভারী হয়ে চেপে বসল।

নীতিশ নিঃস্তব্ধ হয়ে বসে রইল টেবিলের সামনে চৌকিটায়।

১৫

হোলীর ছুটীতে নীতিশের যাবার সময় এসে পড়ল।

ছোট ছোট জিনিষপত্র কত-না দরকারী মনে হ'ত, সেগুলো ফেলাছড়া, বাক্স-বিছানা সব গোছগাছ করা সারা হ'ল। পাড়ার শিশু ভোলানাথের দল সব এসে শুষ্ক মুখে, কেউবা সকৌতূহলে ঘরে দাঁড়িয়েছিল। বাবুজী কেন যাবেন? কোথায় যাবেন? কবে ফিরবেন? ফিরবেন যখন কি আনবেন ওদের জন্য? বুধির জন্য আর কজোড়ের জন্য বল আরো দু একজনের জন্য ঐসব জিনিষের ফরমাস হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে ক্যালেণ্ডার, ছবি, ছেঁড়া বই, ভাঙা পেনসিল, খালি দোয়াত, সাবানের বাক্স, বিন্নু-মিন্নুর জন্য আনা রঙিন পাথর, নানাবিধ মূল্যবান সম্পদ তার সংগ্রহ করতে লাগল।

নীতিশের মনে হতে লাগল সত্যি দেবার মত যদি কিছু থাকত, কিম্বা কিছু কিনে দেয়া যেত। না, দেবার মত তো কিছু নেই-ই। কেনবার মত পয়সাও নেই। অত জনকে দেবেই বা কি করে।

গোছগাছ সারা হ'ল।

প্রতুলের বাড়ীতে গিয়ে দেখল, বীণা এসেছে। ছুটীতে কয়েকদিন দেখা-শোনা হয়ে যেন বেশ ভাল লাগল তাকে। নীতিশের ওকে দেখলে মনে হয় টুলুর কথা। যদিও টুলুর সঙ্গে আকারে বা স্বভাবে সাদৃশ্য কিছুই নেই।

বীণার নির্ভয় মন, সোজাস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি, সাহস, টুলুর সঙ্গে মেলেনা। সে ভীরু অসহায় প্রকৃতির ছিল—তার পারিপার্শ্বিক তাকে এই অবস্থাতেই রেখেছিল।

নীতিশের মনে হয় টুলুকে যদি এইভাবে মানুষ করা হ'ত।

বীণা জিজ্ঞাসা করলে, 'সত্যি কাল যাচ্ছেন? কোথায় যাচ্ছেন?'

প্রতুল বল্লে, 'যাওয়া ঠিক করে ফেল্লি একেবারে?'

নীতিশ বল্লে, 'হ্যাঁ যাচ্ছি তো কাল। তবে কোথায় যাব ঠিক, এখনও ঠিক করতে পারিনি। মনে হচ্ছে একবার কলকাতায় যাই।'

প্রতুল বল্লে, 'যা না, ভালই তো। সুধীশ তো যেতে লিখল কতবার।'

প্রতুলের মাও এসে দাঁড়িয়েছিলেন, বল্লেন, 'একবার যাও না দেশে, জ্যেঠারাও তো বুড়ো হয়েছেন দেখাশোনা করে এসো। আপনার জন বলতে ওঁরাই তো আছেন।'

নীতিশ চুপ করে রইল। প্রতুল একটু হাসলে।

আপনার জন? সম্পর্ক অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সম্পর্কই তো সব নয়, আশ্রয়ও সব নয়, তা ছাড়াও যে কিছু আছে পৃথিবীতে। কিন্তু সেকথাও আর ভাবতে ইচ্ছে হয়না নীতিশের। যাবার লোভ হয়, কিন্তু কি এক তিক্ত ভয়ে সমস্ত অন্তর কটু হয়ে ওঠে।

প্রতুলের মাকে নীতিশ বল্লে, 'হ্যাঁ যাব। আগে ভাবছি, এদিকে কাজের একট ঠিক করি, তারপর যাব।' তারপর প্রতুলকে বল্লে, 'কি বলিস্?'

'কাজ কোথাও পেলি?' প্রতুল বল্লে।

'আমেদাবাদে শুদ্ধ খদ্দর ভাণ্ডারে একটা কাজ পেতে পারি।'

'সেকি? খদ্দর ভাণ্ডার? সেকি সুবিধা হবে? কে যোগাড করে দিলে?' আশ্চয্য হয়ে প্রতুল বল্লে।

'আমাদের এখানকার খাদি ভাণ্ডারের বজরং সহায় বলছিলেন। তা মনে হ'ল দেখাই যাক্ না, কিছুই ভাল কাজ তো করছিনা, যদি কোন ভাল কাজের সঙ্গেও থাকি। তা ছাড়া এখানে শাবরমতী আশ্রমটীও দেখা হবে।'

বীণা বল্লে, 'সত্যি আমারো অনেকদিন থেকে দেখবার ইচ্ছে প্রতুলদা, নীতিশবাবু গেলে চলনা আমরাও দেখে আসি।'

নীতিশ বল্লে, 'বেশ তো খুব ভাল হবে।'

প্রতুল বল্লে, 'তাহলে তোর জীবনের সব ধরণের শিক্ষার কি একেবারে মোড় ফিরে গেল? একেবারে দোকানের সেল্‌সম্যান হয়ে যাবি?'

নীতিশ হাসলে, বল্লে, 'মাথা নেই তারা মাথা ব্যথা। জীবনের ধারা-ধরণ বা কি ছিল, আর শিক্ষাই বা কি পেলাম? খদ্দর ভাণ্ডারে কিন্তু অনেক কিছুই জানা যায়, ওদের সবটাই বেচা-কেনা নয়। দেশের কথা বেশ ভাবে ওরা। সবাই না ভাবুক, ভাবনার অনেক ধারা আসে,—এসে পড়ে ওদের মাঝে। বজ্‌রং সহায় চম্পারণের লোক কিন্তু দেখছ তো কত দূরে এসে পড়েছেন! বেশ লোক না?'

প্রতুল একটু হেসে বল্লে, 'তা বটে। তা আমরাও তো কত দূরের লোক! খুব মন্দ লোকও নয়?'

তারপর বল্লে, 'এইবার আভিজাত্যের তর্কের তোদের শেষ লক্ষণ মিলছে যেন। একেবারে ব্রাহ্মণ আর ভিখিরি একসঙ্গে।'

নীতিশও হাসলে, বল্লে, 'তা আর কই হ'ল? জ্ঞানের ব্রাহ্মণ্য এত সোজা নয়! তবে শেষ লক্ষণটা—?' —কথা শেষ করলে না।

প্রতুল বল্লে, 'নাই-বা চাকরী ছাড়তিস্?—না গেলি?'

বীণা উৎসুকভাবে নীতিশের পানে চেয়েছিল।

নীতিশ একটু হাসলে, 'সেকথা আমারও মনে হচ্ছে।'

প্রতুল বল্লে, 'তবে থেকেই যা, অন্য চাকরী কর্ না হয় এখানেই। বোস্, আমি কাপড়-চোপড় বদলে আসি।'

বসন্তের সন্ধ্যা। কিন্তু তখনো শীত আছে। যেন ঘোর-ঘোর অন্ধকার ঘর, আলো জলেনি।

বীণা সহসা বল্লে, 'থেকেই যান না নীতিশবাবু।'

নীতিশ চকিত হয়ে বীণার দিকে চাইল।

বীণা বল্লে, 'এখানে ছুটিতে এসে বেশ লাগত তবু—একটা দল যেন।'

নীতিশ বল্লে, 'হ্যাঁ কিন্তু আর তো থাকা যায় না, সব যে ঠিক করে ফেলেছি।'

'ঠিক মানে?—চাকরী ছেড়েছেন, এই?' বীণা হাসলে।

নীতিশও হাসলে। বীণার মনে হল, যেন কি ভাবনা, কি কথা একটা নীতিশের মনে রয়েছে যা ওরা কেউই জানে না।

বীণা বল্লে, 'আপনি কি কলকাতায় যাবেন এখন?'

নীতিশ বল্লে, 'তাও তো জানিনা। না-ই বোধ হয়। কেননা থাকার জায়গা আর একটি কাজের আগে ঠিক হোক।'

হঠাৎ বীণা বল্লে, 'নতুন জায়গায় খুব একলা পড়বেন কিন্তু ঠিক আমার মতই।'

নীতিশ একটু চুপ করে রইল, তারপর বল্লে, 'হ্যাঁ, কিন্তু মানুষকে বন্ধুর মত সত্য করে বন্ধুভাবে তো পাওয়া প্রায় যায়ই না। আমরা মনে মনে তো বেশীর ভাগ লোকই একলা।' তারপর একটু হাসলে, 'শুধু জানিনা সেকথা—নয় কি?'

বীণাও হাসলে, বল্লে, 'ঠিক বলেছেন। কিন্তু মানুষ তো কথা কইবারও সঙ্গী চায়, সেও এক রকম বন্ধুত্ব।'

চাকর আলো দিয়ে গেল, মিট্‌মিটে ছোট টেব্‌ল-ল্যাম্প।

নীতিশ অন্যমনস্কভাবে আলোর দিকে চেয়ে রইল। তারপর বল্‌লে, 'তা সত্যি আমরা তো সন্ন্যাসী বা যোগীর মত একলা থাকতে জানিনা। কিন্তু জানেন, ভালো সঙ্গ অর্থাৎ নিজের মত সঙ্গী না পাওয়ার চেয়ে একলা থাকা ভালো। অবাঞ্ছিত সঙ্গ বড় আড়ষ্ট লাগে, না?'

বীণা একটু হেসে বল্লে, 'দেখবেন আমাদেরও যেন ও দলে ফেলবেন না।'

নীতিশের মুখ কৌতুকের সহজ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, বল্লে, 'সত্যই তো, কি বলা যায়—হয়ত আপনাদেরও এই দলে ফেলব।'

এরকম সহজ স্বচ্ছ হাসি নীতিশের মুখে বীণা দেখেনি। তার হঠাৎ মনে পড়ল, নীতিশের শিক্ষা, পারিপার্শ্বিক, বাড়ির ও বংশের কথা, বাংলা দেশের একটা শিক্ষিত স্তরের কল্পনার ধারা ও রুচির কথা। অবশ্য সুমিত্রার বর মনীশের সঙ্গে তার আলাপ হয়েছে। সে নীতিশের মত নয়, যেন একটু অহংকৃত স্থূল প্রকৃতির স্বকেন্দ্রিক ধরণের। যেমন বড় লোকের বাড়ীর কৃতী ছেলের হয়ে থাকে। আত্মকথা ছাড়া, আপনার কৃতিত্ব প্রচার ছাড়া তাদের আর বক্তব্য থাকে না, ক্রমাগত ঘুরে-ফিরে তারা নিজেদের কথাই বলে।

বীণার বেশ ভালো লাগেনি তাকে। কিন্তু তাতে কি? বড় লোকের ছেলে বড় লোকের জামাই, আবার বড় কাজ করে—বিলাত-ফেরৎও। ওর ভালো না লাগলেই বা কি! খাতিরের অভাব মনীশের নেই। বীণার মনে হয় সকলের মনীশকে প্রশংসাতে, সেই সকল দুঃস্থ লোকদের কথা, যারা ধন ঐশ্বর্য্য শক্তি গর্ব অহঙ্কার দেখলে সভয় মুগ্ধতায় চেয়ে থাকে। অতখানি ওঠবার আশাও নেই তাদের, লোভও নেই, কিন্তু মোহিত হয়ে থাকে গল্প-শোনা অজগরের নিঃশ্বাসের সম্মুখে মুগ্ধ জীবের মত।

বীণাও হেসে বল্লে, 'ও ফেললেন, কি আর করা যাবে। তবু যতক্ষণ সঙ্গী না পাবেন আসতে তো হবে। অবশ্য যোগী না হওয়া অবধি।'

নীতিশ বল্লে, 'আপনি 'কাদম্বরী' পড়েছেন?'

বীণা বল্লে, 'পড়েছি, সংস্কৃত নয় অনুবাদ। চমৎকার, না?'

নীতিশ বল্লে, 'হ্যাঁ। যেন ছবির মত সব দেখতে পাচ্ছি মনে হয়, এমনই চমৎকার বর্ণনা। কিন্তু আমি বলছি, চন্দ্রাপীড়ের পত্রলেখার কথা। কাদম্বরী আর মহাশ্বেতা সুন্দরী হতে পারেন, নায়িকাও বটে, কবি তাদের জন্য অনেক পাতা আর পরিশ্রম খরচ করেছেন কিন্তু চণ্ডালকন্যা আর পত্রলেখা আমাদের মনহরণ করে অনেক বেশী যেন।'

বীণা অবাক হয়ে শুনছিল। নীতিশের স্বভাবের এদিকটা সে দেখেনি, বল্লে, 'আপনি তো বেশ সমালোচক দেখছি।'

নীতিশ হাসল, বল্লে, 'কি ভাবেন, একেবারে অজমুখ্যু? আমি বলছিলাম শুধু মনোহারিতাও নয়। পত্রলেখার সঙ্গে চন্দ্রাপীড়ের বন্ধুত্বের কথা। কম বয়সের মেয়ে আর পুরুষে এমনধারা বন্ধুত্বের ওরকম অদ্ভুত সহজ চিত্র দেখেছি বলে মনে হয় না। বিদেশীও নয়, আধুনিকও নয়—কত যুগ আগের লেখা। যেন একটুও কষ্টকল্পনা নেই। অন্য লোক হলে এমন কি এখনকার কেউ হ'লে ওতে একটা অদ্ভুত মনস্তত্ত্ব নরনারীত্ব এনে দিতেন।'

বীণা বল্লে, 'আরও একজায়গায় ওরকম বন্ধুত্ব আছে, মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ আর দ্রৌপদীতে প্রকাণ্ড বই আর অনেক রকমের চরিত্র আছে বলে হঠাৎ চোখে পড়ে না। তা ছাড়া কাদম্বরীতে পত্রলেখা যেন ছবিতে তুলির টানের মত বা কাব্যের উপমার লাইনের মত, মহাভারতের সবটাই ঘটনা ও কাহিনীতে ঢালাই করা।'

নীতিশও শুনছিল। হঠাৎ বীণা বল্লে, 'আচ্ছা, রুথদের পরিবারটা আপনার কেমন লাগে?'

কথার মোড় হঠাৎ এদিকে ফিরল, নীতিশ অবাক হয়ে গেল। কিন্তু বল্লে, 'বেশ, কিন্তু বড় জটীল।'

প্রতুলের স্নান সারা হ'ল, এসে দাঁড়ালো।—'কে জটীল? কার কথা হচ্ছে?'

নীতিশ বল্লে, 'কাবেরীবাঈদের বাড়ীর ব্যাপার—খুব জটীল নয়?'

'তা বটে। কিন্তু ছেলেমেয়ে অর্থাৎ মোহনলালজী আর কাবেরীবাঈকে কিন্তু বেশ ভালই লাগে?'

বীণাও বল্লে, 'আমি বেশী দেখিনি কিন্তু বেশ ভালো লেগেছিল।'

প্রতুল বল্লে, 'ওরা চারজন চার রকমের স্বভাব। তা ছাড়া যেন দুটো নতুন ও পুরানো সংস্কার আর সভ্যতা মিলতে এসে অদ্ভুতভাবে থমকে দাঁড়িয়েছে, মিশ খেতে পায়নি। পাশাপাশি চলেছে কিন্তু। এলাহাবাদের গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমের মত;—দেখেছিস সঙ্গম?'

বীণা বল্লে, 'তুমি আবার সঙ্গম দেখলে কবে?'

'ঐ যে সে বছর মাকে কুম্ভতে নিয়ে গিয়েছিলাম। তীর্থ-টীর্থ করেছি। কিছু পুণ্যি হয়েছে। কি ভাবিস আমাকে। একটু চা করতে বলে আসি। তোরা খাবি?' উত্তরের অপেক্ষা না করেই প্রতুল চলে গেল।

নীতিশ বল্লে, 'ঠিক সত্যিই যেন সঙ্গমের স্রোতের মত। কিন্তু আপনি হঠাৎ রুথদের কথা জিজ্ঞাসা করলেন যে।'

'আমার ওদের বেশ ভাল লেগেছিল। অনেক সময় কথা না বললেও মানুষকে যেন বেশ বোঝা যায় না। রুথকে আমার তাই মনে হয়েছিল।'

নীতিশ চুপ করে রইল।

বীণা বল্লে, 'বন্ধুত্বের কথা বেশ বলেছেন আপনি। আবার জানেন, যেমন বলে লোকেরা, একজনকে দেখলেই হাঁড়ির একটা ভাতের মত সবগুলোর সম্বন্ধেই বলা যায়। তাই তারা বলে, মেয়েতে মেয়েতে বন্ধুত্ব হয় না, মেয়েতে পুরুষেও শুধু বন্ধুভাব হয় না। মেয়ে মেয়ের পক্ষে হয়না—তারা সঙ্কীর্ণমনা আর মেয়ে পুরুষে তো চিরকালের আদিম মনোভাব। যেন মানুষ আদিমতাকে মেনেই চলেছে সর্বত্র।'

নীতিশ বল্লে, 'হাঁ, কিছুটা মানুষের চিরকালের সত্যি, বাকি অনেকটাই তো নিজেদের সুবিধার জন্য তৈরী ভিতের ওপর গড়া। মানুষ নিজে এখন যা, তা যে কতটা তৈরী করা, সেতো জানা কথা। কাজেই অনেক জিনিসের মত, অনেক মতামত, রুচির মত, তৈরী জিনিষ বদলায়, ভাঙে, গড়ে ওঠে। মানুষের মধ্যে সত্যি মানুষ কতটুকু আর গড়া মানুষ কতখানি সেটা ভাবলে নতুন করেই অনেক জিনিস নেওয়া যায়। অনেক নিয়মের রদ-বদল হয়। মানুষের মধ্যে তৈরী সংস্কারই তো চোদ্দ আনা বলা যায়। সে প্রকৃতির জীব,—বাকিটুকু দু আনার।'

প্রতুল এসে দাঁড়িয়েছিল। বল্লে, 'তোমরা তো খুব জমিয়ে গল্প করছ। আলোচনাটা কি নিয়ে?'

নীতিশ বললে, 'কিছুই এমন নয়, বন্ধুত্ব নিয়ে।'

'বন্ধুত্ব নিয়ে?'

বীণা বললে, 'হ্যাঁ মেয়েতে মেয়েতে, মেয়ে পুরুষে। অর্থাৎ তোমাদের মত আমার সঙ্গে রুথের বন্ধুত্ব হ'তে পারা শক্ত এবং সকল জনসাধারণের মতে—'

বীণা হঠাৎ অপ্রস্তুত হয়ে গেল, মনে হল এবারে কার সঙ্গে কার বন্ধুত্ব বলবে।

নীতিশ আর প্রতুল দুজনেই বীণার দিকে চেয়েছিল, নীতিশ মৃদু হেসে বলে, 'বড় মুস্কিলে পড়লেন দেখছি।'

এতক্ষণে প্রতুলও সবটা বুঝলে,—'বুঝেছি, তোর সঙ্গে নিতুর বন্ধুত্ব অর্থাৎ যে কোনো মেয়ের সঙ্গে, এই যেমন রুথের সঙ্গেও আমার বন্ধুত্ব,—একেবারে চলবে না, তার লোকে অন্য নাম দেবে।'

নীতিশ হাসলে, প্রতুলও হাসছিল, বীণাও অপ্রস্তুতভাবে হেসে ফেললে। কিন্তু এরপর আর আলোচনা এগোল না।

নীতিশ বল্‌লে, 'আমি আজ উঠি, রাত্তির হচ্ছে কাল স্টেশনে আবার দেখা হবে। কিন্তু আপনার সঙ্গে বোধহয় হবে না ?'

বীণা বল্‌লে, 'কেন, আমরা সকলে বিনু মিনু প্রতুলদা সবাই যাব।'

নীতিশ চলে গেল।

অনেক রাত্রে প্রতুলের মা হঠাৎ প্রতুলকে বল্লেন, 'নিতু সত্যি যাচ্ছে? হ্যাঁরে—বীণার সঙ্গে ওর বিয়ে হয়না ?'

প্রতুল বল্‌লে, 'না মা, এই বিয়ের সম্বন্ধর ঠেলাতেই ও বেচারা দেশ ছেড়েছে। এখানে যে কি হল জানিনা, কি যেন একটা হয়েছে বুঝতে পারছি না। ওকে আর স্থান ত্যাগ করাতে আমার ইচ্ছে নেই,—আমাদের সম্পর্ক থেকে। নাই-বা হ'ল মা আমাদের মত লোকের বিয়ে, দেখাই যাক্ ফিরে আসে কি থেকেই যায়।'

বীণা এসে পড়েছিল।

প্রতুল বল্লে, 'সেদিন শুনলাম টুলু মারা গেছে, নীতিশই বল্‌লে '

মা বল্‌লেন, 'কে সেই বড় বোনের ননদটি ? আহা। বুঝি ভাল বিয়ে হয়নি ? নিতুর সঙ্গে না কথা হয়েছিল বিয়ের ? হ'ল না কেন ? ফর্শা নয় বলে ?'

বীণা অবাক হয়ে শুনছিল, বল্‌লে, 'মারা গেছে ? আমি তো তাকে দেখেছি, সুমিত্রার বিয়েব সময়, বেশ মেয়ে কিন্তু।'

প্রতুল বল্লে, 'বিয়ে হয়েছিল ভালই বোধ হয়। নিতু করেনি, কাজকর্ম করছিল না তো।'

প্রতুলের মা শুতে চলে গেলেন। বীণাও গেল।

অনেক রাত্রি অবধি ঘুম আসে না বীণার। টুলু মারা গেছে। টুলুর সঙ্গে বিয়ের কথা হয়েছিল ? নীতিশ কি টুলুকে ভালবাসত ? আর রুথ ? কিন্তু ওরা তো ক্রিশ্চান। বীণার মন হাসে কিন্তু ভালবাসা কি জাত মেনে হয় ? কিন্তু পত্রলেখার কথা উঠ্‌ল কেন ? চিরকালের ইতিহাসে কোনদিন আর কোনো মেয়ে পুরুষের মধ্যে কি অত সহজ শ্রদ্ধাময় সদ্ভাব হয়নি ? কিন্তু ওতো অত্যন্ত সংক্ষেপ ছবি ! আজ কিন্তু কে সে পত্রলেখা ? রুথ ? টুলু কি ? সুমিত্রা কি ? কে ? আর কোনো নাম বীণার মনে পড়ে না।

সন্তর্পণে আকাঙ্ক্ষিত একটি নাম, মনে জাগে, যদি সেই নামটি হ'ত! না, বীণা খুব দৃঢ়, বুদ্ধিমতী। ভাবপ্রবণ বা নেকা মেয়ে নয়। তার মনের আশার বিলাস অত নেই, তবু মনে হয়। অবশেষে বীণা ঘুমিয়ে পড়ল।

১৬

ছুটিতে রুথ বাড়ী আসেনি। বিমনা যমুনাবাঈ সেকথা কারুকে বলতে পারেন না যদি গঙ্গাবাঈ বুঝতে পারেন ঘুণাক্ষরে, বড়ই অপ্রস্তুত হ'তে হবে। মোহনলালকেও আর কিছু বলেন না। মোহনলাল মাসীর ব্যাকুলতা বুঝতে পারেন, কিন্তু তিনিও সহজভাবেই কিছু বলেন না। যেন রুথ সত্যই পড়ার জন্য আসেনি।

এমন সময়ে পরীক্ষার ফল বেরুল। খবর এলো মা মাসীদের কাছে পাশ করেছে রুথ বেশ ভাল ক'রে, তার শ্রম সার্থক হয়েছে।

কিন্তু এখন আসতে পারবে না, ব্যস্ত আছে।

যমুনাবাঈ সভয়ে ব্যাকুলভাবে ভাবেন অনেক কথা।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই রুথ এসে পড়ল হঠাৎ।

যমুনাবাঈ গঙ্গাবাঈ খুব খুসী হলেন। রুথ তাঁদের বললে, সে নসিরাবাদেই হাসপাতালে চাকরী পেয়েছে। বাড়ী পাবে থাকবার। জননীরা উৎসুক হয়ে আরো কি বলে শুনতে চা'ন সে কিন্তু আর কিছুই বলে না, অন্য মনে থাকে যেন।

সন্ধ্যার পর মোহনলালের সঙ্গে গল্প করতে বসে। বলে 'ভাইজী, একটু বেড়াতে যাবে?'

মোহনলাল বুঝতে পারেন, তার যেন কি কথা রয়েছে।

শ্রাবণের পাহাড় শ্যাম হয়ে উঠেছে, ধূসর বালি ভিজে নরম হয়েছে, পায়ের জুতোর দাগ স্পষ্ট হয়ে পড়ে, আর ঝরে ঝরে যায় না। মাঠের ও ছুট্টাক্ষেতের পাশে পাশে ভাই-বোনে চলে। দুজনেই চুপচাপ, নয়ত এমনি কথা কয়। সহসা রুথ বল্লে, 'শিউশরণজী একটা চিঠি লিখেছেন।'

মোহনলাল জিজ্ঞাসুভাবে চেয়ে রইলেন ওর দিকে।

'লিখেছেন: তোমার পরামর্শ নাকি নিয়েছেন যাবার সময়। আমায় কিছু তো তুমি বলনি? মাকেও নাকি লিখবেন।' রুথ চুপ করলে।

মোহনলাল বল্লেন, 'তোমার সঙ্গে তো আর আমার দেখা হয়নি, তুমি যে আগেই চলে গিয়েছিল। আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, আমি বলেছিলাম লিখতে পার।'

'হ্যাঁ, লিখেছেন তাই। কি করি বলত? মার আর মাসীজীর মেজাজ জান তো?'

রুথ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।

তারপর বল্লে, 'আমার বিয়ে করতেই ইচ্ছে নেই। তা ছাড়া শিউশরণজী'— রুথ চুপ করলে।

মোহনলালও চুপ করে চেয়ে রইলেন। শেষে বল্লেন, 'কি? শিউশরণ বলে থামলে যে?'

'শিউশরণজীকে এমনি ভাল লাগতে পারে, বিয়ের কথা আমি ভাবিনি।'

'কিন্তু জানো তো ও সেইভাবেই আসা-যাওয়া করত। ওর মনের ভাবটা মুস্কিল, তুই বুঝতে পারতিস। মায়েরা তো অনেকদিন ধরেই বুঝতে কোনরকমে।'

বাড়ী ঝোবো না কেন। কিন্তু ভাল লাগা বা মানুষটাকে সহ্য করে নেওয়া

রুথ যমুনা বা ভালবাসা—অনেক তফাৎ, নয় কি?'

যমুনাবাঈ সঙ্কুচিত ভাবিনি মিশত [illegible] কেন? ওতো ভাবছিল তোরও বেশ

রুথ জিজ্ঞাসা করলে, 'তোমাকে

রুথ হেসে ফেল্লে, 'ঐ তো [illegible] জন্যেই ওকে বিয়ের কথা ভাবতেও পারব না। বাড়ীতে সকলেই আসে, ভদ্রভাবে কথাবার্ত্তা কই, গল্প করি, তাই বলে সে ভেবে বসবে আমি ভালবেসে ফেলেছি এতো বড় মুস্কিলের কথা। না ভাইজী, উনি বড়ই সাদাসিদে লোক। উনি ভাবেন যে ভালবাসা অভ্যাস করা যায়। উনি পছন্দ করলেই আমিও পছন্দ করব! বড়ই সেকেলে গল্পের মতন লোক উনি।'

মোহনলালও হাসলেন, 'তা তোর এই মনোভাবের আভাস আরও আগে ওকে দিসনি কেন? এখন কি করবি? তা ছাড়া ওতো চাকরী ভাল পেয়েছে, লোকও ভালো। এক শুধু ওর জাত নিয়ে যা মা-দের অপছন্দ।'

রুথ একটু হেসে বল্লে, 'চাকরী তো আরো অনেক লোকই ভাল পায়—তাই তারা বিয়ের কথা তুললেই তো লোকে তাকে বিয়ে করে না। আর জাত—সে মা-দের মতামত আমরা মেনে নোব কিনা—,আমরা তো ক্রিশ্চান মারা তা বুঝবেন।'

মোহনলাল বল্লেন, 'না, মায়েরা তা' বুঝবেন না। তাঁদের মনে আশা আমরা সমাজ না মানি জাত মেনে বিয়ে করব। তাঁদের মনে কষ্ট দোব না। অন্তত আমার মনে হয় তাই ভাবেন ওরা।'

রুথ অসহিষ্ণুভাবে হাসলে একটু, তারপর বল্লে 'মা-দের মত মেনে কি করব না করব তাতো এখনো জানি না। কিন্তু শিউশরণজী—কি লিখি বলত? লিখে দিতে পারি এখন মত নেই, কিন্তু উনি আবার যে ধরণের মানুষ আবার দু'বছর বাদে চিঠি লিখবেন, দেখা করবেন। ওসব মানুষ কেমন জানো, ওদের ধৈর্য্যের শেষ নেই। কাজে লাগা, উপকারে লাগার জন্য অধ্যবসায়ের অন্ত নেই। আবার এত সরল যে চট করে মনে কষ্ট দেওয়াও যায়না।'

রুথ হাসলে, বল্লে, 'কিন্তু অধ্যবসায়ের ধৈর্য্যের দামটা কিছু বেশী দেওয়া হয় না, বিয়ে করতে গেলে? দয়া করে দান করা যায়, বিয়ে করা যায়না।'

মোহনলাল হাসছিলেন, বল্লেন, 'হ্যাঁ সময়-অসময়ে কাজে লাগে বলে দয়া করে বিয়ে করাটা কিছু অতিরিক্তই হ[illegible] [illegible]তোর সেই পুরাণের গল্প মনে আ[illegible] দধিচী মুনির?'

মৃদু হেসে রুথ বল্লে,—'হ্যাঁ, তিনি মরে হা[illegible] দিয়েছিলেন [illegible] উপকারের জন্য। বেঁচে অনিচ্ছায় বিয়ে করতে হয়নি কাউকে [illegible] হচ্ছে, মরে অস্থি দেওয়াটা বেশী সহজ।'

দুজনেই হেসে ফেল্লে।

মোহনলাল বল্লেন, '[illegible] ফিরি।'

রুথ জিজ্ঞাসা ক[illegible]

মোহনলাল [illegible]

রুথ তাদের বললে, সে নসিরাবাদেই [illegible] বাড়ী পাবে থাকবার। জননীরা উৎসুক হয়ে [illegible] কিন্তু আর কিছুই বলে না, অন্য মনে থাকে যেন। [illegible]দের সঙ্গে গল্প করতে বসে। বলে 'ভাইজী, একটু [illegible] বুঝতে পারেন, তার যেন কি কথা রয়েছে।

[illegible] পাহাড় শ্যাম হয়ে উঠেছে, ধূসর বালি ভিজে নরম হয়েছে; পায়ের [illegible] স্পষ্ট হয়ে পড়ে, আর ঝরে ঝরে যায় না। মাঠের ও ভুট্টাক্ষেতের পাশে ভাই-বোনে চলে। দুজনেই চুপচাপ, নয়ত এমনি কথা কয়। সহসা [illegible], 'শিউশরণজী একটা চিঠি লিখেছেন।'

[illegible]হনলাল জিজ্ঞাসুভাবে চেয়ে রইলেন ওর দিকে।

[illegible]খেছেন: তোমার পরামর্শ নাকি নিয়েছেন যাবার সময়। আমায় কিছু [illegible]মি বলনি? মাকেও নাকি লিখবেন।' রুথ চুপ করলে।

রুথ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বল্লে, ‘তারপর আর আমাদের বাড়ী আসেন নি বোধ হয় ? সেইজন্যই চলে গেলেন বলে মনে হয় তোমার ?’

মোহনলাল বল্লেন, ‘না আসেন নি আর। তবে গেলেন কেন তা ঠিক বলতে পারিনা।’

রুথ বল্লে, ‘কি ভাবলেন আমাদের কে জানে। ভাবলেন বোধ হয় আমারই আগ্রহ আছে।’

মোহনলাল হেসে বল্লেন, ‘না, তা ভাবেন নি। মা মাসীরা ঐ রকমই কথাবার্তা কন সব দেশেই। মা ভাবছিলেন ভাল লোক, হিন্দু ব্রাহ্মণ, যদি শুদ্ধি করে জাতে উঠে যাস্ তুই বিয়ে হয়ে। বিয়ে হলে ভাল লাগত তোর ওঁকে এতো নিশ্চয়।’

রুথ লাল হয়ে উঠল। একটু হেসে বল্লে, ‘এ যুগে মেয়েদেরও মনের ভাব বদলেছে ভাইজী। আমি যাকে ভালবাসিনা তাকে বিয়ে করাও আমার যেমন মুস্কিল, আমাকে ভালবাসেনা যে, তার সঙ্গে বিয়ে হওয়াও তেমনি অবাঞ্ছনীয়। কোনরকমে বিয়ে হওয়াটাইতো সব নয়।

বাড়ী এসে পড়ল। ভাই বোন বাড়ী ঢুকল।

রুথ যমুনাবাঈকে বল্লে শিউশরণের কথা। মোহনলালও ছিলেন। যমুনাবাঈ সঙ্কুচিত ভাবে চুপ করে রইলেন।

রুথ জিজ্ঞাসা করলে, ‘তোমাকে [illegible]

রুথ হেসে ফেল্লে, ‘ঐ [illegible] জন্যেই ওকে বিয়ে [illegible] ইচ্ছে ?’

বাড়ীতে সকলেই আসে, ভদ্রভাবে কথাবার্ত্তা কই, গল্প করতে দিই!’ যমুনাবাঈ বসবে আমি ভালবেসে ফেলেছি এতো বড় মুস্কিলের কথা। [illegible]লেন, কিছু বলতে বড়ই সাদাসিদে লোক। উনি ভাবেন যে ভালবাসা অভো [illegible] সে ক্ষমা পছন্দ করলেই আমিও পছন্দ করব! বড়ই সেকেলে গল্পের মতন লোক

মোহনলালও হাসলেন, ‘তা তোর এই মনোভাবের আভাস আরও [illegible] মুখের ওকে দিসনি কেন ? এখন কি করবি ? তা ছাড়া ওতো চাকরী ভাল পেয়ে, লোকও ভালো। এক শুধু ওর জাত নিয়ে যা মা-দের অপছন্দ।’

রুথ একটু হেসে বল্লে, ‘চাকরী তো আরো অনেক লোকই ভাল পায়—কিন্তু তারা বিয়ের কথা তুললেই তো লোকে তাকে বিয়ে করে না। আর জাত—মা-দের মতামত আমরা মেনে নোব কিনা—, আমরা তো ক্রিশ্চান মারা কে বুঝবেন।’

'না, তাতো নয়।' মোহনলালেরও আর বলবার কিছু ছিলনা।

মস্ত একটা চিড় খেয়ে গেল পারিবারিক মনে। কোনো দরকার ছিলনা এত কথার। শিউশরণকে কেন্দ্র করে কথাটা উঠল, তারও কোনো লাভ হলনা। কিন্তু চারটি মানুষের মন যেন চার ভাগ হয়ে গেল।

গঙ্গাবাঈ কিছুই জানতে পারলেন না, বুঝতে পারলেন না কিন্তু দুজনেই সহসা ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে সরে গেলেন যেন।

মোহনলালের মনে হল, সত্যই এযুগে তাঁরা সকলে যেন সহসা স্বাধীন হয়ে গেছেন। নিজের জীবন তাঁদের নিজের, জীবিকাও তাঁদের নিজেদেরই জন্য অতীতের কোনো দায় নেই, দায়িত্ব দাবী নেই। কিন্তু সত্যিই কি নেই?

যুগের আদর্শ, দৃষ্টিভঙ্গি, জীবনের ধরণ সব একেবারে বদলেছে। রামায়ণ মহাভারত, রামচন্দ্রের আদর্শ, ভারতের আদর্শ বদলেছে। সীতারও আদর্শ কি বদলাচ্ছে? এখন যেন মানুষ তার স্বল্পপরিসর জীবনের সমস্তটাই নিজের জন্য রাখবে, নিজের কথা ভাববে, নিজের সঙ্গে একান্তভাবে সংশ্লিষ্ট পরিবার স্ত্রী পুত্রের কথা ভাববে। অতীতের কথা তারা ভাববেনা আর। ওঁরা না হয় খৃস্টান কিন্তু আর সকলেও কি বদলাচ্ছেনা?

কিন্তু মা বাপ কি সত্যিই অতীত?

যুক্তির দিক দিয়ে রুথের কথা সত্য মনে হয়। তিনি নিজেও গঙ্গাবাঈয়ের সব কথা মেনে চলবেন না, চলেন না; জানেন—তবু যেন কি একটা সূক্ষ্ম অতি অস্পষ্ট অস্বস্তিকর বেদনা নিভৃত মনে বাসা বেঁধে থাকে।

রুথ চাকরীর জায়গায় চলে গেল। মাকে বল্লে, 'তুমি কি সেখানে যাবে?'

যমুনাবাঈ বল্লেন, 'গঙ্গাবাঈ একলা থাকবেন? বয়স হচ্ছে, পরে কোনো সময় গেলেই হবে।'

জননীর মনে আবার নীড় রচনার বহুদিনের সঙ্গোপন আশা আর ছিলনা। সমস্ত মোহ আকাঙ্ক্ষা সব একেবারে কোন রূঢ় উপেক্ষায় নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল যেন। স্বাধীনতা-দৃপ্ত আধুনিক সন্তানের কাছে ক্ষুদ্র আবেষ্টনবাসিনী ভীরু নির্ভরশীল অতীত আদর্শচারিণীদের আর স্থান নেই, সেকথা জননীরা স্পষ্টভাবে বোঝেননি, কিন্তু সহসা বুঝলেন যেন আজ তাঁরা বাড়তি, অনাবশ্যক অতিরিক্তদের দলে পড়ে গেছেন। ওদের সঙ্গে কোনো মিল নেই, যোগ নেই, ওঁরা শেষ হয়ে গেছেন। শুধু একটা করুণার ওপর ওরা তাঁদের রেখেছে মাত্র।

১৭

কয়েকমাস কেটে গেল আমেদাবাদে। কাজ করা যায়, কাজ আছেও, কিন্তু কাজকে অতিক্রম করেও যা আছে সেটার আর গুঞ্জন থামে না মনে মনে। অবশেষে একখানা তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনে বি. বি. সি. আইয়ের গাড়ীতে উঠে বসল নীতিশ।

ছোটবেলার মোহ, জন্মভূমির, শৈশবকালের সঙ্গীদের মোহ যেন সব মোহের চেয়ে গভীরভাবে মনে ছাপ দেয়। মা নেই নীতিশের কিন্তু 'মা বলিতে প্রাণ করে আনচান' সে কোন্ জননী—মমতাময়ী মোহময়ী যার কথা সে জানেনা কিন্তু যেন সে মোহের শেষ নেই।

রেলগাড়ী বাংলাদেশের দিকে আসে, তার মনে হয় রবীন্দ্রনাথের সুরদাসের :

"আকাশ আমারে আকুলিয়া ধরে, ফুল মোরে ঘিরে বসে,
কেমনে না জানি জ্যোৎস্না প্রবাহ সর্বশরীরে পশে।
ভূবন হইতে বাহিরিয়া আসে ভূবনমোহিনী মায়া।"

যেন এমন ভূবনমোহিনী মায়া আর কোথাও নেই। ফিরে ফিরে মনে হয়, 'মা বলিতে প্রাণ করে আনচান্ চোখে আসে জল ভরে'।

তবু যেন কি এক সঙ্কোচ হয়। দেশ, মাটী, স্মৃতির মোহকে ছাপিয়ে যায় সেই সঙ্কোচ আর ভয়। মনে হয় যেন আসাটা ঠিক হল না, ভুল হল? ত' থাকতে তো আসেনি। তবু ধনীর কাছে দরিদ্রের, প্রবলের কাছে দুর্বলের মত সে অস্বস্তিকর সঙ্কোচ রয়েই যায়। ঘোড়ার গাড়ী ছড ছড় ঝড ঝড করে বাড়ীর দরজায় এসে দাঁড়াল। গেটের সামনে দুখানা মোটর তখন ধোওয়া হচ্ছে। বাইরের দিকে বাড়ীর কেউ ছিলেন না। বাড়ীর সামনের দৃশ্য একটু অদল-বদল করা হয়েছে। যেন আরো আড়ষ্ট অগমনীয় মনে হ'ল তার। ভিতরে যাবার পথটা তেমনি অন্ধকার ধরণেরই আছে। সেইটেই যেন ভরসা আনে মনে।

ঘোড়ার গাড়ী দাঁড়াতে দেখে যারা মোটর ধুচ্ছিল তারা একবার চেয়ে দেখল শুধু। তারা ওকে চেনে না।

নীতিশ ভিতরে ঢুকল। যদি সুধীশকে দেখতে পায় আগে। না, কেউ নেই। হঠাৎ সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো বেলা, মেজজ্যেঠার মেয়ে। তার সঙ্গে মেজ জ্যেঠিমা।

'ওমা, নিতুদা কোথেকে?' বেলা বলে উঠল। তারপর প্রণাম করলে।

একে একে নানাদিক থেকে, কেউবা সিঁড়ি থেকে, কেউবা রান্নাঘরের দিক থেকে, কেউবা কোনো ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

'তাইতো, তুই কখন এলি ?' 'কতক্ষণ' ? 'ওমা নিতু যে !' 'খবর দিস্‌নি যে ?' ইত্যাদি নানারকম মন্তব্য শোনা গেল।

যথাযোগ্য জবাব দেওয়া হল, কিন্তু সুধীশকে দেখা গেল না কোথাও।

বেলার ছেলেকে কোলে নিয়ে নীতিশ জিজ্ঞাসা করে 'খোকা তোমার বাবা কদিনের জন্য ছুটি দিয়েছে ?'

অন্য একটি ছোট ছেলে পাশ থেকে গম্ভীরভাবে বল্লে, 'ওর বাবা নেই।' নীতিশ সচকিতে তার দিকে চাইলে।

বেলা চা নিয়ে এলো।

নীতিশ তার হাত থেকে চা নিলে। পরিধানে শাড়ী, হাতে চুড়ি, গলায় হার পরা সহজ বেলার দিকে সে ভাল করে, চাইতে পারল না। মনে হল বোধ হয় ভুল কিছু শুনেছে, বেলা ঠিকই আছে। ভুলই হবে।

যেন কোন জ্যেঠামশাইয়ের গলার সাড়া পাওয়া গেল। ত্রস্ত হয়ে নীতিশ প্রণাম করতে এগিয়ে গেল

আভিজাত্যের উচ্চাসন থেকে চিরদিনের মত নির্লিপ্ত ভাবে তিনি একবার তার দিকে তাকালেন, তারপর বল্লেন, 'এখনি এলে ? কেমন, ভাল ত ?' ওরে আমার চা পাঠিয়ে দিয়েছিস ?' বলে নিজের বসবার ঘরে খবরের কাগজ খুলে বসলেন। আর দেখতে পেলেন না নীতিশকে।

তারপর অন্য সব গুরুজনদের সঙ্গেও দেখা হ'ল।

নীতিশের মনে হ'ল যেন মোটে কাল সে কোথাও গিয়েছিল। সে ছিল না বা ছিল, সেকথা কারুর যেন মনেই নেই। অভ্যর্থনা, সমাদর, স্নেহ, সাদর আহ্বান সে আশা করেই নি বোধহয়, তবু যেন কোন্‌খানে বাজে মনে, হয়ত করেছিল প্রত্যাশা একটুখানি কিছু। সেটা কি ? নিজেরও তার জানা নেই কি তা !

ঘরে ঘরে কাজকর্ম রান্নার যোগাড়ে নিযুক্ত হলেন গৃহিণীরা, জ্যেঠিমারা। বধূরাও কিছু হয়ত করছিল। নতুন বধূ হয়ে উর্মিলা এসেছে। দেখতে পেলে তাকেও। একটু হেসে কথা কইলে সে। সুমিত্রাও একবার হাসলে শুধু।

নীতিশ দেখলে বাড়ীশুদ্ধ ওরা সকলেই তার মুরুব্বী হয়ে গেছে কেমন করে। সেইরকমভাবেই তাদের নির্লিপ্ত মুখের দু'একটি ভাষণ প্রসাদী নির্মাল্যের মত খসে পড়ে, তারপর সকলেই কার্য্যান্তরে বা গৃহান্তরে চলে যায়।

পুরাতন আমলের বৈঠকখানার দিকে গেল সে। বৈঠকখানা সে রকম আর নেই। জাজিম ফরাস্ তাকিয়ার জায়গায় এসেছে দামী-দামী চেয়ার টেবিল। গোনা লোক আসে, বসে, চলে যায়। নিশ্চয়ই সেকালের মত 'মাসীমার কুটুম' জাতীয়রা আর আসে না। যারা শুয়ে থাক্ত বসে থাকৃত নির্বিকারভাবে নিঃসঙ্কোচে। কখনো মামলা, কখনো অসুখ, কখনো দেখা সাক্ষাতের বরাত নিয়ে আসত যারা। বৈঠকখানাও দু'ভাগ হয়ে গেছে।

বড়ভাই সতীশ বসেছিল্ সেখানে, বল্লেন, তারপর? হঠাৎ কি মনে ক'রে?'

মেজজ্যেঠা মুখ তুলে আপাদমস্তক একবার দেখলেন, তারপর বল্লেন 'স্বদেশীয়ানা করছ, খদ্দর পরেছ। তারপর কাজকর্ম কি করছ আজকাল? একটা খবরও তো দাও না কারুকে।' প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষা না করেই তিনি খবরের কাগজ দেখতে লাগলেন।

সতীশ বল্লেন, 'অজ্ঞাতবাস করছিল বোধহয়।'

মেজজ্যেঠা হেসে উঠলেন, কাগজখানা নামিয়ে, 'ঠিক বলছিস্' বলে।

নীতিশের মুখ লাল হয়ে উঠল। সে বল্লে, 'কেন আমি তো সুধীকে চিঠি দিই।'

সতীশ নিজের রসিকতায় মেজকাকার সমর্থন পেয়ে খুব খুসী হয়েছিলেন, বল্লেন, 'ত জানতে পারি মাঝে মাঝে। এখন তাহলে কোথায় আছ?'

কেন কে জানে নীতিশ অপ্রস্তুতভাবে বল্লে, 'আমেদাবাদে রয়েছি।'

'আমেদাবাদে? সেখানে কি?' মনীশ এসে দাঁড়িয়েছিল, সে জিজ্ঞাসা করলে।

'সেখানে খাদিপ্রতিষ্ঠানে একটা কাজ করছি।'

মেজজ্যেঠা অবাক হয়ে আবার কাগজ রাখলেন। লেখাপড়া শিখে অসাফল্যের এমন অদ্ভুত স্পষ্ট উদাহরণ দেখা গেল তাঁদেরই বাড়ীর ছেলেতে! অর্থাৎ সুতো কাটছে তকলিতে!

'কেন তোমার তো এম-এ, পাশ করা ছিল, বয়সও বেশী হয়ে যায় নি, পড়াশোনা ছিল, বিজ্ঞাপন দেখে সরকারী বেসরকারী অনেক কাজই তো পেতে পারতে। চেষ্টা করনি।' অবাকভাবে বললেন মেজজ্যেঠা। আমাদেরও জানালে পারতে, যোগাড় করে দিতাম যাহোক।'

নীতিশের কান গরম হয়ে উঠেছিল। সে কিছু বলতে পারার আগেই সতীশ

বল্লেন, 'ও চিরকালই ওই রকম। বড় বড় কথা ভাবে। ভাবছে, হয়ত দেশ উদ্ধার হচ্ছে এতে।'

সদাশয়ভাবে মনীশ বল্লে. 'এখানে চাকরী করনা, দেখব চেষ্টা? অবিশ্যি সরকারী চাকরী হবে না তবে আমার অন্য অন্য জায়গায় আলাপ আছে অনেকের সঙ্গে, প্রভাবও আছে।' তারপর বল্লে 'তা থাকবি কোথায়? বাড়ীতে তো একটা সিঁড়ির তলাও খালি নাই।' যেন সিঁড়ির তলা থাকলেই তাতে নীতিশকে দেওয়া যেত শোবার জন্যে।

নীতিশ অবাক হয়ে গেল। বেলাও অত্যন্ত লজ্জিত ও আশ্চর্য্যভাবে মনীশের দিকে চাইল। বড় জ্যেঠিমা পূজা করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। সাড়া পাওয়া গেল গলার।

সিঁড়ির তলার ঘরের কথা চাপা পড়ে গেল। সে জ্যেঠীমাকে প্রণাম করতে গেল। তিনি একটু পিছিয়ে গেলেন, 'ঐখান থেকেই কর্। তোর তো গাড়ীর কাপড়। তা ভাল আছিস? অনেক দিন পরে এলি। খেয়েছিস কিছু? ও বৌমা ওকে চা' জলখাবার দাও।'

আতিথেয়তার পুরানো একটা ক্ষীণ ধারা তাহলে এখনো আছে। নীতিশ অবশ্য সেকথা মনে করবার সময়ই পেল। শুধু কথার আবহাওয়া বদলানোতে বাঁচল যেন। শুধু হেসে বল্লে, 'চা খেয়েছি, বেলা দিয়েছে।'

জ্যেঠিমাই বল্লেন, 'ত' সুধীটাও এই সময়ে নেই। তোর সঙ্গে দেখা হলনা।' দেবর পুত্র বলে নয়—সুধীশের প্রিয় বলে তাঁর মনের কোনখানে একটু ঠাঁই তার ছিল যেন।

নীতিশ জিজ্ঞাসা করলে. 'কোথায় সে?'

'সে পুরী গেছে কদিন হ'ল, বুলু রমারা গেছে সেই সঙ্গে।'

তাহলে সুধীশও নেই।

কয়েক দণ্ডের মধ্যেই নীতিশ জানতে পারল সে একেবারে পুরোনো পচা কিছু। কোনো কিছু কৌতূহল প্রয়োজন জিজ্ঞাস্য তাকে কারুর নেই। তার আসাটা কেন সেইটেই শুধু একমাত্র প্রশ্ন সকলের কথার আড়াল থেকে উঁকি মারছে। এই বাড়ীর সমস্ত জগৎ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ভাষায় তাদের 'নিজের নিজের ঘটি-বাটী সামলাতে ব্যস্ত।' অন্য লোকেরা এখানে একেবারে অবান্তর। অপ্রস্তুতের যেন সীমা রইল না তার। কাল ফিরে যাবে? ঠিক নয় সেটা? খুব যেন থিয়েটারী বা নাটকীয় ধরণের হবে কি? কিন্তু থাকবে কি করে? সকলেই তো

'তারপর ?' 'কদিন আছ ?' 'কদিন ছুটী আছে ?' এইভাবে কথা বলছেন। নয়ত অবাক চোখে চেয়ে আছেন।

পুরানো দলের মধ্যে চেনা যায় শুধু বেলাকে। দুপুর-আহারের সময় সে দেখলে বেলাকে ভালো করে। এক মুহূর্ত্তে সব বুঝতে পারলে। সেই উদ্ধত অহঙ্কারী বেলা যেন হঠাৎ কোথায় নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। আর খুঁজে পাবার উপায়ও নেই। পথহীন গতিহীন জীবন সামনে নিয়ে যেন সে চিরকালের মত হতবুদ্ধি হয়ে গেছে।

সিঁড়ির তলাতে নয়, সুধীশের ঘরে ওর জিনিষ রেখে বিছানা করিয়ে দেয় কে! বোধ হয় বেলা। তারপর আস্তে আস্তে বেলা গল্প করে ওর কাছে বসে। তার ছেলেটি নীতিশের কাছে বসে কথা কয়, খেলা করে।

অনেক গল্প করে: টুলুর কথা, দিদির কথা, টুলুর বরের কি কান্না! না, টুলুর কোনো ছেলেমেয়ে নেই। সে আর আসতইনা প্রায়। বুলু সুধীশের কথা বলে। সুধীশের এবারে ডাক্তারীর শেষ বছর, তারপর বিলেত পাঠাবেন জ্যেঠামশাই। অনেক কথা হয়। শুধু নিজের কথা কিছু বল্লে না, নীতিশও জিজ্ঞাসা করতে পারলে না।

দিন দু'তিনের মধ্যেই যেন কলের মত নীতিশ তার ফিরে যাবার সবুজ রংয়ের টীকিট কিনে গাড়িতে উঠে বসল।

যে মোহময়ীর দুর্ব্বার মোহ, আকষণ তাকে টেনে এনেছিল সে কে তা ও জানেনা। জননী? জন্মভূমি? ছোটবেলার স্মৃতি? বন্ধু? কি তা সে জানেনা। জননী তো নয়ই, কেনন। তিনি নেই, তবু এই এত প্রবল মোহ কিসের, ও ভাবে।

আস্তে আস্তে গ্রামের পর গ্রাম স্টেশনের পর স্টেশন তার জানা নাম, চেনা দৃশ্য আপনজনের মত বেশভূষা পরা অচেনা মানুষ নিয়ে সরে সরে যায়। কয়েক মাস আগের এমনকি তিন দিনের আগেরও সেই মোহময়ী দূরে দূরে, আরো দূরে গ্রাম নগর প্রান্তর নদী ছাড়িয়ে চক্রবাল সীমায় মিলিয়ে যেতে লাগল।

নীতিশ চুপ করে দেখে। সেদিনের কবিত্বময় মোহের কথা ভাববার কোনো জায়গাও যেন তার অন্তরে আর নেই।

শুদ্ধ খাদি ভাণ্ডরের তাক ভরা নানাবিধ সৌখিন খদ্দর, মোটা খদ্দর, শুদ্ধ খদ্দর, মিশ্র খদ্দর আর তার প্রকাশিত বই আর তার ক্রেতা ও ক্রেত্রী। অবশ্য খুব বেশী নয়।

এসে দাঁড়াল প্রতুল ও বীণা।

তাক থেকে জিনিষ নিতে পিছন ফিরেই নীতিশ বল্লে, 'আইয়ে।'

তারপর সুমুখ ফিরে আশ্চর্য্য হয়ে গেল। অন্য ক্রেতাদের বেচাকেনার পর, চমৎকার জামার টুকরা কয়েকটি সংগ্রহ করে বীণা ও প্রতুল উঠল, প্রতুল বল্লে, 'এবারে চল্ তোর বাড়ী।'

ছোট সরু একটি সিঁড়ি দোকানের পাশ দিয়ে উঠে গেছে তেতলা অবধি। সেইখানে একখানি ঘর, একটি দালানে চিক ফেলা একটি ছোট রান্না ঘর, কাঠের আড়াল করা স্নানের ঘর, সামনে ছাত।

নীতিশ মৃদু হেসে বল্লে, এই আমার বাড়ী। তারপর কি করে এসে পড়লি?'

প্রতুল বল্লে, কতদিন তুই যাসনি দেখতে এলাম তাই।'

নীতিশ বীণার দিকে চেয়ে বল্লে, 'তা ওকে কোথায় পেলি?'

'ওযে কিষনগড়ে গিয়েছিল গরমের ছুটিতে।'

নীতিশ হেসে বল্লে, 'ওই সিমলে পাহাড়ে। কিন্তু সত্যি সত্যি কোনো ভালো জায়গায় গেলেন না কেন? ঠাণ্ডা জায়গায়? আপনাদের স্কুলের মেমসাহেবরা তো যায়। এই আবু পাহাড়ের মতন কোথাও?' বীণা বল্লে, প্রথমত আমি মেমসাহেব নই, তারপর আবু আর গরমের ছুটি তো পালাচ্ছে না, প্রতি বছরই আছে, গেলেই হবে। তৃতীয় এখানে আপনাদের খদ্দরের আবহাওয়া দেখতে বেশী কৌতূহল হ'ল।'

'অর্থাৎ এসব পালাতে পারে। তা ভালো। চলুন সব দেখিয়ে দোব।' নীতিশ হাসলে।

হঠাৎ প্রতুল বল্লে, তা' দেশ থেকে ফিরে না দিলি চিঠি, না করলি দেখা। কি রকম লাগল?'

নীতিশ বল্লে, 'ভালই লাগল।'

'অর্থাৎ?'

নীতিশ বল্লে, 'সাধুদের নাকি একটা নিয়ম আছে সন্ন্যাসের বারো বছর পরে একবার জন্মভূমিতে ফিরতে হয়। কেন তাদের এই নিয়ম তা অবশ্য জানিনা। ফিরে এসে আমার মনে হল বোধহয় এটা দরকার হয়, নইলে মোহ থেকে যায়।'

বীণা হাসলে, বল্লে, 'অর্থাৎ আপনি সাধু হয়ে উঠছেন ক্রমশ:!'

একটু হেসে সে বল্লে, 'তা বলতে পারেন। যেভাবেই হোক।'

তারপর প্রতুলের দিকে চেয়ে বল্লে, 'জানিস্ নিশ্চিত স্বচ্ছন্দ জীবন যাত্রা কি অদ্ভুত জিনিষ! মানুষ একেবারে ত্রস্ত হয়ে থাকে। যেন কি বুঝি 'গেল গেল' ভাব সব সময়।'

কথাগুলো যেন স্বগত উক্তি। বুঝতে না পেরে প্রতুল ও বীণা চুপ করে রইল। তারপর সে বল্লে, 'সুধীরের সঙ্গে দেখা হ'ল না। তোর বেলাকে মনে আছে? মেজ কাকার বড় মেয়ে, খুব সৌখিন ছিল? সে একেবারে যেন বদলে গেছে।' বিধবা হয়েছে বলতে পারল না।

'কেন?' প্রতুল আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলে।

'শুনলাম কিছুদিন আগে তার স্বামী মারা গেছে।'

নীতিশ উঠে পড়ল, বল্লে, 'চল তোমাদের আবার ফেরবার সময় হবে. কি দেখবে দেখিয়ে আনি।'

পথে চলতে চলতে হঠাৎ বীণার দিকে চেয়ে বল্লে, আর জানেন, আপনাদের কিন্তু এখনো পোষাকটাই সব, এই রাজবেশ. এই যোগীবেশ। অন্য সব বেশের কথা আর বল্‌ব না। ওখানেও দেখলাম শুধু রাজবেশ ছেড়েই বেল একেবারে দীনহীন হয়ে গেছে। আর অন্য সকলের ঠিক সেই অনুপাতে কি রাজার মত মেজাজ। এক পোষাক পরিচ্ছদই সাধারণ মানুষকে কি-না করে দিতে পারে।'

বীণা বেলাকে দেখেছিল, আলাপও ছিল স্কুলে, সে চুপ করে রইল।

প্রতুল একটু চুপ করে রইল, তারপর বল্লে, 'পোষাকটা তো নিজের ইচ্ছেমত ত্যাগ বা ভোগ করে না ওরা, তাই অত দীনতা দেখতে পাওয়া যায়। ইচ্ছে করে যে কিছু ছাড়ে, সে যে তার চেয়েও বড কিছু পেয়ে ছাড়ে। সে তাই দীন হয় না।

নীতিশ চকিত হয়ে বল্লে, 'ঠিক বলেছিস।'

প্রতুল বল্লে, 'আজকে আমাদের সঙ্গে যাবি?'

বীণা উৎসুক হয়ে চাইল। প্রতুল বল্লে, 'সেদিন কাবেরীবাঈ আর মোহন-লালজীও তোর কথা জিজ্ঞেস্ করছিলেন।'

নীতিশ বল্লে, 'আমার কাজে তো ছুটী নেই। দেখি। কাবেরীবাঈ তো পাশ করে বেরিয়েছেন না? যমুনাবাঈ গঙ্গাবাইরা কেমন আছেন? কাবেরীবাঈয়ের কি বিয়ে হয়ে গেল নাকি পল সাহেবের সঙ্গে?'

প্রতুল বল্লে, 'বিয়ে? কই জানি না তো। পাশ করেছেন বটে, চাকরী করছেন নাসিরাবাদেই। মা মাসীরা এখানেই আছেন। ওর মা মাসী ওখানে বিয়ে হতে দেবেন না মনে হয়, ওরা ঘোর হিন্দু যে।'

তারপর বল্লে, 'চল, আশ্রমের কাছে এসে পড়েছি।'

মৌন ও মৃদুভাষী জনতার মধ্যে তারাও মিশে গেল।

মাস খানেক কেটে গেছে।

কেনাবেচা পড়াশুনার মাঝখানে চিঠি দিয়ে গেল পিয়ন।

সুধীশের চিঠি। অনেক খবর অনেক কথা। তার মাঝে বড় খবর সে পাশ করেছে। আর অন্য কথা তাকে বিলাত পাঠানো হচ্ছে।

নীতিশ চিঠি রাখল একবার। তারপর আবার পড়তে লাগল— সুধীশ লিখেছে, সে বিলাতের কথায় প্রতিবাদ জানিয়েছে, বলেছে যদি ঐ টাকাতে দুজনের খরচ সম্ভব হয় তো সে নিতুদাকে নিয়ে যাবে। নইলে যাবে না।

নীতিশ একলাই লাল হয়ে উঠল। তাকে কি দরকার। সুধীটা অত্যন্ত ছেলেমানুষ।

আবার পড়তে লাগল। 'মনীশদা আর প্রবীরদা কিছু করে টাকা দেবে যে খরচটা আমাদের কম পড়বে। তুমি এলেই পাশপোর্টের জন্য লিখব আর সব গোছগাছ করব। শীঘ্র খবর জানিও আর চলে এসো।'

আর পড়তে ইচ্ছে হ'ল না। কাল মুখ যেন গরম হয়ে উঠল তার। মানুষ কত সরলভাবে ভালবেসেই না জেনে মানুষকে আঘাত করে।

অভিমানহীন ক্ষোভহীন মনে হয়েছিল নিজেকে। কিন্তু দেখতে পেল তা নয়। চিঠিখানা কি ছিঁড়ে ফেলে দেবে? জবাব দেবে না? না কোথাও লুকিয়ে রাখবে? চিঠিটা যেন আর দেখতে পারা যাচ্ছে না।

খরিদ্দার এলো কয়েকজন। নীতিশ বাঁচল। দরকারের চেয়ে বেশী জিনিষ ছড়িয়ে দেখায়, সৌখিন দামী, কম দামী। বই কিনবেন একজন। বই ও পড়তে বলে, এইটে পড়ুন, কত সহজ সরল-স্বাস্থ্য পালনের নিয়ম মহাত্মাজীর। আত্মকথা? সত্যের প্রয়োগ? গুজরাটী? হিন্দী? ইংরেজী? আছে সব আছে। অন্য বই? গীতার ভাষ্য? সব দেখুন না।

১৮

এমন সময় এলেন বজরং সহায় আর তাঁর বন্ধু একজন। দেবীপ্রসাদ। খুসী মনে নীতিশ বল্লে, 'আসুন, আপনি কবে এলেন?'

'আজই। আপনার সঙ্গে কথা আছে কাজও আছে, কখন আপনার সময় হবে?' বজরং সহায় বল্লেন।

সাধারণ বন্ধুমাত্র কিন্তু মনের এমন অবস্থা যেন মনে হল পরম বন্ধু।

সে বল্লে, 'বসুন একটু। আর একজন আসবে, বিকেলের পালা তার। এখন দুটো, সে তিনটেয় আসে।'

'আজকে মহাত্মাজীর প্রার্থনাতে যোগ দেব। আরো অনেক কথা আছে শোনা যাবে। এইজন্যে আমরাও এসেছি, আপনাকেও নিতে এলাম। আপনি সেই অবধি এইখানে আছেন আর কোথাও যাননি? কাজ কেমন লাগছে?'

'ভালোই লাগছে। অনেক রকমের লোকের সঙ্গে আলাপ হয়, বই অনেক। প্রার্থনাতেও মাঝে মাঝে যাই যখন বিশেষ কিছু কথা হয়। তা ছাড়া আমাকে হরিজন স্কুলে এক ঘন্টা করে পড়াতে হয় রাত্রে।'

দেবীপ্রসাদজী বল্লেন, 'আপনার ভালো লাগছে এই সব কাজ? এই দূর বিদেশে।'

'নিশ্চয়। এত সব রকম দেখি যে মনে হয় আমরা কিছু জানি না, জানতুম না। শুধু নিজের বড় বা ছোট চাকরী করে নিজেদের নিয়েই থাকতুম। সামান্য ডালভাত বা রুটী খেয়ে তেলের কুপী-জ্বালা একটা ঘরের গরমে ছেঁড়া চেটাই পেতে আর শীতে মোটা দু-সুতী গায় দিয়ে যারা দিন কাটায় আমাদের রাস্তা পরিষ্কার করে—নোংরা জঞ্জাল তুলে, আমরা তাদের কোনো কিছুই জানি না।'

বজরং সহায় বল্লেন, 'ইনি দেবীপ্রসাদজী কিন্তু অন্য দলের সবটাই এঁর অহিংস নয়। এঁর ধারণা, একটু একটু করে বদল হতে অনেক দেরী হবে, বিপ্লব দরকার। ঐ শ্রেণীর লোকেদের লেখাপড়া শিখে ভাবতে শিখতে অনেক দেরী, ততদিনে ওদের জীবন শেষ হয়ে যাবে, ওদের এখনি জীবনের প্রাপ্য পাওয়া উচিত।'

নীতিশ চুপ করে রইল। তারপর বল্লে, 'তা সত্যি। কিন্তু তার রাস্তা কই? পথ কই? মহাত্মাজী তো একটা পথ দেখিয়েছেন।'

'আমারো তাই মনে হয়'—বজরং সহায় বল্লেন।

'আপনাদের দেশেই আমি লেখাপড়া শিখেছি। জানেন সেখানে আপনাদের

রামকৃষ্ণ পরমহংস বলেছেন, 'যত মত তত পথ'—না ?' দেবীপ্রসাদ বল্লেন একটু হেসে।

নীতিশ বল্লে, 'আপনি বাংলা জানেন ?'

'বুঝতে পারি একটু একটু। পড়তেও পারি সামান্য, বলতে ভাল পারি না।'

নীতিশ হেসে বল্লে, 'হ্যাঁ, তাঁর যত মত তত পথ বলা যায়। তা পথও তো সকলের পক্ষে সব সুগম নয়। তাঁর বই পড়লে তার উপমা পেতেন।'

দেবীপ্রসাদও হাসলেন। বল্লেন, 'আসলে কি জানেন, মত একটা যদি মনে বাসা বাঁধে সেটাকে তাড়াতে সময় লাগে। কিন্তু আরও ভাল পথ পেলে নিশ্চয় সে যাবে।'

'মহাত্মাজীর পথই তো রাজপথ, এখানকার পক্ষে সকলের মতে। নয় ?'

'নিশ্চয়। কিন্তু মানুষের জীবন তো মাত্র ষাট সত্তর বছর কিম্বা আরো কম। যারা কিছুই পায়নি তারা তো ও পথেও কিছুই পাবে না জীবনে।'

'তাদের পরবর্তীরা পাবে। অন্য পথই বা কই ?' বজবং সহায় বল্লেন

'এখন চলুন, আপনার লোক এসে গেছে।'

প্রার্থনা শেষ হলে নীতিশ বাড়ী ফিরল মনটা একটু হালকা হয় কথায়-বার্তায়। কিন্তু চিঠির জবাব কি দেবে ? কি করে সুধীশের শুভ সরল ইচ্ছাকে আঘাত না দিয়ে এড়িয়ে যাওয়া যায় কিন্তু চাদা করা টাকা নিয়ে পড়তে যাওয়া এতদিন পরে।

সুধীশের চিঠির জবাব এলে। সুধীশের পাশের খবরে, বিলাত যাওয়ার খবরে আনন্দ জানিয়ে নীতিশ লিখেছে তারপর লিখছে,—

ভাই, তুমি আমাকে না নিয়ে বিলেত যাবে না জানিয়েছ। তাই দাদারা কিছু করে টাকা দেবেন, জ্যেঠামশাইও মত দিয়েছেন।

এমন একটা সময় ছিল, ক'বছর আগের কথা বলছি, তখন হয়ত ঐ কথা শুনলে কৃতার্থ হয়ে যেতাম, ক্রীতদাসের মত কেনা হয়ে থাকতাম হয়ত। আর তখনকার মত অনুসারে 'মানুষ' হয়ে আসতাম—কৃতী হয়ে আসতাম। বড় লোকের মত, অভিজাতের মত থাকা লোকের সংখ্যা একটা বাড়াতাম। আর সেই রকম ভাবে খুব সুখীও হতাম। জানো, তুমি যখন ছোট আমাদের বড়দের মধ্যে তর্ক হত আভিজাত্য নিয়ে। একটু সম্পন্ন বাড়ীতে জন্মেছি বলে মনে বড় অহঙ্কার তখন সকলেরই। আভিজাত্যের মহিমা ও মাত্রা বিচার হ'ত। কখনো মনে হ'ত বিলিতী ধরণে থাকাকেই বুঝি আভিজাত্য বলে, কখনো মনে হ'ত

সেকেলে বনেদী চালকেই বুঝি বলা যায়, কখনো মনে হ'ত লেখাপড়া শেখাকে, বড় চাকরী করাকে! নানারকম ভাষ্য হ'ত তার।

এখন বুঝতে পারি আভিজাত্য বলে যা ভেবেছি আমরা, তা হচ্ছে সকলের সঙ্গে জনসাধারণের সঙ্গে এক না হওয়া আসলে। নিষ্ঠুর সীমাহীন অহঙ্কার সেই আভিজাত্যের সাধারণ লক্ষণ। যে নিজেকে নিয়েই থাকে অহঙ্কার ছাড়া আর তার কিছুই নেই। তা সেটা যা নিয়েই হোক, পদ-মর্য্যাদা, অর্থ-সম্পদ, বংশ, নাম। সত্য করে আভিজাত্য কি তাহলে? সেও একলা, একান্ত একাকী কিছু। সংযত সূক্ষ্মরুচি সৌজন্য মহিমাময় ব্যবহারের মধ্যে দিয়েও সে নিজের ছোট্ট লুকানো অহঙ্কার নিয়ে একা। জ্ঞানের, ধর্মের, কর্মের, ব্যবহারের যারই হোক সেই অহঙ্কার। তখন যখন মোহ ছিল আভিজাত্যের মনে হ'ত ওটা বুঝি ওর একটা বড় গুণ। আজ মনে হয় সকলকে যে নিজেদের থেকে পৃথক করে রাখল তার মহিমাটা কোনখানে? গ্রাম্যভাবে স্থূল কতকগুলো বিলাস ও প্রয়োজন দিয়েই সে তফাৎ হোক, আর, সূক্ষ্মভাবে শুচিভাবে নিজেকে সুদূর করে রেখেই হোক ও দুই-ই পৃথক হয়ে থাকাই তো। সবটাই অহংকারেরই মহিমা! বলতে পার যায় পরমহংসদেবের ভাষায় 'ভক্তের আমি' 'দাস আমি'র অহংকারও আছে তো। সে যাক্।

তাই চাঁদা করে টাকা সাহায্য নিয়ে আর ওরকম মানুষ হবার মতন মন আজকে নেই। কোটী কোটী দীনদরিদ্র সাধারণ না হোক, অসংখ্য মাঝারি সাধারণের সঙ্গে আজ মিশে গেছি। বুঝতেও পেরেছি। মনে হয় এইটেই আমার ঠিক জায়গা। অবশ্য এদেরও সকলেরই লোভ আরো কিছু হবার, পাবার। কিন্তু সে তো মানুষ নিজেকে, নিজের অবস্থাকে বারবার অতিক্রম করে যেতে চাইবে,—তার স্বভাব। অবশ্য এও জানি না এইটেই আমার ঠিক পথ কিনা।

তুমি শিক্ষিত হয়ে এসো। 'মানুষ' হওয়া কাকে বলে জানি না। সকলের মত আর আদর্শ ভিন্ন। তবে তুমি যে দেশে যাবে সেখানে তুমি অনেক রকম মানুষ দেখতে পাবে হয়ত কিছু আদর্শ খুঁজে পাবে।

আমার ভালবাসা নিও: ইতি নিতুদা।

অভিমানের আভাষ বাষ্পও নেই, বেশ সহজ মিষ্টি চিঠি। তবু সুধীশের যেন মনে হয় নিতুদা কেন এত আলাদা হয়ে যাবে তার থেকেও। যেন একটা অদৃশ্য কি ব্যবধান এসেছে।

যাই হোক তার আর যাওয়ার ইচ্ছা হ'ল না। মনে মনে ভাবল, আমার টাকা হলে সেই টাকাতে নিতুদাকে নিয়ে যাব। তখন তো আর চাঁদা করা টাকা বলতে পারবেনা। হাসপাতালে চাকরী নিল সকলকে আশ্চর্য্য করে দিয়ে। ওর বোকামী দেখে ভাইয়েরা অবাক হলেন এবং দুঃখিত হলেন।

বজরং সহায়ের ও দেবীপ্রসাদের কাজের কথা জানা গেল। মহাত্মা গান্ধীর নুন তৈরীর যাত্রায় ওরাও যাবার জন্যে তোড়জোড় করছে।

নীতিশও দলে মিশল

হঠাৎ বীণার একটা চিঠি এলো। জিজ্ঞাসা করেছে, নীতিশ কি যাবে দাণ্ডীতে, ওকে নিয়ে যেতে পারবে কি। যদি পারে তো ও তৈরী হয়ে আসবে।

নীতিশ অবাক হয়ে গেল। ভাবতে বসল কি লিখবে। দুটো দিন ভাবতে কেটে গেল। তৃতীয় দিনে বীণা এসে দাঁড়াল, খাদি ভাণ্ডারে।

নীতিশ বল্লে, 'আপনি?'

অপ্রস্তুত ভাবে একটু হেসে বীণা বল্লে, 'চিঠির জবাব নিতে এলাম।'

অত্যন্ত অপ্রতিভ হয়ে নীতিশ বল্লে, 'হাঁ, দেরী হয়ে গেল। কিন্তু কি করে আপনি যাবেন এই ভিড়ে?'

'কেন, যেমন করে যাওয়া-আসা করি।'

নীতিশ হাসলে, 'সে তো জানি। কিন্তু না জানা দেশ, আপনার লোক কেউ সঙ্গে নেই।'

মৃদু হেসে বীণা বল্লে, 'আজমীরও না জানাই ছিল তো। আর সেখানে কেউ আপনার লোকও নেই। বেশ তো কাটছে দিন।'

'সে হ'ল কাজের জায়গা।' নীতিশ অপ্রস্তুত হয়ে বলে

'অর্থাৎ কাজের জায়গায় আপনার লোক সঙ্গী না হলে চলে। তা দাণ্ডীতেও যা হোক কাজ করবার চেষ্টা করব বলেই যাবার ইচ্ছে। শুধু নিয়ে চলুন না সঙ্গে। যাবেনই তো।'

'তাতো যাব, কিন্তু'—নীতিশ থেমে যায়।

'অর্থাৎ আমাকে নিয়ে যেতে ভয় হচ্ছে?'

'না, না, ভয় কি?'

'তবে অস্বস্তি?'

'তা বলতে পারেন। প্রতুল চলুক না? বেশ হয় তাহলে।'

এইবার বীণা হাসল, 'অর্থাৎ আমার 'বডিগার্ড' একটি না হলে আপনি সাহস করছেন না। ভয় নেই। আমি আপনাকে ভয় করি না মোটে, আশা করি আপনিও আমাকে ভয় করেন না।'

নীতিশ লাল হয়ে উঠল, বল্লে, 'না ভয়-টয় করি না কারুকে। চলুন যাওয়া যাবে। কিন্তু অসুবিধা হলে আমি জানি না।'

'হোক অসুবিধা, ঘর ছেড়ে এত দূরে এসেও এটা দেখতে পাব না? যাব আপনাদের সঙ্গেই। প্রতুলদার ছুটী কই? তা ছাড়া কোনো বিপদে পড়লে ওর মুস্কিল, মা বোন ভাই আছেন। আপনিও নিরঙ্কুশ, আমিও মুক্ত।'

'আপনারও তো মা আছেন, ভাইয়েরা আছেন।'

'আছেন। কিন্তু আমি তো তাঁদের জীবিকাও নই, অন্নও নই। আমি বরং তাঁদের দায় বা ভার। বাংলায় একট কথা আছে, মার মুখেই শুনেছি, 'এসো লক্ষ্মী যাও বালাই'।'

'সে আবার কি?' নীতিশ আশ্চর্য্য হয়ে হাসলে।

'জানেন না? মেয়েলী কথা, জানবেনই বা কি করে! আমার মেয়েরা অনেকটা এইভাবেই জীবন কাটাই। কখন যে কোথায় 'লক্ষ্মী' আর কোথায় 'বালাই' হয় বুঝতেই পারে না তারা।'

'চলুন, এবারে যাওয়ার ব্যবস্থা করুন।'

ধরমশালা, আশ্রম, তারপর থার্ডক্লাশ মেয়েদের গাড়ীতে। তারপর মেয়েদের দলে বীণা কখন মিশে গেল। আর নীতিশের রক্ষণাবেক্ষণের বা সতর্ক লক্ষ্যের প্রয়োজনের সীমানাও কখন কেটে গেল তারি মাঝে। অসংখ্য নানা দেশীয় যাত্রী ও যাত্রিণীর মাঝে তারাও একদল। সহযাত্রী তাদের মতই, ওরাও পরস্পর অনাত্মীয়, মুখচেনা মাত্র কিছুদিন আগে। উচিত অনুচিত, ভাই বোন, স্বজন বন্ধু, আত্মীয় অনাত্মীয় সেকথা ওঠে না। যাত্রার লক্ষ্য ওদিকে নেই। যাত্রীদেরও লক্ষ্য ওদিকে নেই। যেন দুর্গম পথে তীর্থযাত্রীরা চলেছে। কারো জলের দরকার, কারো জায়গার, কারো ছেলে শোবার, কারো বা খাদ্যের, যে যা পারে সাহায্য করছে। মনেই ওঠে না এ ভালো ও মন্দ, এ দরিদ্র ও অভিজাত। আর এই তৃতীয় শ্রেণীর মাঝে বিশিষ্ট অভিজাতও কেউ নেই। সবাই জাঠ, চাষা, পটেল (মোড়ল) মজুর কর্মীদের ঘরের মেয়ে। কেউ বা অতদূর যাবে কেউ বা যাবে না কিন্তু মহাত্মাজীর নাম, এই 'লুনের' কথা তারাও সবাই জানে। সুহজ সরল বিস্ময়ে তারা সেকথা আলোচনা করে।

গাড়ী বেশীক্ষণ থামলে নীতিশ এসে জানলার কাছে দাঁড়ায়, জিজ্ঞাসা করে, 'কি লাগবে বা কি চাই?'

হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে, 'আচ্ছা, এত সাহস বিশ্বাস আপনার কোথা থেকে হ'ল। আমাকে চেনেন না, আমার বন্ধুদের না। আমার ভারি আশ্চর্য্য লাগে। নিন্দাকেও তো লোকে ভয় করে।'

বীণা হাসলে, তারপর বল্লে, 'তা করে। কিন্তু ছোট বেলায় বাবা খুব প্রশ্রয় আর আদর দিয়ে মানুষ করে ছিলেন, অর্থাৎ মাথাটা বিগড়ে দিয়েছিলেন। লেখাপড়া শেখালেন যে-সব স্কুলে তাও মিশনারীদের স্কুল। সেখানে আর যা তাদের উদ্দেশ্য থাকে থাক, দু'একটা জিনিষ ভালো আছে। সত্যিই তারা সকলকে সমান মনে করে, ছেলেমানুষীকে ধমক দেয় না, অন্যায়কে শাস্তি দেয কিন্তু দুরন্তপনাকে শাস্তি দেয়না। ছোট ছেলেমেয়েকে তাদের বড় মনে করার অভ্যাস নেই আমাদের মত। কাজেই নির্ভয় ভাবেই বড় হলুম। নিন্দার ভয়ও জন্মাল না মনে।

তারপর হঠাৎ যখন বাবা মারা গেলেন তখন আই-এ পড়ি। দেখলাম তখন বাড়ীতেই ভয় করবার দিন এলে। কিন্তু নির্ভয় হয়ে গেছি স্বভাবে, ভয় করা আর মনেই এলো না। উল্টে দেখি লোকেরা আমাকেই ভয় করে।'

বীণা হাসতে লাগল। 'সেটাও অবশ্য উভয়তই ভালো লাগল না। যান, গাড়ী ছাড়লে।'

বল্লে, 'না, জল নিচ্ছে, দেরী আছে। তারপর?' 'তারপর আর কি? ঐ উত্তরাধিকারটাতো বাবা দিয়েই গিয়েছিলেন নির্ভয় হবার, আর কিছু পাই বা না পাই। আজকে বাইরে বেরিয়ে বুঝতে শিখেছি, সমাজে যখন আমাদের আর কিছুই অধিকার দেওয়া হয়না, কোনো দাবীই নেই তখন ভয়ে ভয়ে লাভ বা ক্ষতি কোনোটাই পরম বা চরম বলে মনে না করলেই ভালো হয়। ক্ষতি হতে পারে। কিন্তু কত ক্ষতি সে? নিজেকে মানুষ বলে মনে করলে মেয়েমানুষ না ভেবে, সে ক্ষতি একদিন আপনিই পূরণ হয়ে যাবে, নয়ত লাগবে না গায়ে।'

নীতিশ একটু হেসে বল্লে, 'কিন্তু ভয় আছে, দুর্জ্জন দুর্বৃত্তও আছে বাইরে।'

বীণাও হাসলে, বল্লে, 'তা' আছে। সজ্জনও আছে।'

'গাড়ী ছাড়ছে। আচ্ছা আবার আসব।' নীতিশ নিজের গাড়ীতে চলে গেল।

তার মনে হয় রবীন্দ্রনাথের—

যে নারী বিচিত্র বেশে মৃদু হেসে খুলিয়াছে দ্বার
থাকিয়া থাকিয়া

... ...

তারি সেই চাওয়া সেই চেনার আলোক দিয়ে আমি
চিনি আপনারে।

মেয়েদের সে দেখেনি এমনভাবে। যাদের দেখেছে তারা হয় সম্পর্কীয়া নয়ত সম্পর্ক হতে পারে। সবটাই সম্পর্কের সাতরঙা বেলোয়ারী কাচের মাঝ থেকে দেখা ও চেনা। অনাত্মীয় হৃদ্যতার নির্মল আলো সেখানে ছিল না।

আশ্চর্য হয়ে মনে হয় ওই নির্ভীক মেয়েটির কথা আর তার নিজের জীবনের ভয় দিয়ে আরম্ভের কথা। যেন এতদিন পরে ওকেই বলতে ইচ্ছে করে, আজন্ম সেই সকলকে ভয় করার কথা, সকলের সেই মমতাহীন অবজ্ঞার কথা, ভালবাসা প্রশ্রয়হীন এক দীন ত্রস্ত শৈশবের কথা, যে ভীরুতা নির্ভয় বলিষ্ঠ মনে কোনো কাজ করতে শেখায়নি তাকে। বলতে ইচ্ছে করে, সে কারুকে আপনার করতে, বিশ্বাস করতে, ভালবাসতে শেখেনি। মাথা উঁচু করে কথা কইতে শেখেনি, সহজভাবে হাসতে সাহস করেনি। আর জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করে, তুমি সে পেরেছ, কি করে কেমন করে পারলে। শুধু সেই ছোটবেলার ভালবাসা আর প্রশ্রয় থেকেই এত পেলে? এত ভরসা, সাহস, নির্ভীকতা? এত বিশ্বাস নিজের ওপর, অজানা অচেনার ওপর? আরো তুচ্ছ, বড় কত কথা বলতে ইচ্ছে করে, শুনতে ইচ্ছে করে পরম বন্ধুর মত। প্রেমের কথা নয়, ভালবাসার গুঞ্জন নয়, শুধু সহজ শ্রদ্ধায় আশ্চর্য্য হয়ে তার নির্ভয় নির্ভরতার আশ্চর্য্য কাহিনী শুনতে ইচ্ছে করে। আজ যেন 'তারি সেই চাওয়া সেই চেনার আলোক দিয়ে আমি চিনি আপনারে'—বলতে ইচ্ছে ক'রে।

কিন্তু কিছুই বলা হয় না। গাড়ী ছোট বড় স্টেশনে থামে। নীতিশও বারবার নামে, জানালার পাশে দাঁড়ায়। কিন্তু চিরকালের ভীরু মূক মন নির্বাক হয়ে থাকে। কোনো কথাই খুঁজে পায়না। শুধু জিজ্ঞাসা করে, 'জল চাই?' 'চা চাই?' 'কি চাই?'

পথ শেষ হয়ে গেল যাত্রার। তার মনে হতে লাগল এত শীঘ্র শেষ হয়ে গেল? থার্ড ক্লাশের ভিড়, গরম, নোংরামি তবু মনে হয় আরো একটু দেরী হ'ল না কেন? এমন করে আর কখনো কোনোদিন কোথাও যাবে না হয়ত,

এই যাত্রা এইখানেই সুরু হয়ে এইখানেই শেষ হ'ল হয়ত ; তবু একটু গাড়ী লেট হ'ত যদি।

ভিড় ঠেলে পথ করে বেরিয়ে আসে সবাই।

সহসা সামনে পড়েন মোহনলাল। নীতিশ অবাক আশ্চর্য্যে এগিয়ে যায়। আগ্রহ ভরে কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। মোহনলালজীও আশ্চর্য্য হয়ে খুশী হয়ে ওঠেন।

'তারপর, আপনি কি করে ?' নীতিশ জিজ্ঞাসা করে।

'আমিও তো সেই কথাই জিজ্ঞাসা করব ভাবছি আপনাকেও ?'

'চলুন, আমাদের একটা দল আছে, সেইদিকে যাই। আপনার সঙ্গে কেউ আছে নাকি ?'

'না, আমি একলা। দেখতে এলাম। শুনলাম, শিউশরণ নাকি চাকরী ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছে। সেও আসবে, তাই আরো দেখতে এলাম। আমাদের 'ঈশাই'দের মধ্যে তো চট্ করে কেউ চাকরী-টাকরী ছাড়ে না। তাতে ভালো কাজ পেয়েছিল।'

'সত্যি ? খুব ভালো তো। তা ছাড়লেন বোধহয় ভাল লাগছিল না,'—নীতিশ বল্লে।

'তাই হবে। চলুন, কোন্‌দিকে যাব।'

বীণা, বজরং সহায়, দেবীপ্রসাদ, আরো পথের চেনা, কাজের চেনা খদ্দরওয়ালা চারিদিকে ছড়িয়ে ছিল।

মোহনলালজীর বীণাকে চেনা ছিল, নমস্কার করে তার আসার কথা জিজ্ঞাসা করলেন।

বীণা বল্লে, 'এমন দিন তৈরী তো আর জীবনে দুবার হবে না। দেখব না ? কি বলেন ?'

'ঠিক বলেছেন। আমি অত ভাবিনি। তবে কেমন ইচ্ছে হল তাই এলাম। জানেন তো আমাদের ঈশাইরা ক্রিশ্চানরা এসব ব্যাপারে একটু উদাসীন ভাবেই থাকে, তবে এখন একটু সচেতন হয়েছে। কাবেরীবাঈয়েরও আসবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ছুটি পেলনা, চাকরী করছেন। সত্যিই তো এমন ঘটনা তো রোজ হয় না',—মোহনলালজী বল্লেন।

বীণা বল্লে, 'এলে বেশ হত। আর মনে হয় এতে শুধু দিনের কথা নয়, আহার্য্যে একান্ত দরকারী দিনের মতই জীবনে স্বাধীনতার কথা। আসলে মনে

হয় মহাত্মাজী যেন নুনের রূপকে জানাচ্ছেন আমাদের প্রতি গ্রাসের আহার্য্যে নুনের মতই স্বাধীনতাও জীবনে অপরিহার্য্য। নুনহীন তরকারীর মত স্বাধীনতাহীন জীবনও বিস্বাদ। এই যেন এর রূপক ভাব।'

সকলেই ওর মুখের দিকে চাইল। নীতিশও আশ্চর্য্য হয়ে চাইল।

বজরং সহায় বল্লেন, 'আপনার ব্যাখ্যাটা তো বেশ।'

বীণা একটু অপ্রস্তুত হয়ে বল্লে, 'চলুন, কোনদিকে যেতে হবে।'

১৯

সুধীশ নিজের ব্যাঙ্কের খাতা দেখছিল।

ব্যাঙ্কে মাত্র হাজার দেড়েক টাকা জমেছে। কিন্তু সেতো বিলাতের খরচের পক্ষে কিছুই নয়। ক'বছর লাগবে তাওতো জানা নেই। খানিকটা টাকা জমলে তবে সে নীতিশের কাছে গিয়ে প্রস্তাব করে ধরে আনতে পারবে হয়ত।

বাইরের ঘরে ডাক পড়ল।

বৈঠকখানায় তিক্তমুখে সতীশ বসে আছেন। গিরীশ হরিশও বসে আছেন গম্ভীর মুখে। সে ঘরে ঢুকল।

সতীশ একটু অদ্ভুতভাবে বিদ্রূপের ভঙ্গীতে বল্লেন, 'মহাত্মাজী যে জেলে গেলেন।'

সুধীশ আশ্চর্য্য হয়ে চাইল। তারপর বল্লে, 'সেতো ১৯৩১-শেই গেছেন।'

'সে মহাত্মা নয়, উনি হচ্ছেন আমাদের নিতু মহাত্মা।' হরিশ বুঝিয়ে দিলেন।

সুধীশ অবাক হয়ে চুপ করে গেল। সুধীশ নীতিশের ভাই নয়, ওদের চেয়ে নিকটতম সম্পর্কীয়ও কেউ নয়, তবে ওকে ডেকে এভাবে বলার অর্থ কি? অবশ্য সে কথার তাৎপর্য্য সতীশ জানেন, হরিশ জানেন, গিরীশ জানেন, বাড়ী-শুদ্ধ সবাই জানে। সুধীশই এ-বাড়ীতে এখন একমাত্র লোক যে তাকে ভালোবাসে, তার কথা ভাবে এবং তা সুধীশও জানে। তবু এরকমভাবে 'চাঁদমারী' করে বল্লে আশ্চর্য্য হয়ে যায়। অবাক হয়ে যেন ভাবতেও পারলে না, সে দুঃখিত হ'ল, না, আশ্চর্য্য হল না, ক্ষুব্ধ হ'ল। আর তাঁরাই বা কি হয়েছেন!

'আজ পুলিশের লোক এসেছিল খোঁজ-খবর নিতে। ও কার ছেলে, আমাদের কাছ থেকে চলে গেছে কেন, কতদিন গেছে, মাঝে এসেছিল কেন? অর্থাৎ তাদের 'কালো' খাতায় ওর নামের সঙ্গে আমাদের বংশ পরিচয়ও লেখা আছে। আর তার মানে এ বাড়ীর ছেলেদের ভবিষ্যৎ কাজকর্ম, সরকারী চাকরির দফা শেষ!' সতীশ তিক্তমুখে বল্লেন।

'চিরকাল ওর বাপ জ্বালিয়েছে সকলকে। এখন ও সবাইকে জ্বালাচ্ছে গেছে যাক্, তা না বংশ পরিচয় দেওয়ার সাধটুকু আছে।' মেজকর্তা বল্লেন।

এতক্ষণে সুধীশের মুখে কথা এলো সে বল্লে, 'পরিচয় নিশ্চয় সে নিজে থেকে দেয়নি।'

'না দেয়নি!' প্রবীর বল্লে। সে এসে দাঁড়িয়েছিল।

সুধীশ একটু চুপ করে থেকে বল্লে, 'তোমাদের বুঝি মনে হয় পুলিশের লোকেরা এতই ভাল মানুষ যে না বল্লে খোঁজ নিতেও জানে না।'

গিরীশবাবু বল্লেন, 'তা বটে কিন্তু ওর দুর্বুদ্ধির জন্য চিরকালের মত বাড়ার উন্নতির পথে বাধা পড়ল।'

সুধীশ বাপের দিকে ফিরে বল্লে, 'তা হতে পারে। কিন্তু নিজের মতে নজে জেলে যাবার, কিছু করবার অধিকারও কি কোনো মানুষের নেই?'

সতীশ বিরক্ত মুখে বল্লেন, 'না, নেই। নিজে ডুবে পাঁচ জনকে ডোবানোর অধিকার মানুষের নেই। উনি মহাত্মা হচ্ছেন, আমাদের ছেলেরা পথে বসবে, পুলিসী হাঙ্গামে পড়বে ওর জন্য।'

সুধীশ বল্লে, 'তোমরা বল্লে না কেন, ওকে আমরা অনেকদিন বিদেয় করে দিয়েছি।'

সে নিজেই আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিল কি করে সে এত কথা সকলের সামনে বলে যাচ্ছে এমনভাবে।

সতীশ অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বল্লেন, 'তোমার পরামর্শেরই অপেক্ষা ছিল।'

তাঁর ছেলেরা বড় হচ্ছে। তাদের ভবিষ্যৎ কাজকর্ম কিছু বিদ্যার দ্বারা, কিছু সেলাম মুরুব্বি মারফৎ, খানিক বা উচ্চপদস্থ 'মহাজন'দের পরিচয় পত্র নিয়ে চাই, সবই কি ওই কাণ্ডজ্ঞান হীন গোঁয়ার ছেলেটার জন্য মাটী হবে।

সুধীশ আর কিছু না বলে বেরিয়ে আসছিল।

মেজকর্তা ডেকে বল্লেন, 'তুমি আর ওকে চিঠিপত্র লিখে সংস্রব রেখো না। তোমার চিঠিপত্রের সূত্র ধরেই পুলিশ এখানকার ঠিকানা পেয়েছে। সন্ধান নিতে

এসেছিল। তিনি খুব ভালো দলে জুটেছেন, ভকৎ সিংদের দলে পাওয়া গেছে। যত সস্তায় নাম কেনার চেষ্টা।'

কাকার আহ্বানে সে ফিরে দাঁড়িয়েছিল, এবারে বেরিয়ে গেল।

সমস্ত বাড়ী ভরে গুঞ্জন ওঠে। ভীত ত্রস্ত যত না হোক বিরক্ত তিক্ত। ভয় ওঁদের বিশেষ নেই, সে ওঁরা জানেন। কিন্তু রাগ বিতৃষ্ণায় ভয়ের অসুবিধার যুক্তি দেখিয়ে নীতিশকে অপরাধী করার চেষ্টার শেষ ছিল না। যেন এতদিন পরে ওকে বঞ্চিত করবার তবু একটা সপক্ষে যুক্তি পাওয়া গেল। আর অজানতেই সকলে খুব একটা মনে আরাম পেলেন।

রমারা দেশে নেই। বেলা দুঃখিত হয় যেন একটু। সুমিত্রা ঊর্মিলা কি ভাবে? আশ্বস্ত হয়? ভাবে কি? ভাগ্যে ওর সঙ্গে তাদের কারুর বিয়ে হয়নি। এই নিশ্চিন্ত নিশ্চিন্ত সমৃদ্ধ জীবন-যাত্রা ফেলে কোথায় যেতে হ'ত কে জানে। তাদের গুরুজন ও তাঁদের নির্বাচনও কি এতদিন পরে তারা ঠিক মনে করে বাঁচে?

কিন্তু মেয়েদের অতল মনের কোথায় কি থাকে কে জানে তার কথা

বড় বাড়ী, আপনার লোক, সম্রান্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষার গতানুগতিক চিরন্তন বেড়া জালে জড়িয়ে সুধীশ আজো চুপি চুপি টাকা জমায়। লুকিয়ে লুকিয়ে নীতিশের খোঁজখবর নিয়ে জেনেছে, ঠিক ঠিক 'টেররিস্ট' দলে ওকে পাওয়া যায়নি। তাদের সঙ্গে বস্তুত মেলামেশা ছিল, সন্দেহ আছে। এখন ছাড়া পাবে না পনেরো হাজার বাংলাদেশের ছেলের মধ্যে সেও একজন, যারা নানা জেলে কখনো বক্সা, কখনো হিজলী, কখনো দেউলীতে থাকে, কখনো বা নিজগ্রামে নজরবন্দী হয়ে থাকে।

চিঠিপত্র সরকারী নিষেধ অনুসারে কাঁচি-কাটা হয়ে যায় এবং আসতে পারে। সুধীশ হাসপাতালের ঠিকানায় চিঠিপত্রও লেখে, খোঁজ-খবর নেবার ব্যবস্থা করে মাঝে মাঝে। ভরসা করে একদিন নিতুদা ছাড়া পাবে। তার কথা ভাবলে সেই নোংরা বিবর্ণ সতরঞ্চি জড়ানো বিছানা, চটা-ওঠা বাক্সওয়ালা, খাবারের পুঁটুলী হাতে থার্ডক্লাসের যাত্রী নিতুদাকেই তার মনে পড়ে। আর কোনোদিনের কোনো ঘটনা তার অত প্রত্যক্ষ হয়ে মনে নেই। আর মনে পড়ে 'চাকরী পাইনি

তো ভাই' কথাটি। সেই সঙ্গে মনে পড়ে যায় সেই বাবার মাসীমাকে। কাঁথা-জড়ানো বিছানা নিয়ে যিনি চলে গেলেন, আর আসেন নি। বাবার অনাথা মাসীমার সঙ্গে নিতুদার কি সাদৃশ্য তা' সে জানেনা, কিন্তু তার মনে হয়ে যায়।

এখন ১৯৩৫ সাল। টাকাও জমল কিছু। প্রায় দু'বছর বিদেশের খরচ একলার চলে যেতে পারে। কাঁচি-কাটা চিঠি কতকাল পরে পরে আসে। আর ভয়ে ভয়ে সেও বেশী লেখেনা, পাছে বাড়ীর সবাই জানতে পারেন। আর সে চিঠিতে না খবর, না মনের কোনো কথা পাওয়া যায়, ভালোও লাগে না।

তা হোক, একদিন সে ছাড়া পাবে। সেদিন তারা দুজনে একসঙ্গে যা' ইচ্ছে করবে, যেখানে ইচ্ছে যাবে আমেরিকা, বিলেত, জাপান যদি নিতুদা যেতে মত করে। না যদি এদেশেই থাকবে, সেও যাবে না। সেও এ বাড়ীর মত নিজের কথা নিজের মধ্যেই রাখতে শিখেছে। সেই চমৎকার অভিজাত অহঙ্কার যার কথা নিতুদা লিখেছিল, সেই অহঙ্কার তাকেও কারুকে আপনার করতে দেয়নি। কিন্তু আর সকলের তো বন্ধু আছে, বধূ আছে, অন্য আপনার লোক আছে, তারাও কি তাদের কাছে নিজেদের কথা বলে না?

জানেনা সুধীশ। শুধু ভাবে, কেমনভাবে মানুষ হ'ল, তার কেমন করে। কলের মত, যন্ত্রের মত। অহঙ্কারের বিরাট আড়াল থেকে শুধু তার মনের কোন্খানে যেন ক্ষোভ জাগে। তারো নিচে কোন্ অন্তরালে যেন চোখের জল ছলছল করে। যেন কারুকে চায় মন একান্তভাবে আপন করে। কে সে? নানা সম্পর্কের স্বজন? ভালো সম্বন্ধ করে বিয়ে-করা একটি সালঙ্কারা অভিজাত দুহিতা বধূ?—তার সঙ্গে কিছু ন্যাকামী, কিছু বাস্তব চিরকালের মত প্রেম ভালবাসার আলাপ!

সুধীশের হাসি পায়। আবার ভাবে তাহলে ভালোবাসার ক্ষমতাও তার—তাদের নেই? নইলে হাসি পায় কেন?

মন আবার গভীরভাবে ভাবতে বসে। মনে হয়, না ভালবাসার ক্ষমতা নেই, ভালবাসাই নেই ওদের। আছে অভিজাত সম্পত্তিবোধ, সম্পত্তির ভাবী বংশধারা রক্ষার আপ্রাণ চেষ্টা, আর তার অধিকারবোধ। যার একমাত্র লক্ষ্য নিরুদ্বেগ নির্বিঘ্ন ঔরংজেবীয় জীবন-যাত্রা। যার পথে কেউ বাধা হলে, কোন বাধা এলে যেমনই সে আপনার জন হোক্ না কেন সে বাধা সরাতে, চূর্ণ করে দিতে তার

বাধে না। মনে মনে সকলেই কি ওরা ঔরংজেব? তফাৎ শুধু সম্রাট আর সাধারণ। যেমন? তার মনে পড়ে যায় নীতিশকে।

স্পষ্ট করে সেকথা কোনদিন সে ভাবতে পারে না। নিকটতম স্বজনের নির্মম লুব্ধ অবিচার-জড়ানো সে-কথা। অতি গোপন সঙ্গোপনে চুপি চুপি ভাবে। খাপছাড়া হয়ে মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের 'প্রবলের উদ্ধত অন্যায়' 'লোভীর নিষ্ঠুর লোভ।'...

সুধীশের টাকাও জমতে থাকে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, নীতিশও ছাড়া পায় না।

হাসপাতালে কাজ করতে করতে এলো পিয়ন। একটা প্যাকেট মত, আর একটা অদ্ভুত ধরণের চিঠি এসেছে।

চিঠিটা দেউলী থেকে এসেছে অনেকদিন পথে ঘুরে, ছোট বড় পুলিশ অফিস্ ঘুরে অনেক রকমের ছাপ গায়ে নিয়ে। খবরটি কয়েকটা কথা মাত্র সংক্ষেপে। রাজবন্দী নীতিশের কয়েকদিন হ'ল মৃত্যু হয়েছে। আর তার কয়েকটি চিঠি ও কাগজপত্র। সে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে চিঠিখানা হাতে নিয়ে কতক্ষণ জানে না। সহসা ডাক পড়ে ডাক্তারের কর্তব্য। কলের মত রোগীদের খাটের পাশে পাশে দাঁড়ায়। নার্সের টুকে রাখা বিবরণী দেখে। জ্বর আঁকা-বাঁকা পথে উঠেছে নেমেছে কার,—কালাজ্বর একজ্বরী, টাইফয়েড। হঠাৎ মনে হয়— নিতুদার কি হয়েছিল? সে যেন থেমে যায়, মনও। তবু কথা কয়, মন্তব্য লেখে, যা বলবার বলে। চলতে থাকে খাটের ধারে ধারে, রোগীর পাশে পাশে।

মন নিঃশব্দে চলে যায় কখন হাওড়া স্টেশনে, সেই কতদিন আগে আন্দামীর যাত্রী নীতিশের কাছে। বিছানা-বাক্স মাথায় করা কুলীর পিছনে তারা যাচ্ছে। চিরকালের পথে অনন্তকালের পথে চলেছে সেই যাত্রা। সে যাত্রা আজো থামেনি। অশ্রুহীন, শোকহীন—এক সুধীশ স্থির হয়ে এক মনে যেন দেখে সেই যাত্রা।

আবার ডাক পড়ে কাজের।

বাড়ী ফিরে আসে অনেক রাত্রে।

রাত্রি গভীর হতে থাকে, নিদ্রাহীন সুধীশ বসে থাকে প্যাকেটটা সামনে নিয়ে। কি আছে ওতে? কি কথা, কাকে লেখা?

অবশেষে খোলে। পুরাতন চিঠিপত্র, পরীক্ষা পাশের সার্টিফিকেটগুলি, তার লেখা চিঠিগুলি, একটা চিঠি আধখানা প্রভুলকে লেখা। তাকে লেখা একটুখানি; শেষ হয়নি। সব অর্দ্ধ সমাপ্ত। আর একটা চিঠি বীণাকে লেখা।

বীণা? কে বীণা? সুধীশ কি চেনে? চেনে না?

লেখা—"শ্রীমতী বীণা দেবী করকমলেষু,

অনেকদিন পরে ভাবি চিঠি লিখি আপনাকে কিন্তু কি বলে লিখি, মিস মুখার্জ্জি? না, বীণা দেবী? না, কি? কিছুই মনের মত সম্বোধন হয় না। আপনি বলি না, তুমি বলি তাও বুঝতে পারি না। চেনা আপনার সঙ্গে বেশী হয়নি, কয়েকদিনের মাত্র। হৃদ্যতাও হয়নি, অথচ মনে করতে গেলে আপনাকেই এখন মনে পড়ে কেন তা জানিনা। মনে হয়, যেন অনেক কথা বলবার আছে। আর তা বলা যায় আপনাকেই। কিন্তু চিঠি লিখতে বসে সে সব কথা আর মনে আসেনা। কি লিখি? কুশল প্রশ্ন? আপনার আমার তা নেই কিছুই। সম্পর্কও ত নয়। কুশল মঙ্গল প্রশ্নকে অতিক্রম করে যা আছে সেই গভীর সম্পর্কও আমাদের নয় তবে কি বলতে চায় মন তাই ভাবি।

মনে হয়, শুধু সহজ ভাবে কথা কয়ে যাই। কোনো সমস্যা নয়, বিশ্লেষণ নয়, সুখ-দুঃখ বিচার নয়, সূর্যোর আলোর মত নির্ম্মল অনাবৃত অবাধ প্রকৃতির ঐশ্বর্য্যের মত অকৃপণ অগাধ সহজ পরিচয় আলাপে সে কথা হোক।

কিন্তু কথা কয়ে যাই, আসলে তাও নয়, আপনার কথা শুনে যাই, এইটেই আমার লোভ। দার্জ্জিলিং যাবার পথে গাড়ীতে আমার গল্প শোনা আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু শেষ হতে হয়নি। শেষ কথার জন্য আর অবসর ছিল না। যাত্রা শেষ হয়ে গিয়েছিল সেদিন

আপাততঃ কয়েকদিন ধরে জ্বরে পড়েছি, হাসপাতালে দিয়েছে, বড় ফাঁকা ঠেকছে, যেন কাকে কি বলতে ইচ্ছে করছে। তাই মনে হ'ল আপনাকে লিখি একটা চিঠি। আবার ভাবছি আমার চিঠি পেয়ে 'খাম খুলে আঠারো খা' পুলিশের হিসাবের খাতায় চিহ্নিত না হয়ে যান চিরকালের মত। সেটা কর্মক্ষেত্র বড়ই অসুবিধাকর।

যাক, তবু লেখায় না হয় হোক, পাঠানোটা স্থগিত রাখব না হয়। আপনার

কথা শোনা সেইটেই আসল লোভ বটে, কিন্তু হঠাৎ আমারো কিছু বলবার বিষয় এসে পড়েছে। তার শ্রোত্রী আপনিই হ'তে পারেন মনে হল।

কাল একটা স্বপ্ন দেখলাম। কিষণগড়ের বালিভরা মাঠে রৌদ্রে বেরিয়েছি। একলা। কোথায় যাচ্ছি জানিনা। কিন্তু চলেছি। পথ মাঝে মাঝে আছে, মাঝে মাঝে নেই। যবের ক্ষেত, ভুট্টার ক্ষেত দূরে দেখতে পাচ্ছি। অদ্ভুত গরম। 'লু' চলছে। মাথায় রৌদ্র, পায়ের নীচে বালি গরম আগুন। দূরে দূরে ক্ষেত দেখতে পাচ্ছি বটে, কিন্তু কূয়ো একটাও দেখছি না। খুব তৃষ্ণা পেয়েছে, মানুষও নেই কেউ কোথাও। হঠাৎ দেখি কাছেই একটা কূয়ো রয়েছে। আর কুয়ো থেকে একটি ঘাগরা ওড়না পরা এ দেশী মেয়ে জল তুলছে।

কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। বল্লাম 'আমাকে একটু জল দেবে?' সে চমকে পিছনে ফিরে চাইল, আর তার হাত থেকে মাটীর কলসীটা পড়ে ভেঙে গেল।

আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমার খাটের পাশে টুলের ওপর যে কুঁজোটা ছিল, সেটা ঘুমের ঘোরে আমার হাত লেগে পড়ে ভেঙে গেছে। আর সব রুগীর জেগে উঠেছে। নার্স এসে দাঁড়াল

কিন্তু জানেন কে সেই মেয়েটি? সে টুলু। টুলুকে বোধহয় আপনি চিনতেন। সুমিত্রাদের কাছে নাম শুনে থাকবেন আপনাদের সঙ্গে স্কুলে পড়েছে তাকেই স্বপ্ন দেখলাম।

জানেন না বোধহয় তার সঙ্গে আমার বিয়ের কথা উঠেছিল। শেষে তার অন্য জায়গায় বিয়ে হ'ল।

তারপর একদিন কিষণগড়েই তার মৃত্যুর খবর পেলাম, বুলুর চিঠিতে। সেদিন অদ্ভুত ভাবে দুঃখ পেলাম।

ভালবাসা কাকে বলে জানিনা, আর তা' যে ভাবেরই হোক পাইনি। কেউ করেছে রক্ষণাবেক্ষণ, কেউ করেছে নিরুপায় কর্ত্তব্য। ভালবাসতে শিখিওনি ছোট থেকে। এ জিনিষটা না পেলে লোকে প্রায় দিতেও শেখে না। আমরা শিখেছিলাম ভয় করতে, সঙ্কোচ সমীহ করে চলতে। বুলু টুলুও তাই শিখেছিল। টুলু বেশী করে, কেননা সে বাড়ীর কেউ নয়। যেন বেঁচে থাকাটাতেই তার অপ্রস্তুত সঙ্কোচের সীমা ছিল না।

কিন্তু সেদিনের দুঃখ, তার অকাল মৃত্যুর দুঃখ এ এক অদ্ভুত ক্ষোভভরা কষ্ট, এ আমাকে তাকে ভুলতে দেয় না। যখনি মনে হয় কাঁটার মত মনে খচ খচ করে। করুণ নয়, করুণা করব এমন পদস্থ কিছু ছিলাম না বাড়ীতে, তার

তুলনায় ; শ্রদ্ধা নয়, কেননা সে নিতান্তই নিরীহ মুখচোরা ছোট মেয়ে ছিল। মমতাও নয়, মোহও ছিল না। শুধু এক সঙ্গে এক বাড়ীতে মানুষ হয়েছিল মাত্র। তাতে মানুষকে যেমন মানুষ ভালবাসে। কিছুই জানিনা। শুধু বুঝতে পারি' এ যেন আমি তাকে ঘটনাচক্রে দুঃখ দিয়ে এসেছি, না জেনে তাই। যদিও সে দুঃখ পেয়েছিল কি না আমি জানিনা সেকথা কিছুই। তবু এই ক্ষোভ মুছে ফেলা যেত যদি সে বেঁচে থাকত, সুখে থাকত সকলের মত। ওরই কথা জানবার জন্য সেবারে কলকাতায় গিয়েছিলাম। কিন্তু কি কথা ? কে বলত আমাকে ? কিন্তু আজ আপনাকে একথা কেমন করে বলতে বসেছি—যদি এ চিঠি পাঠাতে পারি তাও ভাবি। আজ 'রাজদ্বারে' এসে অনেক মানুষকে দেখে বুঝতে পেরেছি, মানুষের দাম আছে মানুষ হিসেবেই। আত্মীয় নয়, উপকারী নয়, অপকারী নয়, শুধু সঙ্গী হিসেবে বন্ধু হিসেবেই তার দাম। এখানে এসে সকলেই সমান হয়ে গেছি। নানা শ্রেণী নানা স্তরের নানা শিক্ষার মানুষ আর তাদের ওপর নির্বিচার সরকারী 'বিচার'। সকলকেই এক অবস্থায়, আপনার জনের মত সকলেই নিঃসঙ্কোচ। তাই যেন আজকে আমার সঙ্কোচ আর আপনার কাছেও নেই। আপনি মেয়ে বা অনাত্মীয় মেয়ে, সেকথা আজ জেলের পাঁচিল ভুলিয়ে দিয়েছে। এ একটা মহা শিক্ষালয়। তাই অনায়াসে আপনাকে আজ আমার বন্ধু মনে হচ্ছে। আপনি যেন সেই বন্ধু যে, নির্ভয়, যে সত্য ছাড়া কাউকে ভয় করে না। যাকে পরম নির্ভয়ে সব কথা বলা যায়, তুচ্ছ বড় সুখ-দুঃখের সব কথা সব যে পৃথিবীর মত ধারণ করে রাখতে পারে সহজেই।"

চিঠি এইখানেই থেমে গেছে। আর লিখতে পারেনি অসুখ বেড়ে ছিল ? অথবা আর কিছু লেখবার ছিল না ? কিন্তু শেষ তো করেনি, কেননা নীচে নাম নেই।

সুধীশ অন্য কাগজ-পত্র নাড়ে চাড়ে। পড়তে ইচ্ছে হয় না। পরীক্ষা পাশের সার্টিফিকেটগুলোও তার সঙ্গে জেলেই ছিল ? না থানের মধ্যে ছিল পুলিশের হেপাজতে। আজ পাঠিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এই বীণা কে ? জানলে এই চিঠিটা তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া যেত। হয়ত প্রতুলদা জানে।

স্তব্ধ হয়ে সে ভাবতে থাকে। এই মৃত্যু ? এই অবশ্যম্ভাবী সত্য ? যার পার নেই, কূল নেই, একেবারে পর্দ্দা ফেলা নিস্তব্ধ নিষ্ঠুর মূক লোক।

রাত্রি গভীর হতে থাকে, বাড়ী নিস্তব্ধ হয়ে যায়। পথ নিস্তব্ধ হয়। সুধীশের চোখে জল আসতে চায়, কিন্তু আসে না। শুষ্কভাবে মনে হয় কেন ?

কেন সে সকলের মত কিছুদিনও বেঁচে রইল না। কত লোক তো থাকে। দুঃখ কষ্ট দারিদ্র্য অতিক্রম করে তারা বড় হয়ে ওঠে জগতে, মহৎ হয়ে ওঠে। কোনো মহৎ সম্ভাবনাও কি তার ভাগ্যে ছিলনা? ভাগ্যও কি তার অমোঘ নিষ্ঠুর, তার স্বার্থপর নিষ্ঠুর স্বজনদের মত?

ন্যায়-অন্যায়, বিচার অবিচার সে কাকে বলে তাহলে? নেই সে সব? না থাক্, কিন্তু সে নিজে ব্যক্তিত্বে, মহত্বে সার্থক হয়ে উঠ্‌ল না কেন? সেই তো তার বিরাট জয় হ'ত।

রাত্রি শেষ হয়ে যায়। মন কঠিন হয়ে রাত্রি শেষের আকাশের দিকে নিদৃষ্টি নির্লিপ্ত ভাবে চেয়ে থাকে।

সারাদিন নানা কাজে কেটে যায়। বীণাকে লেখা নীতিশের চিঠির একটা লাইন মনে হয় বারে বারে তারি ফাঁকে ফাঁকে, 'এ মুছে ফেলা যেত যদি সে বেঁচে থাকত।' সেও মুছে ফেলতে পারত যদি নিতুদা বেঁচে থাকত। সব ভুলে যেত, হয়ত নিতুদাকেই ভুলে যেত। হয়ত যাবে ভুলে একদিন।

পরদিন সকালবেলা খবরের কাগজের সঙ্গে দরোয়ান একটা চিঠি দিয়ে গেল চায়ের টেবিলে। চিঠির খামে গিরীশবাবুর নাম লেখা।

আশ্চর্যভাবে গিরীশবাবু চিঠি খুললেন।

চিঠিতে লেখা,

শ্রীচরণেষু বাবা, কাল পুলিশের চিঠিতে জানলাম নিতুদা দেউলী জেলে মারা গেছেন তিন সপ্তাহ হ'ল।

আমি এখানকার হাসপাতালের কাজ ছেড়ে দিলাম।

আপনার সম্পত্তিতে যদি আমার কিছু অংশ থাকে তো আপনি আপনার ইচ্ছামত দাদাদের বা যাকে ইচ্ছা দিয়ে দেবেন ভবিষ্যতে কোনদিনও আমি তাতে দাবী করব না।

আপনি আর মা আমার প্রণাম নেবেন।

ইতি প্রণত সুধীশ।

তিনি হতবুদ্ধির মত চিঠিটা আবার পড়লেন। ছোট চিঠি, পড়া শেষ হয়ে গেল তখনি। তাঁর মুখ কেমন বিবর্ণ হয়ে গেল।

সুমিত্রা চা ঢালছিল, জিজ্ঞাসা করলে, 'চিঠি কার বাবা, এত সকালে?' গিরীশ অস্পষ্টভাবে উত্তর দিলেন, 'চিঠি'?' ছেলেরা এসে বসেছিল। তারা

অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে চাইল। সতীশ চিঠিটা হাতে করে তুলে নিলেন, মনীশও দেখলে। ভায়েরাও এসে বসেছিলেন। সতীশ বিরক্তভাবে কি একটা বলতে গেলেন। গিরীশ শান্তভাবে শুধু হাত নেড়ে বারণ করলেন। সকলে স্তব্ধ হয়ে গেল।

উপন্যাসটির পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশকাল—১৩৫৫

মনের অগোচরে

উপন্যাস

রচনাকাল—১৩৫৯

পরমপূজনীয়

স্বর্গীয় কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের

উদ্দেশে শ্রদ্ধাভরে উৎসর্গিত হইল

অক্ষয় তৃতীয়া, ১৩৫৭

অমৃতসর পাঞ্জাব

মনের অগোচরে

বিশাখা

পশ্চিমের ছোট সহর। রাধামোহনের প্রকাণ্ড মন্দিরের সংলগ্ন প্রকাণ্ড 'হাবেলী' অথবা বাড়ী। চতুর্দিকে বাগান। তার মাঝে একদিকে কুয়া, তারই কাছে গোশালা। তার ওপাশে কিছু দূরে একটা হাতী চৌবাচ্চা ভরা জল থেকে শুঁড়ে করে জল নিয়ে নিজের মাথায় আর চার ধারে ছিটিয়ে খেলা করছে। তার গলার ঘন্টাটা সঙ্গে সঙ্গে বাজছে টং টং। তার নাম মোহনদাস।

মন্দিরের সামনে দেউড়িতে শুভ্র গুম্ফ শ্মশ্রু সমন্বিত গুরু গম্ভীর মূর্তি একটি দারোয়ান বসেছিল। মন্দিরের ভিতরে ভাগবত পাঠ হচ্ছিল।

এমন সময় ঘড় ঘড় শব্দে একটি টাঙ্গা এসে দাঁড়াল, এবং টাঙ্গা থেকে ধূলি ধূসরিত ঘর্মাক্ত কলেবর একটি যুবক তার বাক্স নিয়ে নামল।

চতুর্দিকে তাকিয়ে বাঙালী কারুকে না দেখে সে দরোয়ানকেই অপূর্ব হিন্দীতে বল্লে, 'এ জী ভিতর খবর দেও, শান্তিপুর সে হাম আয়া।'

দরোয়ান বল্লে, 'তুম কোন হ ? সামন হিঁয়া উতারো, বয়ঠো। দু'বাজে পরসাদ মিল যায় গা', মুসাফির কো মিলতা হায়।'

বিরত যুবক 'মুসাফির'ভাবে অভ্যর্থিত হতে প্রস্তুত না হয়ে—মন্দিরের প্রাঙ্গণের দিকে অগ্রসর হয়েই দেখতে পেল তার ভগিনীপতি গোঁসাইজী মন্দিরের মধ্যে ঠাকুরের সামনে বসে ভাগবত পাঠ শুনছেন।

সে গিয়ে প্রণাম করতেই তিনি শশব্যস্তে বল্লেন, 'আরে এখানে ঠাকুরের সামনে আমাকে কি প্রণাম করে ? তারপর তুমি এখানে হঠাৎ ? এসো এসো ভিতরে চল।'

মন্দিরের পাশের এক গলিপথ দিয়ে অন্তঃপুর সীমানায় যাওয়া যায়।

গোঁসাইজী ডাকলেন, 'এই গোবিন্দ তোর মাকে ডাক্। তোর বড় মামা এসেছেন।' সেকেলে ধরণের প্রকাণ্ড অদ্ভুত গড়নের বাটির কোন একদিক দিয়ে একটি পরম সুন্দর বালক ছুটে বেরিয়ে এলো, তার পিছনে ঘোমটা ঢাকা মুখে বিশাখা এসে ভাইকে প্রণাম করলে।

গোঁসাইজী সহাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি ওকে প্রণাম করলে যে ?'

বিশাখা হাসলে, মৃদুস্বরে বল্লে, 'ওযে বড়, দাদা।'

'ওতো আমাকে প্রণাম করলে, না হে কিশোর ?'

কিশোর হাসলে বল্লে, 'আপনিও যে বড় ।'

'তারপর তুমি কি করে এসে পড়লে। বিশাখা ভাইয়ের পানে চাইল। 'তোকে দেখতে এলাম। কতবছর পরে দেখলাম রে ? প্রায় ছ-সাত বছর না ? আচ্ছা আপনাদের দূর দেশ, বাবা !'

গোঁসাইজী হাসলেন, স্ত্রীকে বল্লেন, 'এখন ওকে জল খাওয়াও তারপর গল্প কোরো।'

গোবিন্দর হাত ধরে কিশোর বিশাখার সঙ্গে অন্তঃপুরে চলল।

বিশাখার মুখের ঘোমটা কমে গেল। দীর্ঘ দিন পরে ছবির মত ঘটনাসারি সব তার মনে পড়ল ; চোদ্দ বছরে বিবাহ হয়ে সে এখানে এসেছিল, পিত্রালয়ে যাওয়া হয়নি। এই সাত বছরের জীবনে তার নিজের নামও যেন সে ভুলে গেছে।

২

দীর্ঘ সাত বছর আগে মাঘ মাসের এক সন্ধ্যায় স্কুলের প্রাইজে হাত ভরে নিয়ে বিশাখা বাড়ী এসেই শুনলে 'শীগগির করে ওসব রেখে হাত মুখ ধুয়ে নে সাবান দিয়ে।'

হতবুদ্ধি তার হাত থেকে প্রাইজগুলো মা নিলেন, আর পিসিমা মার হাত থেকে নিয়ে রেখে দিলেন কোথায় কে জানে কোন চৌকির ওপর, অথবা আলমারীর মাথায়, কিম্বা লোহার সিন্দুকের তলায়। সে আর কোনদিন সেগুলো সব ফিরেও পায়নি, দেখেওনি। সেলাইয়ের প্রাইজ ছিল চমৎকার একটি বাক্স, ইংরাজী বাংলার ফার্স্ট প্রাইজ ভাল ভাল বই ছিল। সারাদিন গান অভিনয় খেলা করে যেমন ক্লান্ত তেমনি ক্ষুধার্ত ছিল, তার চোখে জল এসে গেল। মাকে বল্লে, 'বড় ক্ষিদে পেয়েছে।' পিসিমা বল্লেন, 'ওরে ওরা অনেকক্ষণ এসে বসে আছে আগে সেজে নে। একটু পরে খাবার খাস না।' কারা বসে আছে, তা বোঝবার আগেই বাবা এসে ডাকলেন, 'কই তোমাদের হল ?'

আর মা পিসিমা সবাই মিলে তাকে সাবান মাখিয়ে চুল আঁচড়ে গহনা কাপড় পরালেন। তারপর বাইরের ঘরে নিয়ে যাওয়া হ'ল। খানিক পরেই ফিরিয়ে আনা হ'ল।

ও তখন প্রাইজগুলো খুঁজে দেখতে গেল রান্নে। পিসিমা বল্লেন, 'আর

প্রাইজ নিয়ে কি করবি ? ওরা মস্ত বড় গোঁসাই, তোকে খুব পছন্দ হয়েছে। কাল সকালে আশীর্ব্বাদ করে যাবে। কিছু নেবেনা। ১৭ই মাঘ বিয়ের দিন ঠিক করে গেল।'

খুড়িমা বল্লেন, 'ওদের হাতী আছে দোরে'—

বিশাখা প্রাইজগুলো খুঁজেই পেল না—মাকে জিজ্ঞেস করলে ; বল্লে, 'মা, ফার্ষ্ট প্রাইজ ছিল তুমি দেখলেও না। সব কোথায় গেল খুঁজে পেলাম না।'

মাও বল্লেন, 'আর প্রাইজ না পেলি খুঁজে,—নেই। কত বড় লোকের ঘরে পড়েছিস, ওদের ঘরে তোর ঐ বই আর সেলাইয়ের কিবা দাম।'

পিসিমা বল্লেন, 'পাগলা নাই দেখলাম তোর জিনিস। কাল ওরা রাধারাণীর সিঁথি পোঁছে দিয়ে আশীর্ব্বাদ করবে। সেই তখন দেখবে লোকে, দেখিস্।

পরদিন আশীর্ব্বাদ, তার দুদিন বাদে গায়ে হলুদ। তারপর তিনদিনের মধ্যে বিবাহ হয়ে গেল। সাতটা দিন কি রকম হৈ চৈ উৎসব সমারোহের মাঝে ফুল-ঝুরির মত দীপ্ত ও দ্রুতভাবে কোথায় ঝরে গেল।

১৮ই মাঘ সন্ধ্যায় ট্রেণে সে এসেছিল সেখান থেকে। আর যাওয়া হয়নি। সেই প্রকাণ্ড পুরীর অন্তঃপুরে ছিলেন এক বৃদ্ধা পিসশাশুড়ী দুচার জন আশ্রিতা মহিলা আর তার স্বামী ও সে।

বাহিরে মন্দিরে রাধামোহনের নিত্য ভোগ-রাগ উৎসবময় সেবা আর অন্তঃপুরে তার অবগুণ্ঠিত নিঃসংঘাত গুরুজনের সেবাপরায়ণ আদেশপালক দিনযাত্রা। এর মাঝে তার বোন ললিতার বিবাহ হয়েছে, গোবিন্দের জন্ম হয়েছে। বারবার পিত্রালয় থেকে আহ্বান এসেছে কিন্তু তার যাওয়া হয়নি।

দীর্ঘ সাত বছর পরে সে ভাইকে দেখ্‌ল। পরস্পর অবাক হয়ে চেয়েছিল দুজনে। দুবছরের ছোট মাত্র ছিল বিশাখা। তখন চৌদ্দ বছরের। কত বড় আর কত সুন্দর হয়েছে বিশাখা। বিশাখাও দাদাকে চিনতে পারত না কেউ বলে না দিলে।

আসন পেতে দাদাকে বসিয়ে সে ভাঁড়ার থেকে এক রেকাবী প্রসাদ আর এক গ্লাস সরবৎ এনে রাখল ভাইয়ের সামনে।

কিশোর একটু হাসলে, তারপর বল্লে, 'একটু চা দিবিনি ?' অপ্রস্তুত বিশাখা বল্লে, দেখেছ ভুলে গেছি সব। কিন্তু—।' কিন্তু অর্থাৎ চা দেবে কি করে। যদি বা কবে কার জন্য চা এনেছিল সে চা ভাঁড়ারের প্রত্যন্ত সীমায় কোনো অস্পৃশ্য-লোকে ছিল। কিন্তু পুরানো আমলের কেনা এনামেলের চটা ওঠা পেয়ালা দুটোর

কোনো সন্ধানই আর পাওয়া গেল না। অগত্যা পাথর বাটীর পেয়ালাতে করে বিশাখা চা এনে দাদাকে দিল। এবারে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে জিজ্ঞাসা করল, 'সত্যি সত্যি দাদা নিতে এসেছ?'

'হ্যাঁরে নইলে কি শুধু শুধু এই হাজার মাইল ধুলোয় রোদ্দুরের আরাম খেতে আসি? আমার বিয়ে যে।' কিশোর হাসলে।

'সত্যি?. তোমার বিয়ে? মিছে করে বলছনা?' বিশাখা উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

'হ্যাঁরে বিয়ে সত্যিই। বাব বল্লেন নিজে গিয়ে না আনলে যদি এবারও ওরা না পাঠায়। তাই এলাম।'

দীর্ঘকাল পরে আনন্দ অভিমান হাসি কান্নার মাঝখান থেকে যেন বিশাখা আজ হঠাৎ জেগে উঠল।

ভাই বোন মা বাপ সখি বন্ধু কার কথা যে জিজ্ঞাসা করবে সে ভেবেই পায় না। আর সব কথার মাঝে মনে হয়, দাদার এখানে কত কষ্ট হবে। কত অসুবিধা হতে পারে। এলোমেলো অপ্রস্তুতভাবে জিজ্ঞাসা করল, 'যেতে যদি দেরী হয় দাদা, তোমার কষ্ট হবে তো এখানে থাকতে? আচ্ছা সতির বর কেমন হয়েছে? খুব বিদ্বান নাকি? দাদা তুমি কি করছ ভাই? বৌ কোথাকার মেয়ে ভাই?'

দাদা হেসে উঠে দাঁড়াল, বল্লে, আপাততঃ স্নান না করে কষ্ট সত্যি হচ্ছে। তোর ঐ প্রশ্নটির জবাব দিলাম। নেয়ে এসে পরে বাকি জবাবগুলো দেবার চেষ্টা করব।'

'ওমা দেখেছ—কিছু খ্যালই করিনি'—বিশাখাও উঠে দাঁড়াল অপ্রস্তুতভাবে।

'খ্যাল কিরে?' দাদা হেসে জিজ্ঞেস করল।

অপ্রতিভ বিশাখা বল্লে, 'খেয়াল করিনি।'

ছোট ছোট নীচু নীচু ঘরের সামনে সরু থাম দেওয়া দালান পার হয়ে গোবিন্দর হাত ধরে কিশোর প্রকাণ্ড ইঁদারার পাশে পৌঁছল। বিশাখা তেল আর নিজের গামছা এনে দেয়ালে রাখল, বল্লে, 'দাদা ওঁর কাপড় দোব? পরবে?'

'দাদা হাসলে, বল্লে, না তোর গামছাও লাগবেনা। আমার কাপড় তোয়ালে বের করে দেনা সুটকেশ থেকে।

রাধামোহনের প্রতিদিনের ভোগের প্রসাদ আর অতিথির জন্য বিশেষ করে বিশাখার রান্না তরকারী দিয়ে হৃষ্টপুষ্ট আনন্দময় পরিতুষ্ট গোঁসাইজী,' কিশোর

আর গোবিন্দ খেতে বসলেন। বিশাখা তার ছোট মেয়েটিকে নিয়ে অল্প ঘোমটা দিয়ে ভাইয়ের পাশে দাঁড়িয়ে বাতাস করতে লাগল।

গোঁসাই জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কিশোর কি আমাদের দেশে বেড়াতে এলে? কেমন লাগছে?'

একটু হেসে কিশোর বল্লে, 'বেড়াতে আসিনি, আপনাদের আমাদের দেশে বেড়াতে নিয়ে যেতে এসেছি।'

গোঁসাই হাসলেন, 'বটে। কবে?'

'কাল যাব ভাবছি, যদি আপনাদের সুবিধা হয়।'

'সত্যি নিয়ে যাবে? কিরে গোবিন্দ যাবি?'

গোবিন্দ উজ্জ্বল চোখে বল্লে, 'হ্যাঁ বাবুজী কলকাত্তা যাব মামাজীর সঙ্গে।'

গোবিন্দর হিন্দিসুর মিশানো কথাতে গোঁসাইজীর কিছুই ভাবান্তর হ'ল না। তিনি অন্নব্যঞ্জন দেবতার উদ্দেশ্যে দিয়ে পরিতুষ্ট চিত্তে আহারে মন দিয়েছিলেন।

এতদিন পরে আজ বিশাখার হঠাৎ মনে হল, গোবিন্দর কথার সুর তো হিন্দিই, কথাও হিন্দিতে কয় প্রায় সব সময়ই।

গোঁসাইজী বল্লেন, 'আচ্ছা তুমি ওদের নিয়েই যাও কালকে, আমি তো যেতে পারব না। এখানে অসুবিধে হবে।'

অনুমতি পাপ্ত বিশাখার বিবাহের সময়ের বাক্সটি খুলে তাতে কাপড় জামা গহনা গুছিয়ে নিতে সারাদিন কেটে গেল। তার বিবাহের সময়ের যে ফ্যাসানের যা জিনিষ তার সঙ্গে ছিল তাই তার আজো সঙ্গী হ'ল। বডিস্ ব্লাউস্ সায়া তার এখানে কোনদিন কাজে লাগেনি সবই পড়ে ছিল। পাউডার সেন্টও লাগেনি শুধু সাবান তেল আল্‌তা সিন্দুরই ওর কাজে লেগেছিল। উপরন্তু ছেলেমেয়েদের রঙীন আঙ্‌রাখা চুড়ীদার পাজামা আর নিজের ওড়না দুটাও বাক্সে নিল।

তার পর দিন চুড়ীদার পাজামা আর লালজামা পরে গোবিন্দ আর তসরে ওড়না জড়ানো বৃন্দবনী ছিটের পাড় শাড়ী পরা বিশাখা দীর্ঘ সাত বছর পরে বাংলাদেশের অভিমুখে ট্রেণে ওঠবার জন্য স্টেশনে এলো। রঙীন ফুলদেওয়া কালো বনাতের টুপী মাথায় তসরের লম্বা কোটের ওপর গায়ে সাদা চাদর জড়িয়ে খাটো লাল পাড় ধুতি পরা গোঁসাইজী প্রসন্ন হাসিমুখে ওদের ট্রেণে তুলে দিয়ে চলে গেলেন।

কিশোরের মনে হতে লাগল কোথায় যেন ওদের অমিল রয়েছে, ভাষা স্থান, অথবা আচার ব্যবহারে কে জানে।

বিবাহ বাড়ীর উৎসব সমারোহের মাঝে অকস্মাৎ জননী ডাকলেন, 'ওরে ও শাখু, শাখু একবার বাইরে আয় ; তোর পূজো হয়েছে ? তোর সঙ্গে জামাইরা দেখা করতে চাইছেন।'

বহুদিন পরে বিশাখা এসেছে পিত্রালয়ে, তারও সব নতুন লাগছে। দেশের লোকের আত্মীয় স্বজনেরও নতুন লাগছে তাকে, সে যেন কোন অচেনা মানুষ।

রাধিকার অষ্ট সখির নামে তাদের বোনদের নাম রেখেছিলেন পিতামহ। খুড়তুতো জ্যেঠতুতো নিয়ে ৬।৭ বোন। চারজনের বিবাহ হয়েছে। সকলেই বাংলা দেশের ছেলে। বহু-শ্রুত-নাম বিশাখার রূপের কথা, ধনের ঐশ্বর্যের কাহিনী বহুদিন যাবৎ দূরবর্ত্তীত্ব তাদের সকলের মনেও কম কৌতূহল সৃষ্টি করে নি।

বিশাখা বেরিয়ে এলো ঠাকুর ঘর থেকে। ছাপা পাড়ের গঙ্গাজলী শাড়ী সাদা সিদে ভাবে পরা। হাতে মোটা মোটা দুটি বালা, গলায় রাধারাণীর প্রসাদী কণ্ঠমাল, শান্ত অপ্রতিভ হাসি মুখ দিয়ে কপাল ঢাকা ঘোমটা মাথায় সে এসে দাঁড়াল জননীর পাশে।

ভগ্নীপতিরা একে একে প্রণাম করলেন।

ললিতা পিছন থেকে বল্লে, 'অত ঘোমটা দিয়েছিস কেন দিদি, এরা কি তোর ভাসুর নাকি ?'

বিশাখা অপ্রস্তুত ভাবে মুখ তুলতেই ললিতা হেসে উঠল, 'মাগো দিদি যেন সং হয়েছে— নাকে তিলক দিয়েছিস কেন ?'

ভগ্নিপতিরা একটু আশ্চর্য হয়েই ঐ তন্বী তরুণী পরম রূপবতী প্রবাসিনী মেয়েটির দিকে মুগ্ধ চোখে চেয়ে ছিলেন।

সকলেই হেসে ফেল্লেন ললিতার কথায়।

বিশাখা অপ্রতিভ মুখে মৃদুস্বরে বল্লে, 'আমাদের যে তিলক সেবা করতেই হয়।'

মা বল্লেন, 'তা তো বটেই গোসাই বাড়ীর নিয়ম যে।' লজ্জিত মুখ বিশাখার পানে চেয়ে ললিতার স্বামী শৈলেন বল্লেন, 'হ্যাঁ আমাদের বাড়ীতেও আগে সকলের তিলক সেবা নিয়ম ছিল। মা মারা গেছেন তাই ওরা জানে না। আসুন বড়দি আপনাদের দেশের গল্প শুনি আমরা।'

অনাধুনিক মন, লজ্জা নিয়ে—অতর্কিত নব যুগের সংঘাতে এসে পড়া যেন

যেন পুরাকালের অপরূপ একান্ত অন্তঃপুরবাসিনী কন্যার মত বিশাখা অত্যন্ত অপ্রতিভ হয়েই ভগিনীপতিদের দিকে চাইল।

শৈলেনও গোস্বামী ঘরেরই ছেলে। সংস্কৃতে এম-এ পাশ করে কোন কলেজে প্রফেসারী করে। আর তিনজন—সুরেশ, অজয়, রমেশ ওরাও সকলেই বিদ্বান, কেউ বি-এ, কেউ এম-এ, সকলের সঙ্গেই তীক্ষ্ণ কথাবার্ত্তা হাসিতে আধুনিক। এমন কি ললিতা শ্বশুরবাড়ী গিয়ে ম্যাট্রীক পাশ করেছে। হয়ত আরো পড়বে।

বিশাখার জননী বল্লেন, 'তুই ওদের খাবার দে—ওরা গল্প করুক।'

বিশাখা কোন সেকালের মাঝ থেকে আসা লজ্জিত তরুণীর মত বল্লে, 'না মা, তুমিই খাবার দাও। আমি জানিনে কি করে দোব। আমি পান সাজি।'

ইতিমধ্যে বিশাখার ছেলেমেয়ে নিয়ে ওরা ব্যস্ত হয়ে উঠল।

আকর্ণমূল রাঙা হয়ে বিশাখা শুনল গোবিন্দ বলছে, 'আমার নাম গোবিন্দ হচ্ছে—বহিনের নাম হচ্ছে—যশোদা।'

মৃদু হেসে প্রশ্ন করল কে যেন, 'আর তোমার বাবার নামটী কি হচ্ছে ?'

আর একজন কে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমাদের বাড়ীতে কটা হাতী আছে ?'

গোবিন্দ অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে বল্লে, 'হাথি ? আমাদের দুটো হাথি আছে। বাবুজীর নাম কিষণলালজী গোঁসাই হচ্ছে। একটা হাথি আমাদের হাবেলীতেই থাকে, একটা গাঁয়ে আছে।'

ললিতা আর অন্যসব ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা হাসিতে ভেঙে পড়ল। বিশাখার ভগ্নিপতিরাও হেসে ফেল্লেন।

শৈলেন মৃদু হাসি চেপে বিশাখার পানে চাইতেই অপ্রস্তুত হয়ে গেল। সে বল্লে, 'এই থাওনা সব। হৈ হৈ করছ কেন ?'

বিশাখা মুখ নিচু করে নিল, তার চোখ জলে ভরে গিয়েছিল।

শৈলেন চা খেয়ে বিশাখার কাছে গিয়ে বসল। তারপর কোন একটা মেয়ের কাছ থেকে তার খুকিকে নিয়ে বল্লে, 'দিদি পান দিন। আর আপনার এই খুকিট এত সুন্দর এটীকে আমায় দিয়ে দিন না। ঠিক আপনার মতই হবে মনে হচ্ছে।'

কিশোর এসে দাঁড়িয়েছিল গায়ে হলুদের জন্য মাদুরের উপর। সে খুকিকে নিয়ে বল্লে, 'হ্যাঁ ঠিক শাখীর মতই হয়েছে।'

বিশাখা চোখ নিচু করেই পানে পানে এলাচ দিতে লাগল। শৈলেনের সৌজন্য স্তুতিবাদ তাকে কোনো সান্ত্বনা দিতে পারল না। যেন মনে হতে লাগল

সে যেন কত যুগযুগান্তর দূরে রয়েছে এদের থেকে। এরা ওকে ভুলে গেছে, না, ওই এদের থেকে বহু বহু দূরে চলে গেছে!

নতুন বৌ এলো। সেও আধুনিক মেয়ে, আই, এ, পড়ছে। বরণের জন্য বিশাখারা গহনা কাপড় পরতে গেল।

বিশাখার মা এলেন ঘরে,—একটু ইতস্তত: করে বল্লেন, 'শাখু, তেলক না পরে কপালে ফোঁটা দে না চন্দনের? সেওতো দেয় লোকে।'

বিশাখা কালো শান্ত চোখ দুটী তুলে মার পানে চাইল, তার মুখে এলো, 'এতে লজ্জার কি আছে মা?' কিন্তু মার অপ্রতিভ মুখ দেখে সে বল্লে, 'আমাদের যে দিতে হয় মা, আমি সাত বছর এক নিয়মে দিয়ে আসছি।'

আমন্ত্রিত নিমন্ত্রিত অভ্যাগত আধুনিক পুরাতনী অতিথি আত্মীয়দের কয়েকদিন বিশাখার তিলক গোবিন্দর কথা, গোবিন্দদের চুটি হাথি, একটা উগ্র হাসির উপাদান যোগাল। কখনো বাহিরে, কখনো অন্ত:পুরে অট্টহাসি উচ্চহাসির তরঙ্গ ভেঙে পড়ে।

নববধূ ফিরে যাওয়ার সঙ্গে বিশাখারও ফিরে যাওয়ার সময় এলো। মা বাপের ব্যাকুল বিদায় দান, পল্লীর পুরাতন আনন্দময় বহু স্মৃতির মাঝে এবারের বহু নতুন সঞ্চয় নিয়ে বিশাখা গাড়ীতে উঠল সেই বাসন্তী রংয়ের চাদর সেই সাদা বৃন্দাবনী শাড়ী পরে।

ষ্টেশনে এলো শৈলেন। মনের মাঝে কোনখানে তার কাঁটা ফোটে যেন। ঐ অপরূপ আধুনিক যুগের অথচ আত্মবিস্মৃত তরুণী নারীর কাছে তার বরাবরই কি জন্য যেন ত্রুটী স্বীকার করতে ইচ্ছা চচ্ছিল। যেন তাকে অসম্মান করেছে ওরা সবাই মিলে।

কিন্তু সে ত্রুটীর কথা মুখে বলতে গেলে কিছুই কথা আসে না যে। কিছু বলতে না পেরে অনেকক্ষণ ধরে শুধু শৈলেন খুকিকে নিয়ে আদর করতে লাগল আর গোবিন্দর গল্প শুনতে লাগল।

গাড়ী ছাড়বার সময় সহসা বিশাখাকে সে বল্লে, 'আমাদের মাপ করবেন দিদি। সাহেবরা চার্চে যায়, মুসলমান নমাজ পড়ে, তাতে তারাও হাসে না আমরাও হাসি না। কিন্তু তিলক দেখে আমাদের হাসি পায়। বাঙালীর ঘরে ছোট ছেলে ইংরেজী মিশিয়ে কথা বল্লে, হাসি না। কিন্তু গোবিন্দ হিন্দী সুরে কথা বল্লে সবাই হাসি।

তারপর বিস্মিত বিশাখার দিকে চেয়ে একটু হেসে বল্লে, 'আমি আপনার চেয়ে

অনেক বড়, প্রণাম করব না তাই। তবে আপনার বোনের হ'য়ে এই ক্ষমা চেয়ে নিলাম দিদি।

দীপ্ত সুশ্রী মুখ পেলেন সুন্দর মিষ্ট সৌজন্যময় ব্যবহারে যেন বিশাখাকে জাগিয়ে দিল আর এক জগতে।

দীর্ঘ পথের কষ্টের মাঝে বিশাখার শুধু মনে হচ্ছিল সে যেন কোন নির্বাসিত জগতে বাস করে। কই এতদিন তো একথা তার একবারও মনে হয়নি। বারম্বার অতিশয় লজ্জিতভাবে তার মনে হয় এ ভাবনা তার অন্যায়, বিশ্রী, অনুচিত। তবু কেন অচেতন মনে তার জাগে কত কি যেন সে পায় নি। কি তা আর তার মনে করতে ইচ্ছাই হয় না বা জানে না। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সে বাইরের পানে চায়, রুক্ষ ঊষর প্রান্তর ছুটে পিছিয়ে যাচ্ছে—কিন্তু সম্মুখে এগিয়ে আসছে আবার তেমনি পিঙ্গল মরুক্ষেত্র। মাঝে মাঝে একটা একটা ভুট্টার ক্ষেত কুয়া আসে আর চলে যায়।

সন্ধ্যার সময়ে বিশাখা পৌঁছল বাড়ী। গোঁসাইজী হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভাল ছিলে?' গোবিন্দ পিতার প্রশ্নের জবাব দিল অত্যন্ত উৎসাহে।

অন্তঃপুরের পথ দিয়ে রাধামোহনকে ধূলো পায়ে প্রণাম করে বিশাখা নিঃস্তব্ধ অন্ধকার ঘনিয়ে আসা পুরীর মধ্যে প্রবেশ করল।

যথানিয়মে দেবতার সন্ধ্যারতি হয়ে গেল। ভোগ প্রসাদ গ্রহণ করলে সবাই। গোঁসাইজী অন্তঃপুরে এলেন শয়ন করতে।

বিশাখার যেন কাজ আর শেষ হয় না। ঘরের কোণের অল্প আলোতে এঘর ওঘর বড় দেখা যায় না। গোঁসাইজী স্ত্রীর অপেক্ষা করে ঘুমিয়ে পড়লেন।

বিশাখা কত রাত্রে ছেলেমেয়ের কাছে শুয়ে পড়ল নিজেও জানে না।

সহসা তার ঘুম ভেঙে গেল অত্যন্ত চেনা কি শব্দে। বাইরে মোহনদাস হাতী জেগে উঠেছে, তার গলায় ঘন্টা বাজছে টং টং।

তার মনে হ'ল, বড়-শ্রুত কথা, তাদের দোরে হাতী আছে। বিশাখার আর ঘুম এলো না। মোহনদাসের গলার ঘন্টা থেকে থেকে একই ভাবে বাজতে লাগল।

একটু পরেই কুয়ার লোকেরা কুয়ার বলদ কাজে জুড়ে সুর ধরল—'কীলো ভরিয়ো কুয়া চলিয়ো।'

গোবিন্দর ও খুকুর ঘুম ভেঙে গেল, বিশাখা উন্মনভাবে ওদের পানে চাইল। হঠাৎ তার মনে হ'ল, গোবিন্দকে খুব ভাল করে পড়াবে, খুব বিদ্বান হবে,

খুকুকেও বাংলা শেখাবে, বাংলা দেশে বিয়ে দেবে ভালো ছেলের সঙ্গে। না হোক বড়লোক। মনে হয় যেন শৈলেনের মত। তার পরেই অকস্মাৎ অপরাধিনীর মত উঠে দাঁড়াল বিশাখা। পাশের ঘরে গিয়ে দেখলে, গোঁসাইজী গোবিন্দ নাম স্মরণ করে উঠছেন। বিশাখা [illegible] পায়ের ধূলো নিলে।

গোঁসাইজী 'গোবিন্দ পদে মতি থাক' বলে বল্লেন, 'হঠাৎ প্রণাম?' বিশাখা বল্লে, 'কাল এসে করিনি মনে হচ্ছে।'

ললিতা সখী

সেকেণ্ডক্লাস গাড়ী থেকে নামল কিশোর কিশোরের বৌ, ললিতা তার বর শৈলেন আর ওদের দুটী ছেলেমেয়ে। ষ্টেশনে নিতে এসেছিল গোবিন্দ আর তাদের সরকার শিউপ্রসাদ।

সরু লালপাড় ধুতি, গলাবন্ধ তসরের কোট শুধু গায়ে, মাথায় কালো বনাতের টুপী রেশমের ফুলতোলা, পায়ে এদেশী জরীর নাগরা—আধা হিন্দুস্থানী আধা বাঙালী সাজে গোবিন্দ দাঁড়িয়েছিল। কিশোরের তাকে দেখে মনে পড়ল পাঁচ বছর আগের কথা, যেদিন সে বিশাখাকে নিয়ে গেল, ষ্টেশনে তুলে দিতে এসেছিলেন গোঁসাইজী অমনি ধরণের সাজে। আজ যেন গোবিন্দও তাঁর ক্ষুদ্র-সংস্করণরূপে এসেছে।

একটু হেসে ফেলে কিশোর বল্লে, 'তুমি গোবিন্দ না? মস্তবড় হয়ে গেছ।'

খাকি সুটপরা ললিতার ছেলে সমীর, চমৎকার হালকা ফ্লানেলের ফ্রকপরা কিশোরের মেয়ে শিপ্রা আর সুন্দর শাড়ীপরা ললিতা আর কিশোরের বৌ অনিলা নেমে এসে গোবিন্দর কাছে দাঁড়াল।

নিজের জননী ও আত্মীয়াদের অভ্যস্ত সাজ-সজ্জা দেখে গোবিন্দর কাছে যেন এরা একেবারে 'অজানা' বিভিন্ন রকমের মনে হল। হতবুদ্ধির মত অপ্রস্তুতভাবে গোবিন্দ চুপকরে দাঁড়িয়ে রইল।

এবারে জিনিষ নামানোর পর শৈলেশ এসে দাঁড়াল গোবিন্দর পাশে। তারপরই তার চোখে পড়ল ললিতার অনিলার সকৌতুক হাসি আর গোবিন্দর অপ্রস্তুত মুখ।

শৈলেন গোবিন্দর পিঠে হাত দিয়ে বল্লে, 'চল গোবিন্দবাবু কোনদিকে যাব আমরা জানিনা তো।'.

শিউপ্রসাদ এগিয়ে এলো, আভূমি নত হয়ে সেলাম করে বল্লে, 'আসেন হুজুর—গাড়ী বাহার আছে।'

গাড়ীতে উঠে শৈলেন জিজ্ঞাসা করলে, 'কৈ তোমার বোনকে আনলে না যে? গোবিন্দ আরক্তিম হয়ে উত্তর দিলে, 'মা বল্লেন সে বাড়ীতে থাক্। সে বাংলা ভালো জানে না।'

রাধামোহনের মন্দিরের সেই পুরাণো-কালের তোরণের মধ্যে দিয়ে গাড়ী এসে দাঁড়াল। তোরণতলে সেই দরোয়ানের খাটিয়া পাতা বিছানা, চৌকির ওপর তুলসীদাসের রামায়ণ। গাড়ী দেখে তারা দু' তিনজন সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল। মন্দিরের বিস্তৃত বহির্প্রাঙ্গনের একপাশে সেই মোহনদাস হাতী শুঁড় করে জল নিয়ে নিজের মাথায় আর গায়ে ছিটিয়ে স্নান করছে।

দেবতার সমীপে ভাগবত পাঠের কাছে গোঁসাইজীও তেমনি নিবিষ্টমনে পাঠ শুনছেন।

দীর্ঘ ছয় বছর আগের চিত্র যেন হুবহু সেইভাবেই কিশোরের চোখের সামনে ফুটে উঠল।

গাড়ী থেকে অতিথিরা নামল আঙরাখা ও ঘাঘরা পরা বিশাখার মেয়ে যশোদা সামনের প্রাঙ্গণে খেলা করছিল, ছুটে গিয়ে পিতাকে বল্লে, 'বাবুজী পাহুনা এসেছে।'

গোঁসাইজী হাসিমুখে নেমে এলেন মেয়ের হাত ধরে। বল্লেন, 'পাহুনা নয়—মামা মামা।' গোবিন্দ, তোমার মাকে বলগে ওরা এসেছেন।'

ললিতা অনিলা এসে প্রণাম করল। ছোট ছেলে নারায়ণের হাত ধরে বিশাখা অন্তঃপুরের সীমানায় দাঁড়িয়েছিল, পরম আনন্দে উৎসাহে ওদের কাছে এসে দাঁড়াল। গোঁসাইজী সহাস্যে বল্লেন, 'তারপর, আমি তো কাকেও চিনি না, ললিতা সখী কোনটী?

ললিতা ভ্রু-ভঙ্গ করে বল্লে, 'থাক, আমার বুঝি তেমনি চেহারা, মাগো।'

কিশোর বল্লে, 'আপনি বুঝি জানেন না জামাইবাবু আমাদের যে ওখানে সখীভাবে সাধনা করেন, একজন আছেন বেশ একটু গোঁপ দাড়িওয়ালা। তাঁকে ললিতা সখী বলা হয়।

গোঁসাইজী অবাক হয়ে বল্লেন, 'তাই নাকি? আমি শুনেছি অনেকের কাছে, সত্যি আছেন তবে? ভারি ভক্ত তো?'

কিশোর আর শৈলেন হাসল। আসলে ভক্তি এবং বিশ্বাস দুই ওদের গোঁসাইজীর মত নয়। শৈলেন বল্লে, 'তা হতে পারেন। আমরা কিন্তু আপনার মত আর বিশ্বাসী ভক্ত কই হলাম। আর আপনার এই ললিতা সখীও মোটেই ওঁর দিদির মত নয়।'

গোঁসাই হাসলেন, বল্লেন, 'তাহলে তোমাকে আমি ললিতা সখীই বলব' ললিতা বল্লে, 'বলুন না কথার জবাব পাবেন না।'

এবারে শৈলেন বল্লে, 'চলুন দিদি আপনার বোনের আর ললিতা সখীর গল্পে তো আমাদের ক্ষিদে তেষ্টা মিটবে না।'

স্নানাহার শেষে যশোদাকে নিয়ে ললিতা হেসেই আকুল। 'ভাই, নিজেও যেমন সং সেজে থাকিস এমন সুন্দর মেয়েটাকেও কি তাই সাজিয়ে রাখতে হয়? কেন ফ্রক সেলাই করতেও ভুলে গেছিস?

বিশাখা অপ্রস্তুত হয়ে হাসল একটু।

শৈলেন ভ্রূ-কুঞ্চিত করে বল্লে, 'কেন তোমাদের ফ্রকের চেয়ে এতে বেশী ভাল দেখাচ্ছে।'

ললিতা বল্লে, 'দিদি য করবে তাই তোমার ভাল লাগবে তা সং সাজালে হলেও।'

ললিতা মাথায় কাপড় দেয় কি না দেয় সকলের সঙ্গেই সমান গল্প করে—হাসে, কথা কয়, বিশাখা অল্প ঘোমটা টেনে চুপ করে গল্প শোনে। বিশাখার অপ্রতিভ মুখের দিকে সকলেই চাইল। কিশোর বল্লে, 'কিন্তু যাই বলিস তুই, বেশ দেখাচ্ছে ওকে পুতুলের দেশের মেয়ের মত। আমাকে একটা ওই রকম করিয়ে দিস তো ভাই, আমার মেয়েটার জন্যে।'

অনিলা বল্লে, 'ও একদিনই ভালো লাগে ওরকম সাজ।' কিন্তু কথাটার মোড় ফিরুক এ কথা যেন সকলেরই মনে হচ্ছিল—এমন কি কথাটা বলে ফেলে ললিতারও—এবারে শৈলেন বল্লে, 'এখানে কাছাকাছি আজকে দেখবার মত কি আছে?'

গোবিন্দ এতক্ষণ চুপকরে বসেছিল, এবার পরম উৎসাহে মেসোর কাছে এসে বসল। কোথায় রাজপ্রাসাদ কোন পাহাড়ের ওপর কি মন্দির ইত্যাদি—নানা জায়গার নাম বর্ণনা করতে আরম্ভ করল।

বিশাখা বল্লে, 'অন্যসব ঠাকুরদের মন্দিরও দেখতে যেও, অনেক ঠাকুর আছে।'

ললিতা হাসলে, 'দিদি যেন তেরকেলে বুড়ী—ঠাকুর দেবতার মন্দিরই তোর সব আগে মনে পড়ে।' অনিলা বল্লে, 'আপনি আমাদের সঙ্গে যাবেন তো দিদি?' বিশাখা বল্লে, 'না ভাই আমার সময় হবে না, ঠাকুর ঘরে কাজও আছে—এমনি কাজও আছে।'

শৈলেন বল্লে, 'তাহোক চলুন, একসঙ্গে বেড়াই, আপনি না হয় আগে চলে আসবেন। যান আপনারা তৈরী হন সবাই।'

প্রসাধন শেষ হ'ল, ললিতা অনিলা ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল।

'কই দিদি—তোর হ'ল?'

একখানি সাধারণ সাড়ী সেমিজ পরে একটী বৃন্দাবনী ছাপা চাদর গায়ে দিয়ে বিশাখা এসে দাঁড়াল। মেয়ের গায়ে একটি পুরাতন ছোট ফ্রক প্রায় না-হবার মত। বোধ হয় গত পূজার সময় বিশাখার মায়ের দেওয়া।

শিপ্রা সমীর তাদের পরিচ্ছন্ন সুশ্রী আধুনিক পোষাক পরে এসে দাঁড়িয়েছিল।

কিশোর শৈলেন এসে জিজ্ঞাসা করল, 'হল? চল এবারে।'

ললিতা যশোদার দিকে চেয়ে হেসে ফেললে, 'ওকি সং সাজালি ওকে? ওর কি আর জামা নেই? ওটার পিঠে বোতামও দেওয়া যাচ্ছে না এত ছোট হয়ে গেছে। ও জামার চেয়ে তোর ঘাগরা আঙরাখা ভাল ছিল।'

গোবিন্দর মুখ একেবারে লজ্জায় কি রকম হয়ে উঠল। সত্যি তার মার কি কিছু বুদ্ধি নেই। এই সব সভ্য পরিচ্ছন্ন লোকদের সামনে ওই জামা কাপড় পরে নিজে না হয় বেরিয়েছেন বোনটীকে কি বিশ্রী সাজিয়েছেন?

বিশাখার জবাব দিবার মত কথা ছিল না। এক মুহূর্তেই বোঝা গেল। সে নির্বোধের মত মেয়ের পিঠের বোতাম লাগাতে লাগলো। ললিতার দিকে একবার তাকিয়ে শৈলেন বল্লে, 'কেন বেশ হয়েছে চল চল।' কিশোর যশোদার হাত ধরে এগিয়ে গেল।

বাইরের আঙিনায় গোঁসাইজী দাঁড়িয়েছিলেন। গাড়ীতে উঠতে গিয়ে অনিলা বল্লে, 'দিদি আপনি জুতো পরলেন না?'

জুতো? সকলের নজর পড়ল সকলের পায়ের দিকে।

গোঁসাইজী বল্লেন, 'জুতো? উনি পরেন কি? দেখিনি ত?'

'ওমা তাহলে আমরাও খুলি,' ললিতা অনিলা বলে উঠল।

'না না সেকি তোরা কেন খুলবি?' বিশাখা ব্যস্ত হয়ে উঠল। 'আমি তো পরি না, আমার জুতো নেইও। আর মন্দিরে তো জুতো পরা চলবে না।'

'তা আমরাও তো মন্দিরে যাব,' অনিলা বল্লে। 'তা তোমরা তখন কিশোরদের জুতোর কাছে খুলে রেখে যেতে পারবে,' গোঁসাইজী বললেন; 'পরেই যাও। বাগানে বেড়াবে তো।'

দুটী আধুনিক সভ্য মহিলা, দুটী আধুনিক তরুণ তাদের দুটী সুবেশ সন্তান— তার মাঝে বিশাখা গোবিন্দ যশোদা কেমন মানাল সেকথা কে কিভাবে ভাবল কে জানে। শুধু গোবিন্দর যেন কান মুখ লাল হয়েই রইল। তার সমস্ত উৎসাহ যেন কোথায় নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। মা বাক্সটা ভালো করে দেখতে পারতেন বোনটীর কি কোনো ভালো জামা নেই, ওই কি বলছিলেন মামীমা ফ্রক না কি। আর মা? মার তো কটা বারাণসীর শাড়ী আছে তাও তো পরতে পারতেন। কত জায়গায় তো সেসব পরে যান না, আর তার মাকে কত ভাল দেখায় পরলে। মামী-মাসীর কাপড় আর অত ভাল কি? গাড়ীতে বসে মার কানের কাছে মুখ রেখে গোবিন্দ বল্লে, 'মা তুমি সেই লাল কাপড়টা পরলে না কেন?' বিশাখা লাল হয়ে বল্লে, 'চুপ কর।' যশোদার মনে এসব ভাববার অবসর ছিল না, ফ্রক পরে সে শিপ্রার পাশে বসে পরম উল্লসিত হয়েছিল হয়ত ভেবেছে সে শিপ্রার মতই সেজেছে।

আমোদ আহ্লাদে হাসি পরিহাসে একপক্ষের শিক্ষা সভ্যতার গর্বের আমেজ মেশানো কথাবার্তায় অপরপক্ষের অপ্রতিভ সংকোচ স্বীকারে কয়েকটা দিন জলস্রোতের মত বয়ে চলে গেল।

গোঁসাইজী স্নেহমুগ্ধ প্রশ্রয়ে ললিতের গল্প শুনতেন, গল্প করতেন। ফিরে যাবার দিন ঘনিয়ে এল।

গল্প করতে করতে সহসা ললিত বল্লে, 'নামটা কিন্তু বদলান জামাইবাবু যশোদার। ছোট বেলায় একটা ছবি দেখেছিলাম কোন এক ক্যালেণ্ডারে। মা যশোদা গাই দুইছেন আর শ্রীকৃষ্ণ পিছন থেকে মার গলা জড়িয়ে দুধ দোয়া দেখছেন। যশোদা বল্লে ওই একটী ছবিই মনে পড়ে যায়। অমন সুন্দর মেয়ে আর ওইটুকু বয়সে ওই নাম মোটেই মানায় না। ও যখন বড় হবে দিদির মত তখন ওর ওনাম মানবে।'

শৈলেন বল্লে, 'তোমার দেখছি আর কিছু সংস্কারই বাকি রইল না দিদির সংসারের উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টায়। ফ্রক পরানো থেকে নাম বদলানো অবধি।'

কিন্তু গোঁসাইজী হেসে বল্লেন, 'তা আমার তো ছোট মা যশোদাই ও। তা হোক কি নাম রাখতে হবে বল তুমি, না হয় ললিতা সখীর কথাটাই থাক।'

ললিতা বল্লে, 'একটা খুব ভাল নাম আছে সেটার সঙ্গে যশোদার নামের মিলও আছে। যশোধরা রাখুন। বেশ আধুনিকও হবে।'

গোঁসাই একটু হেসে বল্লেন, 'কিন্তু তাতো আধুনিক হলনা—'

'আজ কাল যে এই রকম নাম রাখাই ধরণ হয়েছে—ওদেশে তো যাবেন না, কিছুই জানলেন না।'

'তা বটে', গোঁসাই হাসলেন, 'কিছু দেখাই হল না কি বল গো?' বিশাখা কিছু বললেন না শুধু হাসলেন।

ললিতা বল্লে, 'কিন্তু আর এক বছর পরে খুকি তো আট বছরের হবে আমি ওকে নিয়ে গিয়ে পড়াব ইস্কুলে, কি বলিস দিদি? নইলে একেবারে হিন্দুস্থানি হয়ে যাবে, এখুনি তো বাংলা বলতে পারে না। তুই ছেড়ে থাকতে পারবি তো?'

একটু হেসে বিশাখা বল্লে, 'কিন্তু আমি ছেড়ে থাকলেই তো হবে না।'

'অর্থাৎ আমি? তা মা যশোদা একদিন তো শ্বশুর বাড়ীও যাবে। তার আগে না হয় মাসীর বাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়ার অভ্যাস আমার হোক কি বলিস্ খুকি? খুকি উৎসাহিত হয়ে বল্লে, 'হ্যাঁ বাবুজী যাব মাসীমার বাড়ী।' গোবিন্দ যশোদার বালক চিত্তকেও আগন্তুকদের অজানা উপকরণবহুল নানা প্রয়োজন, নানা প্রকার প্রসাধন সামগ্রী, অনেক আয়োজন, অনেকখানি আকৃষ্ট করেছিল। যশোদা বুঝেছিল কি না বোঝা গেল না কিন্তু গোবিন্দ তাদের নিজেদের জীবনযাত্রার সঙ্গে ওদের অনেক প্রভেদ বুঝতে পেরেছিল। মোটকথা ওরা যে অনেক রকমে ওদের চেয়ে বড় বা উন্নত এটা শিশুমনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। হংস-শাবকের সাঁতার শিখতে হয় না। বিলাস প্রসাধন স্বাচ্ছন্দ্যের শিক্ষা অনভিজ্ঞেরও লাগে না, আপনিই মানুষ আকৃষ্ট হতে চায়। মাসীমা যে মার চেয়ে উন্নততর কেউ, মেসো ও মামা বাবার চেয়ে বেশীরকম কিছু একথা বুঝতে গোবিন্দের দেরী লাগেনি।

গোবিন্দের হাতী আছে, প্রকাণ্ড বড় মন্দির আছে, মস্তবড় বাগান আছে বটে। কিন্তু সেণ্ট, স্নো, ক্রীম, সুন্দর জুতো, ভাল জামা কাপড়—সুট, তার মার ভাল জামা শাড়ী কিছুই নেই। গোবিন্দের অত বোঝবার মত বয়স নয়, কিন্তু তারতম্য যেন বোঝা যাচ্ছিল।

গোবিন্দ বল্লে, 'বাবা আমিও যাব ওখানে পড়তে।' গোঁসাইজী বল্লেন,

'দেখ ললিতা সখী কি কাণ্ড তোমার। ছেলে নিজেই যেতে চায় যে। শেষটা আমিও না তোমার সঙ্গে যেতে চাই।' নিজের রসিকতায় নিজেই হাসতে লাগলেন গোঁসাইজী।

একটু হেসে ললিতা বল্লে, 'চলুন না মানুষ করে দোব আপনাকে। যেন দুশো বছর আগের যুগে রয়েছেন। মন্দির ভাগবত ভজন, হাতি সগ্‌গড় দরোয়ান—যেন ঘুমের পুরী।'

ফেরবার সময় এলো। ঘুমের পুরী কিন্তু কম ভাল লাগেনি জাগ্রত দেশের লোকের চোখে। আর জাগ্রত দেশের লোকেরা যেন সহসা ঘুমের দেশের লোকদের জাগিয়ে গেল।

শান্ত নির্লিপ্ত গোঁসাইজীরও মন একটু বিক্ষিপ্ত হয়েছিল। ওদের গাড়ীর কাছে সকলে এসে দাঁড়ালেন। শৈলেন কিশোর অনিলা ললিত একে একে গোঁসাইজী বিশাখাকে প্রণাম করে গাড়ী উঠল।

শৈলেন বল্লে, 'আমি এসে আর বছর গোবিন্দ আর খুকিকে নিয়ে যাব।'

কিশোর বল্লে, 'আপনি এবারে যাবেন একবার জামাইবাবু।' গোঁসাইজী শুধু হাসলেন। বিশাখা গোবিন্দ ম্লানমুখে দাঁড়িয়ে রইল।

সন্ধ্যার অন্ধকারে তখন বাড়ী আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। কদিনের নানা কর্তব্যের ব্যস্ত সমারোহের দায় আজ আর নেই। বিশাখা অন্তঃপুরের অলিন্দে চুপকরে দাঁড়িয়ে রইল। মন্দিরে গোধূলি আরতির ঘণ্টা বেজে উঠল। শুধু কর্পূর আরতি এসময়ে। কয়েক মুহূর্তের মাঝেই আরতি শেষ হয়ে গেল। আবার পর্দা পড়ল দেবতার সুমুখে বিশাখার আজ যেন আর কোনো কাজ নেই। মনে হয় এই পনের দিন আগেও তো অনেক কাজ করত এই সময়েই। অকস্মাৎ যেন সব দিকের কর্তব্য কি এক ক্লান্তিতে নিঃশেষ হয়ে গেছে—কি যে তার দরকার ছিল অথবা কি যে চাই এখন তা বিশাখা জানে না। অথবা ভাবে না ভাবতেও চায় না। দাসী এসে ডাকল। সন্ধ্যারতির প্রদীপের ঘি চাই, আরও যেন কি কি দরকার তার জন্য পূজক গৃহিণীকে ডাকছেন।

বিশাখা নেমে গেল।

গোবিন্দ যশোদা নারায়ণ সন্ধ্যার পর একলা একলা ঘুরে, খানিক ভাইবোনে ঝগড়া করে, মার কাছে ভৎর্সিত হয়ে—অবশেষে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

অনেক রাত্রে ঠাকুরের শয়ন আরতির শেষে বিশাখা শোবার পাশের ঘরে প্রদীপের কাছে বসে গোঁসাইজী পুরাতন অভ্যস্ত ভাবেই শ্রীধর স্বামীর গীতার

টীকার হিন্দী ভাষ্য লিখছেন। এই পনের দিন তাঁর কোনো কাজ নিয়ম মত হয়নি।

বিশাখা এসে দাঁড়াল। গোঁসাইজী লেখাটা শেষ করে বালির পুঁটলী চাপা দিয়ে কালি শুকিয়ে নিতে লাগলেন। এবারে স্ত্রীর দিকে চাইলেন।

'বোসো।'

বিশাখা প্রদীপের ওপাশে বস্‌ল।

'বেশ ভাল লাগল কদিন। তোমার আজ বড খালি লাগছে না? তা একটু লাগবে বৈ কি।'

বিশাখা প্রদীপটা উস্কে দিলে। জোর আলো হ'ল। গোঁসাই হাসলেন বল্লেন, 'ওকি? একটু কম করে দাও। তোমার বোনটী কিন্তু ভারি বুদ্ধিমতী—বেশ মেয়ে।' বিশাখা প্রদীপটা কমিয়ে দিচ্ছিল, বল্লে, 'আমার বাবা বলতেন ওর বুদ্ধি সকলের চেয়ে বেশী আমাদের মধ্যে—একেবারে আলোর মত। আমি ওর মত মোটেই নয়'

গোঁসাই একটু হেসে বল্লেন, 'আমার ঘরে এই আলোই ভালো। বেশী আলো কি এসব ঘরে মানায়। শৈলেন ছেলেটীও বড ভাল কিন্তু।'

এবারে প্রদীপের সলতেটা অনেকটা তেলের মধ্যে চলে গেল। নিবে যায় আর কি।

গোঁসাই সবিস্ময়ে স্ত্রীর দিকে চাইলেন, 'ওকি? আমার এখনো কাজ আছে, নিবিয়ো না।'

বিশাখা বল্লে, 'নেবাচ্ছি ন, উস্কেই দিচ্ছি।'

খোলা জানালা দিয়ে হেমন্তের অন্ধকার পক্ষের রাত্রির আকাশভরা তারা দেখা যাচ্ছিল। বিশাখা জানালার কাছে দাঁডাল। বল্লে, 'তোমার ঠাণ্ডা মনে হচ্ছে না? জানালা খোলা থাকবে?' গোঁসাই অন্যমনস্কভাবে বল্লেন, 'রোজই তো খোলা থাকে, না?

'আহা এ কদিন এঘরে তুমি ছিলে না কি?' এ ঘরে তো তোমার ললিতা সখীরা থাকত।' গোঁসাই হাসলেন, 'আমার ললিতা সখী? তা বটে আমি ওঘরে শুচ্ছিলাম।' এবারে গোঁসাই পুঁথি পত্র মুড়ে ফেললেন, বললেন, 'আচ্ছা আজ শুয়েই পড়ি।'

পাশাপাশি ঘরে স্বামী স্ত্রী নির্বাক হয়ে শুয়ে পড়লেন, অনেক রাত্রি অবধি ঘুম আর এলো না। খোলা জানালা দিয়ে অগোচর পৃথিবীর আকাশটুকুতে

তারাগুলি ঝিক্‌মিক্ করছিল, গোঁসাইজীর মনে হল যেন ললিতা সখীর ঝিকমিকে হাসি।

স্বামীপুত্রকন্যা পরিবৃত দুর্ভাবনাহীন নিশ্চিন্ত স্বাচ্ছন্দ্য ঐশ্বর্য্যময় অট্টালিকায় শুয়ে বিনিদ্র বিশাখার অগোচর মন কেবলি যেন বল্‌তে লাগল, ভালো লাগে না কিছু ভালো লাগে না। কিন্তু কি যে ভালো লাগে তাও যেন স্পষ্ট করে জানে না। কি ভালো লাগে না—তাও ঠিক করে বলতে পারে না।

যশোধরা

পুত্রকন্যার আগমনের অপেক্ষায় পিতামাতা ঠাকুর দালানের সম্মুখের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়েছিলেন।

কয়েক বছর কেটে গেছে—গোবিন্দ যশোধরার কলিকাতায় পড়ার জন্যে আসার পর। বৎসরান্তে ওরা গরমের বন্ধে আসে, আবার যায়।

গাড়ী এলো। ভাই বোনে গাড়ী থেকে নামল। জননীকে প্রণাম করতে নত হতে মা বল্লেন, 'ওঁকে আগে কর।' পিতা থামালেন, 'আগে রাধামোহনকে করে এসো প্রণাম।'

দুজনেই খুব বড় হয়ে গেছে—যেন চেনা যায় না। যশোধরা বিশাখার মতই সুন্দর হয়েছে। কিন্তু গোঁসাইজীর মনে হয় আরো যেন অন্য রকম, বেশী উজ্জ্বল দীপ্ত। আবার ভাবেন হয়ত বিশাখাও অমনি ছিল।

যাই হোক ছেলেকে পেয়ে নতুন কিছু মনে হয় নি। যতটা মা বাপের কন্যাকে নিয়ে হল। সেটা কি গর্ব অথবা মুগ্ধ স্নেহ ঠিক বলা যায় না।

যশোধরা ফার্ষ্ট ক্লাসে উঠেছে, গোবিন্দ ম্যাট্রিক দিয়ে এসেছে। বিশাখা ভাবে মেয়ে পাশ করবে গোঁসাই ভাবেন যশোধরা আর নাই বা পড়ল। কেউ কিছুই বলেন না মুখে।

দিনগুলি জলের মত বয়ে গেল। যাবার ক'দিন আগে কয়েকখানি ডাকের চিঠি নিয়ে পুলকিত মনে গোঁসাই ডাকলেন, 'তোমার মেয়ের যে বিয়ের সম্বন্ধ এলো।'

খাবার জায়গা হয়েছিল, ছেলেমেয়েরা খেতে বসেছিল, পিতাও এসে বসলেন আসনে।

বিশাখা ভ্রূকুঞ্চিত করে চাইল, প্রশ্ন করলে না কিছু।

গোঁসাই নিজের খুসীতে তার পানে না চেয়েই চিঠি তার দিকে দিলেন।

বিশাখা বল্লে, 'কার চিঠি ?'

স্মিতমুখে গোঁসাই বল্লেন, 'রাধা পিসিমার। বৃন্দাবনের বড় গোঁসাইর নাতির সঙ্গে যশোদার বিয়ের কথা বলে লিখেছেন। এবারে কলকাতাতে পাঠাতে বারণ করেছেন।'

বিশাখা অতর্কিতে কিছু তীক্ষ্ণ স্বরেই বলে ফেল্লেন, 'সেই গোঁসাই ঘরের মুখ্যু ছেলে তো—'

গোঁসাই একটু আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন, তারপর বল্লেন, 'মুখ্যু কেন হবে ? চিঠিটা পড় না। সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষায় পাশ করেছে, ম্যাট্রিকও দিয়েছে এবারে।'

বিশাখা সম্বরণ করতে পারেনি, উষ্ণ ভাবেই বললে, 'চিঠি আর কি পড়ব,—ও কুড়ি বছরে ম্যাট্রিক দেওয়া মুখ্যুরই সামিল।'

মেঘ-ঘন অন্ধকার রাতে ঘরের আনাচকানাচের জিনিষও যেমন সহসা বিদ্যুৎচমকে দীপ্ত হয়ে ওঠে মুহূর্ত্তের জন্য বিশাখার তীক্ষ্ণ কথার স্বরের আলোতে তার সঙ্গোপন অন্তরের অদৃশ্য কোণ কোন এ মুহূর্ত্তেই যেন গোঁসাইয়ের কাছে স্পষ্ট ফুটে উঠল। অপ্রতিভ পিতার চোখ পড়ল ছেলেমেয়ের দিকে, তারা তাদের সুমুখে এই প্রথম জননীর তীক্ষ্ণতা অবাক হয়ে লক্ষ্য করছিল। গোঁসাই আর একটি কথাও বল্লেন না, মাথা নীচু করে খাবার আসনে বসলেন। গোঁসাই ঘরের মূর্খ ছেলে তিনিও তো! তিনি ম্যাট্রিক পাশ করেন নি।

বিশাখা সেই মুহূর্ত্তেই বুঝতে পারল। নিজের আকস্মিক কটু রূঢ় মন্তব্যে সব জিনিষটা বিশ্রী হয়ে গেল।

গোঁসাই নীরবেই আহার শেষ করে উঠলেন। ছেলেমেয়েরা কিম্বা জননী আর একটি কথাও বলতে পারল না কেউ।

ঐ কথাগুলি যেন একটী স্পষ্ট চিহ্নিত মন্তব্যের মত মা বাপ ছেলেমেয়ে সকলের মনেই নিজের নিজের মত ভাবে গভীর দাগ কেটে গেল

২

কয়েকদিন পর সন্ধ্যারতি শেষের পর গোঁসাই ভজন শুনছিলেন, যশোধরা গোবিন্দ দুজনে এসে বসল পায়ের কাছে। সেদিনের পর সকলেরই যেন মনে হঠাৎ একটা সঙ্কোচ এসে গিয়েছিল। পিতা যেন অনেক দূরে চলে গেছেন—

মনে হয়। বিশাখা আর একটী কথাও বলবার সুযোগ পাননি ঐ সম্বন্ধে নিজের রূঢ়তার কৈফিয়ৎস্বরূপ। যশোধরা বাপের কাছে সরে এসে বসল। গোঁসাই শান্ত স্নেহে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিছু বলছ যশোমা ?'

যশোধরা আরক্ত হয়ে বল্লে, 'না এমন কিছু না।'

ভজন শেষ হয়ে গেল, শয়ন আরতিও শেষ হল। এবারে যশোদা বলে ফেললে, 'বাবা তা'হলে আর কি পড়তে পাঠাবে না ?'

তিক্ততা রূঢ়তাতে অনভ্যস্ত গোঁসাই এক মুহূর্ত্ত চুপ করে রইলেন, একবার মনে এলো, বলেন, 'তোমার মার মত নাও।' কিন্তু তা বলতে পারলেন না। বল্লেন, 'আচ্ছা যেও এবারে।'

রাত্রে বিশাখা এটা সেটা করবার ছলে স্বামীর ঘরে এসে বসলেন। গোঁসাই গীতার টীকাভাষ্য নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। স্ত্রীকে বসতে দেখে বই মুড়ে জিজ্ঞাসু চোখে চাইলেন।

বিশাখা কিছু বলতে পারলে না। বল্লে, 'তুমি পড না, আমি এমনিই বসে আছি।'

গোঁসাই হাসলেন। বল্লেন, 'আচ্ছা।'

গোঁসাই নিবিষ্ট মনে ভাষ্য লিখতে লাগলেন। রাত্রি গভীর হতে লাগল। বিশাখা এক একবার প্রদীপ উসকে দেয়—তখন কোনো কোনো বার গোঁসাইয়ের চমক ভাঙে। এক একবার ওর পানে অপ্রতিভ ভাবে তাকান, ভাবটা কি বলবে বল আমি তো বুঝতে পারছি না

হঠাৎ বিশাখা বল্লে, 'ওরা যে চলে যাচ্ছে—তুমি কি যশিকে মত দিয়েছ ?'

গোঁসাই বল্লেন, 'হ্যাঁ যাক। ওদের অত ইচ্ছে। কৃষ্ণ হবে।'

কৃষ্ণতার কথায় বিশাখা যেন স্বামীর মনের অতলের কূল পেলো। যেন কোনখান থেকে একটা করুণার মমতার রশ্মি দেখা গেল। তাড়াতাড়ি বল্লে, 'ললিতার একটা ভাসুর পো আছে—এবারে এম, এ, দেবে তার সঙ্গে যশির সম্বন্ধ করলে বেশ হয় না ?' একটু থেমে আবার বল্লে, 'যশি একটা পাশ করলেই বিয়ে দেবে তারা।'

কিন্তু সেটা স্বামীর মনের কূল নয়, ছোট্ট একটু চড়া বিশাখা বলেই বুঝতে পারলে।

গোঁসাই নত মুখে কাজ করতে করতেই-শান্ত সহজ ভাবে বল্লেন, 'হ্যাঁ।'

কিন্তু কবে কোথায় কি ভাবে কথা কওয়া যাবে, কি বৃত্তান্ত তাদের বাড়ীর,

তারা নিজেরা কিছু বলেছে কি না, অথবা তাঁর নিজের কি মত কোনো প্রশ্ন বা মন্তব্য কিছুই করলেন না। অথবা মুখ্যু গোঁসাই ঘরের ছেলের জায়গায়, এম, এ, পাশ দিচ্ছে ললিতার ভাসুর পো পাত্র, তাঁর মনে কোনো উৎসাহ জাগালো কিনা তাও বোঝা গেল না।

ঠাকুর দালানের বাজা ঘড়িতে এগারটা বাজল। গোঁসাই পুঁথিপত্র গুছিয়ে রাখতে লাগলেন। বিশাখা অনেকক্ষণ শুধু শুধু বসে রইল চুপ করেই। কেবল মনে হতে লাগল স্বামীর মনে প্রবেশ করবার পথ যেন সে হারিয়ে ফেলেছে।

পর বৎসর গোবিন্দ একলাই ছুটীতে বাড়ী এলো।

বিশাখা উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কইরে, যশি এলো না ?'

গোবিন্দ মাকে প্রণাম করে বল্লে, 'তার শরীরটা ভাল নেই, সে বন্ধুদের সঙ্গে দার্জ্জিলিং গেছে।'

'শরীর ভাল নেই। তা এখানে তো সারতে পারত।' মা বল্লে, 'তা আমাদের লিখলেও না যে সে যাচ্ছে।'

'না এমন কিছু শরীর খারাপ নয়। তবে তার বন্ধুরা গেল মাসীমার মেয়ে শিপ্রাও গেল তাই তারও ইচ্ছে হ'ল।'

বিশাখা বল্লে, 'কাদের সঙ্গে গেল ? চেনাশোনা খুব বুঝি।'

গোবিন্দ বল্লে, 'হ্যাঁ মাসীমার বাড়ী খুব যাওয়া আসা আছে। স্বাহা পালিত সংজ্ঞা পালিত দুই বোন ওর সঙ্গে এবার একসঙ্গে পরীক্ষা দিলে। তাদেরই নিজেদের বাড়ী দার্জ্জিলিংয়ে আছে, তাদের মা আর ভাই গেলেন ওদের সঙ্গেই গেল। ওদের বাবা নেই ভাই আমার চেয়ে কিছু বড় এবারে বি, এ, দিয়েছে। ওরা ব্রাহ্ম।' পিতা এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন গোবিন্দর সব কথা শুনলেন। গোবিন্দ তাঁকে প্রণাম করল।

ছেলের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করে পিতা বল্লেন, 'তুমি স্নান করে নাও।'

মা অন্যমনে অন্তঃপুরে প্রবেশ করল। মনের মধ্যে কোথায় কাঁটার ফোটার মত খচ্ খচ্ করে যশোদার যাওয়াটা। তাঁদের এড়াতে চায়। আবার জননীর মন, ভাবেন, আহা ছেলেমানুষ, নতুন দেশ দেখার সখ হয়েছে তাই গেছে। কিন্তু জানাল না কেন ? একটা চিঠিও দিল না। ললিতাও লিখতে

পারত। আর বেশী ভাবতে মন চায় না। কিন্তু বহু ভাবনা জাগে, শুধু কারুকে বলতে পারেন না। স্বামীর কাছে একবার বললেন। তিনি হাসলেন, বল্লেন, 'সে কি আর কিছু ভেবেছে বেড়াতে যাবার সুযোগ পেয়েছে, গেছে।'

৩

দার্জিলিংএ থাকতেই তারা পরীক্ষার ফল জানতে পারলে। যশোধরা মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়ে পাশ করেছে স্কলারশিপ পাবে কলেজেও ফ্রী হবে। কয়েকটী 'অক্ষর'ও নামের পাশে পেয়েছে সে। বিশাখার শঙ্কা সত্য, ভয়ে সে গোবিন্দের সঙ্গে যায়নি—মা বাবার কাছে। পাছে তাঁরা আর পড়তে না পাঠান এখন আর খরচের দিকে কোনো বাধাই রইল না যা অসুবিধা অনুমতি নিয়ে।

স্বাহা পালিত বল্লে, 'ভর্ত্তি হয়ে যা, কিছু বলবেন না।'

সংজ্ঞা বল্লে, 'কি আর হবে ভেবে? নিজেরও পড়ারই তো লোভ হচ্ছে।'

যশোধরা বল্লে, 'কিন্তু বাবা ভাবি দুঃখিত হবেন।'

স্বাহা একটু হাসলে, বল্লে, 'কিন্তু তাঁকে সন্তুষ্ট করতে গেলে তো সেই গোঁসাই গোবিন্দের নাতির সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেবেন।'

যশোধরা লাল হয়ে একটু হাসল। জননীর তীক্ষ্ণ মন্তব্য, বাবার ক্ষুব্ধ নীরবতা আজ সে স্পষ্ট বুঝেছে। কিন্তু তাই বলে সত্যি গোঁসাই ঘরে—ঐ রকম বিয়ে। বহু আত্মীয়াদের দেখা ঘর-সংসার যা আগে তেমন বোঝে নি এখন সব স্পষ্ট হয়ে উঠল যেন। কলকাতার সভ্য সমাজ শিক্ষিত আবেষ্টনীর আওতার প্রভাব ক'বছরেই যথেষ্ট হয়েছিল। নিজের আত্মীয়াদের তার করুণার পাত্রী মনে হ'ত।

স্বাহাদের দাদা সুনন্দ এসে দাঁড়াল। 'আমি তোমাকে অভিনন্দন করছি যশোধরা। খুব আশ্চর্য্য করে দিয়েছো সবাইকে। সেই অজ পশ্চিমের গোঁড়া বৈষ্ণববাড়ীর মেয়ে এমন করে ইংলিশে লেটার পেয়ে পাশ করেছ—আশ্চর্য্য। তারপর কি পড়বে এবারে? কোথায় ভর্ত্তি হবে?'

যশোধরা বল্লে, 'আমি তো এখনো মা বাবার মত জানি না কি করব ভাবছি।'

সুনন্দ বল্লে, 'কেন? তাঁরা মত করবেন না?'

স্বাহা বল্লে, 'না করাই সম্ভব, তাঁদের বাড়ীর ধরণে।'

'তাই বুঝি ? ও, তাহলে ?'

'তাহলে আর কি। ওর বিয়ে হবে বৃন্দাবনের বড় গোঁসাইয়ের নাতির সঙ্গে।' এবারে সংজ্ঞা মুখ টিপে হেসে বল্লে।

আরক্ত হয়ে যশোধরা বল্লে, 'থাম তোরা। বোধহয় তাঁরা পড়াটা পছন্দ করবেন না।'

সুনন্দ একটু চুপ করে থেকে ইংরেজীতে বল্লে, 'তাঁরা তাঁদের জীবন যাপন করেছেন। তোমার জীবনে তাঁদের অধিকার থাকা উচিত নয়। এটা আধুনিক যুগে অন্যায়।'

সুনন্দর মা ঘরে এসে খুব খুসী মনে যশোধরাকে বল্লেন, 'তুমি খুব আশ্চর্য্য করে দিয়েছ মা সবাইকে।'

যশোধরা একটু ইতস্তত: করে তাঁকে প্রণাম করলে।

তিনি কায়স্থ সে ব্রাহ্মণকন্যা তার মনে ছিল এতদিন কোনোদিন প্রণাম বা নমস্কার করেনি।

সুনন্দর মা একটু আশ্চর্য্য হলেন, কিন্তু হেসে চিবুক স্পর্শ করে আশীর্ব্বাদ করলেন। বল্লেন, 'এবারে তো তোমাদের দার্জ্জিলিং থেকে নামবার সময় হ'ল। কোথায় ভর্তি হবে, সব ঠিক করতে হবে। তুমি কোন কলেজে ভর্তি হবে যশোধরা ?'

সংজ্ঞা বল্লে, 'সংসার যাত্রার কলেজে। তুমি বুঝি জান না মা, ওর বাবা যে বিয়ের সম্বন্ধ করেই রেখেছেন।'

সুনন্দর মা যশোধরার দিকে চেয়ে দেখলেন সে অপ্রতিভ ভাবে চুপ করে রয়েছে। তখন নিজের মেয়েদের দিকে চেয়ে বল্লেন, 'তা সে তো মন্দ নয় কিছু, ভালই তো।

স্বাহা বল্লে, 'আগে পাত্রটী কেমন শোন একেবারে তিলকমালা পরা গোঁসাই যে।'

যশোধরা আরক্তিম হয়ে উঠেছিল।

মা এবারে বল্লেন, 'তা ওঁরা গোঁসাই মানুষ ওঁদের ছেলেমেয়ের বিয়ে গোঁসাইবাড়ী হবে না তো কি তোমাদের মতন ম্লেচ্ছ বাড়ী হবে।'

স্বাহা একটু হাসলে, 'আমাদের মতন ম্লেচ্ছবাড়ীই যে গোঁসাইদের মেয়ের ভালো লাগছে, তা তুমি দেখছ না ?'

অকস্মাৎ যেন সকলেই চকিত হয়ে উঠল, কথাটী ছোট্ট কিন্তু তার ব্যঞ্জনার

বিতৃতি আর গভীরতা যেন অনেক খানি। মাও অস্বস্তি বোধ করছিলেন। বল্লেন, 'বাজে বকিস্ নি তোরা, চুপ কর। খাবার দিয়েছে—আয়।'

৪

পত্রদ্বারা অনুমতি আকর্ষণ করে নিয়ে যশোধরা ভর্তি হল কলেজে। গোঁড়া গোঁসাই ঘরের মেয়ের কলেজে পড়া, ব্রাহ্মবাড়ী মেশা, সকলের সঙ্গে মেলামেশা যেন হঠাৎ ভাল করে পাশ করার গুণে ললিতার কাছে বেশ গর্ব্বের বিষয় হয়ে উঠেছিল। যশোধরার লজ্জার, সঙ্কোচের, ভয়ের, পিতা-মাতার অপছন্দর ভাবনার বাধা তার গর্ব্বের ও প্রশ্রয়ের মাঝে যে কখন মিলিয়ে আসছিল তা ললিতারও চোখে পড়েনি, কিশোরেরও মনে লাগেনি। যশোধরার তো অনুভবেই আসেনি।

শুধু শৈলেন গোবিন্দের কি একটা অস্বস্তি ছিল। কিন্তু পরামর্শ করা বা আলোচনা করার সম্পর্ক বা দায়িত্ব তো তাদের নয়। যে সভার কর্তৃপক্ষ নয়, তার সামনে বসে কেউ কোন না অবাঞ্ছিত বা অসঙ্গত কিছু করলেও যেমন তার শুধু চুপ করে দেখা ছাড়া গতি থাকে না ঠিক তেমনি ভাবে গোবিন্দ শৈলেন শঙ্কিত ঔদাসীন্যে দূরে সরে থাকত

পরের বছরে মা বাবার সঙ্গে দেখা হল। যখন ফার্ষ্ট ইয়ার পড়া হয়েছে তখন সে সেকেণ্ড ইয়ারে পড়তে বাধা পড়বে না এ জানাই ছিল যশোধরার যেন।

বাড়ীতে গোঁসাইর রাধা পিসিমা এসেছিলেন। মেয়ে দেখে একেবারে বিমুগ্ধ হয়ে গেলেন গোঁসাইকে বল্লেন, 'এমন মেয়ে। একেবারে যেন কিশোরী শ্রীমতী। এ আমার ছাড়ব না, তুই যেন আর পড়াস নি। আমি আমাদের ঘরেই নিয়ে যাব, বেশী বয়স বলে মনেও হয় না, হোক গে আঠার বছর। আহা মেয়ের কি রূপ। এ ওরা ছাড়বে না।'

গোঁসাই হাসলেন। যশোধরা চুপ করে রইলেন। সম্মুখে উপবিষ্টা নাতনীকে লক্ষ্য করে পুনশ্চ রাধা পিসিমা বল্লেন, 'আর ছেলেও আছে, এ, না কি পাশ দিয়েছে, চমৎকার গৌর গোবিন্দ চেহারা। আর কি ঐশ্বর্য্য। নাতনীর আমার কলসী থেকে জলও গড়িয়ে খেতে হবে না। চারটে করে ঝি একটা বৌয়ের

জন্যে। পানের বাটাটা অবধি এগিয়ে দেয়। আর গহনাগাঁটী সে আর কি বলব। এক একটী গহনাই কত রকমের। মুক্তোর পৈঁছে হীরের বেশর মতির মালা পরে বসে থাকবি খাটের ওপর। বছরে কত গহনাই যে রাধারাণী পান শেঠেদের কাছে। সব বড় গোঁসাইয়ের এষ্টেটে জমা হয়। যত ইচ্ছে বৌরা পরে। এই সেদিনও দক্ষিণের কোন শেঠ রাধারাণীকে দশ হাজার টাকা দামের নাকের বেশর দিয়ে গেল। বৌমা রেখে দিয়েছে, ছেলের বৌকে দেবে বলে।'

যশোধরা স্মিতমুখে সব শুনছিল পিতা মাতা কার্য্যান্তরে চলে গেলে হেসে জিজ্ঞাসা করলে, 'ঠাকুমা ওরা তাহলে সারাদিন খাটেই বসে থাকে চারটে ঝি চারপাশে নিয়ে? মাগো কি বিপদ। শুধু শুধু গহনা পরে বসে থেকে থেকে তারা পাগল হয়ে যায় না?'

ঠাকুমা বল্লেন, 'বিপদ কিসের। নড়ে বসতে হয় না—এত সুখ। বাইরে ছেলেদেরও চারটে করে চাকর তেল মাখাবে, পা টিপবে, পিকদানী এগিয়ে দেবে। তবে না এমন গজেন্দ্র আকার। তোদের মতন লেখাপড়া করে পাকাটী নয় তারা।'

যশোধরা হেসেই আকুল। গোবিন্দও ঠাকুমার গল্পের গন্ধে এসে বসেছিল। গোবিন্দ বল্লে, 'তা তুমি যে বলছ ঠাকুমা ওদের ছেলেও পাশ দিয়েছে এবারে? রোগা হয়নি পড়ে?'

ঠাকুমা ভ্রুভঙ্গি করে বল্লেন, 'রোগা হবে কি করে? তিনটে মাষ্টার আছে পড়িয়ে দিয়ে যায়। তা বড় ছেলের মতন অত ভারি শরীর এর নয়। এইতো পেরথম এদের বাড়ী থেকে ইংরিজী স্কুলে পাশ দিলে।'

যশোধরা গোবিন্দ হেসে বল্লে, 'মাষ্টার এসে পড়িয়ে দিলেই বুঝি পড়া হয়ে যায় ঠাকুমা।'

গোবিন্দ বল্লে, 'কত বড় ছেলে ঠাকুমা? যশিও তো ছুটো পাশের পড়া পড়ছে।'

ঠাকুমা বল্লেন, 'তা এই চব্বিশ বছর হবে।'

যশোধরা ফিক করে হেসে ফেল্লে, 'চব্বিশ বছরে আই. এ. দেবে!'

গোবিন্দ চুপ করে রইল। বিশাখা সব দূর থেকে দেখেছিলেন এবং শুনতে পাচ্ছিলেন। ডাকলেন, 'পিসিমা তোমার ঠাকুর সেবার সময় হলো। এসো এখানে, যোগাড় করে দিয়েছি।'

পিসিমা বধূমাতার কাছে শ্বশুরালয়ের ঐশ্বর্য্য সমৃদ্ধি আড়ম্বরের কাহিনী বলতে লাগলেন। তাদের বছরে কত লক্ষ টাকা আয়—কোনরকম ব্যয় নেই। আগেকার গোঁসাইদের কারো কারো স্বভাব চরিত্রের খুব অক্ষুণ্ণ সুনাম ছিল না সেজন্য কিছু অপব্যয় হ'ত। এখনকার ছেলেরা আর সে রকম নয়, তাতে এ ছেলের তুলনাই হয় না, বিদ্বান ছেলে। ওদের দোরে লক্ষ্মী বাঁধা পড়ে আছেন। সরস্বতীও এবারে এলেন। আর জানিস্ বৌমা, তোদের তো একটা হাতী, ওঁদের পাঁচটা হাতী। ওঁরা হোল বৃন্দাবনের রাজা। আর ওঁদের বংশ কি আজকের? কত কালের। যখন থেকে গোবিন্দজীর আবির্ভাব ততদিনের বংশ ধারা ওঁদের। পিসীমা কত পুরাতন গরিমার কথা বলেন।

বিমনা ভাবে বিশাখা, আগ্রহ সহকারে গোঁসাই রাধা পিসীমার প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। ঐশ্বর্য্যের কাহিনী বিশাখার একটু মনোহরণ করেনি তা নয়। গোঁসাইর কাছে অবশ্য গোস্বামীদের ঐশ্বর্য্য সমৃদ্ধি কিছু নতুন নয়, তাঁর কাছে বৃন্দাবনের বড় গোঁসাইবাড়ী এইটেই সব চেয়ে বড় কথা। অত বড় ভক্ত পুরাতন বংশের রক্ত ধারায় তাঁর বংশ প্রবাহ মিলিত হবে। তাছাড়া মেয়ে রাজরাণীর মত ঐশ্বর্য্যশালিনী হবে। এবং ছেলে মুখ্য নয়! তাঁর কাছে আঠারো বা চব্বিশ বছর বয়সে পাশ করা বা না করা এমন কিছু বড় কথাও নয়, লজ্জার কথাই বা কি?—গোঁসাই ও সব ভাবনা কিছুই ভাবেন না।

অতঃপর রাধা পিসিমা সকলকে প্রচুর আশীর্ব্বাদ করে—বহু শুভাকাঙ্ক্ষা জানিয়ে ভাবী পৌত্রবধূরূপে যশোধরাকে বহু স্নেহ সম্ভাষণ করে বৃন্দাবনে ফিরে গেলেন। নিঃসন্তান বিধবার নিজের পিতৃকুলের রক্ত প্রবাহকে পুনশ্চ বিখ্যাত শ্বশুর কুলের বংশ স্রোতের সঙ্গে মিলিয়ে এবারে সফল করার আগ্রহের উৎকণ্ঠার শেষ ছিল না। আর এমন 'শ্রীমতী'র মত মেয়ে! তাঁর নাতনীর রূপ গর্ব্ব করে বলার মত। সেও কম কথা নয়।

বিশাখার ছেলেমেয়েও ফিরে গেল কলকাতায়। রাধা পিসিমার শ্বশুরকুলের সমৃদ্ধি ঐশ্বর্য্য যশোধরাকে কতটা মুগ্ধ করেছিল কিছুই জানা গেল না। ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ আর তা ব্যবহারের প্রকার যে সেকালের চেয়ে অনেক পরিবর্ত্তিত হয়েছে—সেটা স্পষ্ট করে না হোক অচেতন মনেই যশোধরার একটা ধারণার ভিত্তি বিস্তার করছিল। প্রচুর গহনা অলঙ্কার ভূষিত হয়ে দাসী পরিবেষ্টিত হয়ে রাত্রি দিন শুধু বিছানায় বসে থাকা পরম ঐশ্বর্য্যশালিত্বের পরিচয় বলে যশোধরার মনে হয়নি।

৫

চিঠিখানা হাতে নিয়ে গোবিন্দ আড়ষ্ট হয়ে বসেছিল। বেশী কথা নেই, দু'লাইন কালো অক্ষরের সারি। কিশোরের লেখা।

বহুক্ষণ কেটে গেল। বিশাখা এসে ডাকলেন, 'কইরে গোবিন্দ নাইতে গেলি না? উনি যে খেয়ে চলে গেলেন, তোর ভাত পড়ে। আমি বলি নাইতে গেছিস। কি হয়েছে তোর? মুখটা অমন কেন? জ্বর হয়েছে নাকি?'

বিবর্ণ মুখে গোবিন্দ বলবার চেষ্টা করলে, 'কিছু হয়নি তো।' কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরুলো না শুধু চোখ দিয়ে দু ফোঁটা জল ঝরে পড়ল। সে মাথাটা নিচু করে নিল।

বিশাখা এসে কপালে হাত রাখলেন, 'কই জ্বর তো নয়? চিঠি কার রে তোর কোলে?' চিঠিটা খোলা পড়েছিল। গোবিন্দ মুখ নিচু করে বসে রইল। চিঠির সমস্ত লেখা সামান্য ক'লাইন। বিশাখা পড়লেন। কিশোরের লেখা, স্পষ্ট গোটা গোটা বাংলায় লেখা। কোনো ভনিতা নেই, দুঃখ জ্ঞাপন নেই, মন্তব্য নেই। শুধু লেখা "গোবিন্দ, কাগজে দেখলাম গত ১৭ই জুলাই সুনন্দ পালিতের সঙ্গে যশির বিয়ে হয়ে গেছে—ব্রাহ্ম বিবাহ আইন অনুসারে।"

ইতি—

বড মামা।

ছুটীতে গোবিন্দ বাড়ী ফিরেছিল যশোধরা ফেরেনি, পরীক্ষার ফল না দেখে ফিরবে না এই বলেছিল। কথা ছিল, এবারে কিশোর বা অন্য কারুর সঙ্গে আসবে। তারপর চিঠিপত্র বহুদিন আসেনি। বিশাখা উৎকণ্ঠিত ছিলেন কেমন আছে।

বিশাখার ঘরের সামনে দেবতা দর্শনের 'ঝরোকা', জালি কাজ করা ছোট ঢাকা বারান্দা মত। হতবুদ্ধির মত বিশাখা সেইখানে বসে রইলেন।

দেবতার তখন মধ্যাহ্ন ভোগ আরতি শেষ হয়ে গেছে, দ্বিপ্রহরের বিশ্রামের জন্য পর্দা পড়ল, দুয়ার বন্ধ হয়ে গেল। শ্রাবণ মাস, রেশমী ঝালর দেওয়া টানা পাখার দড়ি মন্দিরের চত্বর থেকে টানা হতে লাগল। পুরোহিত, পূজক, সেবক, দাসদাসী সকলে প্রসাদের অন্ন নিয়ে নিজের নিজের ঘরে চলে গেল। দীর্ঘ দিনের প্রহর মুহূর্তগুলি কি ভাবে বয়ে যেতে লাগল বিশাখা বুঝতে পারলেন না।

অপরাহ্ণ বেলায় পূজার আয়োজনের জন্য দাসী ডাকল, পূজক আহ্বান করলেন। হতবুদ্ধি বিশাখা কিছুই বললেন না উঠলেনও না। স্বামী কোথায়, ছেলেরা কোথায়, কিছুই জানবার দরকার ছিল না তাঁর আজ। অদ্ভুত অপরিসীম লজ্জায় ধিক্কারে গ্লানিতে অভিভূত হয়ে, বিশাখা বসে রইলেন। স্বামীর কাছে এ খবর পৌঁছেচে কি না, আর তা তাঁর কাছে কি রকম বেদনাদায়ক হবে বিশাখা ভাবতেও পারলেন না। সমস্ত ঘটনাটা যেন তাঁকে কেন্দ্র করেই হয়েছে—যশোদার কলিকাতায় যাওয়া, পড়া, বিবাহ দিতে না দেওয়া,—সবই বিশাখার ইচ্ছানুসারে হয়েছে। গোঁসাই কোনো কিছুতেই বাধা দেয়নি।

হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বিশাখা বসে রইলেন। কর্পূরবাসিত গোধূলি আরতি, দীপধূপ বস্ত্র সর্ব্বোপচারে সন্ধ্যারতি হয়ে গেল। ভাগবত পাঠ আরম্ভ হ'ল। গোঁসাই প্রসন্নমুখে ভাগবত শুনছেন বিশাখা দেখতে পেলেন মুখ তুলে। গোবিন্দ নারায়ণ কেউই পিতার কাছে নেই। গোঁসাইর কাছে এ খবর এখনো পৌঁছয় নি।

রাত্রি গভীর হয়ে এলো। ছেলেরা স্বামী আহার করলেন কি না তাও জানবার ইচ্ছা হ'ল না। গোবিন্দ অভুক্ত ছিল প্রাতে একবার মনে পড়ল। নিজেও অভুক্ত ছিলেন। কিন্তু সংসারের কাজের ভাবনা, ক্ষুধা তৃষ্ণা কর্ত্তব্যবোধ দায়িত্ব সবই যেন গ্লানি লজ্জা শ্রান্তিতে ডুবে গেছে।

স্বামীর কাছে পরিজনদের আত্মীয়স্বজনের কাছে কি করে আর কোনোদিন দাঁড়াবেন তা বিশাখা ভাবতেও পারলেন না। সমস্ত লজ্জা ধিক্কার সবই যেন ক্লেদের মত তাঁরই গায়ে ছিটিয়ে গেছে। এইখানেই যদি এই লজ্জা ধিক্কারের জীবনের তাঁর শেষ হয়ে যেত।

শয়ন আরতি আরম্ভ হয়ে গেল। 'শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, গিরি গোবর্দ্ধন' গাইতে গাইতে মন্দির পরিক্রমা দিয়ে শয়নের বিশেষ ভজন শেষ করে পূজারী ভজনকারী সকলে মন্দির বন্ধ করে দিলেন। বিশাখা দেখতে পেলেন স্বামী সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে অন্তঃপুরের দিকে চলে গেলেন। একটি প্রকাণ্ড প্রদীপ ছাড়া সমস্ত আলো ঝাড়বাতি নিবিয়ে দিয়ে গেল পরিচারকরা।

গোঁসাই আহারে বসে গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার মা আজ আসেন নি যে!'

গোবিন্দ নতমুখে বললে' 'জানি না তো।'

স্বামীপুত্রের আহারের স্থানে বিশাখার অনুপস্থিতি এমন দিন দীর্ঘকালের

মধ্যে পিতাপুত্রের কারুরই মনে পড়ল না। অস্বস্তিকর নীরবতার মাঝে নারায়ণ, গোবিন্দ, গোঁসাইজী আহার সমাপ্ত করে উঠে গেলেন।

গোঁসাই নিজের ঘরে বসে গীতার টীকা ভাষ্য খুলে বসলেন। গোবিন্দ এসে দাঁড়াল। দুর্ম্মুখের কাজ তাকেই করতে হবে। মাকে সে দেখতে পেয়েছে, কিন্তু মার কাছে যেতে পারল না।

গোঁসাই আশ্চর্য্য হয়ে ছেলের দিকে চাইলেন।

গোবিন্দ আস্তে আস্তে চিঠিখানা রেখে বল্লে, 'একখানা চিঠি এসেছিল বড় মামার।' গোবিন্দ আর দাঁড়াল না।

৬

পুঁথি সব চতুর্দ্দিকে ছড়ানো রইল। শ্রাবণের সিক্ত এলোমেলো বাতাসে প্রদীপ সারারাত্রি কেঁপে কেঁপে জলতে লাগল, শয্যা যেমন তেমনি পাতা রইল, খানিক খানিক বর্ষণ খানিক আকাশ মুক্ত দেখা গেল। জানাল দিয়ে বৃষ্টির সিক্ত জলকণাও থেকে থেকে পুঁথির ছড়ানো পাতা সেঁতিয়ে দিয়ে গেল, গোঁসাই ছোট্ট চিঠিখানা সামনে নিয়ে অভিভূতের মত স্থির নিস্পন্দ হয়ে প্রহরের পর প্রহর বসে রইলেন। রাত্রি শেষ হয়ে এলো, আকাশের অন্ধকার হালকা তরল হয়ে এলো ধূসর গভীর অবগুণ্ঠনের আড়ালে। নিঃশব্দ কান্নার মত আকাশের মেঘাচ্ছন্ন মুখ প্রত্যুষের নির্ম্মল আলোকে আড়াল করে রেখেছে।

মন্দিরের নহবৎখানায় ভোরে সুর বেজে উঠল। 'উঠবে নন্দলালা ভোর ভৈল' গান বহির্প্রাঙ্গনে দারোয়ানের মুখে শোনা গেল। গোঁসাই সচকিত হয়ে চিরাভ্যস্ত 'গোবিন্দ' গোবিন্দ' গোপাল গদাধর' বলে উঠলেন, এবারে ঝর ঝর করে তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

'হে ঠাকুর, হে জনার্দ্দন, হে গোবিন্দ, এ কী করলে,' অসম্বদ্ধ বিলাপে সমস্ত মন মথিত হতে লাগল গোঁসাইয়ের।

গোঁসাই চোখ মুছে পুঁথিপত্র গুছিয়ে তোলবার চেষ্টা করতে লাগলেন। গীতা উল্টে পড়বার চেষ্টা করতে লাগলেন, যদি কোন সান্ত্বনা পান। যদি আশ্বাসের কিছু কথা পান। কিন্তু গীতা, টীকা, হিন্দী ভাষ্য, পুঁথি, সব একাকার হয়ে গেছে ঝাপসা চোখের সামনে, সব মিশে গেছে যেন, কোনও কিছু পৃথক করা গেল না।

হতবুদ্ধি গোঁসাই হাতড়ে হাতড়ে পুঁথি উল্টাতে লাগলেন, কি দিয়ে কি করে এই চোখের জল, এই উন্মত্ত বেদনাকে চাপা যায়। ঘরে আলো এসে পড়েছে সকালের,—তবু প্রদীপ উস্কে নিয়ে গোঁসাই গীতা খুলে পাতা ওলটান। চোখে পড়ল 'অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহংম ইতি মন্যতে।' 'যন্ত্রা রূঢ়ানি মায়য়া।' চোখ ঝাপসা হয়ে গেল, আঙ্গুল দিয়ে পুঁথির উপর চিহ্ন রেখে মূঢ়ের মত গোঁসাই বার বার শুধু বলতে লাগলেন, 'অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহংম ইতি মন্যতে।'

গোবিন্দ এসে দাঁড়াল, সারারাত্রি বিনিদ্র আরক্ত চোখে কালিমাঙ্কিত চোখের কোল পিতা বিমূঢ় ভাবে ঐ একটি শ্লোকের লাইন আবৃত্তি করছেন। পুত্রের দিকে হতবুদ্ধির মত দৃষ্টিতে চাইলেন। গোবিন্দ হেঁট হয়ে বসে বল্লে, 'আপনি উঠুন বেলা হয়েছে আমি পুঁথিপত্র গুছিয়ে দিচ্ছি।' গোঁসাইজীর সম্বিৎ ফিরে এলো। ধীরভাবে পুত্রের সঙ্গে উঠে ঘরের বাইরে এলেন। ঝরকার পাথরেব জালিতে মাথা রেখে কাত হয়ে বিশাখা ঘুমিয়ে পড়েছেন। গোঁসাই সেদিকে চেয়ে স্তব্ধ ভাবে থমকে দাঁড়ালেন।

গোবিন্দ ডাকলে, 'মা ঘরে শোওনি ?'

বিশাখা ত্রস্তভাবে উঠে বসলেন। আত্মবিস্মৃত স্বপ্নাভিভূতের মত বল্লেন, 'ঘরে—? আরতি দেখতে বসেছিলাম।' সহসা সব মনে পড়ে গেল। এবারে স্বামীর মুখের পানে চেয়ে তাঁর চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়তে লাগল। নীরবে তিনজনে নেমে গেলেন।

গোবিন্দ

গোঁসাইজীর সংসার যাত্রায় শরীরে ও অন্তরে একটা বিশ্রী কাটা ক্ষত চিহ্নের মত যশোধরার বিবাহ ঘটনাটা গভীর সুপরিস্ফুট দাগ কেটে দিয়ে গেল। দীর্ঘ দিন অবসাদে মূঢ়, বেদনায় আচ্ছন্ন হয়ে থেকে গোঁসাই ধীরে ধীরে আবার স্বাভাবিক কাজকর্ম্মের মাঝে আপনাকে নিযুক্ত করবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

গোবিন্দর এম, এ-র ফিফ্‌থ ইয়ার পড়া চলছিল, সে পিতামাতাকে ফেলে আর কলকাতায় ফিরে যেতে পারে নি। মনে মনে হয়ত তারও অনেক সংস্কারের 'স্কীম' কল্পনা ছিল, চিন্তার ধারাও ঠিক গোঁসাইবাড়ীর ছেলেদের মত ছিল না, গোপন অন্তরে নানাবিধ অত্যাধুনিক, কমআধুনিক কল্পনার ধারা নানাদিকে প্রবাহিত

হ'ত। কিন্তু আকস্মিকভাবে নিজের বাড়ীতেই এমনতর সংস্কৃতি সুরু হয়ে যাবে ঠিক বুঝতে গোবিন্দও পারেনি। সহসা এখন তার কাছে সংস্কারের অন্যদিকও স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল।

এই ঘটনার পর পিতা নিরবচ্ছিন্ন নির্ভরতায় হঠাৎ যে তাকে কেমন ভাবে আশ্রয় করে নিলেন সে তাও ভাল করে বুঝতে পারল না। শুধু অপরিসীম সমবেদনায় ও করুণায় সে পিতার সহচর হয়ে উঠল যেন। তিলক গান্ধি অরবিন্দের আধুনিক গীতার নানাবিধ টীকাভাষ্য, পিতাকে পড়ে অনুবাদ করে শোনানো যেন তার কাজ হয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে নিজের পড়া ও নিজের ভাবনা যেন তার আয়ত্তের অনেক দূরে চলে গেল।

আস্তে আস্তে বৎসর শেষ হয়ে এলো প্রায়। গোঁসাই রাত্রে আর নিজের কাজ করা ছেড়ে দিয়েছিলেন। গোবিন্দের কাছে বইয়ের নানা অনুবাদ শুনতেন ও আলোচনা করতেন। বিশাখা চুপ করে বসে শুনতেন, অথবা হয়ত সুপারি কাটতেন, শলতে পাকাতেন।

সহসা একদিন গোবিন্দ বল্লে, বাবা আমাদের মন্দিরের উঠানে একটা পাঠশালা করলে হয় না? আপনাদের আগে তো শুনেছি সংস্কৃত চতুষ্পাঠী মত ছিল, না? উঠে গেল কেন?'

গোঁসাই আশ্বস্ত হয়ে উঠলেন যেন পুত্রের কথায়। বিশাখাও যেন স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠলেন মনের কোণে। বহুদিন ধরে জনক-জননীর মনে ভয় ছিল, যদি গোবিন্দ কলকাতায় ফিরে যেতে চায়। যদি তারও এই দেশ, এই দেবতা-সেবা এই দেবত্র তদারক করার কাজ ভাল না লাগে!

গোঁসাই বল্লেন, বেশ তো কর না। আমাদের চতুষ্পাঠী ছিল ঠাকুর্দার আমলে, অনেকগুলি ব্রাহ্মণ ছাত্র থাকত বাড়াতে, আমি তখন খুব ছোট অল্প অল্প মনে আছে। তারপর ঠাকুর্দা মারা যাবার অল্পদিন পরেই বাবা মারা গেলেন, দেবত্র সম্পত্তি গেল মুন্সরামের (রিসিভারের) হাতে, খরচপত্র কি হত না হত কিছুই জানি না। হয়ত দেনা ছিল, সেটা উঠে গেল। তারপর আমি বড় হলাম তা আমি তো বেশী লেখাপড়া শিখিনি।'

গোঁসাই পুঁথির ওপর চোখ নিচু করে নিলেন। বিশাখা গোবিন্দ এতক্ষণ গোঁসাইয়ের দিকে চেয়েছিলেন, অপ্রতিভ বিশাখা চোখ নামিয়ে নিলেন হাতের কাছের রাশীকৃত সলিতার তুলোর ওপর। গোবিন্দের বহু দিন আগের বিশাখার মুখে গোঁসাই ঘরে যশোধরার বিবাহ নিয়ে "মুখ্যু" ছেলের কথা বলার—কথা মনে

পড়ে গেল। একটু অপ্রস্তুত ভাবে চুপ করে থেকে সে বইয়ের পাতা উল্‌টাতে উল্‌টাতে বল্লে, 'আপনি সংস্কৃত তো খুব ভাল জানেন—আমরা পাঠশালা করলে আপনাকে সংস্কৃত পড়িয়ে দিতে হবে তাদের।'

গোঁসাই চুপ করে রইলেন। তারপর বল্লেন, 'কি ভাবে করবে ভেবেছ?'

গোবিন্দ বল্লে, 'আমার মনে হচ্ছিল, আপনি তো আপনার মন্দিরে দেশ-বিদেশের লোকের কাছ থেকে এত পান, এত প্রসাদ আপনার বিক্রী হয়, এতো সবই সকলের কাছে পাওয়া; এই পাঠশালাতে সব জাতের গরীব ছেলেদের পড়াই, শুধু ব্রাহ্মণ নয়; আর সকলকে আপনি আপনার প্রসাদের খানিকটা করে দুপুর বেলা দিন। তাতে গরীব ছেলেরা খেতেও পাবে, পড়াতেও খানিকটা মন দিতে পারবে, খাবার জন্যে আর মজুরী করতে দৌড়বে না। আর আমাদের গোঁসাই ঘরের ছেলেরা জড়ভরত হয়ে আছে, তারাও ভাল করে একটু লেখাপড়া শিখবে।' গোবিন্দ 'মুখ্যু' কথাটা উচ্চারণ করতে পারল না। গোঁসাই বল্লেন, 'বেশ তুমি কাজ আরম্ভ কর—আমি অর্দ্ধেক প্রসাদ তোমাকে দোব। কে কে পড়াবে?'

গোবিন্দ বল্লে, 'এখন আমি নারাণ আর আমাদের গোঁসাইদের জানা আর দু'একটি ছেলে মিলে আরম্ভ করব।'

২

কয়েকদিনের মধ্যেই রাধামোহনের নিস্তব্ধ প্রাঙ্গণ পল্লীর সকল ঘরের শিশু দেবতার বালগোপালের প্রতিনিধিদের কল-কোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠল। সকালে আটটা থেকে এগারটা অবধি তারা পড়ে, তারপর মন্দির প্রাঙ্গণ মুখরিত ক'রে তারা প্রসাদ গ্রহণ করে বাড়ী ফেরে। দীনহীন অপ্রতিভ হাসিমুখ শিশু বালকে আঙিন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। শুধুই পাঠশালা হলে হয়ত এত তাদের আনন্দময় মনে হত না। গোঁসাই ঠাকুর দালানে বসে, বিশাখা অন্তঃপুরের ঝরোকা থেকে এই নূতন ধরণের মহোৎসব দেখেন—তাদের পড়ার, প্রসাদ পাওয়ার। অন্য কোনো কোনো গোঁসাই বাড়ীর কেউ, বা মন্দিরের কর্ম্মচারীরা বিরক্ত হয়, বলে, 'যত ছোট জাতের নোংরামি, অজাত-কুজাতের অপরিচ্ছন্ন কাণ্ড।'

গোবিন্দের কানে যায়, সে হাসে, 'তাহলে প্রসাদ বলেছেন কেন? মন্দিরেরই বা মাহাত্ম্য কি? ওদের যদি মন্দিরেও আলাদা রাখবেন, তা হলে কোথায় এক

হবে ? প্রসাদ তো ওদেরই পাওনা, ওদের মুখের হাসির দিকে একবার চেয়ে দেখুন।'

গোঁসাইয়ের কানে বাদানুবাদ আলোচনা পৌঁছয়, গোবিন্দের মন্তব্যও পৌঁছয়, তিনি কিছুই বলেন না, প্রসন্ন হাসিতে অবাক হয়ে গোবিন্দের কথাই মেনে নেন। সত্যই ওদের মুখের হাসির দিকে চেয়ে দেখেন তিনিও।

তাঁর মনে হয় অনেক কথা। মনে হয় এই দৃষ্টিভঙ্গী, এই আনন্দলোক সৃজনের কল্পনা, গোবিন্দ কোথা পেল। যে অনায়াসে সঞ্চয়ের পুরুষানুক্রমিক মোহ থেকে মুক্তি পেয়েছে, বিলাসের, ব্যসনের দুর্ব্বার বাসনাকে অতিক্রম করে গেছে, এমন লোভহীন আনন্দময় পথের কণ্ঠস্বর প্রেরণা সে কোথা থেকে পেল।

পুরুষানুক্রমে তাঁরাও দেবতার নিত্য ও নৈমিত্তিক সেবার, ভোগরাগের ঐশ্বর্য্যময় লীলাময় উৎসব করে এসেছেন। জনসাধারণ ধনী ও দরিদ্র, অট্টালিকা-প্রাসাদ থেকে পথবাসী সকলেই তাদের পূজাসম্ভার অলঙ্কারে ধনভারে নানা উপচারে, বিনা উপচারেও এনে সেই উৎসবে যোগ দিয়ে গেছে। বিনিময়ে ওঁরাও প্রসাদ দিয়েছেন তাদের, কিন্তু নামমাত্র। বহু শতাব্দী ধরে সেই সমস্ত উপচার ধনভার দেবতার নামে তাঁদের কোষাগারে জমেছে, আজো জমে আছে। আর সেই দেবতার নামে সঞ্চিত ধন সকলে কি ভাবে, কি অনাচারে, অমিতাচারে, বিলাসে, ব্যসনে ব্যয় করেছে ও করে সেও তো জানেন, দেখেছেন।

কিন্তু সে কি দেবতার ভোগ ? দেবতার কাজে ব্যয় হয়েছে ?

আজ গোবিন্দ বলেছে, 'সকলের কাছে ঠাকুর পান'। সত্যই তো, এতো সকলের কাছেই পাওয়া। তাঁদের আগে অবশ্য ছিল তীর্থে, দেবালয়ে, টোল, চতুষ্পাঠী, অন্নদান, অন্নসত্র ; তবু মনে হয় এ যেন অন্য ধরণের দেখা। যারা পায় না, যারা পায়নি, যারা বঞ্চিত, যারা মূঢ়, ভাত ভীরু তাদের সেই ব্রাহ্মণেতর অতি নিম্ন স্তরের সকলকেও গোবিন্দ মন্দিরের আঙিনায় এনেছে ; তাদের আসায় আজ আর প্রাঙ্গণ অশুচি হয়নি, এই কথা শ্রীচৈতন্যদেবের পর নূতন করে বলেছে। এর নামই কি চিরকালের 'সত্যের' নূতন করে প্রকাশ হওয়া ?

গোঁসাই পরম শ্রদ্ধায় স্নেহে ভাবেন, এ কোন শিক্ষা ? এতো উনি শেখাননি। এই কি আধুনিক শিক্ষা ?

অকস্মাৎ যশোধরার কথা মনে হয়, যেন তাঁর হৃৎস্পন্দন খানিকক্ষণের জন্য মূঢ় হয়ে যায়। বিচলিত হয়ে দেবতার দিকে চেয়ে থাকেন। তারপর চোখে

পরে দেবদেউলের গায়ে আঁকা সমুদ্র মন্থনের ছবি, লক্ষ্মী অমৃত কলস নিয়ে উঠেছেন। তারপর বাসুকীর নিঃশ্বাসের বিষে সমস্ত চরাচর আচ্ছন্ন হয়ে গেল। শিব বিষের ভাগ গ্রহণ করলেন। মঙ্গল অমঙ্গলকে গ্রহণ করলেন।

৩

দিনে পাঠশালা বসে। রাত্রে মা বাপ ভাই সকলে মিলে সেই আলোচনা চলে।

গোবিন্দ বই আনায় পড়ায়, পড়ার ধারার নানারকম সংশোধন করে আলোচনা করে। খানিকটা পাঠশালা, খানিকটা স্কুল, কিছুটা মন-গড়া ধারায় ওদের পড়ানো চলে।

কাজের আনন্দ যেন মনের মরিচা-ধরা হাসিহীন আনন্দহীন জায়গাগুলোও মসৃণ হয়ে গেছে সকলের। বিশাখা পরম উৎসাহে প্রসাদের বিপুল ভাগ ভাণ্ডার থেকে বের করে দেন। গোঁসাই সামান্য কিছুক্ষণ বড় ছেলেদের পড়ান, তারপর স্মিত হাস্যে তাদের প্রসাদ গ্রহণ করা দেখে অন্তঃপুরে আসেন। নারাণ পরম উৎসাহে দাদার সঙ্গে অন্য বন্ধুদের সঙ্গে পড়ানোর ভার নিয়েছে।

কোন ছেলে কেমন পড়ে, কেবা দুষ্ট দুরন্ত, কেবা দীন ভয়ার্ত সবই চোখে পড়ে সকলের।

গোঁসাই জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা ওই ছেলেটি খুব সুশ্রী দেখতে, চালাক চটপটে ভাব ওটি কার ছেলে?'

বিশাখা বল্লেন, 'হ্যাঁ বেশ ছেলেটি। নীল জরীর টুপী পরে আসে, না?'

গোবিন্দ বল্লে, 'ওটি মাধব গোঁসাইর ছোট ছেলে। বেশ বুদ্ধিমান। এরি মধ্যে অনেক এগিয়ে গেছে ওর দলের চেয়ে।'

নারাণ বল্লে, 'ওর দলের মধ্যে সব চেয়ে চালাক ওই, ওকে আলাদা করে পড়াতে হয়।'

গোঁসাই বল্লেন, 'বাঃ! তা আর সব ছাত্র তোমাদের কেমন হচ্ছে? কত মোট ছাত্র জোগাড় হল?'

গোবিন্দ বল্লে, 'তা জন চল্লিশ হবে। ছেলে প্রায় সবই ভাল, তবে যে যেমন ভাবে মানুষ হয় তার মত খানিকটা হয় তো। সেদিন একটি ছেলে, আমাদের

নন্দরাম ছুতোরের ছেলে দেখলাম, কি পরিষ্কার মাথা অঙ্কে। পড়াতেও ভালো বেশ। কিন্তু বেচারা এমন ভীতু হয়ে গেছে, ভদ্রলোকের ভয়ে, উঁচু জাতের আওতায়, যে প্রশ্নের উত্তর দিলে পাছে বামুন বেনে উঁচু জাতের কাছে অপরাধ হয় সেই ভয়ে চুপ করে থাকে। একদিন সকলের অঙ্ক ভুল হল, তারই ঠিক হল তাই তাকে ধরতে পারলাম। এতদিনে তার একটু ভরসা হয়েছে কথা বলবার।'

গোঁসাই বল্লেন, 'বটে। তা ভালো তো।' আর কিছু বলেন না, বসে বসে পুঁথি দেখেন।

নারায়ণ গোবিন্দ কথা কয়, বিশাখা শোনেন।

খানিকক্ষণ পুঁথি দেখে সহসা গোঁসাই গোবিন্দকে বল্লেন, 'তোমাকে একটা কথা বলব ভাবছি।'

গোবিন্দ আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসু ভাবে পিতার দিকে চাইল। বিশাখা স্বামীর দিকে চেয়ে রইলেন।

গোঁসাই আবার পুঁথির দিকে চেয়েছিলেন, এবার মুখ তুলে বল্লেন, 'তোমার তো সংসার ধর্ম্ম করার বয়স হল।'

বিশাখার হাতের যাঁতি থেমে গেল। মন চঞ্চল উৎকর্ণ হয়ে উঠল। এই দীর্ঘ দিন আনন্দহীন ভবিষ্যৎ উৎসাহহীন বাড়ীতে যেন তাঁর চোখের সামনে ফুটে উঠতে লাগল গোবিন্দের বধূ, গোবিন্দের নির্লিপ্ত কাজের মাঝে তার আনন্দময় সংসার যাত্রা, তার সন্তান···তাদে' নিয়ে তাঁদের আবার সংসার যাত্রা!

গোবিন্দ চুপ করে নিচু মুখে পিতার জন্য আনা মহাত্মা গান্ধীর গীতার ব্যাখ্যার পাতা ওলটাতে লাগল।

জনক-জননী উৎসুক হয়ে তার পানে চেয়ে ছিলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে গোবিন্দ দ্বিধাভরে বল্লে, 'আপনি নারাণের বিয়ে দিন না বাবা।'

গোঁসাই অবাক হয়ে গেলেন, বিশাখাও আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। গোঁসাই কিছু বলার আগেই তিনি বলে ফেল্লেন, 'সে কিরে? বড় থাকতে ছোটর বিয়ে কি করে হবে?'

গোবিন্দ মাথা নিচু করে বইয়ের দিকে চেয়েছিল। গোঁসাই যেন মৌনভাবে বিশাখার প্রশ্নেরই উত্তরের অপেক্ষা করছিলেন।

এবার গোবিন্দ বলে, 'বিয়েতে আমার ইচ্ছে নেই মা।' কিছুক্ষণ ঘরটা স্তব্ধ হয়ে রইল—যেন অনেকক্ষণ। তারপর সহসা গোঁসাই বললেন, 'তোমারো গোঁসাই ঘরের মুখ্যু মেয়ে বিয়ে করতে ইচ্ছে নেই?' প্রশ্নটা যেন শুধু প্রশ্ন নয়, যেন

উত্তরও। বিশাখার হাতের কাজ, ছেলেদের হাতের বই, শ্রোতারা শ্রোত্রী সবই সমানভাবের জড় পদার্থের মত নিঃস্পন্দ হয়ে গেল।

খানিকক্ষণ পরে গোবিন্দ বললে, 'আমি শুতে যাই মা।'

৪

অবশেষে বিমনা জনক-জননী নারায়ণের বিবাহের আয়োজন করলেন। আধুনিক শিক্ষা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, মানুষের অধিকারতত্ত্ব এসব বার্তা, নতুন জগতের পড়া-শোনার কথা কিছুই গোঁসাইয়ের জানা নেই, তবু কোন এক অজানা শিক্ষা, ভদ্র মন, শান্ত গাম্ভীর্য্য তাঁকে গোবিন্দর সঙ্গে বাদানুবাদ করতে প্রবৃত্তি দিল না। তিনি মাথা নিচু করে তাঁর ভাগ্যের অজানা কর্ম্মের ফল মেনে নিলেন। কিন্তু কি ভেবে নারায়ণকে আর পড়ার দিকে দিলেন না।

এইবার গোবিন্দর পড়া-শোনার কৃতিত্বে ঈর্ষাতুর এখন বুদ্ধি দৃপ্ত হয়ে আত্মীয়-স্বজনরা বন্ধু প্রতিবেশীজন জনে জনে এসে প্রকাশ্যে, ইঙ্গিতে, আভাসে বলে গেল, 'লেখাপড়া শেখার, বিদেশী শিক্ষার এই ফল, এই যশোধরার বিবাহ, এই গোবিন্দর স্বাধীন মতামত এবং এর পরিণাম মোটেই রমণীয় নয়, গোবিন্দও হয়ত কোন্ অজ্ঞাতের মেয়ে বিবাহ করে তোমার পবিত্র ঘরে আরো কালিমা লেপন করবে, এই তার অভিপ্রায় ইত্যাদি।'

সমবেত সংগৃহিত অভিমতের নির্গলিতার্থ এই যে, নারায়ণকে লেখাপড়ার দিকে বেশী দাও নি ভাল করেছ, ওর বিবাহ দাও।

গোঁসাই নির্বাক হয়েই সব উপদেশ অভিমত গলাধঃকরণ করলেন। উদ্ধব গোঁসাইর ছোট মেয়ে রাইকিশোরীর সঙ্গে নারায়ণের বিবাহ স্থির হ'ল। মেয়েটি দেখতে ভালো। সুশ্রী মুখ, আঁটসাঁট ছোট-খাটো গড়ন, গড়নের মতই কঠিন মুখ, হাসির মিত আভাসহীন চেপা ঠোঁট, ঈষৎ প্রসর তীক্ষ্ণদৃষ্টি, টানা চোখ, যে চোখ মানুষকে দেখে শুধু, যা হাসিতে মধুর হয় না, ভালবাসায় কোমল দেখায় না।

একটি পরমাত্মীয় বাদ গেল, অন্যটিও যেন সরে দাঁড়ালো; তাহলেও বহু আত্মীয়-অনাত্মীয় জড় করে ব্যথাতুর সমারোহে ক্ষুব্ধ উৎসবে নারায়ণের বধূ ঘরে এলো।

গোবিন্দ পরম উৎসাহে বধূর জিনিষপত্র সংগ্রহ করেছিল, বিশাখা গোঁসাইও বহু আশায় দীর্ঘ দিনের সঞ্চিত বহু অলঙ্কার গহনা, জরী জড়াও শাড়ী ওড়না, পিতল কাঁশা রূপার তৈজস-বাসন উজাড় করে বার করে দিলেন। আর কার জন্য? গোবিন্দ বিবাহ করবে না—যশোধরা দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্কের বাইরে।

জিনিষ-পত্র দেখে রাইকিশোরীর বুদ্ধিমতী জননী মেয়েকে বলে দিয়েছিলেন, 'মা মেলেচ্ছ বুদ্ধি ঘরে—মেয়ে পালানো ঘরে (তাঁদের মতে যশোধরার বিয়েটা পালানোরই মত) তোমায় দিলাম, শুধু এই জেনে যে সব তোমার হবে। রাধামোহনের অনেক বিষয়; এসব তোমার হল। ভাসুর যদি বিয়ে করত তো তার হত সব, বড়ইতো এখানের নিয়মে সব পায় কি না। তা ও তো বিয়ে করলে না, আর করে যদি তাহলেও আমাদের ঘরে না হলে কিছুই পাবে না। শ্বশুর শাশুড়ী গেলেই সব তোমার। সব 'উড়ন চণ্ডে' কাণ্ড ওদের; তুমি বুঝে চলবে; যা ভেবেছিলাম আছে—তার চেয়েও বেশী আছে। সব বুঝে নেবে।'

মেয়ে নির্ব্বাক মুখে সব শুনল, একটি কথাও ভুলল না। 'সব তার' একথা মনে রইল তার।

বধূ বরণ করে এনে পরম বিস্ময়ে বিশাখা দেখলেন, ওই স্তব্ধ মুখ হাসিহীন তীক্ষ্ণবুদ্ধি মেয়েটির কোনোখানে যেন এতটুকু ফাঁক নেই, পথ নেই মনে প্রবেশ করবার। বসনে ভূষণে আহার্য্যে আদরে যত্নে সে ঘনিষ্ঠ হয় না: তাকে সকলের ঘরের বধূর মত সাংসারিক প্রবহমান শিষ্টাচার শেখানো যায় না, পারিবারিক পুরুষপরম্পরাগত রীতি-নীতির কথাও বলা যায় না, কিছু বললে মনে হয় সেও কি বলবে যেন, কিছু বলে না কিন্তু। তীব্র সমালোচকের দৃষ্টিতে সে শুধু নির্লিপ্তভাবে দেখে যেন।

গোঁসাই ভেবেছিলেন যশোধরার ফাঁকটা বুঝি খানিকটা পূর্ণ হবে বধূর দ্বারা—কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁরও মোহ ভাঙল। গোবিন্দ জ্যেষ্ঠাধিকারে বহু কর্ত্তৃত্ব আর বিষয়ের ব্যবস্থা করে। বহু শখের প্রয়োজনের জিনিষ আনে নারায়ণের জন্য, বধূর জন্য। বধূ কঠিন নির্লিপ্ততায় গ্রহণ করে—যেন মনে হয় সে ভাবে, সবই তো তার! যেন ওদের হাতে আনা ওরই সব এবং তা দিয়ে তারাই কৃতার্থ হয়ে যাচ্ছে, যারা দিচ্ছে।

কয়েক মাসের মধ্যেই সকলে বুঝতে পারলেন, বিশাখা গোঁসাই গোবিন্দ সবাই —হিমালয়ের যে তুষার গলে না কিম্বা গলতে আরম্ভ হয়েই আবার জমে যায়

রাইকিশোরী তেমনই কঠিন আর হিম শীতল। অত্যন্ত আনন্দিত মনে সমাদর স্নেহভরে তার কাছে আসার পর সহসা পরিজনরা যেন থমকে আড়ষ্ট হয়ে যায়। তার আড়ষ্ট নির্লিপ্ততার ছোঁয়াচ লেগে যায় যেন।

৫

তবু সকলে সত্য সত্যই একদিন কৃতার্থ হয়ে গেল?

রাইকিশোরী কি হেসেছিল? অথবা কথা কয়েছিল ভাল করে? কিম্বা তার জন্য আনা কোনো-কিছু খুশী মনে গ্রহণ করেছিল? না, সে সব কিছুই ঘটেনি। পিত্রালয় থেকে খবর এসেছিল রাইকিশোরীর একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেছে।

গোবিন্দর আনন্দের সীমা রইল না যেন। গোঁসাই বিশাখা খুশী মনে পৌত্রীকে দেখে এলেন মোহর মালা দিয়ে, রূপার বাসন দিয়ে। পৌত্রীকে কোলে নিয়ে গোঁসাইয়ের চোখ সজল হয়ে এলো, যেন শিশু যশোদাস ফিরে এলো তাঁর ঘরে।

পরম সমাদরে পৌত্রীর নামকরণ হ'ল, চন্দ্রাবলী। আর চন্দ্রাকে নিয়ে গোবিন্দর যেন নতুন পাঠশালা আরম্ভ হল আবার। কাঁথা-নেকড়া-জড়ানো চন্দ্রাকে সে দাসীর কোল থেকে নিয়ে আসে সকালে। সারা সকাল সে জ্যেষ্ঠতাত পিতামহ পিতার আশে-পাশে শুয়ে থাকে, ঘুমায়, কাঁদে, খেলা করে। মাঝে মাঝে অন্তঃপুরে মায়ের কাছে নিয়ে যায় দাসী। গোবিন্দ আবার ফিরিয়ে আনে।

সহসা একদিন কানে পৌঁছায় তার, 'ছোট ছেলের গায়ে অত হাত দিলে নোনা লাগে আমার মা বলেন।' অপ্রতিভ গোবিন্দ বলে দাসীকে, 'ওকে তো আমরা কোলে নিই না শুইয়েই রাখি।'

তবু চন্দ্রাবলীকে নিয়ে আসার মোহ তার যায় না।

রাইকিশোরীর পিসিমা এলেন, বৃন্দাবন থেকে। পরম গর্ব্ব ও স্নেহ সহকারে চারদিক দেখে বেড়িয়ে রাইকিশোরীর ঘরে বসলেন।

বিশাখা এসে বসলেন কাছে।

পিসিমা বললেন, 'তা এইবার আমার রাইয়ের একটি খোকা হলেই বেশ হয়। বেশ বাড়ী-ঘর আমার রাইয়ের। বেশ বিয়ে হয়েছে: তা জামাই কোথা?

একবার ডাকা না ?' রাইয়ের পানে চেয়েই বল্লেন। যেন বিশাখার উপস্থিতি তাঁর চোখে পড়েনি।

অপ্রতিভ বিশাখা নারায়ণকে অন্তঃপুরে আহ্বান করতে উঠে গেলেন।

নারায়ণ এসে প্রণাম করল। হিন্দী-মিশ্রিত বাংলায় পিসিমা আশীর্ব্বাদ করলেন জামাতাকে, 'রাজা হও, রাজা বেটার বাপ হও। যা তোমার ভাই বোন বেটা, ভাগ্যে তুমি জন্মেছিলে তাই বংশের সংসার-ধর্ম্ম নাম বজায় রইল।'

রাইকিশোরীর পানে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁরে ননদটা কোথায় ?' বিশাখা দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিলেন, নারাণকে কি জিজ্ঞাসা করবার জন্য, তাঁর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। নারাণ অপ্রস্তুত বিরক্তিভরে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

তখনো শোনা গেল, 'ভাসুরটা আবার বিয়ে করবে না তো। তুই আমার রাজমাতা হয়ে—রাজরাণী হয়ে থাক।'

৬

চন্দ্রাবলীর চার বৎসরের সময় রাইকিশোরীর বেণুগোপাল জন্ম গ্রহণ করল। বংশধরের আগমনীর উৎসব চিরকালের প্রথানুযায়ী দানে অর্পণে বাদ্য ভাণ্ডে মন্দিরের প্রাঙ্গণ কলকোলাহলে ভরে দিল। পরম হর্ষে বিজয়িনীর মত রাইকিশোরীকে ও নবজাত শিশু উত্তরাধিকারীকে তার পিতা মাতা দেখে গেলেন। যেন নিশ্চিন্ত হলেন। বিশাখা ও বিশাখার পুত্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার যোগ্যতা এতদিনে রাইকিশোরী লাভ করেছে। ছেলে তো সকলেরই হয়। সব মেয়েরই —দরিদ্র ধনী সব ঘরেই কিন্তু এতো শুধু ছেলে নয়, বংশানুক্রমিক ধনাধিকার! পৌত্রলাভে আনন্দিত বিশাখা-গোবিন্দকে যেন কি এক রকম ভাবে উপেক্ষা করে রাইকিশোরীর স্বজনরা আসে-যায়। যেন ভাবটা, বিশাখার ওরা প্রতিদ্বন্দ্বী।

তাদের উপেক্ষায় আহত ব্যাকুল বিশাখা তত বুঝতে পারেন না। কিন্তু গোবিন্দ যেন একটু বোঝে, নারায়ণও বোঝে। তবে ঈর্ষাহীন স্পৃহাহীন নির্লিপ্ত গোবিন্দের মনে হাসি আসে। নারায়ণ যেন লজ্জা পায়।

বাইরে পাঠশালার কাজ—ছোট ক্লাসের স্কুলের মত খানিকটা হয়ে উঠেছে, পড়াশোনাও বেড়ে চলেছে, ছাত্রও বেড়ে চলেছে।

গোঁসাইয়ের মনের বেদনার ক্ষত মিলিয়ে এসেছে। চন্দ্রাকে নিয়েই তাঁর

পাঠশালার প্রাত্যহিক আনন্দময় আরম্ভ। বালিকা ঐ বয়সের যশোধরাকে তাঁর মনে পড়ে যায় মাঝে মাঝে, কিন্তু আর তাতে ব্যথার তীক্ষ্ণতা নেই যেন। মন ভোলাবার মায়াময় যেন যাদুময় নূতন উপকরণ সামনে এসে পড়েছে, চন্দ্রা আর বেণু রূপে।

বেণুগোপালের অন্নপ্রাশনের উৎসবের দিন এসে পড়ল। বহু সম্পর্কীয় আত্মীয়-কুটুম্বতে অন্তঃপুর ভরে গেল।

উৎসবের কদিন পর অভ্যাগত আমন্ত্রিত নিমন্ত্রিতের জনতা আস্তে আস্তে বিরল হয়ে এলো।

খেতে বসে গোবিন্দ চন্দ্রাকে জিজ্ঞাসা করলে, 'কদিন পড়তে যাসনি যে চন্দ্রা?'

পিতামহের পিঠের ওপর ঝুঁকে পড়ে চন্দ্রা দেখছিল, তাঁর থালার আহার্য্য থেকে কি খাবে না খাবে।

গোঁসাই বললেন, 'এসে পাশে বসো। কি খাবে? সত্যি পড়তে ভুলে গেলে বুঝি?'

চন্দ্রা বসল না, কণ্ঠবেষ্টন করে বললে, 'ভুলে যাইনি, মনে আছে।'

গোঁসাই সহাস্যে বললেন, 'কই, বলত?' চন্দ্রা বললে, 'অ এ অজগর আসছে তেড়ে, আমটি আমি খাব পেড়ে,' দেখচ মনে আচে। তারপর 'লিচি (ঋষি) মছাই বছেন পূজোয়, না, দাদামশাই বচেন পূজোয়।' গোবিন্দর দিকে চেয়ে চন্দ্রা হাসে, তারই শেখানো 'দাদামশাই' বলা। সকলেই হাসলেন চন্দ্রার কথায়।

গোঁসাই বললেন, 'বাঃ বেশত মনে রেখেছে, তা যাওনি কেন পড়তে?'

চন্দ্রা দাদার পাশে বসে কি একটা তুলে মুখে দিচ্ছিল, বললে 'আল পলব না, দিদিমা বলেছে।'

গোবিন্দ ও নারায়ণ একটু আশ্চর্য্য হয়ে চাইল চন্দ্রার দিকে। গোঁসাই নতমুখে খাচ্ছিলেন, বললেন, 'কেন পড়বে না?'

চন্দ্রা ক্ষীরের বাটীর মধ্যে হাত ডুবিয়ে মুখে একটু তুলে বললে, 'মাকে বলেছে, আল পলবে না, বছি পিচির মত পালিয়ে যাবে।'

বিশাখা প্রসাদের মিষ্টির আর ফলের থালা নিয়ে আসছিলেন। অতর্কিতে কথাটা কানে গেল, আস্তে আস্তে থালাখানি সেইখানেই নামিয়ে রেখে তিনি ভাঁড়ার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন অভিভূতের মত, আর ফিরে এলেন না।

গোঁসাইয়ের হাতের গ্রাস পাতের ওপর পড়ে গেল। তিনি মাথা নীচু করে দৃষ্টিহীন চোখে থালার দিকে চেয়ে রইলেন। গোবিন্দ নারায়ণের আর মুখ তোলার শক্তি রইল না।

আকস্মিকভাবে আহত হলে কচ্ছপ যেমন তার মুখটা তার কঠিন দেহের আবরণীর মধ্যে লুকিয়ে নেয়, গোঁসাই যেন সহসা তেমনভাবেই নিজেকে একান্তভাবে মন্দিরের পূজা-পাঠের মধ্যে লুকিয়ে ফেল্লেন। তাঁদের দীর্ঘদিনের লুকানো দুঃখ, সঙ্গোপন বেদনা, লজ্জা, শিশু মুখে এমন করে বিকৃত হবে এমন কথা কারো মনে হয়নি, সকলে যেন সভয়ে নির্ব্বাক হয়ে গেল।

চন্দ্রার কলকাকলী কথা, হাসির অমৃতধারা পান করবার ভরসা আর নেই যেন কারো।

গোঁসাইয়ের মন্দিরের পাঠ আর শেষ হয় না, বিশাখার দেবতার ভাঁড়ারের কাজের অন্ত হয় না, গোবিন্দ পাঠশালার কাজের পর মোটা মোটা বই নিয়ে পড়তে বসে ; নারায়ণ নীরবে ভাইয়ের কাছে বসে থাকে বা কর্ম্মান্তরে নিযুক্ত থাকে—পরস্পরের কথা-আলাপও যেন আকস্মিক কি বিপর্য্যয়ে থমকে গেছে

৭

কয়েকমাসের মধ্যেই গোঁসাইয়ের মৃত্যু হল। বাইরে বিমনা দুই ভাই সামাজিক শোক, আনুষ্ঠানিক শোক, আন্তরিক শোক নিয়ে লোকের সঙ্গে আলাপ করে, কথা কয়, শ্রাদ্ধের আয়োজন করে। অন্তঃপুরে নিঃস্তব্ধ এক পাশে বিশাখা বহু অনাত্মীয়ার মাঝে চুপ করে বসে থাকেন। নারায়ণের শ্বশুর উদ্ধব গোঁসাই এসে বসেন। সময়োচিত খানিক 'আহা, উহুর' পর বল্লেন, 'আর বাবা, এখন সোজা হয়ে ওঠ, শোক-দুঃখ-জন্ম-মৃত্যু সবই মিথ্যে বাবা, এই সংসার এই রকমই। তিনি মহাপুরুষ ছিলেন স্বধামে গমন করেছেন। পুণ্যবান ব্যক্তি, এখন তাঁর উপযুক্ত ভাবে তোমরা সব ক্রিয়াকর্ম্ম করে বিষয় সম্পত্তি রক্ষা কর।' গোবিন্দ ও নারায়ণ চুপ করে থাকে।

তারপর আবার উদ্ধব গোঁসাই বলেন, 'তা এ দিকের কি সব ব্যবস্থা করছ ?'

গোবিন্দ বল্লে, 'আপনারাই বলুন কি করা হয় না হয় ?'

'তাতো বটেই, সে তো ঠিকই তোমার উপযুক্ত কথাই বলেছ—তা চিরকালের নিয়ম অনুসারেই সব করা উচিত। তা তোমার মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসি একবার', এবারে উদ্ধব গোঁসাই দাঁড়ালেন। অকস্মাৎ চারদিক দেখে বল্লেন,

'তা বাবা পাঠশালাটি কি তুলে দিলে? বেশ করেছ! অতি অপব্যয়, বৃথা শ্রম আর ভূত-ভোজনও উঠে যাওয়াই বেশ হয়েছে।'

গোবিন্দ বল্লে, 'না তুলে তো দিই নি, অশৌচের পর আবার বসবে।'

উদ্ধব নারায়ণের দিকে চেয়ে বল্‌লেন, 'না, না, না, আর নয়। তিনি প্রবীণ মানুষ ছিলেন তাঁকে বলতে পারিনি। তোমরা এ সব আর কোরো না। উঠিয়ে দাও।' যেন গোবিন্দ কেউই নয়।

নারায়ণ কি বলতে গেল, তিনি ততক্ষণ অন্তঃপুরের দিকে চলে গেলেন। নারায়ণ লজ্জিত মুখে চুপ করে মাথা নীচু করে রইল। কয়েকজন আত্মীয়া-অনাত্মীয়াদের মাঝে বিশাখা চুপ করে বসেছিলেন, রাইকিশোরীর জননীও ছিলেন।

উদ্ধব গোস্বামী এসে বসলেন। তাঁকে দেখে কেউ কেউ উঠে গেলেন। গোস্বামী বল্‌লেন, 'আহা, কি কাণ্ড অকস্মাৎ ঘটে গেল বোঝাও গেল না। এমন সাবিত্রীতুল্যা স্ত্রীলোকের ভাগ্যে এমন ঘটনা আমরা কল্পনাই করিনি। রাইয়ের আমার পিতৃবিয়োগ হ'ল। আমি তো মিথ্যা পিতা। আপনারাই ছিলেন ওর মাতা পিতা সব। ওকে আপনাদের চরণে সমর্পণ করে যে কত নিশ্চিন্ত ছিলাম। এই দেখুন, এখন এই মহাগুরু নিপাত হল, কিভাবে সম্বৎসর যাবে সেও ভাবনার কথা।'

বিশাখার সম্পর্কীয়া ননদ বসেছিলেন কাছে, তিনি বল্‌লেন, 'তাইতো।'

গোস্বামী এবারে শ্রোত্রী-হিসাবে তাঁকে পেয়ে বলতে আরম্ভ করলেন, 'তাই নারায়ণ বাবাজীকে বলছিলাম এবার পাঠশালা ইস্কুল তুলে দাও—ওসব খরচ একেবারে বৃথা।'

ননদ বল্‌লেন, 'ওতো নারাণ করছে না, পাঠশালা তো গোবিন্দ করেছে।'

গোস্বামী বলেন, 'হ্যাঁ তা তো জানি। তা এখন নারাণই সব দেখবেন শুনবেন, পরে তো সবই আমার বেণুগোপালের হবে। তাঁর তো দায়িত্ব আছে একটা। কয়েকটা অপোগণ্ডের পাঠশালা করে—বিষয়টা উড়িয়ে দেওয়া তো ঠিক নয়।'

আশ্চর্য্যভাবে গোবিন্দর পিসিমা এবারে বলেন, 'বিষয় তো এখনো নারায়ণের নয়—এখন গোবিন্দর, যদি বিয়ে না করে তবে নারাণের ছেলে সব পাবে।'

উদ্ধব বলেন, 'সে তো বটেই—তবে আমি ভাল ভেবেই পরামর্শ দিচ্ছিলাম। তা বেয়ান গোবিন্দকে বলবেন বুঝিয়ে তাহলেই সব ঠিক হবে।' নত মুখ বিশাখা চুপ করেই রইলেন, গোস্বামী আর খানিকটা কথাবার্তার পর উঠে গেলেন।

৮

অশৌচ গেল, শ্রাদ্ধের সমারোহ গেল। আগন্তুক জনতাও ফিরে গেল।

পরামর্শদাতা উদ্ধব গোস্বামী প্রত্যহ আসেন। তার মাঝখানে ভাঙা হাটে বেচাকেনার মত পাঠশালা বসে, গোবিন্দ ছাত্রদের ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি। কতক-বা পড়তে চায়, কতক-বা প্রসাদের আশায় পড়তে আসে, অনেকে দুই-ই চায়। গোবিন্দ বিমূঢ়ভাবে বিচ্ছিন্ন আগ্রহে তাদের নিয়ে বসে। প্রসাদ দেবার সময় হলে নারায়ণকে বলে, 'মার কাছ থেকে প্রসাদগুলো আনিয়ে ভাগ করিয়ে দে তো।'

নারায়ণ ভিতরে যায়; প্রসাদের ভাণ্ডারের চাবী যে আর জননীর কাছে নেই সে তা জানে, এবং গোবিন্দও জানে। বিশাখার শোকের মূল্যবান অবসরে সমস্ত কর্ত্রীত্ব ও চাবীর অধিকার রাইকিশোরীর হাতে গিয়েছিল। বিশাখা তখন জানেনও নি, খোঁজও রাখেন নি। তারপর? হয়ত জেনেছিলেন, সে কথা নিষ্প্রয়োজন।

তারপর থেকে নিয়মিত বিক্রীর পর উদ্বৃত্ত প্রসাদ পাঠশালায় আসে, গোবিন্দ দেখে না, জানে যা এলো অতি পরিমিত, ক্ষুধিত শিশুদের তাতে কিছুই হবে না। গোবিন্দর মনে হয় গীতার একাদশ অধ্যায়ের সেই শ্লোকের কথা—"এই রাজা মহারাজা সৈন্য কেউই বেঁচে নেই"—তেমনি গোবিন্দও বেঁচে নেই—উদ্ধব গোস্বামী ও রাইকিশোরীর কাছে,—শুধু বেণুগোপালই মাত্র জননী-সহ সেই বহুদূর পশ্চাৎপটে বিরাজ করছে।

কয়েকমাসের মধ্যেই ক্ষুধিত শিশুদের পাঠশালার মোহ কেটে গেল। স্বল্পাবশিষ্ট ছাত্র নিয়ে গোবিন্দ বিমনা ভাবে বসে থাকে। অবশেষে একদিন নারায়ণ রাগ করে স্ত্রীকে বলে, 'প্রসাদ বেচে তোমার কত টাকা হয় যে তুমি দিন দিন পাঠশালার ভাগ কমিয়ে দিচ্ছ।'

রাইকিশোরী সরোষে চুপ করে থাকে। জবাব দেয় না।

নারায়ণ তিক্তভাবে বলে, 'লেখাপড়ার ধার তো ধারলে না, তাই গরীবদের অনাথদের মর্ম্মও বুঝলে না।'

এবারে বিদ্যুতের মত তীব্র হেসে রাইকিশোরী বলে, 'তোমাদের তো খুব মর্ম্ম বোঝা হয়েছে। অমন লেখাপড়া ভাগ্যিস শিখিনি।'

নারায়ণ রেগে গিয়ে মূঢ়ভাবে বলে, 'তার মানে? ওকথার মানে?' রাইকিশোরীর তীক্ষ্ণ হাসির ফলা তখনো ঠোঁট থেকে মিলিয়ে যায় নি, একটু চুপ

করে বল্লে, 'মানে দেশের সবাই জানে আর তুমি জানো না?' রাইকিশোরী আর দাঁড়াল না।

সহসা পাশের ঘরে কাঁচ ভাঙার শব্দ হ'ল। নারায়ণ বেরিয়ে এলো দালানে। পাশের ঘরে দেখলে গোবিন্দ সাবানের ফেনা-মাখা মুখে তার দাড়ি কামানোর আরসির ভাঙা কাঁচগুলো একপাশে জড় করে দিচ্ছে। আর পাশে বসে চন্দ্রা অনর্গল কথা কয়ে যাচ্ছে। অপ্রতিভ নারায়ণ এগিয়ে এলো, মনে হলো, হয়ত দাদা শুনতে পাননি। সঙ্কুচিত অন্তরাত্মা বলে দিল দাদা সব শুনেছেন। হয়ত সেই সময়েই আরসি ভেঙেছে অন্যমনস্কতায়।

৯

রাত্রে গোবিন্দ নারায়ণ জননীর কাছে এসে বসে।

কয়েকদিন পরে গোবিন্দ একদিন সহসাই বল্লে, 'মা আমি কলকাতায় যাব ভাবছি।'

জননী আশ্চর্য্য হয়ে বল্লেন, 'কেন? কলকাতায় কিছু কাজ আছে?'

গোবিন্দ বল্লে, 'না কাজ নয়। ভাবছি এবারে গিয়ে এম. এ পরীক্ষা দিয়ে দিই। তা হলে কাজ-কর্ম্মের একটু সুবিধা হবে।'

নারায়ণও আশ্চর্য্য হয়ে চেয়েছিল ভাইয়ের দিকে।

বিশাখা বল্লেন, 'কাজ কর্ম্মের সুবিধার তোর কি দরকার? এখানের সব দেখবে শুনবে কে? এ তো তোরই।'

গোবিন্দ হাসলে, বল্লে, 'পড়ে নি, পড়াটা বাকি রয়েছে। এখানের সব নারাণ দেখবে।'

'পড়া শেষ করে আসতে কতদিন হবে?' মা জিজ্ঞাসা করলেন। গোবিন্দ বল্লে, 'তা কি বলা যায়, পড়ে পাশ করে যদি ভাল কাজকর্ম্ম পাই তা হলে তো ভালই হবে।'

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বিশাখা বল্লেন, 'সেকি? তা হলে ওখানেই থাকবি? এখানে থাকবি না?'

গোবিন্দ বল্লে, 'না না আসব বৈকি, তোমার কাছে মাঝে মাঝে।'

বিশাখা চুপ করে রইলেন। কিন্তু বিশাখার অন্তর যেন স্পষ্টই বুঝতে পারলে,

গোবিন্দ সব ছেড়ে দিল। আসবে হয়ত কখনো। কিন্তু এই সংসার-যাত্রার মাঝে, এই কাজের আনন্দের কোলাহলের মাঝে আর ফিরবে না।

বিশাখা তবু বলেন, 'তা হলে পাঠশালার কি হবে?'

এবার গোবিন্দ নারায়ণের দিকে চেয়ে বল্লে, 'নারাণ যদি চালাতে চায়, চালাবে।'

বহু আশা কল্পনায় গড়া, গোঁসাই-বিশাখার মনে বহু সান্ত্বনা আনা, গোবিন্দর আনন্দময় নিজস্ব কর্ম্মের কল্পনার লোক বাস্তবের লোভের চাকার তলায় গুঁড়িয়ে চুরমার হয়ে গেছে। কিন্তু গোবিন্দরও মন তার মোহমুক্ত হয়ে গেছে একেবারে।

নারায়ণ চোখ নীচু করে রইল। কাজের সঙ্গে দৃষ্টির প্রসারতা যেটুকু হয়েছিল সেটা ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। যে অধিকার তার ছিল না, হতে পারত না,—একেবারে অপ্রত্যাশিত, পাছে বিচ্যুত হয় তা থেকে—তাকে আয়ত্ত করবার রাইকিশোরীর ও তার মা বাপের বিপুল চেষ্টার ছোঁয়াচ ক্রমশঃ তাকেও লাগছিল। যশোধরাকে ধিক্কার, গোবিন্দকে অকারণ অনাবশ্যক অস্তিত্ব মনে করা ভাল না লাগলেও প্রতিবাদ করবার মত মানসিক শক্তি নারায়ণের ছিল না।

ছেলেরা উঠে গেল। বিশাখা উন্মনাভাবে চুপ করে বসে রইলেন, হয়ত স্পষ্টভাবে তিনি জানেনও না, বুঝতেও পারেননি যে তাঁর অগোচর মনের অতল মন্থন করে তাঁর অতি প্রিয় যারা দুজন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে দাঁড়াল তারা তাঁর সংসারে বিষ আর অমৃত দুইই এনেছিল। বিষ তাঁর সমস্ত জীবনের ধারা নীল বিবর্ণ করে দিয়ে গেছে, আর আনন্দের অমৃতধারা লোভের মরুভূমির মাঝে পথ হারিয়ে ফেলল।

নারায়ণের পুত্র-কন্যা নিয়ে—পৌত্র-পৌত্রী পরিবেষ্টিত সংসার যাত্রা তাঁর রইল বটে, কিন্তু কোনো বন্ধনই যেন রইল না! নারায়ণ তাঁর সন্তান, কিন্তু গোবিন্দ যেন তাঁর শুধু সন্তান নয়; সম্পদ, নির্ভর, আশ্রয়।

গোবিন্দ নারায়ণ আহারান্তে শোবার জন্য উপরে এলো। নারায়ণ শুতে চলে গেল। গোবিন্দ জননীর কাছে দু'চারটি কথা বলে আপনার পড়া-শোনা নিয়ে বসল। মন্দিরের সব আলো নিবে গেল, দাস-দাসীরা শয়ন করতে গেল। বিশাখার মালা জপ আর শেষ হ'ল না। তিনি চুপ করে অন্ধকার প্রাঙ্গণের দিকে চেয়ে রইলেন, যেখানে পাঠশালা এখনও বসে, যে পাঠাশালা তাঁদের অবসন্ন মনে নতুন লোকের বার্ত্তার, আশার, আনন্দের সন্ধান এনে দিয়েছিল, গোবিন্দর সুখে-দুঃখে মোহ-মমতায় যে পাঠশালা গড়ে উঠেছিল, কোন্ দেশের

কোন্ কালের অনাগত দিনের আদর্শে অথবা কি অপরূপ আশায় তা তিনি জানেন না; শুধু আজ যখন ভেঙে যাচ্ছে সেই আনন্দময় পাঠশালা, সেই খেলাঘর শিক্ষালয়,—তখন তাঁর মনে হ'ল, এই মানুষের মনে অনির্ব্বচনীয় ধ্রুবলোকের সন্ধান আর কোনোদিন তিনি পাবেন না। এ কোন্ সত্য তা বিশাখা জানেননি, কিন্তু সন্তানের চোখ দিয়ে সেই অপূর্ব্ব দৃষ্টিশক্তি তিনি লাভ করেছিলেন।

বিশাখা নিঃশব্দে বসে রইলেন। নিজের গড়া ঘর-করনার সামনে যেন আজ সহসা তাঁর নিজেকে দর্শক বলে মনে হতে লাগল।

১০

বালীগঞ্জের একটি বাড়ীর সামনে গোবিন্দ এসে দাঁড়াল। কড়া নাড়তে চাকর এসে দরজা খুলে দিল।

গোবিন্দ জিজ্ঞাসা করলে, 'বাড়ীতে কে আছে?' ভৃত্য বল্লে, 'মা আছেন। আপনি বসুন।'

বাইরের বসবার ঘরে গোবিন্দ এসে বসল। আধুনিক ধরণের বসবার ঘর, যেমন টেবিল চেয়ার-কোচে সাজানো হয়। জানালা দিয়ে প্রচুর রৌদ্র বাতাস আসে, জানালায় দরজায় সুশ্রী পর্দ্দা ফেলা। ছবি মূর্ত্তি দামী বইতে ঘর সজ্জিত।

গোবিন্দর চোখে কিছু হয়ত পড়ল, হয়ত পড়ল না, জ্ঞান গেল না।

সহসা ভিতর দিকের পর্দ্দা সরিয়ে যশোধরা এলো।—'দাদা?' সবিস্ময়ে যশোধরা থমকে দাঁড়াল, তারপর নত হয়ে প্রণাম করলে।

তাকে দেখে গোবিন্দর দীর্ঘকাল আগের জননীর রূপ মনে পড়ল যেন।

গোবিন্দ তার মাথায় হাত দিয়ে বল্লে, 'ভাল আছিস্, সুনন্দ ভাল আছে?'

যশোধরা ঘাড় নাড়লে। ভাই-বোনের পুরাতন কথার উৎস যেন শুকিয়ে গেছে।

গোবিন্দ জিজ্ঞাসা করলে, 'সুনন্দ কোথায়? কখন আসে?' যশোধরা বল্লে, 'কোর্টে গেছেন। সন্ধ্যের পর ফেরেন ক্লাব থেকে।'—'তোর কি একটা বাচ্চা আছে না? তাকে আন্?' যশোধরা ছেলেকে নিয়ে এলো।

পরম সুন্দর হৃষ্টপুষ্ট শিশু বছর তিনেকের।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই মাতুলের সঙ্গে তার ভাব হয়ে গেল।

'কি নাম রেখেছিস রে? কে আছে এখানে? তোর শাশুড়ী কোথায়—আর ননদ?'

যশোধরা বল্লে, 'শাশুড়ী এখানে থাকেন না। নাম ওর এখনো কিছু হয়নি তুমি বলনা একটা। তুমি হঠাৎ এলে যে দাদা?'

'নাম তোরাই রাখ্, তোরা কত জানিস নাম। কিন্তু তিনি কোথায় থাকেন তাহলে তোর শাশুড়ী? আমি এম, এ, পরীক্ষা দেবো মনে করে এলাম।'

শাশুড়ীর কথায় যশোধরা অপ্রস্তুত হয়ে বল্লে, 'তিনি আলাদা থাকেন। আমাদের বিয়েতে তাঁর মত ছিল না, তাঁর ব্রাহ্ম ঘরের মেয়েতে ইচ্ছে ছিল। তাহলে তুমি পড়বে? বাবা মত করলেন?'

গোবিন্দ ভাগিনেয়কে নিয়ে খেলা দিচ্ছিল। কিছু বল্লে না।

এবারে সহসা যশোধরা বল্লে, 'দাদা, বাবা কেমন আছেন?'

এবারে গোবিন্দ এক মুহূর্ত্ত চুপ করে থেকে বল্লে, 'বাবা নেই।'

যশোধরা আস্তে আস্তে মাথাটি চেয়ারের ওপর নীচু করে নিলে। তার চোখ থেকে ফোঁটা ফোঁটা করে জল পড়তে লাগল।

গোবিন্দ নীরবে জানালার বাইরে চেয়ে রইল। সান্ত্বনার কথা, শোকের কথা, সমবেদনার কথা কিছুই সে বলতে পারল না। অনেকক্ষণ পরে যশোধরা মুখ তুলল। তারপর জিজ্ঞাসা করলে, 'দাদা, বাবা আমার কথা কি বল্লেন?'

গোবিন্দ একটু থেমে বল্লে, 'তিনি তো কোনদিনই বেশী কথা বলতেন না। কিছুই বলেননি।'

সে যশোধরার ছেলেকে কোলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল, বল্লে, 'আজকে যাইরে, আবার একদিন সুনন্দর সঙ্গে দেখা করতে আসব।'

দরজার কাছে খোকাকে কোল থেকে নামিয়ে গোবিন্দ রাস্তায় নেমে গেল।

যশোধরা উন্মন দৃষ্টিতে পথের দিকে চেয়ে রইল। জনক-জননী, গোবিন্দ-নারায়ণ সমস্ত সম্পর্ক সমস্ত অতীত যেন তার চোখের সামনে মুছে দিয়েছে কে। যেন সেদিকে কোন পথ নেই—কোন ক্রমেই আর কোনোদিন সেই পথে যাওয়া যাবে না। সে জননীর কথা, নারায়ণের কথা জিজ্ঞাসাও করতে পারল না—সে নিজের অতীতের কাছে যেন মৃত।

অনেক দূর গিয়ে সহসা পিছন ফিরে গোবিন্দ দেখল একবার—যশোধরা তেমনি চুপ করে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

নারায়ণ, বেণু ও চন্দ্রা

দীর্ঘ কুড়ি বছর কেটে গেছে। নারায়ণ এখন প্রৌঢ়ত্ব পার হয়ে গেছেন, বেণুগোপালের কোনো ভাগীদার নেই। চন্দ্রাবলীর বিয়ে হয়ে গেছে। রাইকিশোরী নিশ্চিন্ত। বেণুগোপালের বিয়ের কথা হচ্ছে। তা'হলেই সব হয়।

দ্বিপ্রহরে বাইরের আঙিনায় বুড়ো দ্বারবানের ঘরে এখনো, 'রামচরিত-মানস' পড়া হয় তেমনি। বৈকালিক সিদ্ধি ঘোটা হতে থাকে। তার সঙ্গে প্রাঙ্গণে প্রকাণ্ড একটা শিলে বাটা হতে থাকে 'ঠাণ্ডাই' (বাদাম, পেস্তা, খরমুজের বিচি) দুধ দিয়ে, সিদ্ধিতে মিশিয়ে বেণুগোপাল কুস্তির শেষে সবান্ধবে খাবে।

গরমে জল ছিটোনো খসখসের টাটি দেওয়া ঘরে ঘুম, শরতে তাস পাশা খেলা শীতে ঘুড়ি ওড়ানো ছাতে, কিম্বা খোস গল্প রোদ্রে বসে, আবার বসন্তেও তাস পাশা বছরের পর বছর একইভাবে ঘুরে যায়। মন্দির যত দিনের ভাবধারাও যেন তত দিনেরই, একইভাবে চলেছে। আয় ব্যয় আহার বিলাস সবই পুরাতন প্রথায় শুধু মাঝে কয়েক বছর মাত্র গোবিন্দের সময়ে অন্য রকম কিছু হয়েছিল।

পিয়ন এসে ডাকল, রেজেস্ট্রী আছে দুটো সই করে নিতে হবে। রামচরিত ছেড়ে মুন্সির দ্বারোয়ান উঠল। চিঠি? কার নামে? বেণুগোপাল গোঁসাই আর চন্দ্রা গোঁসাই? সই করে নিতে হবে। ঘুড়ি ছেড়ে বেণুগোপাল সবান্ধবে নেমে এল।

নারায়ণের কাছে খবর গেল রেজেস্ট্রী চিঠি বেণু চন্দ্রার নামে? কে পাঠাল? সই করা হল।

চিঠি এসেছে এক এটর্নীর আপিস থেকে কলকাতা থেকে।

বেণু ও চন্দ্রাকে পৃথক চিঠিতে একই কথা লেখা গোবিন্দ গোস্বামীর উইলের নির্দেশ অনুসারে তাঁর লাইফ ইনসিওরের দশ হাজার টাকা শ্রীযুক্ত বেণুগোপাল গোস্বামী আর চন্দ্রাবলী দেবীকে দেওয়া যাবে পাঁচ হাজার করে। সে বিষয়ে এটর্নীর আপিসে খোঁজ করলেই সব খবর জানানো হবে।

বেণুগোপালের কষ্ট করে লেখা পড়া শেখবার কিছু দরকার নেই, তাকে তার বন্ধু বান্ধব স্তাবকরা বুঝিয়ে ছিল। কষ্টে সৃষ্টে বাপের সাহায্যে তখনকার মত পাঠোদ্ধার হ'ল চিঠির।

নারায়ণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। উইল? দাদার উইল? তাহলে দাদা নেই? স্থবির বিশাখা এখনো বেঁচে আছেন। যশোধরার চলে যাওয়া—স্বামীর মৃত্যু তাকে কষ্ট দিয়েছিল মর্ম্মান্তিক। গোবিন্দর চলে যাওয়ার পরও তাঁর শান্ত সংযম ও ধৈর্য্য নষ্ট হয়নি।

আগে দু'তিনবার বহু পরে পরে দু' একদিনের জন্যই গোবিন্দ এসেছে মাকে দেখতে দেখা করতে। শেষ দিকে কয়েক বৎসর সে আর আসে নি, যেন মনে হত সে এলে রাইকিশোরী ও নারায়ণ বিচলিত হয়ে উঠ্‌তেন। চিঠিপত্র দিতেন জননীকে। নিয়মমত জননীর নামে মাসের পর মাস টাকাও এসেছে। কিন্তু বছর দুইয়ের বেশী হবে জননা আর যেন তেমন প্রকৃতিস্থ নেই, কানেও কম শোনেন, বোঝেনও কম।

নারায়ণের চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। ভাইয়ের কথা মনে পড়ে। মার সঙ্গে বসে একসঙ্গে গল্প করা—পিতার কাছে বসে কত রকম আলোচনা সব মনে পড়ে। তারপর? তারপর কি রকম অদ্ভুতভাবে সমস্ত ঘটনা মোড়ের পর মোড় নিল। যশোধরা গিয়েছিল সে আঘাত মা বাবার মনে কম লাগেনি। কিন্তু গোবিন্দের যাওয়ার কি দরকার ছিল······কেন গেল? স্পষ্ট কারণ ঘটেনি কিন্তু নিগূঢ় মর্ম্মান্তিক দুঃখময় সঙ্কোচে নারায়ণ যেন নিজের মনের কাছেও লুকিয়ে লুকিয়ে ভাবেন সেদিনের কথা····· দীর্ঘ সুন্দর দেহ দীপ্ত হাসি মুখ দাদা কিছু না বলেই কারুকে কোন অভিযোগ অনুযোগ না করেই পড়ার নাম করে চলে গেল, নিজের সম্পত্তিরই সমস্ত অধিকার ওকে ছেড়ে দিয়ে। তার নিজের দুর্ব্বলতা রাইকিশোরী ও তার বাপের প্রচণ্ড লোভ যেন দাদাকে নিরুপায় হয়ে—ঘর ছাড়া করল। কিন্তু দাদা কেন জোর করল না? মা কেন বল্লেন না? দাদা বিয়ে করুক আর না করুক দাদার অধিকার সে কেন ছেড়ে চলে গেল? নারায়ণ আজো বুঝতে পারেন না সে কথা। গোবিন্দ চলে যাওয়াতে রাইকিশোরী খুসীই হয়েছিল। তার পিত্রালয়ের লোকেরা নিশ্চিন্ত হয়েছিল। কিন্তু তিনি কেন আশ্বস্ত হয়েছিলেন?··· নিজের ওপর এতদিন পরে যেন কেমন বিতৃষ্ণা হয়, ধিক্কার আসে। অবুঝের মত প্রতিকার খুঁজে বেড়াতে চায় মন। কোনোদিনই বেশী খুঁটিয়ে ভাববার ক্ষমতা তাঁর ছিল না, কিন্তু বেদনাবোধও তার ছিল না। আজ এক অদ্ভুত ব্যাকুল দুঃখ তাঁর অন্তর মথিত করে তুলতে থাকে।

সহসা স্তব্ধ হয়ে মনে হল, এই প্রথম সর্ব্বপরামর্শদাত্রী রাইকিশোরীকে এই বিষয়ে তাঁর কোনো কথা জিজ্ঞাসা করার বা বলার ইচ্ছা নেই। বেণুগোপালের

কাছেও বিশেষ কিছু বলতে পারলে না। তাঁর এই শৈশবের বাল্যের যৌবনের সঙ্গী সাথীকে ওরা কেউ জানে না চেনে নি। কিন্তু শুধু কি ওরা? তিনিও কি চিনেছিলেন? ভোগাসক্ত লুব্ধ দীর্ঘ জীবন কাটিয়ে সহসা আজ নিরাসক্ত গোবিন্দর কাছে বিশাখার কাছে নিজেকে অপরাধী মনে হ'ল।

২

মাধব গোঁসাইয়ের ছেলে কৃষ্ণপদর সঙ্গে চন্দ্রাবলীর বিবাহ হয়েছিল। তারা এলো।

নারায়ণ জামাতার হাতে চিঠি দুখানা দিলেন।

চিঠি পড়া হলে সে রেখে দিলে। গোবিন্দকে সে দেখেছিল, তাঁর পাঠশালায় সেও ছাত্র ছিল। তার তাঁকে মনে আছে।

কিন্তু চিঠির এই খবর—এই পরিবারের কাছে,—তার কাছে, মৃত্যুর জন্য শোকের বা টাকার জন্য আনন্দের তা বোঝা গেল না। সে চুপ করে বসে রইল। ছোট সহরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কীয় জ্ঞাতি ও পরিবারের সব পারিবারিক বড় বড় ঘটনাই প্রায় সকলের জানা হয়ে যায়। কৃষ্ণপদরও অনেক কথাই জানা ছিল যশোধবার কথা, গোবিন্দর বিবাহ না করার কথা, তারপর গোবিন্দর চলে যাওয়া।

বেণু চুপ করেই বসেছিল, তার জ্যেঠাকে জানাই ছিল না। চন্দ্রাও নীরবে বসেছিল। সে যখন ছোট ছিল, তখনকার কথা পিতামহীর কাছে প্রতিবেশিদের কাছে শুনেছে।

আস্তে আস্তে পিতাকে সে বল্লে, 'তাহলে কি জ্যেঠামশাই বেঁচে নেই?'

নারায়ণ জামাতার দিকে চাইলেন। চিঠির অর্থ সে ভাল করে করতে পারবে। সে লেখাপড়া শিখেছে, পাশ করেছে, স্কুলে মাষ্টারী করে।

জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার কি মনে হয়?'

সে বল্লে, 'আপনারা ওদের আপিসে চিঠি লিখুন। নেইই মনে হয়, নইলে তারা টাকার কথা লিখবে কেন?—আর কোনো চিঠি-পত্র কেউ দেখেনি?'

বেণুগোপাল জবাব দিলে, 'কে লিখবে?—সেখানে আর তাঁর কে আছে।'

চন্দ্রাবলী বল্লে, 'কেন পিসিমা তো আছেন।'

রাইকিশোরী এসে দাঁড়ালেন, 'কার পিসিমা?'

বেণুগোপাল বল্লে, 'আমাদের পিসিমা।'

রাইকিশোরী জিজ্ঞাসুভাবে সকলের দিকে চাইলেন, তারপর বল্লেন, 'এতদিন পরে তাঁর নামে কি দরকার?'

আশ্চর্য্য, আজ আর বেণুগোপাল ভয় পেল না। নারায়ণও কিছু বল্লেন না। রাইকিশোরীর কথার জবাবে বেণুগোপাল শুধু বল্লে, দরকার একটু আছে। জ্যেঠার উপর মমতা বোধ না থাক, আজকের এই চিঠি তাঁর চলে যাওয়ার ইতিহাস তার কাছে অস্পষ্টভাবে কি ফুটিয়ে তুলেছিল যেন।

নারায়ণ ছেলের দিকে চেয়ে তারপর স্ত্রীর পানে চেয়ে শান্ত ভাবে বল্লেন, 'দাদার এটর্ণীর চিঠি এসেছে বেণু আর চন্দ্রাকে দাদা কিছু টাকা দিয়ে গেছেন।'

'গেছেন' কথাটা মানেই যেন যে দিয়েছে সে নেই।

রাইকিশোরী আশ্চর্য্য ভাবে চুপ করে গেলেন কিছুক্ষণের জন্য। তারপব বল্লেন, 'তিনি তাহলে মারা'ই গেছেন?'

শোক নয়, শোচনা নয়,—বেদনাবোধ নয়। শুধু হয়ত তাঁর মনে হ'ল লৌকিক কাজ, দায়, নিয়ম; হয়ত একেবারে নিশ্চিন্ত হলেন বিষয় সম্পত্তি সম্বন্ধে।

নারায়ণ ও বেণু সকলেই তাঁর দিকে চাইল, 'মারা গেছেন' কথাটা শুনে। নারায়ণ বল্লেন, 'ঠিক জানি না এখ ন। মাকে জানাবার দরকার নেই।'

কৃষ্ণপদর পানে চেয়ে বল্লেন, 'তাহলে কি করা যায়?'

সে বল্লে, 'আপিসে লেখা হলে সব জবাবই পাওয়া যাবে।'

রাইকিশোরী অবাক হয়ে নির্ব্বোধের মত দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর চির অনুগত স্বামী সন্তান আজ তাঁকে এবং তাঁর পরামর্শ ছাড়াই কাজ করছে।

চন্দ্রাবলী উঠে আসে পিতার ঘর থেকে। একবার দাঁড়ায় পিতামহীর কাছে গিয়ে। অদ্ভুত অব্যক্ত বেদনা তার গলার কাছে বাসা বেঁধে নেয়। যে দুঃখের ভাষা নেই, বিলাপ নেই, আলোচনা নেই। সবচেয়ে বড় দুঃখ এই একান্ত আপনার জন, সত্যিই মহৎ লোক, তাকে জানা হয় নি, চেনা হয় নি, কেউ তার কথা বলে নি। পিতামহীব মুখেই ব সেই তাঁর কথা তারা কি বা শুনেছে!

বিশাখা বুদ্ধিহীন স্মৃতিহীন লোকের মত প্রসন্ন স্মিত মুখে ওর দিকে চাইলেন, যেন ও কি বল্‌চে জানতে চাইলেন, আর তিনিও যেন সব বুঝতে পারবেন!

চন্দ্রার এবারে চোখে জল এলো। মনেহয়—লোকমুখে গল্পে শোনা, পিতামহীর রূপের কথা, বুদ্ধির কথা, [illegible]

সাধারণ সকলের মত ওরা—মা বাবার কাছে কোনো পুরানো স্মৃতির মধুর কাহিনী পারিবারিক কথা শোনেনি। ওরা শুধু শুনেছিল তাদের পিসিমার অসামাজিক বিয়ের কথা, পড়াশোনার কথা। যার জন্য বিশেষ ভাবেই তাকে লেখাপড়া শিখতে বাধা দিয়েছিলেন জননী।

রাত্রে শ্বশুর বাড়ী ফিরে আসে সে উন্মনাভাবে। ব্যক্তিগত শোক নয়, জানা লোকের কথা নয়, অথচ স্বামী স্ত্রী দুজনে ভাবে একই কথা। কেমন ছিলেন তিনি? কেন গেলেন? তাঁকে আঘাত করেছিল কেউ? না এমনি? তবে আর ফিরে আসেন নি কেন? তাঁর জননীও তাঁর কথা কেন বলতেন না? তিনিও কি বিয়ে করেছিলেন যশোধরার মত? তাহলে এ টাকা তো দিতেন না তারাই পেত।

সসঙ্কোচে চন্দ্রা কৃষ্ণপদকে জিজ্ঞাসা করে, 'তোমার মনে আছে তাঁর কথা—এই জ্যেঠামশাইয়ের কথা?' তার জ্যেঠামশাইয়ের কথা সে জিজ্ঞাসা করছে অন্য লোককে। কৃষ্ণপদ বুঝতে পারে যেন তার মনের কথা। বলে, 'একটু একটু মনে পড়ে। স্পষ্ট নয়—আমরা খুব ভালবাসতাম পাঠশালায় যেতে। অনেক ছেলেই প্রসাদ খেতে পাবার জন্যেই যেত। আমাদেরও বেশ লাগত।'

তারপর চুপ করে যায়। আরো অনেক কথা জানে, বড় হয়ে জেনেছে, চন্দ্রার সঙ্গে বিয়ে হবার আগে ও পরে। সেকথা রাইকিশোরীর ক্ষুদ্রতার নারায়ণের দুর্ব্বলতার কথা,—সেকথা বলা যায় না চন্দ্রাকে।

'কিন্তু পাঠশালা তো আমরা দেখিনি?'

'না, উঠে গিয়েছিল।'

'জ্যেঠামশাই উঠিয়ে দিয়েছিলেন?'

কৃষ্ণপদ বলে, 'ঠিক জানি না আমরা তখন ছোট।'

৩

জবাব এলো চিঠির এটর্ণীর আপিস থেকে।

কৃষ্ণপদ চিঠি পড়ে খবর বলে শ্বশুরকে।

মৃত্যু তাঁর হয়েছে। এবং অশৌচ শ্রাদ্ধের দিনও কেটে গেছে। তাহলে কোনো দায় কর্ত্তব্যও নেই! নারায়ণ দুঃখিত ভাবে চুপ করে থাকেন।

বেণুগোপাল বলে, 'কিন্তু আমাদের তো কিছু করা উচিত বাবা।'

নারায়ণ আশ্চর্য্য হয়ে চান তার দিকে। সে বলে, 'দিদি বলছিল সেদিন, আমরাই তো তাঁর ছেলেমেয়ের মত, তা আমরা কিছু করব না?'

নারায়ণ বল্লেন, 'বেশ। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখি যা বলেন তাই হবে।'

আন্তরিক ও পরম শ্রদ্ধা সহকারে উত্তীর্ণ দিন শ্রাদ্ধের দিন দেখা হয়। নিয়ম সামগ্রী যোগাড় করা হয়।

রাত্রে বাপের সঙ্গে বসে কথা কয় পরামর্শ করে ছেলেমেয়েরা। শোচনাময় বেদনায় তিনজন এক জায়গায় বসেন। হঠাৎ চন্দ্রা জিজ্ঞাসা করে, 'জ্যেঠা-মশাইয়ের পাঠশালা উঠে গেল কেন বাবা?' অতর্কিত আঘাত পেলে যেমন মানুষ কেমন যেন হয়ে ওঠে তেমনি নারায়ণের মুখটা ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌ল।

বেণুগোপাল বল্লে, 'আমার বন্ধুরাও ঐ কথা সেদিন বলছিল। তাদের কেউ কেউ ঐ পাঠশালায় পড়েছিল। কেন তুলে দিলে বাবা?'

সত্য কথা যদি সত্য করেই বলা যেত! কারুর দোষ না দিয়ে, কারুকে না বাঁচিয়ে নিজের দুর্বলতা দেখিয়ে! নারায়ণ বল্লেন, 'কি জানি, তখন বুঝতে পারলাম না। বাবা মারা যেতে তোমাদের মাতামহ এসে বারণ করলেন, বল্লেন অপব্যয় হচ্ছে বড়।'

বেণু চন্দ্রা একসঙ্গে বল্লে, 'তোমাদের বাড়ী অত ভাল কাজ দাদামশাই বারণ করলেন। তোমরা শুনলে কেন!' যুগধর্ম্মে তাদেরও মনে শিক্ষা অশিক্ষার ভালোমন্দ ভেদজ্ঞান জেগেছিল। তিনজনেই চুপ করে রইলেন!

বেণু জিজ্ঞাসা করলে, 'ইস্কুলটা কে করেছিল বাবা? জ্যেঠামশাই? তিনি অনেক লেখাপড়া জানতেন না?'

নারায়ণ বল্লেন, 'হাঁ। দাদাই করেছিলেন।'

'থাকলে ভাল হ'ত, আমরাও তাহলে হয়ত লেখাপড়া শিখতাম। ওরা সবাই বলছিল, এই আমার বন্ধুরা,' একটু অপ্রস্তুত ভাবে বেণু বল্লে।

নারায়ণও ঠিক ঐ কথাই বহুদিন ভেবেছিলেন, সত্যিই থাকলে ভাল হ'ত। হয়ত বেণুগোপাল পড়া-শোনা করত। আজ মনে হয়—কিন্তু তাঁরা তো তা চাননি। ঐকান্তিক ভাবে চেয়েছিলেন সম্পত্তিতে অধিকার ও সঞ্চয় ও একক ভোগ বিলাস। বিদ্যা দান, ভোজ্য দান, প্রসাদ বিতরণের কথা তাঁরা ভাবেন নি। গোবিন্দর কোনো রকম অধিকার থাক তা চান নি তার অধিকার সত্ত্বেও। এতদিনের পর এই বিষয়ে কোনো কিছুই বলবার নেই। সবই স্পষ্ট হয়ে আছে

সকলের কাছে। গোবিন্দ সেদিন কতখানি আঘাত পেয়েছিলেন, কেমন করে এমন নিরাসক্ত হয়ে চলে গিয়েছিলেন, সেকথা চুপি চুপি একাকী সঙ্গোপন মন তাঁর কখনো কখনো ভেবেছে স্পষ্ট নয়—অস্পষ্ট ভাবে। সে মন প্রকাশ্যে এই বঞ্চনাকে অস্বীকার করেছে, বঞ্চিতকে অস্বীকার করেছে। এতদিন পরে সেই বঞ্চনা অন্যরূপে স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল! বেণু বঞ্চিত হয়েছে জীবনের এক মহৎ সম্পদে। সেকথা আজ সে ভেবেছে। বলে ফেলেছে।

'আর করা যায় না বাবা ইস্কুল?' চন্দ্রা জিজ্ঞাসা করলে।

'ইস্কুল?' বলে নারায়ণ চুপ করে রইলেন।

বেণুও উৎসুক হয়ে চেয়েছিল। সে বল্লে, 'জ্যেঠামশায়ের নামে পাঠশালা একটা কর না বাবা?'

নারায়ণ অপ্রস্তুত ভাবে বল্লেন, 'কে পড়াবে?'

বেণুর চোখ নীচু হয়ে গেল।

৪

শ্রাদ্ধ ও চতুর্থীর জন্য নির্দ্ধারিত দিন এসে পড়ল।

বেণু ও চন্দ্রাবলী পিতাকে জিজ্ঞাসা করে, জ্যেঠামশাইয়ের ছবি আছে বাবা?'

'ছবি?' পিতা নির্ব্বাক হয়ে ভাবেন।

'কোনো ছবি নেই?'

'ছোট বেলার তোলা বাবার সঙ্গে একটা ছিল মনে হচ্ছে, কিন্তু সেকি আর আছে?' গোবিন্দ যাদের আদরের ছিল তাঁরা একজন নেই, অন্য জন ছবির অবস্থায়। তার বিয়ে হলে সব থাকত। নারায়ণ চুপ করে ভাবেন।

চন্দ্রা বল্লে, 'ঠাকুমার ঘরের বাক্সে দেখ্‌ব?'

'থাকতে পারে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করলে কি বলবে?'

'কিছু বল্‌ব না, পাইতো, দেখতে চেয়ে নেব।'

খাটো ধুতি, কালো বনাতের কোট, রেশমের ফুল কাটা টুপী মাথায়, পায়ে মোজা ও নাগরা পরা গায়ে রেশমী পাট করা চাদর দেওয়া পূর্ব্বগোঁসাই, গোবিন্দদের পিতা আর তাঁর কোলে হাত রেখে দাঁড়ানো দু ভাই বোন যশোধরা আর গোবিন্দের একখানি ম্লান বিবর্ণ হলদে হয়ে আসা ছবি পাওয়া গেল।

বছর আটের গোবিন্দর মাথায় জরীর টুপী, জরীর কাজ-করা মখমলের জামা, চুড়ীদার পাজামা, আর নাগরা পরা, আর যশোধরার ঐ ধরণেরই পোষাক পরা, তার উপর মাথায় বেণী, কপালে টীপ, চোখে কাজল, সর্ব্বাঙ্গে গহনা, পায়ে জুতার উপর মল পাঁইজোড়।

এই ছবি দেখে তারা এখনকার ছেলে মেয়ে, গোঁসাই বাড়ীর আবহাওয়ার মানুষ হলেও কয়েক দিন আগে হ'লে হেসে ফেলত। আজ আর হাসি এলো না তাদের, গম্ভীর নির্ব্বাক গভীর দৃষ্টিতে ভাই বোনে ছবির ভাই বোনকে দেখতে লাগল।

শিক্ষিতা স্বমত অনুসারিণী রূপবতী পিতৃস্বস, স্বেচ্ছায় অথবা অজানা কারণে দেশান্তরবাসী জ্যেষ্ঠতাত, যাদের এরা দেখেনি বল্লেই ঠিক হয়। মনে নেই, শোনা নেই, যাদের কথা, এই তারা। অন্যের কাছে স্বল্প শ্রুত, জননীর কাছে তিক্ত মন্তব্য শোনা, সহসা এত দিনের পর কৌতূহল শ্রদ্ধায় প্রশ্নে জিজ্ঞাসায় খুঁজে ফেরা এই তারা!

'বড় করা যাবে ছবিটা?' একজন জিজ্ঞাসা করে।

অন্য জন বলে, 'দেখা যাক দোকানে দিয়ে।'

মনে মনে কিন্তু যেন দুজনেই ভাবে, কি হবে, কি আর হবে। যারা নেই, যে নেই, এই তাদের সমাদর শ্রদ্ধা এ কি কোনোদিন তাদের কাছে পৌঁছবে! কেউ কি জানে! যদি জানানো যেত. যদি জীবিত কালে একবারও চেনা হ'ত!

বাপের কাছে গেল, ছবি পাওয়া গেছে।

রাইকিশোরী ছিলেন।

ভ্রূকুঞ্চিত করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ছবি কার? তারপর বল্লেন, 'কি হবে ছবি?'

বেণুগোপাল বল্লে, 'বড় করে—বাঁধিয়ে রাখব, যদি করা যায়।'

রাইকিশোরী কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর বল্লেন, 'তোমাদের দেখছি—খুব ভক্তি হয়েছে।'

বেণু ও চন্দ্রার মুখ লাল হয়ে উঠল। নারায়ণের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল, কি যেন বলতে গেলেন কিন্তু বলতে পারলেন না।

ক্ষুব্ধ ভৎসনা ভরা চোখে বেণুগোপাল জননীর দিকে চাইল।

রাইকিশোরী সে দিকে লক্ষ্যও করলেন না, বল্লেন, 'তা অত টাকা পেলে সকলেরই হয়।'

নারায়ণ একটু চুপ করে রইলেন।

তারপর বল্লে, 'সকলের হয় না। অন্তত: আমার তো হয়নি। দাদারই তো সব, কই আমি তো কোনো ভক্তি বা কৃতজ্ঞতা দেখাই নি কখনো।'

নারায়ণ 'আমরা' বল্লেন না। কিন্তু এই প্রথম শান্ত অথচ দৃঢ়ভাবে 'দাদারই তো সব' বলে যা বল্লেন, রাইকিশোরী অবাক হয়ে গেলেন, রেগেও গেলেন। কিন্তু কোনো কথাই জবাবে তাঁর মুখে এলো না।

৫

বিবর্ণ অস্পষ্ট হয়ে আসা ছবি বড় করা গেল না। চন্দ্রার চতুর্থীর আর বেণুগোপালের শ্রাদ্ধের আয়োজন সম্ভারে সাজানো আঙিনায় একটা চৌকীর উপর ফুলের মালা দিয়ে সাজানো সেই ছবিতে পিতার কোলে হাত রেখে দাঁড়ানো কৌতূহল ভরা উজ্জ্বল চোখ বালক গোবিন্দ হয়ত চন্দ্রা ও বেণুগোপালের দেওয়া জলপিণ্ড দান দেখল। হয়ত শুনতে পেল মন্ত্র—

"ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা"—

"আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্তং জগতৃপ্যতু।"

গল্প

আরাবল্লীর আড়ালে

রাজপুতনার ম্যাপ খুললে কিংবা ঐ লাইনের রেলওয়ের ম্যাপ দেখলে সেলাইয়ের ফুলকাটা কাজের মতন রেখাবলী এঁকেবেঁকে নগর, অরণ্য, নদী, বাঁধ, রেলপথ ঘিরে-ঘিরে চলেছে দেখতে পাওয়া যায়। সেই আরাবল্লীরই ছোট্ট কোলের শিশুর মত একটি গণ্ডশৈলের পাশের এক ক্ষুদ্র গ্রামে ধাপি জন্মেছিল।

বড় বোনের নাম ছিল মোহর, মেজো মেয়ের নাম হয়েছিল কেশর, সেজোর নামও ভালই রেখেছিল মা-বাপ—কস্তুরী ; কিন্তু এর বেলায় আর ধৈর্য রইল না তাদের জন্ম-মুহূর্তেই এর নামকরণ হয়ে গেল—ব্রাহ্মণ সজ্জন ছাড়াই। কে রাখল, কে বলল ঠিক বোঝা গেল না, কিন্তু নাম হয়ে গেল—ধাপি। ও-দেশের কোনো কিছু সুখ-দুঃখ যথেষ্ট হলে, বা পেট ভরে গেলে, গ্রাম্যভাষায় ওরা বলে 'ধাপ গিয়া।' অর্থাৎ যথেষ্ট বা ঢের হয়েছে। এক কথায় 'আর না' থাক্ ; আমাদের আন্নাকালী থাকমনির মত আর কি।

দূরে দূরে নীল পাহাড়ের শ্রেণীর নীচে বাজরা, যব গম ও ভুট্টার নীলাম্বিত ক্ষেত ; ছোট ছোট বালির পাহাড় আর গণ্ডশৈলের পাশে, ধূ-ধূ করা বালির মাঝে গণ্ডগ্রামগুলি ; কয়েক ঘর চাষী, কিছু অন্য জাতি—ক্ষত্রিয় রাজপুত নাপিত দারোগা কিছু বা ব্রাহ্মণ-বেনে ; মাটির দেওয়াল-দেওয়া খড়ে-ছাওয়া ঘর, বলদে জল-টানা গভীর অতলস্পর্শী কয়েকটি কূয়া, সকাল-সন্ধ্যায় তারই পাশে, জলার্থিনী কলসী-মাথায় নারীর ভীড়, পুরুষের তারই একান্তে তাম্রকূট সেবন আর সুখ-দুঃখের আলোচনা,—এই নিয়ে গ্রাম। ব্রাহ্মণ-বেনের (বৈশ্যের) সাধারণ ঘরের মেয়েদের গোল ভাবের শান্ত মুখ, প্রায়-ফরসা রং, ধীর চোখ, কোমল হাসি, অনতিদীর্ঘ দেহ ; আর রাজপুত-ক্ষত্রিয়ানীদের অবনীবাবুর রেখাটানা শক্তিমূর্তির মত লম্বা ধরনের মুখের তীক্ষ্ণ গঠন, কালো দীপ্ত দৃষ্টি, পাতলা বাঁকা ঠোঁট, উজ্জ্বল গৌর এবং দীর্ঘদেহ।

দারোগা জাতটা এদেরই ঘরের সঙ্কর। রাজপুত-ক্ষত্রিয় ঘরের দাস-দাসীর সন্তান অর্থাৎ ক্ষত্রিয় পিতার দাসীর সন্তান। এদের দারোগা বলে। বহুদিন ধরে ক্রমশ: এরাই একটা জাত হয়ে গেছে।

ধাপি ছিল এই দারোগা ঘরের মেয়ে। "যৌবনে বহু-পরিচর্যারত" ভর্তৃশালিনী কি ভর্তৃহীনা জানা নেই—এক পিতামহী বা মাতামহীর ক্রোড়ে যে ক্ষত্রিয় সন্তান

জন্মলাভ করেছিল সে তার পৈতৃক রক্তধারার রূপের বৈশিষ্ট্য পুরো পেয়েছিল। ধাপিরাও তার প্রসাদ থেকে বঞ্চিত হয়নি। কিন্তু সবচেয়ে বেশি প্রসাদ পেয়েছিল ধাপি। কোনো পূর্ব-প্রপিতামহীর রূপের আলো তার তনুটিকে যে অপরূপ দীপ্তি দিয়েছিল, পাশাপাশি কাছাকাছি আর কোনো গ্রামে বৈশ্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় দারোগা-ঘরে তেমন সুন্দরী আর কেউ ছিল না।

জন্ম-মুহূর্তে ধাপি নাম হলেও আদর করে রাঙা আঙ্‌রাখা রঙীন ঘাগরা কপালে টিপ মাথায় লাল সুতো দিয়ে বিনানো চোটি (বেণী), পায়ে মুবাঠি (মেল), কানে পিপ্পল পাতার ঝুমকো, গলায় বলেওড়া (রূপার মোটা হার) হাতে পৈঁছাকঙ্কণে তার সাজের ত্রুটি রাখেনি মা-বাপ-বোনেরা।

কূয়ার পাশে বাঁধানো প্রণালী, তার পাশে খেলী (ছোট চৌবাচ্চা), প্রকাণ্ড চামড়ার চড়শ (থলে) করে জল উঠে আসছে, আর প্রণালী বয়ে খেলীতে পড়ছে, তারপর চাষীর কাটা মাটির আল-বাঁধা পথে ক্ষেতে ক্ষেতে চলে যাচ্ছে। মাঝে-মাঝে গ্রামের মেয়েরা বাঁধানো প্রণালী থেকে মাটি বা পিতলের কলসে জল ধরে নিয়ে যাচ্ছে। অনেকে খাবার জল হাতে করেই ডোলে করে টেনে তুলে নিচ্ছে,—এই নিয়ম-বাঁধা দৈনিক কাজ।

কেশররা তিন বোন তিনটি চরি (পিতলের ও-দেশী কলসী) নিয়ে আসে। ছোট্ট একটি চরি'-মাথায় ধাপি'ও তাদের সঙ্গে আসে। গ্রামের বয়স্কা, প্রৌঢ়, বালিকা, তরুণী কলসী-মাথায় বাসন-হাতে সবাই আসে, শ্রেণী করেই দাঁড়ায় এখনকার 'কিউ'য়ের মতই। তার মাঝে গল্প হাসি কলহ কোলাহল সমান ভাবে চল্‌তে থাকে। যাদের হাতে বাসন থাকে, তারা খেলির পাশে মাজতে বসে। যারা জল ভরে তারা জল নিয়ে চলে যায়। নানা রকমের হলুদে নীল গোলাপী রংয়ের ওড়না, খয়েরী রঙের মোটা রেজা-র (খদ্দরের) ওপর সাদা ফুল ছাপা ঘাগরা, গায়ে নানা টুকরাজোড়া রঙীন কাঁচুলি, মাথায় বোরলা (রূপার পুঁটে, নারীর ভূষণ—কুমারী ও সধবা পরে), সর্বাঙ্গে ভারি ভারি রূপার গহনা, কারো বা সোনারও একটি-আধটি আছে; মাথার বিঁড়ের উপরি-উপরি কলসী বসিয়ে, লুগড়ি কোমরে গুঁজে অনায়াসে তারা আবার গল্প করতে করতে ঘরে চলে যায়।

সহসা একদিন গ্রামের টিমে তালের ছন্দ কেটে গেল। জল ভরতে গিয়ে মেয়েরা বেশী করে ঘোমটা টেনে দিয়ে আঙুলের ফাঁক দিয়ে একটি করে চোখ বার করে দেখতে পেলে, কূয়ার ধারের প্রকাণ্ড অশ্বত্থতলায় যেখানে পুরুষেরা

তামাক খায়, বিশ্রাম করে, সেখানে লাল রংয়ের আচ্‌কান-পরা কোমরে তক্‌মা আঁটা, হাতে রূপার আশাসোটা, মাথায় শহুরে রঙীন লহরিয়া (ঢেউখেলান) রংয়ের সাফা (পাগ্‌ড়ি) পরা দু'-তিন জন লোক এসে বসে গল্প করছে। দু'জন বর্ষীয়সী নারীও রয়েছে একটু দূরে আর একটা গাছতলায়।

মেয়েদের দেখে মেয়েরা দু'জন এদিকে এগিয়ে এলো। তাদের শহুরে সভ্য পরিচ্ছদ,—মল্‌মলের রঙীন ঘাগরা, হাল্‌কা পাতলা কাপড়ের চওড়া জরিপাড় লুগ্‌ড়ি (ওড়না) গায়ে, কাঁচুলির উপর সদ্‌রি (হাতওলা জরির কাজ-করা জামা), সর্বাঙ্গে সোনা-রূপার বিপুল ওজনের গয়না ঝল্‌মল্‌ করছে।

ঘোমটা যারা দিয়ে রইল তারা ঘোমটাও খুল্‌লো না, কথাও বল্‌লো না। কিন্তু তাদের আশপাশের বালক-বালিকা-শিশুর দল কয়েক মুহূর্তেই গ্রামে রটনা করে দিল—অজস্র গহনা-পরা, লহরিয়া রংয়ের পাগড়ি, লাল রংয়ের আচকান পরা নরনারী কারা এসেছে তাদের গ্রামে। তাদের সঙ্গে আশাসোটা শিঙাধারী চোপদার ও সঙীনধারী সেপাই এসেছে। মাঝে মাঝে তারা শিঙা বাজাচ্ছে। দেখতে দেখতে গ্রামের বর্ষীয়সী অর্ধবয়স্কা মেয়েদের সমাগম হতে লাগলো।

ধাপিরাও মাথার চরি হাতে নিয়ে এসে দাঁড়ালো। মলিন সবুজ আঙরাখি পরা, হলদে রংয়ের খদ্দরের ওপর সাদা বুটিদার মোটা ঘাগরা পরা ধাপিকে দেখা গেল। গ্রামে জল্পনা-কল্পনার আর শেষ রইল না। মেয়েরা বলাবলি করে,— আগন্তুকদের ওড়না ঘাগরার বিচিত্র রংয়ের কথা, গহনার গুরুভারের কথা, কাচের চুড়ির বাহারের কথা। গ্রামের বর্ষীয়সীরা সেই নবাগতা বর্ষীয়সীদের কাছে শুনে আসে দূর শহরের অপরূপ কথা; রাজঅন্তঃপুরের ঐশ্বর্যের কথা, সোনা রূপা হীরা মুক্তার ঝলমলে বসন-ভূষণ পরা রানীদের কথা, তাদের সখীদের কথা এবং আরো কত কি রহস্যময় জীবন-মৃত্যু-প্রেমের কাহিনী। যার কিছুটা ওরা বুঝতে পারে অনেকটাই বুঝতে পারে না, শুধু অভিভূত হয়ে শোনে। প্রকাণ্ড প্রাসাদের পর প্রাসাদ, অট্টালিক সৌধময় জনাকীর্ণ অপরূপ নগরী; যার পথ বাঁধানো, পথে শ্রেণীবদ্ধ আলো; গাড়ি-ঘোড়া তাঞ্জাম রথের পালকির শেষ নেই, সেখানকার মেয়েরা চিত্র-বিচিত্র নানাবিধ বসন, অলঙ্কারের বহুতর সুখের বিলাসের উপকরণে পরিপূর্ণ। সেখানে সব সময়ে সব পাওয়া যায়, দোকানে বাজারে সাজানো থাকে সব জিনিস, হাটের দিনের জন্ত কারুকে অপেক্ষা করতে হয় না। পুরুষেরা কত রকমের কাজ করে। শুধু চাষ-বাস? ছিঃ! কত লেখা-পড়ার কাজ, কাছারী, আদালত, মহকুমা আম (মহকুমা)। তাতে কত

লোক, কত মানুষ, কত জাতি ! ওরা ধবধবে সাদা রংয়ের সাহেব দেখেছে, ওরা ঘোড়া-গরুহীন হাওয়া গাড়িও দেখেছে, ওরা কতবার রেলগাড়িতে চড়েছে। ওদের দেশে নাটকঘর আছে, সেখানে বিলিতী ছবির ছায়াবাজী দেখা যায়। সবাই দেখে টিকিট কিনে। মেয়েরা ? শুধু জল তুলে গম পিষে রুটি গড়ে দিন কাটায় না। আটা কিনতে পাওয়া যায়। জল তোলাৰ্ লোক আছে। মেয়েরা বড় বড় ঘরে সবাই বসেই থাকে। শুধু বসে থাকে ? ইচ্ছা হলে গান গায়, পান খায়, শুয়ে থাকে, কিছু করে না, করতে হয় না। তারা নাটক দেখতে যায়, বেড়াতে যায়।

বিবরণের পর বিবরণ, কাহিনীর উজ্জ্বল বর্ণনা গ্রামটিকে কয়েক দিনের মধ্যেই মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলল। শ্রোত্রীদলের বর্ষীয়সীরা বাড়ী এসে গল্প শেষ করে প্রতিদিনই নিঃশ্বাস ফেলে ; বলে, 'তা আর কি আমাদের কখনও ও সব দেখা হবে ! এবং বালিকা কিশোরী তরুণী সব বয়সের মেয়ে সকলেই সে কাহিনী আরব্য উপন্যাসের মত বার বার শুনতে চায়। তাদের কৌতূহলের সীমা থাকে না সব কথা শোনবার জন্য। আর ? আর যদি কোনো দিন কেউ নিয়ে যায় সেই স্বপ্নের মত অপরূপ দেশে।

বড়রা বর্ষীয়সীরা গ্রাম্যবৃদ্ধারা অনুপস্থিত থাকলে, এরা বলে তাদের কাছে রাজ-অন্তঃপুরের কাহিনী, কত সখী, কত অপরূপ সুন্দরীর কথা—যারা কোনো দিন হয়ত রানীদের অতিক্রম ক'রে রাজার সুনজরে পড়বে। তার পর ? রহস্যময় ভাবে চোখ টিপে বলে—রানীরাও তাদের ভয় করেন ! তারা রাজার প্রিয়পাত্রী পরম আদৃতা, তারা খোজাদেরও শাসন করে—কখনো কখনো। তাদের গায়ে রানীদের মতই গহন', পায়ে সোনার মল, মুরাঠা পাঁয়জোড়।

অবাক্-বিস্ময়ে শ্রোত্রীদের বাক্যস্ফূর্তি হয় না। সোনার মল, পাঁয়জোড় ? সোনার জিনিস তো পায়ে পরে না কেউ। স্যাকরাদের মেয়ে মনফুলী বিজ্ঞভাবে বলে, 'কই, সোনা তো এখানে 'পাটেল'জীর বাড়ির মেয়েরাও পায়ে পরে না, তারা তো খুব বড়লোক ! সোনা পায়ে পরতে নেই।'

শহরবাসিনীরা হেসে উঠে বিদ্রূপ ক'রে বলে—'বড়লোক ! পরতে নেই ! পাটেলজী ! চল না তোরা আমার সঙ্গে, আমি তোদেরই একদিন সোনার মল পরাব। তাজিমী দিয়ে রাজা নিজের হাতে সোনা পরিয়ে দেন তাদের পায়ে। কত সুন্দর মেয়ে আমরা নিয়ে গেছি। ঐ তো সরবতী বাঈ—সে পাত্রী থেকে পর্দায়েত হল আমাদেরই সামনে। এখন সোনার মল পায়নি ? মহারাজা তাকে

দেখে উঠে দাঁড়ান, রানীদেরও দাঁড়াতে হয়, হু'জুর লালজী সাহেবের মা সে! তার কত সন্মান, তাজিমী পেয়েছে, তার আলাদা রাওলা (মহল) গাড়ি পালকি রথ। ছিল তো তোদেরই মত গেঁয়ো মেয়ে। কপাল ফিরে গেল না তার? শহরের জান্‌তো কি?'

মনফুলী, ঘিসি, ধাপি, কেশর, কাবেরী সব অবাক হয়ে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকে। মৃদু হেসে একজন শহরবাসিনী বলে, 'তোরা যদি যাস তো আমি নিয়ে যাব।'

আশা আকাঙ্ক্ষা কৌতূহলে বালিকারা মূক মূঢ় হয়ে যায়! যদি? যদি যেতে দেয় মা-বাবা; উৎকণ্ঠিত বালিকারা জিজ্ঞাসা করে, 'কবে ফিরে আসতে পাবে যদি যেতে পায়?'

শহরবাসিনীরা অট্টহেসে ওঠে—'ফিরে? ফিরে এসে কি হবে? তখন রানীদের মত নিজের মহলে থাকবি, তোদের তালুক-মুলুক হবে, হুজুর সাহেব তোদের রাওলায় এসে বসবেন কত দিন, তোদের ছেলেমেয়ে হবে, ছেলে লালজী হবে, মেয়ে বাঈজী লাল হবে। ফিরবি কি জন্য এই ধূ-ধূ করা বালিভরা পাহাড়ে মরুভূমির দেশে?'

কেশর কাবেরী নতমুখে বসে থাকে। তারা বড় হয়েছে। কিছু যেন বুঝতে পারে ভিতরের কথা।

কিন্তু শহরবাসিনীরা ওদের দিকে চেয়ে বলে, 'ওদের নেব না। ওদের বিয়ে হয়ে গেছে যে। আমরা সুন্দরী কুমারী মেয়ে খুঁজছি। তারা ধাপি, মনফুলী, ঘিসিদের দিকে চায়। 'আমরা বিয়ে হওয়া মেয়ে নিই না,' আবার বলে।

আশা-উৎকণ্ঠায় ধাপি মনফুলী চঞ্চল উদ্বেল হয়ে উঠে। ওরা কুমারী, এখনো বিয়ে হয়নি সৌভাগ্যক্রমে।

আর কাবেরী কেশরও যেন মনে মনে একটু নিরাশ হয়ে যায়, কি আকাঙ্ক্ষা যেন কিসে প্রতিহত হয়ে গেল। সোনার মল? গহনা? অথবা অপরূপ না-দেখা শহরের জন্য? কিম্বা নাটকঘর, হাওয়া-গাড়ি?

সহসা একদিন গ্রামের লোকেরা শুনলে, যারা এসেছিল তাদের সঙ্গে গতরাত্রের শেষ প্রহরে যখন গ্রামের সকলে ঘুমোচ্ছিল তখন মনফুলী ধাপি আর মনফুলী ধাপির বাপ শহরে চলে গেছে!

ধাপির মা-বোনেরা কিছুই জানে না, মনফুলীর বাড়ির কেউ জানে না।

সমস্ত গ্রাম যেন মূঢ়স্তব্ধ হয়ে গেল।

ধাপির মা হতবুদ্ধির মত কোলের ছেলেটিকে স্তন্যপান করায়, তার ওপরের মেয়েটিকে নিয়ে বসে থাকে। মেয়েরা,—কেশর মোহর রুটি গড়ে, ভাই-বোন মাকে খেতে দেয়। মা অন্যমনে একটু মুখে দেয় আর উন্মনা ভাবে চারিদিকে তাকায়, কি ভাবে মুখে কিছুই বলে না। কয়েক দিন পরে ধাপির ও মনফুলীর বাবা শহর থেকে ফিরে এলো। শহর দেখার গর্বে উৎফুল্ল এবং কন্যাদের ভাবী কালের সৌভাগ্য আশায় গর্বিত তাদের মুখে দরিদ্র গ্রামের কৌতূহলী সকলে ঈর্ষাকাতর হয়ে, বিতৃষ্ণাভরে উদাসীন ভাবে শুনল, যারা এসেছিল তারা ধাপিকে রাজ-অন্তঃপুরের জন্য নিয়েছে, ওকে দু'শো টাকা দিয়েছে। আর মনফুলীর জন্য একশো টাকা দিয়েছে।

ভিড়ের মধ্যে থেকে কে বল্লে, 'তুমি বেচে দিলে তোমার মেয়ে ?'

ক'দিন শহরে থেকে, গতরাত্রে 'কলালে'র দোকানে পান আহার করে তাদের আমিরী মেজাজ তিক্ত হয়ে উঠল এ কথায়। মনফুলীর বাবা বললে, 'বেচব কেন ? এত দিন মানুষ করিনি? তার তো খরচ লেগেছে। হুজুর সাহেব অমনি-অমনি নেবেন কেন ?'

কন্যা-গর্বে গর্বিত ধাপির বাপ বললে, 'গাঁয়ে তো কত মেয়ে রয়েছে তা আর কারুকেই নিল না কেন ?'

ঐশ্বর্য্য বিলাসহীন নিতান্ত দরিদ্র গ্রামের অধিবাসীরা ক্রমে ক্রমে ঘরে ফিরে গেল, আর বিশেষ কিছুই বললে না।

ছোট্ট পাহাড়ের পিছন দিকে সূর্য অস্ত গেল, সঙ্গে সঙ্গে শহরের দিকের রেলগাড়িখানা দূরের বড় গ্রামের স্টেশন পার হয়ে চলে যাবার ঝিক্‌ঝিক্ শব্দ মিলিয়ে গেল। গ্রামবিচ্ছিন্নাদের অনাগত ভাবী কালের ঐশ্বর্যময় বিলাস-বাসনময় দিনের আশার স্বপ্ন যেন ঐ শব্দে নিস্তব্ধ গ্রামের অন্তর মথিত করে তুলতে লাগল। যেন তা সুখ নয়, যেন তা দুঃখও নয়, তারও চেয়ে গভীর কিছু। যেন চিরন্তন মূঢ় শূন্যতাময় অন্ধ বিরহ-বেদন। আর মাটির দেওয়ালে খড়ের চাল দেওয়া ছোট্ট ঘর দু'খানিতে মা-বাপের কাছে ভাইবোনদের মাঝে শুধু দুটি ছোট জায়গা চিরদিনের মত নিশ্চিহ্ন ভাবে খালি হয়ে গেল। তাদের মূঢ় মূক জননীরা তাদের খাবার থাল পেড়ে নিয়ে আবার তুলে রাখে, শোবার জায়গা বাড়তি হয় সেদিকে উন্মনা হয়ে চেয়ে থাকে। স্ত্রীর দিকে চেয়ে ধাপির বাবা বসে তামাক খেতে খেতে,—'এখন তো পাত্রী হবে', ব্যাখ্যা করল—'এই ছোট মেয়ে নাচ গান শিখলে তাদের পাত্রী বলে। তারপর চাই কি হুজুর সাহেবের নেক

নজরে পড়লে পর্দায়েত হয়ে যাবে। তারপর জোর-কপাল হলে মেয়ে আমাদের পাশোয়ান হবে। পর্দায়েত হল পাশোয়ানের চেয়ে একটু নীচে, পাশোয়ান রানীর পরেই। সরস্বতী বাঈ এখন 'প্রেম-রায়' খেতাব পেয়েছে—পাশোয়ান হয়ে গেছে।'

ধাপির মার চোখ দিয়ে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে আসে, সে কিছুই বলতে পারে না। ঐশ্বর্য-বিলাস-আকীর্ণ ওর একান্ত অজানা সেই সুখ-ব্যসনের কোনো কল্পনা তার মনে জাগে না, শুধু ধাপির মুখ, হাসি আর কথা তার মনে পড়ে।

বহু বৎসর কেটে গেছে—প্রায় দশ বছর। ছোট লাল কুর্তা আর লাল চুড়িদার পাজামার ওপর ওড়না। পাত্রীদের নির্দিষ্ট পোশাক-পরা ধাপির বালিকা-তনুদেহ ক্রমে ক্রমে অপরূপ হয়ে বিকশিত হয়ে উঠেছে। মেয়েরা সখীরা দেখে মুগ্ধ হয়। সর্দার খোজা 'খুশ নজরজী'র মনে একটা অপূর্ব স্নেহ আর অদ্ভুত ভয়ভাবনা জাগে তার জন্য। এত রূপ। রানীদের পাশোয়ানদের ঈর্ষাতিক্ত দৃষ্টি অতিক্রম করে যায়নি। সকলের চোখ পড়েছে সেদিকে, কেউ বা মুগ্ধ হয়ে দেখেছে, কত জন বা তিক্ত, কত জন ভীত-শঙ্কিত চোখে দেখে তাকে—পাছে রাজার মুগ্ধ দৃষ্টিও তার ওপর পড়ে কোনো দিন, আর তারা তাদের বহু-মানসমাদৃত স্থানভ্রষ্ট হয়।

বিরাট অন্তঃপুর। জনাকীর্ণ। শুধু মেয়ে কিন্তু। দাসী, সখী, সেবিকা, সহচারিণী, প্রতিহারিণী, সব মেয়ে—যেন অসংখ্য। তিন রানী—তাঁদের এক একজনের এক এক প্রাসাদ। তাঁদের পিত্রালয়ের সখী দাসী, রানীত্ব লাভের পর পতিগৃহের সখী সেবিকাতে নিজ নিজ অন্তঃপুর পরিপূর্ণ। এ ছাড়া পাশোয়ান পর্দায়েতদের রাওলা (মহল) ভরা দাসী সহচারিণী।

পুরুষ শুধু রাজা। এবং লালজী সাহেব দু'জন,—প্রেমরায়ের ছেলে। অবশ্য তাদের শুধু খুশ নজরজীর অনুমতি নিয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশের যাতায়াতের অধিকার আছে মাত্র।

মাঝে মাঝে জলসা হয়। উৎসব-প্রাঙ্গনে নাচ-গান-অভিনয় হয়। রাজার সুবর্ণখচিত আসন পড়ে,—তারপর পদানুসারে মহারানীর পর অন্য রানী, পাশোয়ান, পর্দায়েতদের আসন পড়ে। তারপর নিমন্ত্রিত অভ্যাগতদের, সমাগতদের আসন থাকে। একের পর এক নাচের দল, গান গেয়ে নেচে চলে যায়।

রাজার সামনে থাকে রূপার থালায় মধুর মদির পানীয়, তার জন্ত ছোট ছোট কাচের গেলাস, তবকে-মোড়া পান, লবঙ্গ, এলাচ।

কোন্ পুরাকালের প্রথামত মহারানী পানীয় প্রথমে ঢেলে দেন মহারাজার গ্লাসে, তারপর সেটা রাজার ওষ্ঠ-পৃষ্ঠ হয়ে রানীর অধর-স্পর্শ লাভ করে। তারপর একে একে অন্ত রানী, পাশোয়ান, পর্দায়েতদের এবং লালজীদের মধ্যে ঘুরে আসে।

নাচের গানের—বারবার পুনরাবৃত্তি ও পানীয় পাত্রের একইভাবে মুখে মুখে আবর্তনে রাত্রির প্রহরের পর প্রহর কেটে যায়।

সেদিন জলসা প্রেমরায়ের মহলে। প্রেমরায়ের পাত্রীর দলের মধ্যে সহসা দেখা যায় ধাপিকে। মদিরামুগ্ধ রাজা সখীদের দিকে চেয়েছিলেন। সহসা প্রেমরায় মহারানীর আসনের কাছে এসে নত হয়ে কুর্নিশ করে—কিছুক্ষণের জন্ত অন্তত্র যাবার আবেদন জানালেন। নিয়মিত সঙ্গে সঙ্গে সখীর দলও চকিত হয়ে উঠে দাঁড়াল তাঁর অনুসরণ করার জন্তে।

খুশ্ নজরজী এসে দাঁড়ালেন প্রথানুসারে প্রত্যাগমনের জন্য, তারপর মুহূর্তের জন্ত তার মাঝে চকিতের মত ধাপিকে দাঁড়ানো দেখা গেল। চাঁপা ফুলের মত উজ্জ্বল রং, কালো চুলে ঘেরা অপূর্ব সুন্দর মসৃণ পরিচ্ছন্ন কপাল, সফরী-নেত্র, চমৎকার টুকটুকে দুখানি ওষ্ঠাধর সহসা যেন ঝকমক করে উঠল ঝাড়-লণ্ঠনের আলোয় এবং নিমেষের মধ্যেই আর তাকে দেখা গেল না। সকলের আড়ালে মিলিয়ে গেল। প্রেমরায়ও দেখতে পেলেন তাকে ঐ এক মুহূর্তেই।

মহলে এসে প্রেমরায় ডাকলেন, 'গোদাবরী বাঈ।'

ধাপি এসে কুর্নিশ করে সামনে দাঁড়াল। রাজ-অন্তঃপুরে এসে ধাপির নাম হয়েছিল, গোদাবরী। ধাপি নামটা গ্রাম্য।

'তোমাকে বারবার বলেছি না', তুমি হুজুর সাহেবের জলসায় যাবে না?' প্রেমরায় গম্ভীর মুখে প্রশ্ন করলেন। ফর্সা রং আসব ও ক্রোধের উত্তেজনায় লাল হয়ে গেছে—মুখের ভাব তিক্ত বিরাগে হিংস্র ঘৃণায় ভরা।

'আমি চাই না, তোমাকে হুজুর সাহেব দেখতে পান।' তারপর খানিকক্ষণ কি ভেবে বললেন, 'আচ্ছা আর তোমাকে দেখতে কখনো কেউ পাবে না।' প্রধান সখী বাড়রণজীর দিকে চেয়ে বললেন, 'ওকে বাঁদা কুইদের একটা ঘরে রাখগে।'

এক মুহূর্তের মধ্যে সব ঘরখানা আড়ষ্ট হয়ে গেল। দীর্ঘকালের মধ্যে

কোনো বাঁদীর এমন শাস্তি ওরা দেখেনি। সহসা দ্বারের কাছে বৃদ্ধ খুশ্‌নজরজীকে দেখা গেল, তিনি অতর্কিতে নিয়মবিরুদ্ধভাবে 'কাকে?' জিজ্ঞাসা করেই কৌতূহল সম্বরণ করে জানালেন, 'হুজুর সাহেব সেলাম দিয়েছেন।'

প্রেমরায়ের কঠিন মুখ কঠিনই রইল। শুধু শান্তভাবে 'যো হুকুম' বলে তিনি খুশ্‌নজরজীর অনুগমন করলেন।

দুর্গ-পরিখার নাম 'তালকটোরা'। অর্থাৎ যে তটিনীর আকার বাটির মত। বহু কালের জমা জলে স্রোতহীন গভীর হ্রদ—নদী নয়। বর্ষার কূলে কূলে পূর্ণ হয়ে ওঠে, গরমে শুকিয়ে কোথায় নেবে যায়, শীতে স্থির শীতল মুখে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে প্রাসাদের ছায়া বুকে নিয়ে। অসংখ্য কুমিরে সমাকুল। তারাও বর্ষায় ভেসে বেড়ায়, কখনো গরমে কাদার মধ্যে লুকিয়ে থাকে, শীতে পরিখা-কিনারে স্থিরভাবে রৌদ্রে শুয়ে থাকে।

দুর্গতল বর্ষায় পরিখার সঙ্গে প্রায় সমান সমতল হয়ে যায়। সেদিন প্রাসাদের নীচের ঘরগুলিতে জল ভরে যায়। বহু গ্রীষ্মের বিলাস-শয়নাগার, দাসী-বাঁদীর গ্রীষ্মের শোবার ঘর, থাকার ঘরও ঐ গৃহশ্রেণীর মধ্যে পড়ে।

তারি মাঝে আছে বন্দিশালা। নিরপরাধ, নিরীহ অপরাধিনীদের নির্বিচার কারাগৃহ। প্রধান অপরাধ—যাদের রূপের প্রতিদ্বন্দ্বিতা অথবা কণ্ঠের সুরের শ্রেষ্ঠতা; অথবা অকারণ বিঘ্নকারিতার অপরাধ তো আছেই। সলিটারি সেলের মত যেন!

এখনো লাল চুড়িদার কুর্তা ওড়না-পরা স্বল্পপরিণত কিশোর তনুশালিনী সামান্য পাত্রী মাত্র—সখীও নয়, বহু আকাঙ্ক্ষিত পর্দাতে তো নয়ই,—ধাপি ওরফে গোদাবরী বাঈ পুরানো সখীর হাত ধরে গ্রাম থেকে অজানা-পথে প্রাসাদে আসার পর আজ আবার নতুন করে আর এক না-জানা পথে ধীরে ধীরে নেমে গেল। সব সঙ্গিনী দাসীরা এক মুহূর্তেই ওদের দেখে সরে গেল। সমবেদনায় সাহস তাদের নেই, কথা বলার ভরসা নেই, আতঙ্কে সকলে যেন ভোজবাজীর মত মিলিয়ে যেতে লাগল।

নির্জন অজানা গলি সুড়ঙ্গ পথ অতিক্রম করে যন্ত্রচালিতের মত কত সিঁড়ি কত নীচু গড়ানে পথ বেয়ে ধাপি নেবে এলো।

সারি সারি ঘর! দিনেও অন্ধকার যেন। উপরে অনেক উঁচুতে ছোট ছোট জানালার মত আছে। বর্ষায় সেখানে জল পৌঁছায় না।

ঠাণ্ডা ঘরের মেজেতে দু'খানা চট একটা কম্বল পড়ে আছে। ধাপিকে

সেখানে হাত ধরে বসিয়ে দিয়ে বড়ারণজী বললে, 'সন্ধ্যে বেলা আলো দিয়ে যাবে আর খাবারও পাবি ঠিক সময়ে।'

ফ্যালফেলে হতবুদ্ধি হরিণের মত কালো চোখ দুটি মেলে সে চেয়ে রইল তার মুখপানে, কিছুই কথা বলতে পারল না। হয়ত বড়ারণের করুণা হ'ল, তার মুখ দেখে বললে, 'ভয় নেই, আমি আসব আবার।'

সিঁড়ি দিয়ে সে ওপরে উঠে গেল। দরজা বন্ধ হয়ে গেল। অভিভূত ধাপি অশ্রুহীন চোখে শুয়ে থাকে। সহসা কিসের শব্দে ঘুম ভেঙে যায় তার। দেখে—সামনে দু'খানা রুটি, এক ঘড়া জল আর একটি প্রদীপ রেখে গেল একজন দাসী। চেয়ে দেখলে ওপরের আলোও আর নেই। অকস্মাৎ তার মনে পড়ে যায়, সে একেবারে একা। এই গৃহ-শ্রেণীর মাঝে কোথাও কেউ নেই। এবং বহু কাহিনী আশেপাশে থমথম করছে। একদা যারা এখানে ছিল আর কোনখানে যেতে পারেনি, তাদের কথা মনে করে তার সর্বাঙ্গে যেন কাঁটা দেয়। নিস্তব্ধ ঘরের আশে-পাশে কোনখানে মানুষের সাড়া নেই, জীবিত জীবের সংস্পর্শ নেই।

ধাপি রুটি খেতে পারে না, গলা কাঠ হয়ে গেছে, জল খায় শুধু। তারপর প্রদীপটা বাড়িয়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে থাকে। পিঠে দেওয়াল থাকে আর আশপাশে সামনে বারবার চায়। তার চীৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে হয় কিন্তু কণ্ঠস্বর তার একেবারে বসে গেছে যেন।

সারারাত সে জেগে বসে থাকে। মাঝে মাঝে ঘরের পাশে পরিখায় জলের শব্দ হয় ছলাত ছলাত করে, তার মনে হয় যেন তালকটোরার জলটা তার জীবিত সঙ্গী।

সকালবেলা রুটি নিয়ে বড়ারণ এলো। ভয়ে অনাহারে অনিদ্রায় প্রেতের মত ধাপিকে দেখে সে হতবুদ্ধি হয়ে গেলো, বললে, 'তুই খাসনি কেন?' আজ এই সামান্য কথাই সহসা যেন ধাপিকে সাহস দিল। সে বড়ারণের পায়ে লুটিয়ে পড়ল। কাঙালের মত বললে, 'আমাকে আমার মার কাছে পাঠিয়ে দাও বড়ারণজী। আমি আর কখনো এখানে আসব না, হুজুর সাহেবের সামনে বেরুব না।'

বড়ারণ বললে, 'তোকে পাঠালে যে আমার গর্দান যাবে, নইলে আমি কি মানুষ নই, তোর মত বাচ্চাকে এই কয়েদঘরে রাখি! আচ্ছা তুই খা তো, দেখি তোর মাপ হয় কিনা।'

ধাপি আকুল হয়ে কাঁদে শুধু। খাবারের দিকে ফিরে চায় না। যায়

কোনো সভ্য সমৃদ্ধ শোভা নেই, অলঙ্কার নেই, সেই ছোট গ্রাম আর জননীর শান্ত মুখ তার মনে পড়ে।

রাত্রির পর দিন আসে। কত দিন কত রাত্রি গেল, ধাপি জানে না। দিন দিন সে শীর্ণ হতে শীর্ণতর হয়ে যায়—দিনের বেলায়ও সে কোনো দিকে চায় না, ভয় করে। কোনো দিন এক টুকরা রুটি খায় কোনো দিন খায় না।

সহসা একদিন সকালে এলেন খুশ্‌নজরজী বড়ারণের সঙ্গে, ধাপিকে দেখে হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। সে ঘুমোচ্ছিল—পাঙাশ মুখ যেন মৃতের মত।

করুণাভরে ডাকলেন, 'বাঈ, গোদাবরী বাঈ।'

রাত্রির বিনিদ্র-ক্লান্ত আরক্ত চোখ মেলে সে বললে, 'জী।'

খুশ্‌নজর বললেন, 'আমার কাছে যাবে? আমি নিয়ে যেতে পারি, হুকুম পেয়েছি।'

সে চোখ বুজেছিল আবার, একটু হেসে চোখ বুজেই বললে, 'জী', অর্থাৎ আচ্ছা। বড়ারণ তাকে বললে, 'ওঠ্‌ সেলাম কর।' সে কথা কইলে না। খুশ্‌নজর ওপরে উঠে গেলেন, বললেন, 'কাল ওকে নিয়ে যাব।'

সকাল হল। সিঁড়ির মাথায় লোহার দরজা খুলে গেল।

বহু মিনতি করে আজ মনফুলী ওদের সঙ্গে এসেছে। তিনজনে নেমে এলো। ধাপির ঘরে কাল আর প্রদীপ জ্বলেনি, যেমন তেমনি তেলে ভরা রয়েছে। রুটি পড়ে আছে শুধু জলের ঘটিটা গড়িয়ে গেছে ঘরের এক দিকে।

ধাপির আজ আর ঘুম ভাঙল না।

রচনাকাল—১৩৫২

খুশ্‌নজরজী

রাজার 'সালগিরা' অর্থাৎ জন্মতিথি উৎসব এসে পড়েছে।

মাজী সাহেবদের (রাজমাতাদের) প্রাসাদ থেকে অন্তঃপুরের মহারাণীর প্রাসাদ, অন্য রাণীদের সৌধ অট্টালিকা প্রাসাদ পর্দাবেত পাশোয়ানদের মহলে নাচ-গান পান-ভোজনের নানা তালিকায় উৎসব সুরু করার যোগাড় হচ্ছে। পর্দার খোজা খুশ্‌নজরজীর কাজের ভিড়ের শেষ নেই।

ক্ষীণকায়, বার্দ্ধক্যে শীর্ণ ঈষৎ আনমিত দেহ খুশ্‌নজরজী অন্তঃপুরের পর অন্তঃপুরের—প্রাসাদের পর প্রাসাদের মহলের পর মহলের অলি-গলি সুড়ঙ্গ-পথ দিয়ে চলেছেন, সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছেন পোষ্যপুত্র খুদাবক্স।

খুশ্‌নজর ওঁর নাম নয়, 'খুশ্‌নজর' খেতাব ; যার অর্থে, যাকে দেখলে চক্ষু প্রীত হয়। নাম ওঁর আল্লাবক্স। দীর্ঘ কাল আকৈশোর বা আবাল্য রাজদরবারের অন্তঃপুরের সমস্ত তত্ত্বাবধান করেছেন ; রাজার প্রিয় প্রয়োজনীয় বহু কার্য্য সম্পন্ন করেছেন ; এবং অন্তঃপুরিকাদের—প্রাসাদবাসিনীদের তেমনি কারণহীন অপ্রীতিকর কর্ত্তব্যও বহু করতে হয়েছে। পুরস্কার-স্বরূপ বার্দ্ধক্যের সীমায় এসে রাজদরবার থেকে যার জন্য খুশ্‌নজর খেতাব লাভ করলেন, আর 'খেলাত' পেলেন বছরে তিন হাজারের জায়গীর। হয়ত রাজার জন্মতিথির আগামী উৎসবে 'তাজিমী'র সম্মানও পাবেন। 'তাজিমী' অর্থে রাজাকেও তাজিমীপ্রাপ্তদের জন্যে উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান ও সমাদর জানাতে হয়।

মহারাণীর অন্তঃপুরের প্রয়োজনীয় কাজ শেষ হ'ল। মাজী-সাহেবের প্রাসাদেও পুত্রের জন্মতিথি উৎসবের নিয়ম-অনুষ্ঠান পূজাপাঠ মিষ্টান্ন পাঠানোর সব ব্যবস্থা করা হল। বাকি অন্য রাণীরা এবং 'পর্দায়েৎ' 'পাশোয়ান'। যাঁরা কেউ কেউ এবারে রাজার কাছে 'তাজিমী' পাবেন, সোনার মল পাঁইজোরএ ভূষিত হবেন। কেউ বা জায়গীরও পাবেন। যার কথা কেউ জানে না, কেউ বা আভাস মাত্র জানে, এ সব বিষয়ের আভাস সকলের আগে 'খুশ্‌নজরজী'ই পান। অন্তঃপুরের কখন কার ভাগ্যে মালা আছে, কার ভাগ্যে জাল' সে শুধু একটুখানি খুশ্‌নজরজীই বলতে পারেন।

মহলের পর মহল অতিক্রম করে যান খুশ্‌নজরজী। কোনোখানে শুধু নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ করে চলে যান, কোনোখানে ছোট-বড় ষড়যন্ত্র-তোষামোদের কাহিনীও গোচরে আসে। আর আশে-পাশে ঘিরে দাঁড়ায় নানা রঙের ওড়না কুর্ত্তা পাজামা-পরা পরম রূপবতী, সুশ্রী, টানা চোখে সুরমা-কাজল আঁকা বালিকা পাত্রীরা, বিচিত্র ঘাগরা ওড়না-পরা একটু বড় বয়সের তরুণী যুবতী সখীরা। কেউ-বা রাজার চোখে কখনো পড়েছে, কখনো অগোচরেই রয়ে গেছে। আজন্ম আবাল্য অন্তঃপুরবাসিনী, একান্ত নারী-জগৎবাসিনী—যারা শুধু উৎসবের জলসায় নতুন কথা বাহির-জগতের কথা শুনতে পায় খুশ্‌নজরজীর কাছেই ; তাদের কৌতুহলের সীমা নেই। রাওলার পর রাওলার (মহলের)—দরজা খোলে, আস্তে আস্তে তারা একটি একটি করে এসে, মখমলের ওপর জরীর কাজ

কবা চোগা, মাথায় জরীর টুপী, সাদা চুড়ীদার পাজামা ও জরীর নাগরা পরা বৃদ্ধ খুশ্‌ নজরজী ও তাঁর পোষ্যপুত্র পরম সুন্দর সুশ্রী দীর্ঘকায় খুদাবক্সকে ঘিরে দাঁড়ায়।

পুরুষহীন নিরাপদ্‌ অন্তঃপুরে এই বহু যুগ যুগান্তরের নারী-শালিকায় মাঝে মাঝে দাসী-সন্তান জন্ম ও অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু ছাড়া কোনো নূতন ঘটনা প্রায় ঘটে না। আর কোনো নূতন বার্তাও আসে না বাহির থেকে। এবং পৌরুষহীন পুরুষ খুশ্‌ নজরজীকে তাদেরও ভয় নেই, অন্তঃপুরবিলাসী কর্ত্তৃপক্ষেরও ভয় নেই।

ছোট ছোট 'পাত্রী'রা এসে পরম বিস্ময় কৌতূহলে খুশ্‌ নজরজীর জরীর জুতার কারুকার্য্য দেখে, জামার ওপর হাত বুলিয়ে জরীর কলকার আয়তন পরিমাণ করে। কেউ বা উৎসবদিনের খাদ্য-আহার্য্যের কথা জিজ্ঞাসা করে। আর তরুণী সখীরা কখনো জরীর নাগরা লুকিয়ে তাদের পায়ের ছোট লাল জুতা রেখে যায়। কখনো আবেদন করে, কিছু 'সুরমা', বা নূতন জামা কাঁচুলীর ছিটের জন্য, বেণী-বন্ধনের রঙীন রেশমের সুতার জন্য। হরিণীর মত সরল দীর্ঘায়ত কাজল-পরা চোখ উজ্জ্বল হাসি কথা কৌতুকের মাঝেও চকিত ও ত্রস্ত হয়ে ওঠে থেকে থেকে। পাছে তিনি অসন্তুষ্ট বা বিরূপ হন। কিন্তু খুশ্‌ নজরজী পরম স্নেহ ও করুণায় তাদের আবেদন শোনেন, তাদের কৌতুকে হাসেন, আর প্রশ্নের জবাব দেন। নিমন্ত্রণ শেষ হয়ে আসে। দিনও শেষ হয়ে এলো।

প্রাঙ্গণ থেকে গলি-পথ, তারপর সুড়ঙ্গ পথ আবার কারো মহলের আঙিনা, আবার সুড়ঙ্গ—পিতা-পুত্রে অতিক্রম করে যান। সুড়ঙ্গ-পথে দিবালোকেই অন্ধকার—তার বহু দূর কোণে কোণে স্তিমিত প্রদীপ-শিখা পথিকের পথ নির্দ্দেশ করে। উপরের ছোট গবাক্ষপথে সন্ধ্যার আলো মিলিয়ে আসে।

খুশ্‌ নজরজী একটি মহলের ছোট অলিন্দে সান্ধ্য-নমাজ সেরে নিলেন।

এবার পাশোয়ানজী প্রেম রায়ের মহল।

সুড়ঙ্গ-পথের নীচে পড়ে দাসী পাত্রীদের সখীদের পদানুযায়ী কক্ষাবলী।

২

খুশ্‌ নজরজী নতশিরে সুড়ঙ্গ অতিক্রম করছিলেন, সহসা গলির মোড়ের কোণে দীপ-শিখা থর থর করে কেঁপে উঠল। একটি গোলাপী ওড়না মাথায় ঢাকা একটি পরম সুন্দর মুখ এক মুহূর্ত্তের জন্য দেখা গেল।

খুশ্‌নজরজী চকিত ভাবে চাইলেন, বুঝলেন, প্রেম রায়ের মহলের কোনো বালিকা পাত্রী কৌতুক করবার জন্য এসেছিল। কিম্বা হয়ত পৃথক ভাবে কিছু আবেদন করতে চায়। সুড়ঙ্গের এ মোড় শেষ হয়ে গেল। সুমুখে বহু দূর আবার অন্য মোড়ের অপেক্ষায় সোজা পথ পড়ে আছে, এবং সুদূর অপর প্রান্তে তারও একটি বৃহৎ প্রদীপ জ্বলছে।

বিস্ময় ও সংশয়ভরে বৃদ্ধ একটু থামলেন ও সামনে চাইলেন। কেউ কোথাও নেই। পিছনে চাইলেন, পুত্র পিছনে আসছেন।

পুত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সামনে কাকে দেখলে না!'

আশ্চর্য্য হয়ে পুত্র বল্‌লেন, 'না, কাকে?'

একটু চুপ করে পিতা বল্‌লেন, 'দেখ তো, সামনে কোনো 'বাঈ' (কন্যা) লুকিয়েছে কিনা। আমি অন্ধকারে যেন কাকে দেখলাম! কাবেরী বাঈ? না',—কিন্তু থেমে গেলেন, আর কোনো নাম বল্‌লেন না।

খুদাবক্স সুড়ঙ্গ-পথে এগিযে গেলেন। তাঁর গায়ের বাতাসে ও-কোণের প্রদীপ কেঁপে উঠল এ-কোণের প্রদীপের মত।

পুত্র ফিরে এলেন, বললেন, 'না, কেউ তো নেই।' তারপর বললেন, 'আর এখনো তো 'রাওলা'র (মহলের) চাবী খোলেনি। আপনার 'হুকুমনামা' না পেলে তো কেউ দরজা খোলা রাখবে না।'

পিতা বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিক তো। চল তবে।'

প্রেম রায়ের মহলের দুয়ার খুলল।

বালিকা পাত্রী, তরুণী সখী, যুবতী সহচারিণী দু'চার জন সেলাম করে এসে দাঁড়াল। খুশ্‌নজরজী সস্নেহে শান্ত হাস্যে সকলের সঙ্গে কথা কইলেন। প্রেম রায়ের কাছে নিমন্ত্রণ জলসায় উৎসবের আলোচনা ব্যবস্থার কথাও শেষ হল।

শুধু গোলাপী রঙয়ের ওড়না পরা কোনো সুন্দর মুখ চোখে পড়ল না।

জন্মতিথি বা 'সালগিরা'র উৎসব যথারীতি পদানুসারে—পাত্র অনুসারে 'খেলাত' 'খেতাব' 'জায়গীর' 'তাজিমী' এবং ভোজ্য পানীয় বিতরিত হয়ে শেষ হয়ে গেল। সুন্দরী রূপবতী নবীনা সখীরা কেউ কেউ 'পর্দ্দায়েৎ' হলো। যুবতী পাত্রীরা সখীদের পর্যায়ে পড়ল। 'তাজিমী'র সম্মান পেলেন খুশ্‌নজরজী সঙ্গে পেলেন সোনার পদভূষণ।

পুত্র খুদাবক্সও পারিতোষিক পেলেন সুবর্ণ-খচিত শিরোপা। এবং মহলে

মহলে প্রাসাদের বিভাগে বিভাগে—সকল রাণীর অন্তঃপুরে ও সখীদের নাচে গানে নিমন্ত্রিতদের পান-ভোজনে সোনা-রূপার মোহর-মুদ্রার 'ভেট' 'নজরে' উৎসব শেষ হয়ে গেল।

৩

প্রহরী এসে দাঁড়াল খুদাবক্সএর ঘরের সামনে। বললে, 'খুশ্‌নজরজী সেলাম দিয়েছেন।' ভাদ্র মাসের গরম। খসখসের পর্দা ফেলা, আধ অন্ধকার কক্ষতলে শ্বেত মর্ম্মর চৌকীতে খুশ্‌নজরজী শুয়েছিলেন। সুমুখে প্রকাণ্ড জরী-জড়ানো আলবোলার নল নীচের গালিচার উপর পড়ে আছে। মাথার জরীর টুপীটাও খোলা রাখা রয়েছে। মাথার ওপর টানা পাখা মৃদু ভাবে আন্দোলিত হচ্ছে।

খুদাবক্স অভিবাদন করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আব্বাজান, আপনার শরীর কি অসুস্থ?'

গালিচার পাশে পুত্রকে আসন গ্রহণ করতে ইঙ্গিত করে পিতা বললেন, 'না, অসুস্থ নয়।'

খুদাবক্স চুপ করে বসে আদেশের বা বক্তব্য শোনার অপেক্ষা করতে লাগলেন। পরম সুন্দর সুশ্রী দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ খুদাবক্সের দিকে খুশ্‌নজরজী অন্য মনে চেয়েছিলেন।

ছোট্ট রোগা, শীর্ণকায় অনুজ্জ্বল তামার মত রঙ সাদা চুড়ীদার পাজামা আর আঁট সাদা আচকান পরা খুশ্‌নজরজীকে পিছন হতে যেন বালকের মত মনে হয়। গালিচার পাশে রাখা জরীর জুতা জোড়াটিও যেন ছোট বালক বা মেয়েদের পায়ের বলে ভ্রম হয়।

তাঁকে দেখলে তিনি খুদাবক্সের যে কেউ নন তা বোঝা যায়।

চৌকীর পাশে গালিচার ওপর একখানি চিঠি পড়েছিল। খুশ্‌নজরজী চিঠিটা হাতে করে তুলে নিলেন। তারপর বললেন, 'তোমার কি তোমার মাকে মনে আছে?'

খুদাবক্স মাথা নাড়লেন, মনে আছে।

'তোমার মার কথা তো তুমি কিছুই জানো না? কেমন করে এখানে তিনি এলেন, আমার কাছে রইলেন?' খুশ্‌নজরজী চুপ করলেন পুত্রের পানে চেয়ে।

'জী, না' বলে খুদাবক্সও আর কিছু বললেন না। প্রশ্ন কয়া আদবকায়দা বহির্ভূত, জিজ্ঞাসু ভাবে বসে রইলেন।

'তোমার মাকে আমি দেখি দিল্লীতে প্রথম। সে আজ ত্রিশ বছর আগের কথা। 'হুজুরসাহেব' (মহারাজা) দিল্লী গেলেন—হরিদ্বার বৃন্দাবন সব যাবেন। আমাকে সব বন্দোবস্ত করবার জন্য আগে যেতে হ'ল। মহারাণী যাবেন, পছন্দমত সখীরা কতক জন যাবে। কোথায় কি ভাবে থাকার ব্যবস্থা তাদের হবে, আর অন্তঃপুরের নানা কাজ, জান তো অন্য লোকের ওপর ভার দেওয়া নিয়ম ছিল না।

তখন আমার বয়স তোমার এখানকার চেয়ে বেশী বটে, কিন্তু বুড়ো হইনি।

হঠাৎ আমাকে আমার দিল্লীওয়ালা এক বন্ধু বললেন তোমার মা'র কথা। তাঁদের কোন্ দূর-আত্মীয়ের স্ত্রী তিনি, বিধবা হয়েছেন—তোমাকে নিয়ে বড়ই অসুবিধায় পড়েছেন। বয়স কম, দেখতেও ভাল ছিলেন, কিন্তু আবার বিবাহ করতে ইচ্ছুক নন। কোথাও থাকতেও পারেন না, কেউ রাখতেও চায় না। অথচ অর্থাভাব তো বটেই। তোমার বাবার একটা কাচের বাসনের দোকান ছিল, সে দোকান তাঁর মৃত্যুর পরই উঠে গেছে।

আমি অনেক দিন ধরেই আমার বাড়ীতে কোনো স্ত্রীলোকের অভাব বোধ করছিলাম। কিন্তু আমাদের ঘরে আর স্ত্রীলোক কি জন্য আসবে! কোন্ সম্পর্কের সম্মান তাকে দোব!'

খুশ নজরজী আবার একটু চুপ করলেন।

পুত্র নতশিরে পা মুড়ে করতলবদ্ধ হয়ে পিতার কথা শুনছিলেন।

পিতা বললেন, 'আর আমি কি করে এখানে এলাম, তাও তোমাকে কখনো বলিনি। আমাকে আমার কোন এক আত্মীয় আমার আগে এই পদে যিনি ছিলেন তাঁকে বেচে দিয়েছিলেন, তিনি ও আমরা খুব গরীব ছিলাম। আমি তখন শিশু। আমার কিছুই বিশেষ মনে পড়ে না। আমি আমার আর কোনো পরিচয়ই জানি না, এই পালক-পিতা ছাড়া। আর তিনিও আমাকে কবে এই পদের উপযুক্ত করে নিলেন তাও আমি জানি না।'

বাইরে থেকে খসখসের পর্দায় জল ছিটিয়ে গেল ভিস্তি এসে, ঘরের হাওয়া আরো শীতল হয়ে উঠল।

'যাক্। তার পর তোমার মার কথা শোনো। আমাদের ঘরে স্ত্রীলোক

আনার কোন অর্থই নেই, কি ভাবে তাঁকে আনি, বলসুম তোমাকে। আমি তোমার মাকে জিজ্ঞাসা করে পাঠালাম, সেই বন্ধুকে দিয়ে, আমার কথা সব বলে; যদি তিনি আসেন, আমার আত্মীয়ার মতই সম্মানে তিনি থাকতে পাবেন। সাংসারিক সুখ-শান্তি স্নেহ-মমতার অধিকার আমাদের নেই, এই পদের অবশ্যম্ভাবী অবস্থা যেটা। তবু যা পাওয়া যায়। কিন্তু আসলে তোমাকে আমি দেখেছিলাম বন্ধুর বাড়ীতে। আমার লোভ হ'য়েছিল তোমার ওপরেও। যেমন অপত্যহীন লোকের ধনের ওপর 'যখ' দেওয়ার লোভ হয় শোনা যায়। তেমনি আমাদের এই পুরুষানুক্রমিক পদের মোহ ধনের লোভ আমারও কেমন মনের মধ্যে লুকিয়ে ছিল। তোমাকে দেখে মনে হল, তোমাকে আমার পদের উত্তরাধিকারী করতে পারব, হয়ত তোমার দরিদ্র জননী আপত্তি করবেন না। দরিদ্রের কাছে ধনের মোহ—সুখের, স্বাচ্ছন্দ্যের মোহ তো কম নয়?' বলে একটু থেমে তিনি আলবোলার নল তুলে মুখে দিলেন কিন্তু আগুন নেই, নিবে গেছে। পুত্র তাম্রকূট-বরদারকে ডাকলেন।

বেলা আর নেই। দক্ষিণের দুয়ারের খসখসের পর্দা তুলে দিতে ভৃত্যকে আদেশ করে বৃদ্ধ আলবোলার নলে মুখ দিলেন। ঘরে আলো ভরে গেল। আরাবল্লীর পশ্চিমের ছোট্ট একটি শিখরের পাছে সূর্য্য হেলে পড়ছিল। রাজপুতনার অসহ্য গরমেও ঘরে বর্ষাম্বু ভরা দুর্গ-পরিখা তালকাটারার উপর থেকে উষ্ণ ও স্নিগ্ধ একটা মিশ্র হাওয়া বয়ে এলো।

বৃদ্ধ বললেন, 'আর আমি তোমাদের দু'জনকেই পেলাম। তুমি ছিলে দু'বছরের শিশু। আর তোমার মা ছিলেন বাইশ-তেইশ বছরের মেয়ে। তাঁর নাম ছিল 'নূরুনেহার।' তিনি মাত্র তিন বছর বেঁচেছিলেন। আমার তাঁর কাছে তোমাকে নেবার অনুমতি নেওয়া হয়নি। হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হল, সামান্ত অসুখে। আমি আগে অনুমতি নিতে ভরসা করিনি। পাছে আপত্তি করেন। আর বাধা রইল না, তুমি আমারই হয়ে গেলে।'

বৃদ্ধ উন্মনা ভাবে আলোর দিকে চেয়ে রইলেন। যেন নিজেকে ঐ পরম সুন্দর যুবার কাছে কেমন অপরাধী ও অপ্রস্তুত মনে হল।

খুদাবক্স নতমুখেই বসে রইলেন।

এইবার চিঠিখানা পুত্রের হাতে দিয়ে বললেন; 'এই চিঠিখানা তোমার মা'র এক ভাইঝির। তিনি তাঁর দু'টি ছেলে নিয়ে এখানে আসতে চান। আজকে রাত্রে এসে পৌঁছবেন, তুমি তাঁদের নিয়ে এসো।'

৪

খুশ্‌নজরজীর উৎসব-আনন্দহীন ভবিষ্যৎ-আশাহীন ক্ষমতা-লিপ্‌সুদের ষড়যন্ত্ররত অট্টালিকা সহসা নারীর আর শিশুর মধুর কল আনন্দ কোলাহলে ভরে উঠ্‌ল। বালকের তুচ্ছ খেলার জিনিষে প্রাঙ্গণ অলিন্দ কক্ষ ভরে উঠ্‌ল। অকারণ কথার, অপ্রয়োজনীয় জিনিষের, অনাবশ্যক আনন্দের যেন একটা স্রোত এসে পড়ল বাড়ীতে।

আর নুরন্নেহারের ভাইঝি গুল্‌সুরৎ যেন অকস্মাৎ কর্ত্রীহীন নারীস্পর্শহীন বাড়ীতে নতুন যত্ন সেবা সাহচর্য্যের স্বাদ এনে দিল।

এই নূতন ধরণের উৎসব-উল্লাসময় জীবনের ধারায় খুদাবক্স যেমন খুসী মনে ডুবে গেলেন, তেমনি বদ্ধ খুশ্‌নজরজীর যেন বার্দ্ধক্যজনিত অবসাদ দিন দিন বেড়ে উঠ্‌ল।

বৎসর শেষ হবার আগেই এক দিন সহসা বৃদ্ধ খুদাবক্সকে ডেকে পাঠালেন। তাঁর রাজকার্য্যের ভার, অন্তঃপুর রক্ষণা-বেক্ষণের ভার আপনিই খুদাবক্সের হাতে এসে পড়েছে। বৃদ্ধ আর বড় বেরুতে পারেন না। গুলসুরতের দু'টি ছেলে আর কন্যার মত গুল্‌সুরৎকে নিয়ে তাঁর সময়ে কাটে। বালক হকিকত আর হবিব তাঁকে 'দাদা' বলে ডাকে, আর খুদাবক্সকে বলে মাতুল। আর গুলবং খুদাবক্সকে 'ভাইসাহেব' বলেন।

বাসন্তী অপরাহ্ণ। খুদাবক্স পিতার আহ্বানে এসে দাঁড়ালেন।

প্রচুর আলো-রৌদ্রে ঝলমল নবপল্লব ও শুষ্ক পত্রের সমারোহে অট্টালিকা-সংলগ্ন উপবন-বাগান ভরে গেছে। বসন্তের পাতা ঝরার মর্ম্মর ভেসে আসছে চার দিকের মাটি থেকে। উপরে গাছে রক্ত বা হরিৎ পত্রাবলীর আন্দোলনের বিরাম নেই।

পুত্রকে বসতে বলে খুশ্‌নজর বললেন, তোমার মনে আছে 'সালগিরা'র নিমন্ত্রণের দিনের কথা? প্রেম রায়ের মহলে যখন আমরা যাচ্ছিলাম?'

পুত্র বল্‌লেন, 'জী, মনে আছে!'

পিতা বল্‌লেন, 'সেই যে মেয়েটিকে আমি দেখেছিলাম কাল রাত্রে তাকে দেখলাম। চিনতে পেরেছি এবারে।'

পুত্র আশ্চর্য্য হয়ে পিতার পানে চাইলেন। এই অন্তঃপুরে আর কেউ মেয়ে তো কখনো আসেনি।

পিতা বল্‌লেন, 'সে গোদাবরী বাঈ। কাল আমি স্বপ্ন দেখলাম, সেই

গোলাপী ওড়না-পরা মেয়ে সেই পথেই আমার আগে আগে চলেছে। হঠাৎ প্রেম রায়ের মহলের 'তয়খানা'র (মাটির নীচের কুঠুরী) দিকের পথে সে চলে গেল। যাবার সময় তাকে আমি স্পষ্ট দেখলাম, আর চিনতে পারলাম। আমি এতদিন প্রায় ভাবতাম সে কোন্ মেয়ে, যাকে আমরা আর দেখতে পেলাম না— কোথায় লুকালো। আজ বুঝলাম সে লুকোয়নি। সে গোদাবরী বাঈ। যাকে আমি বাঁচাব ভেবেছিলাম, কিন্তু বাঁচাতে পারিনি।'

পুত্র প্রতিবাদ করলেন না, চুপ করেই রইলেন। যদিও তাঁর মনে হচ্ছিল পিতার চোখের ভ্রম। সুড়ঙ্গের বহু বৎসরের মলিন দেওয়ালে উপর থেকে আসা সন্ধ্যার আলোয় প্রদীপের স্তিমিত কম্পিত শিখায় কোনো তরুণী মানবীর ছায়া রচিত হয়েছিল, পিতার বার্দ্ধক্য-স্তিমিত চোখের দৃষ্টির সুমুখে; আর কিছু নয়।

গুলসুরৎ এসে বসেছিলেন। সামনের বারান্দায় তাঁর পুত্রেরা খেলা করছিল।

এবারে খুশ্‌নজরজী বললেন, 'তার পর আমার মনে হল আমার দিন আর বেশী নেই। তাই আজ তোমাদের ডেকেছি একটা কথা ভাববার জন্যে। তোমরা জানো বোধ হয়, আমাদের মৃত্যুর পর আমাদের 'জায়গীর' ধন-দৌলত সব রাজে 'খালসা' (বাজেয়াপ্ত) হয়ে যায়। কেন না আমাদের উত্তরাধিকারী কেউ থাকে না। আমার পালক-পিতা তাই আমাকে তাঁর পদের জন্য দৌলতের জন্য পোষ্য নিয়েছিলেন। আর আমিও খুদাবক্সকে তার জন্যই নিয়েছিলাম। আর খুদাবক্সের পর কে ওর পদ অধিকার করবে সে কথাও আমি এতদিন ভেবেছি। আমার ধন-দৌলত জায়গীর খেতাব খেলাত এ সব রাজে 'খালসা' হয়ে যাবে, না কারুকে পাব, অথবা খুঁজে দেখব এই আমার বহু দিন ভাবনা ছিল।'

গুলসুরতের দিকে চেয়ে বললেন, 'এমন সময় তোমার চিঠি পেলাম। দেখলাম, তুমিই আমাকে আমার ভাবনা থেকে মুক্ত করলে।'

বাইরে হকিকত আর হবিবের খেলা ও গল্প শোনা যাচ্ছিল।

সেদিকে চেয়ে উৎকর্ণ ভাবে বৃদ্ধ বললেন, 'হ্যাঁ, আমার ধন-দৌলত খেলাত সম্পত্তি প্রচুর আছে! কে ভোগ করবে! এতদিন অবধি আমি তাই ভাবছিলাম।

গুলসুরতের দিকে চেয়ে বৃদ্ধ বললেন, 'আর বেটি, তোমারো ইচ্ছে যে আমি খুদাবক্সের জন্য হকিকতকে বা হবিবকে পোষ্য নিই।'

গুলসুরৎ বললেন, 'জী, আপনার মেহেরবাণি।'

'আর তোমার ? খুদাবক্স ?'

খুদাবক্স যেন বুঝতে পারছিলেন পিতার কি একটা অস্বস্তি হচ্ছে। বললেন, 'আপনি যা আদেশ করবেন।'

পিতা এবারে বললেন, 'তুমি ডাকতো একবার ওদের।'

খুদাবক্স বালক দু'টিকে নিয়ে এলেন। পরম সুন্দর সুশ্রী দীপ্ত চোখ উজ্জ্বল মুখ দু'টি বালক জননীর পাশে দাঁড়াল। খুদাবক্সও দাঁড়িয়েছিলেন। বৃদ্ধ অভিভূতের মত চেয়ে রইলেন চার জনের দিকে।

তারপর বললেন, 'যাও বেটা, তোমরা খেলা করগে।'

তারা চলে গেল।

এবারে বললে, 'জানো বেটা, এই গুলসুরৎ আর ওই বাচ্চারা আসার পর থেকে আমি কি ভেবেছি ? আমি ভেবেছি, আমি যদি এই গুলসুরৎকে পেতাম বধূর মত করে, আর ওরা তোমার ছেলে হ'ত।'

খুদাবক্স মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন। গুলসুরৎ আরক্ত হয়ে উঠলেন

খুশ্‌নজরজী বললেন, 'বেটা, এ 'শরম' আমার, তোমার নয়। তুমি মাথা নীচু কোরো না।

তার পর গুলসুরতের দিকে চেয়ে বললেন, 'আর বেটি, আমি তোমার ছেলে নোব না।'

গুলসুরৎ অবাক্ হয়ে চাইলেন। খুদাবক্সও একটু আশ্চর্য্য হলেন।

সহসা যেন সকলের চোখের সামনে ভেসে এল এই সমস্ত ঐশ্বর্য্য রাজ্যে 'খালসা' হয়ে গেছে। গুলসুরৎ দিল্লী ফিরে গেলেন সেই দারিদ্র্য-মথিত সংসারে। আর খুদাবক্স ? তাঁর মৃত্যুর পর সব যাবে। আগে নয়—তবু— দু'জনেই চুপ করে চেয়ে রইলেন।

খুশ্‌নজরজী বললেন, 'আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে, 'তাই ভেবেছিলাম আমি এই কাজটা করেই যাব। কিন্তু না, তা আর করব না।'

এইবার গুলসুরৎ বললেন, 'কিন্তু কেন আপনি ভাবছেন এত কথা। আমার তো ওরা দু'জন আছে। আপনি এক জনকে নিন্।'

বৃদ্ধ একটু হাসলেন, তারপর বললেন, 'বেটি, ছেলে তোমার দু'টি জানি। কিন্তু ওদের 'জিন্দ্‌গী' তো একটি করেই। জীবন তো আর একটা তুমি ওদের এনে দিতে পারবে না। ওই চমৎকার সুন্দর শিশু বড় হয়ে যখন সকলের মত জীবনের সুখ আশা কল্পনা আনন্দ খুঁজবে, তুমি দিতে পারবে কি ? আমি কি

পেরেছি দিতে ? না, আমি আর আমার দৌলতখানায় 'বখ্‌' ওদের বানাব না। ওরা মানুষের মতই বড় হোক। না হয় গরীব থাকবে।'

কালো দীপ্ত চোখ সুন্দর মসৃণ কপাল সুস্থ বালক দু'টি তখন সামনের ছাতে তাদের খেলা ঘর পেতেছে, তাদের মধুর কণ্ঠে গৃহ-রচনার পরিকল্পনা শোনা যাচ্ছিল। খুদাবক্স শান্ত নির্লিপ্ত ঈষৎ বিষণ্ণ চোখে চুপ করে সেই দিকে চেয়েছিলেন। যা তাঁর জীবনে আসেনি,—মানুষের মোহ প্রেম আশা,—তা থেকে ওরা বঞ্চিত হোক অথবা পাক্‌, কি ভাবছিলেন জানা গেল না।

গুলসুরৎ নতশিরে নীরবে বসে রইলেন।

রচনাকাল—১৩৫২

লালজী সাহেব

ছেলে রাজার, কিন্তু রাজপুত্র নয়, বন্দিনীপুত্র বা বাঁদীপুত্র। বালক সুজনসিংহের মৃত্যু হয়েছে।

তার জননী কেশরবাই রাণী নন, বাঁদী থেকে সখি তার পর সহচারিণী, সঙ্গিনী, প্রেয়সীর পদে পৌঁছেছিলেন রাজ-অন্তঃপুরের আরো অনেকের মত। এখন তাঁর পদ 'পাশোয়ান'জী, খেতাব স্বরূপ রায়, সম্মান রাজ-প্রেয়সীদের মহিমায় মহারাণীর ও বিবাহিতা রাণীদের পরেই এবং ক্ষমতা ও প্রতাপ সবার উপরে। অর্থাৎ আসলে মহারাণীই, শুধু সরকারী ভাবে স্বীকৃত নন।

রাজপুত্র নামে অভিহিত না হলেও বালক লালজী সাহেব (মহারাণী ও রাণীদের পুত্র ছাড়া রাজাদের এই রকম সব সন্তানই—পুত্র লালজী সাহেব ও কন্যা, বাইজী লাল নামে অভিহিত হয়) অন্যতমা প্রিয়তমা নারীর ও নিজের সন্তান, রাজাও স্বরূপ রায়ের সঙ্গে শোকে-দুঃখে আকুল হয়ে উঠলেন।

নিয়ম নয় তবু রাজশোক, প্রকাশ্যেই বেসরকারী ভাবে শোকের দরবার বসল। সম্মানিত পদস্থেরা—সর্দার লোকেরা, ঠাকুর সাহেবরা (জমীদার জায়গীরদার), পদস্থ কর্মচারীরা সাদা কাপড় সাদা পাগড়ী পরে নিস্তব্ধ দরবারগৃহে রাজপুত শোক-প্রকাশের নিয়ম অনুসারে নতশিরে পাঁচ দশ মিনিট বসে চলে গেলেন।

অন্তঃপুরেও স্বরূপ রায়ের মহলে শোক জ্ঞাপন করার হুকুম জারীহল,

ঠাকুর সাহেবের ঘরে ও বড় বড় ঘরে পৌঁছল। ঘেরা-টোপ-পরা রথের পর রথ, বন্ধগাড়ী ভরে ঘরানা-ঘরের; বড় ঘরের অসূর্য্যম্পশ্যা শেঠানী ও ঠাকুরাণীরা দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকে অন্তঃপুরের অচেনা অলি গলি পথ সুড়ঙ্গ প্রধান খোজা ও প্রতিহারিণীদের সঙ্গে অতিক্রম করে এসে বিলাপাকুল শোকগৃহে দশ মিনিটের জন্য বসে গেলেন।

অন্তঃপুরের শোকগৃহ বাইরের মত নিস্তব্ধ নয়। সেখানে আর্ত্তনাদ করে, হা-হুতাশ করে করাঘাতে বক্ষ তাড়না করে, নানা রকমে শোক প্রকাশ করে কাঁদার জন্য আগন্তুক সখি সেবিকা দাসী ও বহু বাইরের থেকে ভাড়া করে আনা মেয়েদের উদ্বেল বিলাপে আচ্ছন্ন ও আকুল হয়ে থাকাই নিয়ম। যদিও যাঁর শোক তিনিই সেখানে অনুপস্থিত থাকেন চিরাচরিত প্রথায়।

সুজন সিংহের বড ভাই সমর সিংহ তখন ১০।১১ বছরের বালক। রাজা ব্যাকুল মোহে তাকে কাছছাডা করতে পারেন না। তার জননীর কাছে সে থাকে খানিকটা, বেশীর ভাগই পিতার কাছে থাকে।

বৃদ্ধ রাজার শোকাচ্ছন্নতার খবর সাদা রাজদূত রেসিডেন্ট সাহেবের কানেও পৌঁছল।

ছেলেও রাজার বটে, শোকও রাজার সত্য, কিন্তু রেসিডেন্টের বডই মুস্কিল হল। বিলিতী মতেও এবং সরকারী ও দরবারী ভাবেও এ-পুত্র ও এ-শোক স্বীকার করে নেওয়ার নিয়ম নেই। অথচ রাজার সন্তান, রাজা শোকার্ত্ত, রাজকুমার বলে সসম্মানে স্বীকৃত না হলেও

বিমনা রেসিডেন্ট সাহেব সৌজন্য করে দেখা করতে এলেন।

প্রবীণ প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে রাজা খাস-কামরায় বসে দেখা দিলেন। বালক সমর সিংহও পাশে বসেছিল।

রেসিডেন্ট যথারীতি অভিবাদন ও করমর্দন করলেন রাজা ও মন্ত্রীর সঙ্গে। তারপর কিছু না জানার মত আড়ষ্ট ভাবে শুধু কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। সমবেদনা জ্ঞাপনটা নির্ব্বাক্ দ্বিধার মাঝেই রয়ে গেল।

কিন্তু অভিভূত রাজা ব্যাকুল দুঃখে দুঃসংবাদের কথা জানালেন, আর সমর সিংকে দেখিয়ে বললেন, এই ছেলেরও ছোট ভাই ছিল সে। বালক সমর সিংহ দীপ্ত কৌতূহলী চোখে চেয়েছিল সাহেবের দিকে। সে এইবার প্রধান মন্ত্রীর ইঙ্গিতে সেলাম করলে।

কিন্তু রেসিডেন্টের কানেও যেন সে পরিচয় গেল না, আর চোখেও সে

সেলাম পড়ল না এবং হাতও বাড়িয়ে দিলেন না। তার অস্তিত্বটাও যেন অদৃষ্ট ও অস্বীকৃত রয়ে গেল সাহেবের কাছে।

সপ্রতিভ বালককে শেখানো ছিল সাহেব হাত বাড়ালে তারও হাত বাড়াতে। মুহূর্ত্তের জন্য সে দক্ষিণ হাতখানি একবার উঁচু করার মত নাড়ল, তখনি প্রধান মন্ত্রীর ইঙ্গিতে অপ্রতিভ বিমূঢ় ভাবে মাথা নীচু করে নিল। সমাজে তার পরিচয় সম্মানিত ভাবে স্বীকৃত নয় বালক সেদিন বুঝতে পেরেছিল কি না জানা নেই, কিন্তু প্রত্যভিবাদিত ও দৃষ্টিগোচর না হওয়া তার জীবনে এই প্রথম। সে তার অস্বীকৃত অস্তিত্ব নিয়ে বিবর্ণ মুখে অসহায় ভাবে বসে রইল তার অসীম ক্ষমতাশালী স্নেহাতুর রাজ-পিতা ও মন্ত্রীর পাশে এবং সাহেবের সামনে।

২

তারপর অনেক বছর কেটেছে।

সে রাজার পর আবার নতুন রাজা সিংহাসনে বসেছেন।

অন্তঃপুরের সে রাজার বহু সন্তানের মাঝে বহু আছে—বহু নেই। যারা আছে বাড়ী ও ভাল মুনাফার জায়গীর পেয়েছে তারা। তারা ও বাইজীলালরা বিবাহিত হয়েছে পূর্ব্বপুরুষদের লালজী-সাহেবদের বংশে। বহু বিস্তৃত শাখা-প্রশাখায় সম্মানে, অসম্মানে, ষড়যন্ত্রে, দারিদ্র্যে ও ঐশ্বর্য্যে, ক্ষুদ্রতায় তারা বিরাট একটি পরিবারের মত থাকে। আজ এর ঘরে ওর বিবাহ হয়। এক ঘর নিঃসন্তান হলে অন্যের ঘর থেকে দত্তক পোষ্য গ্রহণ করে বংশ ও ধনপ্রবাহ বহমান রাখে। সুখ-দুঃখ ভোগ-বিলাসময় দিন-যাপনের ধারা তাদের কত কাল ধরে যেন একই ভাবে চলছে আজো।

একান্ত আদিম তার লীলা। এক দিকে পুত্র-কন্যা-পরিবার বংশানুক্রমিক ধন-ঐশ্বর্য্য, অপর দিকে রাজ-অন্তঃপুরের মতই বহু চিরবন্দিনী বাঁদী, রূপসী নারী নিয়ে নৃত্য-গীত ও অতি স্থূল ভোগময় জীবনযাত্রা। তাদেরও দাসী সন্তান-সন্ততিতে অন্তঃপুর ভরা যাদের বিশেষ কোন পরিচয় বা জাতি নেই। খাঁটি দাস-সম্প্রদায়। জাতিগোত্র অচিহ্নিত মানুষের দল।

লালজী সাহেব সমর সিংহও জায়গীরদার এখন। রাজ-পিতৃস্নেহ মহিমায় অন্য ভাইদের চেয়ে কিছু বেশী আয়ের সে জায়গীর। এ জায়গীর মানে খাজনা লাগে না রাজদরবারে। ফেলে ছুড়ে লুটিয়ে বিলিয়ে খেয়ালে খুশীতে

ভোগ করে যেতে পারে চিরকাল, পুরুষানুক্রমে। শুধু সে পুরুষানুক্রমটি জ্যেষ্ঠাধিকারী।

তাদের অন্য সব সন্তানরা? তারা প্রথম পুরুষে 'ছুট-ভাইয়া' (ছোট ভাইয়ের দল)। তারপর কাকাসাহেব। তাদের সন্তানরা আস্তে আস্তে প্রকৃতির প্রতিশোধের মত ঐ দাসীপুত্রদের মূঢ় একটা সম্প্রদায় গড়ে অস্তিত্ব রাখে যারা ধনহীন, বিদ্যাহীন, অধিকারহীন।

লালজী সাহেবের অনেক সন্তান। পুত্র-কন্যা বহু। জীবনযাত্রার পুরাতন ধারায় কঠিন প্রাচীরের আড়ালে বসেও তাঁর মন যেন কেমন ব্যাকুল ও চিন্তিত হয়ে ওঠে।

কোন্ অবমাননা অসম্মানের মাঝে সে চিন্তার ভিত্তি স্থাপন হয়েছিল ঠিক জানেন না বা বোঝেন না, কিন্তু নিজের সন্তানদের পানে চেয়ে যেন কি ভাবনা প্রতিকারহীন মূঢ় বেদনায় উদ্বেল করে তোলে থেকে থেকে। অনেক ভাবেন। রাত্রে খেতে বসেন মাঝে মাঝে সকলকে নিয়ে, চার ছেলে—সূর্য্যসিংহ, চন্দ্রসিংহ, তারাসিংহ, সমুদ্রসিংহ। অবিবাহিতা বালিকা ছোট মেয়ে দু'টি মাতা-পিতার কাছে আসে যা পারে সামান্য মুখে দিয়ে দাসীদের কাছে গিয়ে শোয় রাত্রিব মত।—মা-বাপকে তারা ঐ এক-আধ বার নৈমিত্তিক প্রথায় দর্শন করে মাত্র।

খাবারের পিঁড়ি পড়ে একটা করে বসবার আর একটিতে খাবার রাখবার—প্রকাণ্ড কাঁসার থালায় করে আসে বহু রকমের ভোজ্য, হয়ত রূপার, নয়ত রূপার কলাই-করা বাটিতে সাজিয়ে। সুমুখে কিছু দূরে নৃত্যগীত করে সুন্দরী বাঁদিরা—মদির পানীয়ও থাকে হুকুম হলে আহার্য্যের সঙ্গে।

লালজী সাহেব বড় ছেলেকে পাশে নিয়ে বসেন।—তারও বিবাহ হয়েছে রাজপুতানারই অন্য রাজ্যের কোনো দাসীকন্যা এক বাইজীলালের সঙ্গে। ছেলে-মেয়েও হয়েছে।

অহিফেন, আসব ও বিলাস-ভোগময় দেহ জরায় বার্দ্ধক্যে স্তিমিত ও স্থবির হয়ে আসে লালজী সাহেবের।

লেখাপড়া শেখেননি বেশী, অল্প পরিসর জীবনের ধারা, বাইরের কোনো স্রোত কোনো দিন তাতে মেশেনি, বাইরের জ্ঞান অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র নেই বলাই ঠিক; কিন্তু ব্যাকুল মুগ্ধ পিতৃস্নেহ তাঁকে কি কথা কানে বলে যায় ক্ষণে ক্ষণে।

সহসা কোনো দিন আহারের পর—নৃত্যগীত পান শেষ হলে, কাঁসা (খাবার-দেবার নাম কাঁসা পরিবেশন) তুলে নিয়ে যায় দাসীরা। লালজী সাহেব

ছেলেদের দিকে চেয়ে কি যেন ভাবেন। তারপর বড় ছেলেকে বলেন, আমার তো দিন শেষ হয়ে আসছে। আমার এই সব সন্তান, এরা ভাবনায় ফেলেছে আমাকে।

ছেলেরা সবাই উৎসুক হয়ে চেয়ে থাকে। বড় ছেলে বুদ্ধিমান, তিনি সম্ভ্রম-নত শিরে স্মিত মুখে বসে থাকেন। কি বলতে চান পিতা?

দ্বিধাগ্রস্ত মনে ভাষা যোগায় না। পিতা বলেন, আচ্ছা, আমি যদি এদের তিন জনের জন্য খানিকটা করে সম্পত্তি দিই আর বাড়ী করিয়ে দিই? এই তোমার থেকেই, তোমার তাতে লোকসান হবে না। তোমার তো ছুটভাইদের দেখতে হবেই—।

বড় ছেলে সম্ভ্রমভরে বলেন, আপনার যেমন ইচ্ছা।

লালজী সাহেব আশ্বস্ত হন। হাঁ, তাহলে কাল থেকে এই বিষয়টা চন্দ্রসিংয়ের আর তারাসিং সমুদ্রসিংয়ের জন্য ওই জায়গা বা সম্পত্তি ঠিক করে দেবেন।

কিন্তু প্রভাতে উঠে মনে হয় দরকার নেই তার, কিছু অসুবিধা হবে না এবং বড় ছেলেই বা কি মনে করবে। হয়ত দেবে না। এক জনের ভোগাধিকার পুরুষানুক্রমে অন্য সবাইকে বঞ্চিত করে এসেছে, সে-ও জানে তার সন্তান সকলে পাবে না। কিন্তু আপাত লোভ নিজের ক্ষমতার ঐশ্চর্য্যের মোহ পিছনের অতীতের বঞ্চনাকেও ভাবতে চায় না, মানুষের ভবিষ্যৎ বঞ্চনাকেও ভাবতে চায় না।

আবার কোনো দিন সবাইকে নিয়ে বাগানে বসেন। কি যেন বলতে চান। বড় ছেলের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন, তাহলে ওদের কি কি দেওয়া যায়? কোন্ মঞ্জিল, কোন্ দিকের ঝরোকাওলা মহল? কতটুকু বাগান, জায়গীরের কতটুকু আর পেতে পারে।

পরামর্শ যেখানে আরম্ভ হয় সেইখানেই ফিরে এসে থেমে যায়। লৌহ নিগড়ে বাঁধা নিয়মকে ডিঙিয়ে, পাশ কাটিয়ে ভেঙ্গে যাওয়ার কোনো রকমের পথই খুঁজে পাওয়া যায় না। সতর্ক বড় ছেলের কাছ থেকেও কোনো অঙ্গীকার বা আশ্বাস পাওয়া যায় না।

৩

একদিন গরমের সন্ধ্যায় তরুণ কনিষ্ঠ পুত্র সমুদ্রসিং স্মিত মুখে এসে পিতাকে অভিবাদন করে জানাল, সে ম্যাট্রিক পাশ করেছে।

এই ধরণের বহু বিস্তৃত বংশের নানা শাখা চার দিকে ছড়িয়ে আছে, বালক, তরুণ, যুবক, ছেলে কম নেই। কিন্তু কেউই আজ পর্য্যন্ত পাশ করেনি, ইংরেজী

লেখাপড়া শেখেনি। এমন কি লালজী সাহেবের নিজের অন্ত ছেলেরাও না। মেলামেশার জন্ত বিত্তার কি এমন দরকার? আর আংরেজী? তারা তো চাকরী করবে না। উর্দ্দু ও হিন্দী? দু-চারটে বইয়ের বেশী কি বা দরকার? কাজ-কর্ম্ম তো 'কামদার' মুন্সীরাই করবে। এই তাদের মোসাহেবের কাছে শিক্ষা এবং ধারণাও এই পুরুষ-পরম্পরা ধরে।

পিতা আনন্দে গৌরবে গর্ব্বে খুসী হয়ে পুত্রকে পাশে বসালেন। সেকাল হলে কিছু হয়ত পুরস্কার দিতেন। এখন সে ভাবের রেওয়াজ নেই।

ভাইদের ঈর্ষ্যা ও আনন্দ সমানই হল হয়ত।

কে কবে লেখাপড়া করেছিল তাদের বংশে, যদিও সবাই তারা হিন্দি ও উর্দ্দু জানত। এখনকার দিনে ঠাকুর লোকদের ছেলেদের একটু ইংরেজীর দিকে ও শিক্ষার দিকে লক্ষ্য হয়েছে। সব বাইরের বিদেশের লোকই শিক্ষার গুণে বড় কাজ পাচ্ছে এই জন্য। ইত্যাদি কথা হ'তে লাগল।

সন্ধ্যা শেষ হয়ে গেল। রাত্রি হ'ল। চারিদিকের চাটুকারের দল ও পুত্রেরা একে একে উঠে গেল।

পিতা সমুদ্রসিংকে বললেন, এবারে তুমি তোমার মাকে খবর দিয়ে এসো। দিয়েছ কি?

সমুদ্রসিং বললে, না, যাই তারপর একটু ইতস্তত: করে বললে, শিউগড়ের ঠাকুর সাহেবের সেজ ছেলে, অমরপুরার ঠাকুরের এক ভাইপো, তেজগড়ের রাও সাহেবের দু'টি নাতি সব আমরা একসঙ্গে পাশ করেছি। ওরা সব আজমীরে পড়তে যাচ্ছে। আমাকেও ওখানে পড়ানোর ব্যবস্থা করে দিন।

আরো পড়বে? আর পড়ে কি হবে? সবিস্ময়ে পিতা জিজ্ঞাসা করলেন।

সমুদ্রসিং নত শিরে খানিকক্ষণ বসে রইল, তারপর বললে আমাদের তো কাজ বা চাকরীই করতে হবে। ওরাও তাই বলছিল। কেন না ওরাও তো কেউ বড় ছেলে নয়। লেখাপড়া শেখা থাকলে কাজ ভাল পাব। এখানে না পেলেও বাইরে পাব।

বিস্মিত লালজী সাহেব আরো আশ্চর্য্য হলেন, ওদের মধ্যে এত আলোচনা হয়েছে জেনে। তারা তো যাবে, অনায়াসেই যেতে পারে। কিন্তু লালজী সাহেবদের বংশের কেউ কি ঠাকুর সাহেবদের ছেলেদের সঙ্গে রাজপুত কলেজে বা অন্য কলেজে আজমীরে কখনও পড়েছে? অর্থাৎ পড়তে পারে কি?

দীর্ঘকাল আগের সুজন সিংহের মৃত্যুর পরের সেই ঘটনা মনে পড়ে গেল। তখন যা বুঝতে পারেননি বড় হয়ে অনেক দিন পরে তা বুঝেছিলেন। বৃদ্ধ খুশ্‌নজরজীর ছেলে খুদাবক্স তাঁর বন্ধু ছিল। সে বুঝিয়ে দিয়েছিল এক কথায় যে তিনি বা লালজী সাহেবরা বিবাহিতা রাণীর সন্তান নন। রেসিডেন্ট সাহেব তাই তাঁকে দেখতে পায়নি। মহারাণীর চেয়ে আদরিণী প্রতাপান্বিতা তাঁর জননী মাত্র জননীই, মর্য্যাদাহীন বাঁদী। সেদিনও নতমুখে সেই সত্য ও গ্লানি গলাধঃকরণ করেছিলেন।

তিনি স্তব্ধ হয়ে রইলেন। যদি ঠাকুর সাহেবদের ছেলেদের সঙ্গে পড়তে না পায়। যদি কিছু আপত্তি ওঠে। তাঁর যা কষ্ট হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশী কষ্ট হবে এদের। যদিও তাঁর কষ্টও কম হয়নি, কিন্তু সন্তানের মনে সেই ধরনের কষ্ট হবে এটা মনে করতে ভাল লাগছিল না।

মুখে তিনি বললেন—আচ্ছা, পোড়ো দেখি আমি আজমীরের ব্যবস্থা কি করতে পারি।

তারপর দেখতে দেখতে দিন কেটে গেল।

ভর্ত্তি হবার সময় জুলাইয়ের গোড়ায় কখন মুন্সী 'কামদার' গিয়ে রাজার কলেজে টাকা জমা দিয়ে এলো। (কামদার কর্ম্মচারীদের বলে)।

সমুদ্রসিং বাপের কাছে আবার জিজ্ঞাসা করতে এসে শুনলেন তার ভর্ত্তির ব্যবস্থা এখানকার কলেজেই হ.। বি-এ পড়বার সময় ওখানে গেলেই তো হবে।

ক্ষুব্ধ মনে সে মাথা নীচু কবে বসে রইল, তার চোখে জল আসছিল।

ভাইয়েরা পিতার সাঙ্গোপাঙ্গরা আর পিতা এখানকার কলেজের পড়ার অনেক সুখ-সুবিধার কথা নৈর্ব্যক্তিক ভাবে আলোচনা করতে লাগলেন।

৪

আই-এ পাশ করল সমুদ্রসিং। সবিস্ময়ে পিতা দেখলেন সে আজমীরে পড়ার কথা কিছু বলল না। আশ্বস্ত ভাবে বি-এ পড়ার ব্যবস্থা করে দিলেন স্থানীয় কলেজেই। কি ভয়ে কি যেন শোনার ভয়ে তিনি জিজ্ঞাসাও করলেন না কিছু। সেও কিছু বলল না। সে কি ভুলে গেছে? পিতা ভাবলেন আবার।

সহসা দেখা গেল শুধু তার বাল্যবন্ধুর দল নানা দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। এবং আর তার বন্ধু নেই। এখন সমুদ্রসিং সঙ্গিহীন গম্ভীর প্রকৃতি অল্পভাষী যুবক। এখনকার সহপাঠী আছে কিন্তু সঙ্গী নেই। জ্ঞানবৃক্ষের চমৎকার কোনো ফল কি সে চেখেছিল? বোঝা গেল না।

দু'বছর বাদে বি-এ পাশও করল সমুদ্রসিং। দান, পূজায়, জলসায়, গানে, উৎসবে, ভোজে লালজী সাহেবের অট্টালিকা মুখর হয়ে উঠ্‌লো। তার গর্ব্বিত পিতার কাছে অন্য রাজ্যের জীবিত রাজার বন্দিনী তনয়ার সম্বন্ধ আসতে লাগল। আগের রাজাদের লালজীদের সন্তান নয়, একেবারে খাঁটি প্রধান ধারার সঙ্গে সম্পর্কের প্রস্তাব।

লালজী সাহেবের মনের বহু ভাবনা নিতান্ত ছুটভাইয়াত্ব প্রাপ্তির ভয় অন্তত: এ ছেলের জন্য আর ছিল না।

জন্ম মৃত্যু বিয়ে। জন্মের সময় যে জন্মায় তার মতের অপেক্ষা কেউ করে না, মৃত্যুর সময়েও না। শুধু শুধু বিয়ের সময় মত নেওয়াটা এখনকার কালেই হয়েছে—কয়েকটা জায়গায়ই অবশ্য। এখানে তার ঢেউ এখন আসেনি। সুতরাং সমুদ্রসিংয়ের মত না নিয়েই—বিয়ের কথাবার্ত্তা চলছিল।

৫

এমন সময়ে এক দিন শীতের সন্ধ্যায় সমুদ্রসিং বাপের দরবারে এসে দাঁড়ালো। কনকনে শীতের ঠাণ্ডা, লালজী সাহেব চমৎকার রেশমী বালাপোষে গা ঢেকে মূল্যবান গালিচায় বসে ভাগবত পাঠ শুনছিলেন। পুণ্যলোভী বেশী কেউ ছিল না আশে-পাশে। ওকে দেখে ভাগবত সেদিন সংক্ষেপে সমাপ্ত হ'ল।

রাজপ্রিয়া স্বরূপা স্বরূপরায়ের পৌত্র সমুদ্রসিং তাকে দেখলে লালজী সাহেবের জননীর কথাই বেশী মনে পড়ে পিতার চেয়ে। জননীর মতই মুখশ্রী দৃপ্ত ও দীপ্ত, রঙও সেই রকম। ঠোঁটের না চোখের কোনখানটা যে তার পিতামহীর মত ঠিক বুঝতে পারা যায় না। এক কথায় সমুদ্রসিংয়ের চেহারা চমৎকার, দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, সুন্দর মুখশ্রী।

পিতার কাছে এমনি এসে বসে সবাই অনেক সময়। কিন্তু এত রাত্রে একলা এসে বসে না কেউই।

সমুদ্রসিং দু-একটা অবান্তর কথা জিজ্ঞাসা করে পিতার শারীরিক কুশলের

কথা জিজ্ঞাসা করল। তারপর সহসা বললে, আমি একটা কাজ পেলাম। আপনার অনুমতি আগে নিতে পারিনি, আপনি অসুস্থ ছিলেন। আর কাজটা হবে নাই ভেবেছিলাম।

পিতা শুয়েছিলেন কাত হয়ে। উঠে বসলেন, বললেন, কাজ পেলে? কোথায়? এখানেই তো? কে করে দিলে?

তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দ্বিতীয় বৎসর। পুত্র বললে, না, এখানে না, যুদ্ধের চাকরী পেলাম। দরখাস্ত করেছিলাম।

বৃদ্ধ অবাক হয়ে বললেন, লড়াইয়ের চাকরী? সে কি? কি চাকরী? ট্রান্সপোর্ট? রসদ সরবরাহ, মজুত সেপাই দেখাশোনা? সে তো ভাল চাকরী, তা সে তো এখানেও পেতে পারে।

ছেলে বললে না, সে কাজ আমাদের দেয় না। সে বড় বড় রাজপুত সর্দ্দারদা পায় আপনি তো জানেন। আমি ব্রিটিশ-ভারতের যুদ্ধের কাজ নিলাম। ওরা অনেক লোক নিচ্ছে। এখান থেকেও অনেক গেছে। এখন শিখতে পাঠাচ্ছে।

পিতা ভয় পাবেন, না, খুসী হবেন যেন বুঝতে পারলেন না। কি রকম লড়াই তাতে কি ভাবে থাকবে সে, কি পদ, কি দায়িত্ব, কিছুই জানেন না তিনি। বিচলিত ভাবে তবু জিজ্ঞাসা করলেন, কুমেদানজীর মত কাজ?

কুমেদানজী অর্থাৎ 'কমাণ্ড ইন-চীফ।' তিনি ছিলেন আগের দিনের ঐ রাজ্যের সৈন্য বিভাগের কর্ত্তা। ঘোড়ায় চড়ে পায়ে হেঁটে প্রকাণ্ড তরোয়াল মস্ত বন্দুক নিয়ে বর্শা নিয়ে যারা লড়াই করত সেকালে। এক সময়ে প্রকাণ্ড জোয়ান লম্বা-চওড়া চেহারা অধুনাবৃদ্ধ ন্যুব্জদেহ কুমেদানজীর কাছে আফ্রিকার যুদ্ধের গল্প শোনবার জন্য অনেকেই যেত। লালজী সাহেবের ছেলেরাও কখনো কখনো সমবেত হয়েছে। কমাণ্ডার-ইন-চীফকে সোজা করে নিয়েছিল তার দলের সেপাইরা 'কুমেদানজী' নামে।

পুত্র একটু হাসলে, বললে, না, এখন ও পদ খুব উঁচু পদ। এখানেও আর এখন সে রকম সৈন্য আর সে রকম অস্ত্র-শস্ত্র নেই সেকালের মত। সেই কুমেদানজীকে পেনসন দেওয়ার পরই অনেক বদল হয়েছে। আমি ছোট চাকরীই পেয়েছি পদাতিক সৈন্যের দলে।

পিতা জিজ্ঞাসা করলেন, তা কোন্ দেশে তোমায় যেতে হবে?

এখন তো মাউ ছাউনিতে ওদের একটা শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে, সেখানে

যেতে হবে। তারপর কি জানি কোথায় দেবে, আসামে কি বর্ম্মায় কোথায় জানি না।

ভূগোল জ্ঞানহীন, বাইরের খবর সম্পর্কে অজ্ঞ ও উদাসীন, একান্ত অন্তঃপুরবাসিনী মেয়েদের মত বৃদ্ধ লালজী সাহেব হতবুদ্ধির মত চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, কবে আসবে আবার ?

—ছুটী পেলেই আসতে পাব।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বৃদ্ধ বললেন, আমি চেষ্টা করি তুমি এখানে কাজ পাও যাতে, তুমি এখনি কিছু ঠিক কোরো না।

পুত্র এক দিকে চেয়ে বসেছিল অন্য মনে। মোটা গালিচাপাতা প্রকাণ্ড ঘর, সাদা দেওয়ালে সুন্দর পাতা ফুল লতা পাখীর ছবি আঁকা। ওপরে দেওয়ালে কয়েকটা ছবি গত মহারাজের, বর্ত্তমান রাজার, বিলিতী গত রাজার সপরিবার ছবি, এখনকার রাজা-রাণীরও এবং দু'-একখানা বিলিতী প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি টাঙানো। দু'দিকের দেওয়ালে প্রকাণ্ড একটা করে আরসি এবং দু'টা বড় বাজা-ঘড়ি ঠিক সামনা-সামনি। তার পাশে এক দিকে লালজী সাহেবের নিজের কম বয়সের রং ফলানো বড ছবি একটা। মাথায় যোধপুরী সাফা (পাগড়ী), ব্রিচেশ ও গলাবন্ধ কোট-পরা, হাতে ঘোড়ার চাবুক—ঠিক শিকারে বেরুবার পোষাক মনে হয়।

ছেলে চোখ ফেরালে, বললে, এখানে হবে না বাবা।

—কেন ? আমি চেষ্টা করে দেখি।

ছেলে এবারে বললে, আপনি তো জানেন কেন হবে না। যে জন্য আমার আজমীরে পড়া হতে পারেনি, যে জন্য আমার এখানে বড় কাজ হবে না, সেই জন্যই হবে না।

লালজী সাহেব মাথা নীচু করে চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, কেন ? তুমি কি কারুকে জিজ্ঞাসা করেছিলে ?

সমুদ্রসিং বললে, আমি যখন আজমীরে যেতে পেলাম না, এখানেই ভর্ত্তি হলাম, তখনি আমার এক বন্ধু তেজগড়ের নাতি বলেছিল, তোমার পড়া ওখানে হতে পারবেই না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কেন ? নিশ্চয় হবে, বাবা বলেছেন। সে তখন চুপ করেই রইল।

সমুদ্রসিংও চুপ করে গেল, আর কিছু বললে না।

পিতা জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর ? সমুদ্রসিং একটু ভাবলে, তারপর বললে,

অনেক দিন পরে সে যখন আজমীর থেকে আই-এ পরীক্ষার পর ছুটীতে এলো, আমি বি-এ পড়বার খবর নিতে তার কাছে গেলাম। সে চুপ করে রইল, তারপর বললে, তোমার ওখানে পড়া হতে পারবে না। আমি এবারে জোর করে জিজ্ঞাসা করলাম, কি জন্য এ কথা ও বলছে, কেন হবে না?

সে বললে, ওটা খানদানী (সম্ভ্রান্ত) ও খাঁটী পবিত্র রাজপুতদের জন্য কলেজ। তার পিতামহ বলেছেন, তাতে তাদেরই বাঁদী ও দাসীপুত্রের নেওয়া হয় না। বলে অবশ্য সে খুব লজ্জিত হয়েছিল।

লালজী সাহেব চুপ করে রইলেন, অনেকক্ষণ কিছুই বলতে পারলেন না। শুধু মনে পড়ে গেল!

বহুদিন আগের সেই ছোটবেলার কথা। কিন্তু কিছুই বললেন না। তারপর বললেন, আমিও জানতাম তোমার ওখানে পড়া হবে না। খোঁজ নিয়েছিলাম। তোমাকে বলতে পারিনি।

রাত্রি গভীর হয়ে এলো। পিতা-পুত্র চুপ করে কি ভাবতে লাগলেন কে জানে।

অবশেষে ব্যাকুল পিতা বললেন, কিন্তু আমি যে তোমার খুব ভাল বিয়ের সম্বন্ধ পেয়েছি, বহু যৌতুক পাবে। তোমার টাকার অভাব হবে না, হয়ত ভাল কাজও পাবে। তাছাড়া তুমি বিবাহ করেই যেও না হয়। যদি এই পরম লোভ—অর্দ্ধেক রাজত্ব ও রাজ ক্তার লোভ ছেলেকে ফেরায়। একবার মাত্র 'হাঁ' বলুক। তারপর সব চিরকালের মত ঠিক হয়ে যাবে।

সমুদ্রসিংয়ের মুখে একটু হাসির রেখা দেখা গেল। সে বললে, বাঁদী-সন্তানের, দারোগাদের (রাজপুতদের দাসী-পুত্র) দুঃখ-লাঞ্ছনা তো আপনি স্বচক্ষে দেখলেন, আর তাদের বংশবিস্তার করে কি হবে? আমি যৌতুক লক্ষ টাকা পেলেও আর কোনো রাজ্যের বাইজীলালকে বিয়ে করলেও আমার ছেলে-মেয়ে বাঁদীর সন্তানই থেকে যাবে। ক্রমে দরিদ্র ছোটভাইদের সন্তান তাদের লোকে দারোগাই বলবে। যদি বা বড়কে লালজী সাহেব বলে।

তারপর ধীরে ধীরে বললে, আমি যদি লেখাপড়া না শিখতাম, তাহলে আমি হয়ত এত কষ্টবোধ করতাম না। আপনি আমাকে মাপ করবেন, আমি বিবাহ করব না।

স্থবির পিতা অবুঝের মত তার দিকে চাইলেন ব্যাকুল ভাবে। কিছু বলতে পারলেন না। যদিও বার বার তাঁর মনে হচ্ছিল এত টাকা যৌতুক, অমন কন্যা,

একেবারে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ বন্ধ হওয়া, কাল নিশ্চয়ই সমুদ্রসিংয়ের মত বদলাবে। কি আর হয়েছে এতে—এতো চিরকালের নিয়ম।

সমুদ্রসিং পিতাকে অভিবাদন করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বাইরে কুয়াসাচ্ছন্ন রাত্রি সাদা ঘোমটা দেওয়া নতমুখী বিধবা বধূর মত নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল অস্পষ্ট পৃথিবীর মাঝে।

রচনাকাল—১৩৫৩

সুমেরু রায়

সবে ভোর হয়েছে। শাশুড়ী মাটির ঘরের দাওয়ায় বসেছিল। বধূ উঠে গোয়ালের দিকে গেল গোয়াল পরিষ্কার করবার জন্য। আগলের কাছে দাঁড়িয়ে একটু আশ্চর্য হয়ে বল্লে, 'মা, তুমি কাল রাত্রে গোয়ালঘরের দরজা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিলে?'

শাশুড়ী উত্তর দেবার আগেই সে ঘরে ঢুকে চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে ঘরের মধ্যে কে শুয়ে আছে।'

এবার শাশুড়ী বিরক্ত হয়ে উঠল। বল্লে, 'কি সকালে উঠে 'শোর' (গোলমাল) করছিস্। একবার বল্লি আগল বন্ধ করি নি, আবার বলছিস্ ঘরে কে, ক্ষেপে গেছিস্?'

ততক্ষণে বধূর স্বামী আর দেবর উঠে এসেছে রকের উপর। বধূ বেরিয়ে এসেছিল ভীতভাবে, এখন স্বামীকে দেখে ওড়নার অবগুণ্ঠন দীর্ঘ করে উচ্চস্বরেই বল্লে, 'দেখ না কেন ঘরে এসে?'

এবারে দেবর, স্বামী, শাশুড়ী সব একে একে ঘরে ঢুকল—পিছনে পিছনে ছুই বৌও ঢুকল।

সকলের সঙ্গে ঘরে আসায় এখন নির্ভয় কৌতূহলী বধূ এগিয়ে গিয়ে কোণ থেকে একটু উঁকি মেরে দেখে নিয়ে আশ্চর্য হয়ে বলে উঠল, 'আরে, এ যে উম্‌দাবাঈ!' উম্‌দা মানুষ হিসেবে মানে চমৎকারিণী, জিনিস হিসাবে ভালো।

গোয়ালের অন্যদিকে প্রকাণ্ড আটা-পেষা এক যাঁতার ঘেরা জায়গায় একদিকে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে শুয়ে আছে একটি তরুণী। মাথায় নীল ওড়নার

অবগুণ্ঠন তাকে ঘিরে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছে। লাল সুতা ও জরি জড়ানো দীর্ঘ বেণী খাতার তলায় লুটিয়ে রয়েছে। গায়ে লাল রংয়ের আঙরাখা (অঙ্গরক্ষা অর্থাৎ জামা), আধময়লা পীত ঘাগরা পা'দুখানি ঘিরে পড়েছে। গলায় রূপার হাঁসুলি, মাথায় রূপার সিঁথি, কানে সারি গাঁথা ছোট ছোট সোনার মাকড়ি, পায়ে রূপার মোটা মল, বেড়ার ফাঁকে আসা রৌদ্রে ঝকমক করছে। সেকালের কবি হলে তার রূপ বর্ণনা করতে পারতেন হয়তো—'বান্ধুলী পুষ্পের' মত অধর, 'তিলফুল জিনি নাসা' 'দশন মুক্তার পাঁতি' 'হরিণ নয়ন' ইত্যাদি বলে। কিন্তু দেখবার রূপের সম্বন্ধ চোখের সঙ্গে, লেখবার রূপ দেখার বাইরে। সত্যিকারের রূপ লেখায় বোঝান যায় না বোধ হয়।

যাই হোক, বধূর কথায় কিম্বা সমবেত দলের উপস্থিতির জন্য তার ঘুমটা কেমন হঠাৎ ভেঙ্গে গেল। সে উঠে পড়ল। তারপর অবাক হয়ে চেয়ে রইল। যেন তার মনে হচ্ছে না ঠিক—এটা জাগা না স্বপ্ন, অথবা কি। কি আর কোন জায়গা এটা।

এইবার তার বড়ভাই জিজ্ঞাসা করলে কঠোরভাবে, 'তুই কোত্থেকে এলি? কেন এলি?'

ততক্ষণে সে ভাল করে জেগেছে, সব মনেও পড়েছে। সে কিছু উত্তর দেবার আগেই তার মা জিজ্ঞাসা করলে, 'কার সঙ্গে এলি? কেন এলি?'

এতক্ষণে সে সোজা হয়ে বসে মাথায় ওড়না তুলে দিয়েছিল। এবারে দুষ্টু ঘোড়ার মত কারুর পানে না চেয়ে অন্য একদিকে তাকিয়ে মার কথার জবাব দিলে, 'একলা এসেছি।'

মা ভাইরা একসঙ্গে বলে উঠল, 'এই রাত্রে একলা এসেছিস?'

সে নির্বিকারভাবে গরুগুলোর দিকে চেয়ে রইল। অসহ্য রাগে বড়ভাই কটু একটা গালি দিয়ে বলে উঠল, 'তুই কি পাগল হয়ে গেছিস? লোকে আমাদের কি বলবে তা জানিস না? তোকে আজ আমি মেরে খুন করে ফেলব।'

সে চুপ করে একগুঁয়ের মত সেই দিকেই তাকিয়ে রইল। এবার ছোটভাই বল্লে, 'আচ্ছা, ওকে এই গোয়ালেই দরজা বন্ধ করে রেখে দাও, খেতে দিও না। যতদিন না ওর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা এসে আবার নিয়ে যায়।'

এইবার সে মুখ তুল্লে, তারপর স্থিরভাবে বল্লে, 'আমি না-খেয়ে মরে গেলেও সেখানে যাব না। সেখানে তারা মারে, গালাগাল দেয়। রাতদিন কাজ করায়, খেতে দেয় না ভাল করে। কক্ষনো যাব না। দাদা মেরেই ফেলুক।'

ওড়নার পাশ থেকে তার বাহুর ওপর মুচ্‌ড়ে যাওয়া কালশিরে কালো কালো দাগ দেখা যাচ্ছিল। চোখে তার জল ছিল না, মিনতি বা বিনীত করুণায় যাচ্ঞার ভাবও মুখে নেই। গৌরসুন্দর কিশোর তনু, আরও উজ্জ্বল চোখ, সুন্দর নিখুঁত মুখ ভোরের বেলায় অনুজ্জ্বল স্নিগ্ধ আলোয় যেন গৌরীর মূর্তির মত দেখাচ্ছিল। সহসা বাইরে কে ডাকল, ভাইরা বেরিয়ে গেল। জননীও এগিয়ে গেল দরজার দিকেই।

বধূ ননদের কঠিন স্থির মুখের দিকে চেয়ে ভীতভাবে কিছু না বলে গরুর দিক পরিষ্কার করতে লাগল। উমদা এবারে ক্লান্তভাবে শুয়ে পড়ল। দু'রাত্রি সে হেঁটেছে। খেতে পায় নি। দিনে হাঁটতে সাহস করে নি, পাছে কেউ দেখতে পেয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। গোয়ালের দুটি বাছুর চুপ করে চেয়েছিল শান্তভাবে উমদার দিকে। যেন তারাও বুঝতে পারছিল—কি একটা হয়েছে, আর উমদাকে চিনতে পেরেছিল।

২

ভাইরা বাইরে এলো।

হাতে মোটা একটা লাঠি, মাথায় সাদা আধময়লা পাগড়ি, গায়ে রেজার (খদ্দর) মেরজাই, মোটা ধুতি, পায়ে রূপার কড়া (মল) পরা এক দীর্ঘকায় মস্ত গোঁফওয়ালা জাঠ চাষা দাঁড়িয়েছিল।

ভাইরা তটস্থ হয়ে বল্লে, 'এসো, এসো যমুনালালজী, খবর সব ভালো? এত সকালে?'

যমুনা সিং বল্লে, 'হ্যাঁ সব ভালো। কিন্তু বৌকে কাল থেকে দেখতে পাচ্ছি না, এখানে এসেছে?'

বড়ভাই বল্লে, 'হাঁ, এসেছে তো?'

আশ্চর্য হয়ে যমুনা সিং বল্লে, 'এসেছে! একলা চলে এসেছে পরশু রাত্রে। তা থাক ও এখানেই। আর ওকে নিয়ে যাব না। আমার ভাইয়ের আবার বিয়ে দোব।'

যমুনা সিং উঠে দাঁড়াল।

এবার ছোট ভাই বল্লে, 'না না, বসুন। আপনি রাগ করবেন না। ও বড়ই ছেলেমানুষ। আমার পিতামহ ওকে আদর দিয়ে 'উমদা পরী' (সুন্দরী পরী)

বলে ওর মাথা খারাপ করে দিয়েছেন। আমরা ওকে বুঝিয়ে আবার পাঠিয়ে দোব।'

মাও এসে দাঁড়িয়েছিল, সে বল্লে, 'বেটা' আমিও ওকে নিয়ে বড়ই মুস্কিলে পড়েছি। মেয়েমানুষ, ওর সাহসও তো কম নয়! এই রাত্রে একলা পথ চলেছে! ওকে তোমাদেরই হাতে দিচ্ছি, তোমরাই মেরে বকে শাসন করো।'

যমুনা সিং বল্লে, 'ওকে শাসন করে আমরা কিছুই করতে পারি না। ও ভারী একজেদী। তাছাড়া ও কারুকে মানে না। সুন্দর বলে ভাইয়ের বিয়ে দিলাম। ঐ সুন্দর বলেই মুস্কিল হয়েছে। যত গাঁয়ের মেয়ে আর ছেলেদের সঙ্গে ও কথা কয় লুকিয়ে লুকিয়ে। আমাদের চাষার ঘরে ও মেয়ে চল্‌বে না। সবাই নিন্দে করে, হাসে।'

ব্যাকুল হয়ে জননী বল্লে, 'তা হোক্, ওকে তোমরা শাসন করো।'

ছোট ভাই তামাক সাজতে বস্‌লে কুটুম্বের জন্য। তারপর উম্‌দার বড ভাই আর ভাসুর নীরবে বসে তামাক খেতে লাগল। মা ভেতরে গেল কুটুম্বের অভ্যর্থনার যোগাড়ের জন্য।

অনেকক্ষণ পরে উম্‌দার ভাসুর বল্লে, 'এক কাজ করা যায় ওকে শাসন করবার জন্য। আমাকে আমাদের গাঁযের একজন বলছিল।'

বড ভাই বল্লে, 'কি কাজ?'

যমুনা সিং বল্লে, 'সে বল্লে, আগে আগে অনেক সময় দুরন্ত বৌ-মেয়েকে লোকে রাজবাড়িতে পাঠিযে ঝি করে রেখে দিত। একেবারে বন্দী হয়ে থাকত। তাতে বাইরে বেরুনো, কারুর সঙ্গে কথা কওয়া, বাজে গল্প—সব বন্ধ হয়ে যেত। তারপর সিধে হযে গেলে দু-তিন বছর পরে নিয়ে আসৃত।'

মা ফিরে এসেছিল। ভাইরা, মা, চুপ করে রইল। ছোট ভাই বল্লে, 'তারা কি সকলের মেয়ে নেয?'

যমুনা সিং বল্লে, 'তা নেয না। জানাশোনা লোক দিয়ে ঠিক করতে হয়।'

মা বললে, 'কতদিন রাখতে হবে?

'তা জিজ্ঞাসা করে বলা কওয়া করে নেওয়া যাবে।'

বড় ভাই তেজ সিং বললে, 'তা গঙ্গা কি বলে?'

গঙ্গা সিং উম্‌দার বর।

যমুনা সিং আশ্চর্য হয়ে বললে, 'বাবা রয়েছেন, মা রয়েছেন, তাদের মত আছে, আমি বড় ভাই মত দিচ্ছি। ওর আবার মত কি?'

অতিশয় অপ্রস্তুত হয়ে তেজ সিং আর মা বলে উঠল, 'নিশ্চয় তাতো বটেই।

গোয়াল, গরু, গোবর ও যাঁতার ধূলোর পাশে নিদ্রিত ক্লান্ত উম্‌দা বাঈয়ের ভাগ্যলিপিকায়, তার জীবনের বিধাতাদের সর্বসম্মতিক্রমে নতুন এক রেখাপাত হয়ে গেল।

৩

উম্‌দার ঘুম ভাঙল অনেক বেলায়। সে আশ্চর্য হয়ে দেখলে, গোয়ালের দরজা খোলা, কেউ বন্ধ করে রাখে নি। সে বেরিয়ে এলো বাইরে। মা রান্না ঘরে রুটি করছে। মাও কিছু বললে না। সে একটু ভয়ে ভয়ে মার কাছে খাবার চাইল। মা দিল। খাওয়ার সময় মা বললে, 'তোর ভাসুর এসেছে।'

চকিত হয়ে নিমেষে সে উঠে দাঁড়াল, বললে, 'আমি সেখানে যাব না। আমি পালিয়ে যাবো।'

মা একটু চুপ করে রইল, তারপর বললে, 'আচ্ছা যাস নি।'

বিচলিত চঞ্চল উম্‌দা বিকালের দিকে ভাজের কাছে শুনল, তাকে নিয়ে ওরা সব শহরে যাবে, রাজার বাড়িতে সে থাকবে এখন থেকে, সেখানে কাজ করবে। ভাসুর আর ভাইরা এই বলেছে। উম্‌দা অবাক্ হয়ে গেল।

রাজার বাড়ি? রাজ-প্রাসাদ? রানীরা? মহারাজা? সেখানে চাকরি করবে বা কি কাজ করবে, সেকথা উম্‌দার মনে এলো না। অবাক হয়ে সে শুধু ভাবতে লাগল, রাজার বাড়ির কথা, রাণীদের কথা, তাদের ঐশ্বর্যের কথা। যে ঐশ্বর্য সে দেখে নি সেকথা তার কল্পনায় এলো না। সে স্বপ্ন, তার জানা ঐশ্বর্যের স্বপ্নের চাক্কি, চুলা (যাঁতা, উনান), পাকা বাড়ি, গহনা, কাপড় অতিক্রম করে যেতে পারে না। তবু সে ভাবতে থাকে, মুগ্ধ ভাবে ঘুরেফিরে গহনা-কাপড় পরা অজানা রানীদের কথা, তার জানা দেখা বড় বাড়ির কথা।

৪

তারপর একদিন যাত্রার দিন এসে পড়ল। উম্‌দার রুক্ষ চুলে ঘি মাখিয়ে আঁচড়ে, মোম মাখিয়ে পেটি পেড়ে উঁচু খোঁপা রুক্ষ তালুর পিছনে বেঁধে, যথাসম্ভব

গহনা পরিয়ে, পরিষ্কার ঘাগরা লুগড়ি কাঁচুলি ও জামা পরিয়ে মাথায় দীর্ঘ অবগুণ্ঠন টেনে দিয়ে—তাকে রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হওয়ার তাদের মতে উপযুক্ত সাজে সাজিয়ে তার ভাই, ভাসুর আর মা তাকে নিয়ে শহরের দিকে রওনা হ'ল। আজ রাজপ্রাসাদের স্বপ্নমুগ্ধ কিশোরী উম্‌দা এই যাত্রায় কোনো বাধাও দিল না, প্রতিবাদও করল না।

নানা তদ্বির, নানা মানুষ, বহু দেখা সাক্ষাৎ করার পর একদিন সন্ধ্যায় তারা অন্তঃপুরে প্রবেশের অনুমতি পেল।

গ্রাম্য জাঠ চাষা উম্‌দার ভাই আর ভাসুর ধূলিমলিন জামা-কাপড়-পাগড়ি ধুয়ে পরিধান ক'রে, মোটা লাঠিটি হাতে নিয়ে সপ্ত-তোরণ প্রাসাদের প্রথম তোরণে বিনীত ভাবে ওদের পাঠিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। এবং মা আর মেয়ে অবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকে একজন খোজার সঙ্গে কোনো এক রানীর প্রধানা সখীর দরবারে গিয়ে পৌঁছল। উম্‌দার ধূলি-ধূসর মেহেদী-পরা দুখানি গাঢ় রক্তবর্ণ চরণকমল উঁচু ধরনের গ্রাম্য ঘাগরার তলা থেকে দেখা যাচ্ছিল। মেহেদী-আঁকা দুখানি করপল্লব জোড় করে উম্‌দা মার পাশে দাঁড়িয়েছিল।

প্রধান সখী একটু রূঢ়ভাবে বল্লে, 'অত ঘোমটা দিয়েছিস কেন? চল্ রানীজীর কাছে নিয়ে যাই, যদি রাখেন। যদি তোর কপালে থাকে।'

তারা রানী তোমরজীর (তোমর বংশের কন্যা) মহলের দুয়ারের একপাশে এসে দাঁড়াল।

উম্‌দা-জননী-বর্ণিত উম্‌দার অবাধ্যতা ও চঞ্চলতার সমস্ত কাহিনী রানীর কাছে বর্ণনা করে বড়ারণজী (বড সখী) তাকে ডেকে নিয়ে বল্লে, 'এই, মুখ তোল্। এমনি করে কুর্নিশ কর্।'

কুর্নিশ করা দেখবার জন্য মাথায় গুণ্ঠন সরিয়ে কুর্নিশ করে উম্‌দা বিনীত ভাবে পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়াল। ঝাড়ের মোমবাতির স্নিগ্ধ আলোতে অলিন্দের পাখী, ফুল আঁকা রঞ্জিত দেওয়ালের এবং কক্ষতলে বিছানো সুন্দর গালিচার রংয়ের পরিপ্রেক্ষিতে রানী তার দিকে চেয়ে সেই গ্রাম্য কৃষক বালিকার রূপে অবাক হয়ে গেলেন। সখীরা এবং খোজাও আগে দেখে নি, তারাও আশ্চর্য হয়ে চেয়ে রইল তার দিকে।

আর উমদাও তার কল্পলোকের অজানা এই বিরাট প্রাসাদ এবং প্রাসাদ-বাসিনীদের অপূর্ব বেশভূষা দেখে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। তাকে দেখে যে তারাও অবাক হয়ে গেছে, সে কথা সে বুঝতেও পারল না।

৫

কয়েকটা বছর কেটে গেছে।

সহসা একদিন গঙ্গা সিং এসে দাঁড়াল তেজ সিংয়ের বাড়ি। শাশুড়ী আর তেজ সিংকে নিয়ে সে শহর থেকে উম্‌দাকে আনতে চায়। এতদিনে নিশ্চয় সে শান্ত হয়েছে। বড় হয়েছে। স্বামীর ঘর করবার মত তার বুদ্ধিও হয়েছে।

তেজ সিং চুপ করে রইল। তার কানে বোনের 'পদোন্নতি'র খবর, তার ওপর রাজনেত্রের 'নেক নজরে' পড়ার আভাসও একটু যেন পৌঁছেছিল। সেদিন সরল জাঠ কৃষক তাতে গর্বিত হয়েছিল কিনা কে জানে, আজ গঙ্গা সিংয়ের কথায় হঠাৎ সে যেন লজ্জিত আর দুঃখিত হল। তারা তো কিছুদিন পরে বোনকে স্বামীর ঘরে ফিরিয়ে আনবে ঠিক করেই ওখানে দিয়েছিল। কিন্তু আনা তো হয়নি।

তেজ সিং বল্লে, 'তুমি এতদিন আসনি কেন?'

গঙ্গা সিং বল্লে, 'মা মরে গেল, বাপ মরে গেল, ভাইয়ের অসুখ হ'ল, অজন্মা হ'ল, আমি ভাবলাম সে যদি আবার এসে চলে যায়। তারপর আমি পলটনে চাকরি নিলাম, ছুটি পাই নি। এখন ভাল কাজ করি, তাই এলাম।'

প্রকাণ্ড তলোয়ারখানি কোলে নিয়ে পিঙ্গলবর্ণ দীর্ঘদেহ, মস্ত-গোঁফওয়ালা, মস্ত-পাগড়ি-পরা জোয়ান গঙ্গা সিং স্ত্রীর কথা বলতে বলতে গ্রামের লোকের মত সরল লজ্জিতভাবে একটু হাসলে।

বৃদ্ধা শাশুড়ী গর্বিত স্নেহভরে তার দিকে চেয়েছিল, বল্লে, 'চল যাই, নিয়ে আসি তাকে।' এমন সিপাহী জামাতা, অমন সুন্দরী মেয়ে।···ভাবে।

দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, গুম্ফ সুশোভিত রৌদ্রম্লান মুখ, দুটি জাঠ পুরুষ আর তাদের বৃদ্ধা জননী শহর অভিমুখে আবার যাত্রা করল।

সেবারের মতই তারা প্রাসাদের প্রথম তোরণে অপেক্ষা করতে লাগল, জননীকে অন্দরমহলের দেউড়ীর দিকে পাঠিয়ে।

প্রহরীমণ্ডলীর কাছে বৃদ্ধা দাঁড়াল। তারা জিজ্ঞাসা করে, 'কাকে চায়, কি আবেদন?'

উম্‌দাকে দেখতে চায়, নিয়ে যেতে চায়? কে উম্‌দা? কোনো উম্‌দাকে তারা চেনে না। কোন্ রানীর দাসী?

'তোমরজীর? আচ্ছা খবর দিচ্ছি।'

'বড়ারণজী আর প্রধান খোজার কাছে যা কেউ, এত্তেলা দে।' বহু দর্শনার্থীর দলে বৃদ্ধাও অপেক্ষা করতে লাগল। দেখা হ'ল। ভ্রূকুঞ্চিত করে প্রধানা সখী বড়ারণজী চেয়ে রইল, 'কাকে চাও ? কে তুমি ?'

প্রধান খোজাও এসে দাঁড়াল। 'উম্‌দা ! উম্‌দার মা তুমি ? তাকে নিয়ে যেতে এসেছ ? কোন উম্‌দা ?'

বিনীতা বৃদ্ধা কন্যার পরিচয় জানায়। সহসা কি মনে প'ড়ে ঈষৎ হাসির একটা রেখা খোজার মুখে ফুটে উঠল।

বড়ারণজীর মুখে হাসি এবার স্পষ্ট ও উচ্চ হয়ে উঠল।

খোজা বল্লে, 'ওহো ! তোমরা জানো না বুঝি ? উম্‌দা বাঈ তাঁর নাম নেই আর। তাঁর নাম খেতাব শোনো নি ? হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার মেয়ে তিনি জানি। কিন্তু তিনি এখন পর্দায়েত্। তাঁর মস্ত নাম, খেতাব সুমেরু রায়। মহারাজার কাছে পেয়েছেন। কি বললে ? দেখা করবে ? কি বল্‌ছিস্ তুই ? তোর মেয়ে সে, তাকে দেখতে চাস্ ? কি বলছিস্ তার বর নিতে এসেছে ? তুই পাগল হয়ে গেছিস ? ওকথা আর মুখেও আনিস নি শহরে দাঁড়িয়ে। তোর মেয়ে তিনি তা জানি। এখন আর তোর মেয়ে নেই, তিনি রানী। বুঝেছিস্, রানী ! পথে ঘাটে তাঁকে 'মেয়ে' 'মেয়ে' করলে তোর 'ফাটক' হয়ে যাবে। বুঝলি ? একেবারে গেঁয়ো। যা গাঁয়ে ফিরে যা।'

খোজা আর সখীরা উপহাসের হাসিতে উচ্ছল হয়ে উঠল।

৬

সুমেরু রায়ের কানে এ কাহিনী পৌঁছায় কিনা কে জানে। ঐশ্বর্য বিলাসময় নিরবকাশ দিনের মাঝে কে কার দুঃখময় পূর্ব জীবনের কথা বা দুঃখদাতা স্বজনের কথা মনে রাখে। কার এমন সাহস যে কোন গণ্ডগ্রামের গোঁয়ার চাষাকে আজ বলে, রাজ-প্রেয়সী সুমেরু রায়ের স্বামী ! আর এক স্থবির গ্রাম্য বৃদ্ধাকে বলে তাঁর মা !

হয়ত শুনেছিলেন, নয়ত শোনেন নি। যাক্। কিন্তু তাঁর যৌবন আর রূপ তো সীমাহীন নয়, আর প্রকৃতির মত নিত্য নূতনও হয় না এবং বিপুল পৃথিবীতে সুন্দরী নারীরও অভাব নেই।

অকস্মাৎ শহরের লোকেরা, ক্রমে গ্রামবাসিনী তার জননী তার ভাইয়েরাও শোনে, সুমেরু রায় বা উম্‌দা বাঈয়ের ওপর গঙ্গাদেবীর আবির্ভাব হয়।

সহসা একদা এক বৈশাখী পূর্ণিমার রাত্রে 'মহলী' ভবনের (স্নানাগারের) শ্বেত মর্মর কুট্টিমে শুভ্র সূক্ষ্ম বসনে প্রস্রবণের ধারাস্নাত তনু এখনো তন্বী রূপসী উমদা বাঈ ওরফে সুমেরু রায় রবি বর্মার গঙ্গাবতরণের ছবির মত গঙ্গাদেবী রূপে রাজগোচরে আবির্ভূত হয়েছেন।

মদিরামুগ্ধ রাজা মূঢ়ভাবে প্রেয়সী নারীর এই অপরূপ নবশোভাময় রূপের দিকে চেয়ে থেকে শুনলেন, গঙ্গাদেবীর আদেশে আজ এখন আর তিনি সুমেরু রায় নন—তাঁর ইষ্টদেবী গঙ্গাদেবীর অবতার।

তারপর কখনো জ্যোৎস্না রাত্রে, কখনো নক্ষত্র-খচিত চমৎকার তিমির রাত্রে দেবীর আবির্ভাব হয় তাঁর উপর।

রাজ্য সংক্রান্ত নানা সমস্যা, নানা কথা, ভবিষ্যৎ বর্তমান অতীতের মীমাংসা হয় সেদিন।

আর সঙ্গে সঙ্গে উমদা বাঈয়ের বা পর্দায়েত সুমেরু বাঈয়েরও রাজার ওপর প্রভাব হ্রাস হয়ে যাবার আতঙ্ক থাকে না। ধর্মের মোহময় ভয় রাজার নানা নারীর মোহ বিলাসকে দেবীর কাছে অপরাধ ভয়াবিষ্ট করে রাখলে।

আর গঙ্গাদেবী আবিষ্ট সুমেরু রায় প্রত্যাদেশ পান এবং রাজাকে আদেশ দেন—কখনো প্রতিদ্বন্দ্বিনী নারীকে 'কোতল' করতে, কখনো অন্য রানীদের অসম্মান করতে ; কখনো রাজ্যে কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা ওলটপালট করতে। লোকে সভয়ে অনুভব করে, বলাবলি করে, জাহাঙ্গীরের নূরজাহানের মত সুমেরু রায়ই রাজা এখন।

তবু অবতারত্বের ইন্দ্রজালের মহিমা একদিন সহসা মিলিয়ে গেল রাজার মৃত্যুতে।

আর প্রত্যাদেশ পেলেও আদেশ শোনবার জন্য মুগ্ধ হ'য়ে কেউ বসে নেই এবং আর প্রত্যাদিষ্টও হন না সুমেরু রায়।

মানুষের বিশ্বাস এত টলমলে, কয়েকদিনেই শহরের গ্রামের সকলে বুঝতে পারল, সুমেরু বাঈয়ের ওপর যে 'ভর' হ'ত গঙ্গাদেবীর—সব ছলনা, কিছুই নয়! যারা উৎপীড়িত হয়েছিল, যারা বঞ্চিত হয়েছিল, যারা লাঞ্ছিত হয়েছিল, তাদের সঙ্গে সমস্ত রাজ্যের সকলেই অবিশ্বাসেও যেন এক হয়ে গেল।

রাজার মৃত্যুতে রানীদের রাজ্ঞীত্ব আর থাকে না বটে, পদেরও পরিবর্তন হয়, মর্যাদারও প্রকার ভেদ হয়, কিন্তু তাঁদের মাজীসাহেব বা রাজমাতারূপে সম্মান প্রতাপ কিছু কম হয় না।

কিন্তু রাজ-অন্তঃপুরের প্রমোদ-প্রাসাদবাসিনী অসংখ্য বিলাস-ক্রীড়নক নারীদের সঙ্গে সুমেরু বাঈও এক নিমেষেই মূঢ় মর্যাদাহীন সাধারণ বার-নারীর পর্যায়ে মিশে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সেই মুহূর্তেই ইঙ্গিতে অঙ্গুলি হেলনে রাজ্যের নানা রকম বিপর্যয়, যথেচ্ছাচার ঘটাবার অধিকারও তার মিলিয়ে গেল।

প্রাসাদের বিরাট নারীশালায়, মহলে মহলে অন্য মেয়েদের মত তারও জীবনযাত্রা চিরকালের মত বন্দী হ'লে গেল।

তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী, তখনও রূপবতী, সুমেরু বাঈয়ের আশেপাশে আর স্তুতিবাদকারিণীদের ভিড় জমে না।

৭

এমন সময়ে একদিন এক সখীর মুখে শুনলেন বৃদ্ধা জননীর কথা, তার এখানে আসার কথা, আর ফিরে যাওয়ার কথা। বিস্মৃত শৈশবের কথা মনে পড়ে গেল। সুমেরু বাঈ ঈষৎ বিমনাভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তাকে তোরা অন্দরে আনলি নি কেন? আমাকে এত্তেলাও (খবর) দিস্ নি তো!'

এখন নির্ভয়ে সখী প্রগল্‌ভ ভাবে হেসে বল্লে, 'তার যা ময়লা গেঁয়ো কাপড়-চোপড় আর কথাবার্তা শুনে সে যে আপনার মা তাই বিশ্বাস হয়নি।' তারপর একটু মুখ টিপে হেসে বল্লে, 'সে আ 'র বলছিল সঙ্গে আছে তার জামাই আর তার ছেলে, আপনাকে তারা দেখতে চায়। দেখা করতেও এসেছে, নিতেও এসেছে।'

সুমেরু রায় ভ্রূকুঞ্চিত করে তার দিকে চেয়েছিলেন, এখন আর ওরা তাঁকে আগের মত সম্ভ্রম করে কথা বলে না। সে যেন সমানে সমানে হাসছে গল্প করছে।

তাঁর ভ্রূকুটিতে ভ্রূক্ষেপ না করে সে আবার বল্লে, 'তা খোজা সাহেব আর বড়ারণজী হেসেই খুন। তারা ওদের বল্লেন, যা পালা ছেড়ে, তোর মেয়ে এখন রানী হয়ে গেছে। ওই গাঁওয়ার'টারকে তার স্বামী বলে পরিচয় দিলে, তোদের ফাটক হয়ে যাবে'।'

সুমেরু বাঈ চুপ করে রইলেন। মনে হতে লাগল—মা আছে না নেই? ভাইরা বেঁচে আছে নিশ্চয়। আর গ্রামের মুক্ত জীবন! রাজ-অন্তঃপুরের সুখ বিলাসহীন ঐশ্বর্যহীন সে জীবন! সহসা আজকে এতদিন পরে বহু আকাঙ্ক্ষিত এই

জীবনকে যেন বন্দীশালার জীবন মনে হ'তে লাগল। রত্নঅলঙ্কার-ভূষিত দেহের পরিচর্যাকারিণী দাসী-সখীপরিবেষ্টিত বহু বিলাসময় প্রাসাদের মহিমা গৌরবের মোহ, রাজার মৃত্যুতে তাঁর ক্ষমতা লোপের সঙ্গে সঙ্গে যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে।

সখীটা বলতে থাকে, 'তারপর আবার সেদিনও এসেছিল তারা!' এবারে অপেক্ষা করে প্রশ্নের।

সুমেরু বাঈয়ের পদমর্যাদায় সম্ভ্রমের চেয়ে কৌতুহল বেশী হয়। বল্লেন, 'কে এসেছিল? মা? কেন?'

সখী হাসে একটু। তারপর বলে, 'আপনার মা ভাই আর তার জামাই আর ছেলে। আছে তারা শহরে।'

সুমেরু বাঈ জিজ্ঞাসা করলেন, 'মা এসেছে? ছেলে কার?

'ছেলে জামাইয়ের। সেপাইয়ের আর চৌকিদারের চাকরির জন্য এসেছে তারা। বড়ারণজী বলছিলেন। তা এখন তো আর আপনাকে বল্লে হবে না, এখন মহক্‌মা খাসের হুকুম লাগবে।'

সুমেরু বাঈ আবার ভ্রূকুঞ্চিত করে চুপ করে রইলেন। স্পর্ধা বেড়েছে ওদের। স্পষ্ট করে বলার এই সাহস হয় নইলে। কিন্তু চুপ করেই রইলেন। যেন কথা বললেই ওদের স্পর্ধা আর প্রগল্‌ভতা বেড়ে যাবে বুঝতে পারলেন।

কিন্তু তিনি না কথা বল্লেও সে আবার বল্লে, 'আর ছেলেটা নাকি এমন সুন্দর দেখতে। বারো-তেরো বছরের ছেলে, মস্ত তরোয়াল কোলে নিয়ে চুপ করে তার মামা আর বাপের পাশে বসেছিল। যেন মেওয়ারের গল্পের বীর বাদল। খাঁটি রাজপুতের বাচ্ছা হাজার হোক।' স্পর্ধিত কৌতূহলে সে জিজ্ঞাসা করে, 'আচ্ছা, ওকি আপনার ছেলে?'

সুমেরু বাঈ গম্ভীরভাবে বল্লেন, 'যা খসখসের পর্দাগুলো ফেলে দিয়ে তাতে জল দিতে বল। আর পাখা টানতে বল। আমি শোব।'

তবু প্রতিদিনই নির্ভয়ে কোনো না গল্পগুজবের অবতারণা করে সখীরা কেউ না কেউ।

ক্রমে সুমেরু রায়ের সয়ে যায়। আর প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে। গ্রামের কথা মনে হয়, মায়ের কথা মনে হয়, পারিবারিক জীবন যে কেমন তাও মনে হয়। সঙ্গোপনে ভাবেন, তাহলে স্বামী বিবাহ করেছিল? সন্তানও হয়েছে? এমন সুন্দর সন্তান? সপত্নী নিশ্চয়ই রূপবতী।

কেমন কৌতূহল হয়। সব সময় মনে হয় কেবলি, একবার গ্রামে যেতে পারা যায় না? বৃদ্ধা জননী ও ভাইদের কাছে তারপর রূপসী সতীনকে দেখে আসতে পারে। তার চেয়ে কি সুন্দরী সে হবে! আশ্চর্য, সপত্নীর সঙ্গে কিবা সম্বন্ধ, আর কিবা প্রয়োজন, তবু ঘুরেফিরে কিশোরকুমার তার ছেলের কথা মনে হয়। কেমন দেখতে তারা—দেখতে কৌতূহল হয়। তার কি তাতে? তবু।

আস্তে আস্তে পদগৌরবের নীহারিকা মণ্ডল মিলিয়ে আসে, সুমেরু বাঈ শহরের গল্প শোনেন, গ্রামের গল্প জানতে চান। সখীরা পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে চুল বেঁধে দিতে দিতে সব কথা বলে।

সবশেষে একদিন এক বিশ্বস্ত সখীর কাছে বলে ফেলেন, 'একবার গাঁয়ে যাওয়া যায় না?'

সে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। গ্রামে—গাঁয়ে? বাঈ সাহেবার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? মুখে বল্লে, 'সে হুকুম তো কারুর নেই। কেউই তো কখনো 'হারেম' ছেড়ে বেরুতে পারে না। শুনিনি তো।'

সুমেরু বাঈ নীরব হয়ে যান।

আবার কতদিন যায়। এবারে একদিন বলেন, 'আচ্ছা, চুপি চুপি বাসনমাজার দাসীর সঙ্গে চলে যাই যদি, আবার দু-চার দিন বাদে ফিরে আসব।'

দ্বিধাভরে সখী চুপ করে থাকে। এবারে বলেন, 'যদি সব গহনা টাকা নিয়ে তোকে নিয়ে দুজনেই চলে যাই! এখানে বন্দী থেকে আর কি সুখ?'

সুমেরুর সিন্দুকভরা ধনরত্ন, অলঙ্কার গহনা সে দেখেছে। লুব্ধভাবে সে চুপ করে থাকে, প্রতিবাদ করে না।

প্রতিদিন আলোচনা করতে করতে ভয় যায় ভেঙ্গে। আশা হয় দুর্বার। অবশেষে ঠিক হ'ল দুজনে যাবেন আগে পরে করে। প্রথমে ধন অলঙ্কার হস্তান্তর করবে আরো দু-একজন দাসীকে দলে নিয়ে, তারপর যেমন করে হোক চলে যাবেই।

মহলের পর মহল, তাতে প্রবেশের জন্য সুড়ঙ্গের পর সুড়ঙ্গ পথ, প্রাসাদের মধ্যে মহলের আর বাড়ির সমুদ্র যেন। বিরাট কেল্লার মধ্যে প্রাসাদ, তার তোরণে প্রহরী, তাদের খবরদারী। বিপুল জনতা তার মাঝে আসে যায়। কিন্তু যারা কবে একদিন শৈশবে না কৈশোরে ঐ.বিরাট অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছিল, সেই নারীরা আর তো সেই ব্যূহ কখনো ভেদ করে বাইরে ফিরে আসে নি।

তাদের পায়ে নেই সহজ গতি, মনে নেই সহজ সাহস, চোখের সামনে নেই চেনা কোনো সহজ পথ।

এক মুহূর্তে সুমেরু বাঈ সখী ও সবশুদ্ধ আবার প্রাসাদে ফিরে এলেন। এবারে প্রহরী খোজার সঙ্গে।

এবারে মহলে বন্দীশালা আরও দৃঢ় হ'ল। আর ধনরত্ন সব মহারানীর হুকুমে তাঁর কোষে বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল।

সুমেরু বাঈ শুনতে পান, তাঁর ধন ঐশ্বর্য নিয়ে এক প্রকাণ্ড মন্দির গঠিত হচ্ছে, মহারানীর করাচ্ছেন স্বামীর নামে।

অহঙ্কৃতভাবে ভাবেন তিনি, তাঁরও নাম থাকবে সেখানে, তাঁরই তো ঐশ্বর্য! তৈরী হলে দেখতে যাবেন—আগের মত সমারোহে পাল্কি বন্ধ গাড়ি খোজা ও দাসী সমভিব্যাহারে।

মন্দির শেষ হয়ে যায়, দেবদর্শনে রানীরা যান, বাঁদীরা যায়, সাধারণ মেয়েরা যায়। কিন্তু সুমেরু বাঈয়ের কোন হুকুম পাওয়া যায় না।

প্রাসাদের ভিতরে সুরক্ষিত সুন্দর মহলে একদা প্রতাপান্বিতা রাজ-প্রেয়সী, গঙ্গাদেবীর অবতার সুন্দরী উমদা বাঈ, পরে সুমেরু বাঈ, স্থবিরের মত বসে থাকেন, কিছুই ভাবতে পারেন না আর। শুধু অবশিষ্ট সামান্য সম্পদ আর মাসোহারা নিয়ে। আর তোশামোদ করে এবং পুরাতন প্রভাব দিয়ে সংগ্রহ করেন মদির পানীয়।

আচ্ছন্নমনে খাপছাড়াভাবে ভাবেন ভুলে যাওয়া গ্রাম্য জীবনের কথা, আর মাঝে মাঝে বৃদ্ধা জননীর কথা এবং না-দেখা কোন্ সুন্দর তনয়শালিনী অজানা এক সপত্নীর কথা।

রচনাকাল—১৩৫৩

শেঠানীজী

অবশেষে বহু আশা নিরাশার দ্বন্দ্বের পর শেঠানীজী রাজঅন্তঃপুরে তৃতীয় রানী চন্দ্রাবৎজীর (চন্দ্রাবৎবংশীয়া) মহলে কোন বড় জলসায় একটা নিমন্ত্রণ পেলেন। কবে একদিন কি এক সামান্য কারণে তাঁর পিতামহীর আমলে ঐ নিমন্ত্রণ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তা তাঁরা জানেন না। কিন্তু চার বছরের মেয়ে তিনি

সেই শেষ জলসায় গিয়েছিলেন। তারপর বহুদিন ধ'রে তার বিবরণ শুনে শুনে তাঁর মনে এমনি এঁকে গিয়েছিল সেই কাহিনী যে, তাঁর মনে হ'ত তাঁর সবই মনে আছে, ভোলেন নি; শোনা কথা নয়, মনে থাকা ঘটনা।

সেই শোনা কথা-কাহিনীর মোহ তাঁকে একেবারে অধীর করে তুলেছিল, আবার কোনদিন ঐ আমন্ত্রণ পাবার আকাঙ্ক্ষায়। যে ভাবেই হোক যেমন করেই হোক রাজ অন্তঃপুর আর প্রাসাদবাসিনীদের দেখা তাঁর পাওয়া চাইই।

এবং যদি রাজার দৃষ্টিপথে পড়েন!

যে মোহ যে স্বপ্ন অকারণে তাঁকে ওড়নায় ঘাগরায় কাঁচুলিতে বর্ণবিন্যাস করিয়েছে,—শ্রাবণে ঘন নীল মেঘের ছায়ায় পীত উত্তরী সবুজ কাঁচুলি পরিয়েছে, চোখে কাজল মাথায় মুক্তার সিঁথি 'বোরলায়' শোভিত করেছে। বসন্তে হালকা মতিয়া রংয়ের ওড়না নয়ত আসমানী রংয়ের উত্তরীতে পীত কঞ্চুলিকায় সেজে অন্তঃপুরের উপবনে নয়ত ছাতে বেড়িয়েছেন। প্রতি দিনই সৌখীন প্রসাধনের তাঁর শেষ ছিল না। যেন কি এক প্রতীক্ষা উৎকণ্ঠায় তাঁর দিন মাস ঋতু কেটে যেত।

তাই বলে যে তিনি কুমারী বা অবিবাহিতা ছিলেন তা নয়। স্বামী শ্যামনাথ শেঠ ছিলেন প্রচুর সম্পত্তিশালী ও প্রতিষ্ঠাবান—এক শেঠের একমাত্র বংশধর। কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠীজন অনুচিত কুদর্শন খর্ব শীর্ণ ক্ষীণ দেহ আর অতিশয় নিরীহ অপ্রতিভ ব্যক্তিত্বে নিতান্ত সাধারণের মনে হত যেন তিনি একজন পরিপূর্ণ মানুষ নন।

এক কথায়, স্ত্রী পুত্র কন্যা সত্ত্বেও তাঁকে ক্লীব বা অনতিপরিণত আধখানা মানুষ মনে হত।

২

জলসাটি ছিল তৃতীয়া রানীর মহলে। নাই বা হল মহারানীর প্রাসাদে। দেখতে তো সকলকেই পাবেন; মহারানীও সৌজন্য রেখে আসবেন।

আনন্দিত শেঠানীজী সিন্দুকে আবদ্ধ পুরুষানুক্রমিক সঞ্চিত পূর্ব শ্বশ্রূমাতাদের আহরিত ভারী ভারী হীরা-মুক্তা-সোনা-জড়োয়ার নানা দেশের গহনা ছড়িয়ে নিয়ে বসলেন। মাথায় মুকুট, সিঁথি, বোরলা, ঝাপটা,—কানের ঝুমকো, দুল, ফুল, জড়োয়া কান, মুক্তার পিপল পাতা,—গলায় সাতনরী, পাঁচনরী, কণ্ঠী,

সরস্বতী হার, হাঁসুলী, সোনার হার, মোতির মালা—বাহুর তাবিজ, জসম, বাজু, বাঁক,—হাতের নানা আকারের কঙ্কন চুড়, পৈঁছি, মানতাসা,—কটির নানা গড়নের মেখলা,—পায়ের চরণপদ্ম, পাঁয়জোর, মল মুরাঠা—সব রূপার থালায় করে সাজিয়ে ছড়িয়ে শেঠানীজী দেখতে লাগলেন।

চকচকে রূপার থালায় মুখের প্রতিবিম্ব পড়ল। শেঠানীজী সেটা হাতে তুলে নিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে তার দিকে চাইলেন।

সুন্দরী তিনি। নিজের ছায়ার দিকে চেয়ে তিনি ভাবেন।

কিন্তু রাজপ্রাসাদের সকলের চেয়ে তো সুন্দরী তিনি নন! সেখানে সংগ্রহ করে আনা, চেয়ে আনা, ইচ্ছা করে আসা, ইচ্ছা করেই রাজ অন্তঃপুরের জন্য দেওয়া মেয়েদের পাশে তিনি কি সুন্দরী বলে গণ্য হবেন! কারুর নজরে কি পড়বেন? রাজা কি দেখতে পাবেন? কয়েক বছর আগেও তিনি আরো ভালো ছিলেন দেখতে।

চোখের পাশে ও কি? রেখা পড়েছে? মাথার চুলও আগের চেয়ে পাতলা হয়ে গেছে কি? মুখের দিকে আবার দেখেন ভালো করে। নাঃ, তেমন কিছু মনে হয় না,—ভালোই দেখতে আছেন।

মন কিন্তু তবু বিমনা হয়ে যায়। আরো কয়েক বছর আগে এই নিমন্ত্রণ কেন এলো না? দীপ্ত কালো চোখ, মসৃণ ত্বক, ঘন নিবিড় কুন্তলা তখনকার তরুণী শেঠানীজীর কাছে।

দেরি হয়ে গেছে। হঠাৎ মনে পড়ে যায়—,আরসি নয় থালা ওটা। থালাখানি নামিয়ে রাখেন। আবার খানিক পরে তুলে নিয়ে দেখতে ইচ্ছা হয়। জানলা দিয়ে এসে পড়া দীপ্ত রৌদ্রে মুখ জলজল করে ওঠে এবার! মনে হয়—না, দেরি হয় নি। সেদিনের তন্বী তরুণী শেঠানী নেই বটে, আজকের শেঠানীজীর মুখের দীপ্তিও কম নেই।

সঙ্কুচিত অপ্রতিভ হাসি মুখে নিয়ে শেঠজী এসে দাঁড়ালেন। রূপবতী ও বুদ্ধিমতী স্ত্রীর বুদ্ধির উপর তাঁর ভরসা আর শ্রদ্ধার সীমা ছিল না।

জিজ্ঞাসা করলেন, 'গহনা দেখছ? আরো কিছু এখনকার জিনিস আনাব কি?'

শেঠানীজী হাতের থালায় আরশি স্বামীকে দেখে নামিয়ে রাখলেন; বললেন, 'গহনা? দেখলাম। না, এই থেকেই বেছে পরব। তবে যদি এমন হ'ত কোনো গহনা, যা' রানীদের চোখেও সহজে পড়ে না!'

স্বামী বসলেন। কিশোর ছেলে আর তরুণী মেয়েও এসে দাঁড়িয়েছিল, বসল।

স্বামী বললেন, 'আমি সিন্দুকের সব গহনা দেখি নি। তবে দু'-একটি গহনা নাকি আছে তেমন। আমার মা আমার বাবার কাছে শুনেছিলেন এক মুক্তার মালার কথা, আর তেমনি হাতের নীলার পৈঁছির কথা। আমার পিতামহী তাঁর বাপের কাছে যৌতুক পেয়েছিলেন? তিনি কাথিয়াওয়াড়ের এক বড় শেঠ ছিলেন। সেরকম গহনা নাকি এদিকে আর কোন শেঠের ঘরে নেই। খুঁজে দেখ না সেটা। সেইটে পরে দাদাজী কবে এক সময়ে রাজপ্রাসাদেও গেছেন।'

ছেলেমেয়েরা বল্লে, 'তবে তো সেও পুরোনো দেখা জিনিসই।'

শেঠজী আর শেঠানী একটার পর একটা মখমলের, হাতির দাঁতের, মীনার কাজ করা, সাদা পাথরের, ছোটবড় গহনা রাখা বাক্সগুলি খুঁজছিলেন। পুরোনো শুনে শেঠানীজী একটু হাসলেন, তারপর বললেন, 'হ্যাঁ, পুরোনো আর দেখা জিনিস বটে, কিন্তু যারা দেখেছিল তারা তো আর নেই, এখন আবার নতুন লোকে দেখবে।'

'এই যে, এইটে কি?'

একটি শ্বেত পাথরের বাক্স থেকে একটি চমৎকার মুক্তার মালা বেরিয়ে এলো। স্বামী মুগ্ধ চোখে হাতে নিলেন দেখে বল্লেন, 'এই বোধ হয়। আমাদের কাছে তো অনেক রকম আসে কিন্তু এরকম জিনিস আমিও দেখি নি।'

ছেলেমেয়েও দেখল।

শেঠানী গলার সেই মালা, চিক, কণ্ঠশ্রী, হাতের দিকে নীলার পৈঁছি, নির্মল উজ্জ্বল মুক্তার কঙ্কন, মাথায় জড়োয়া সিঁথি, আরো কয়েকটি হাতের পায়ের ও কটির কি কি বেছে বেছে দেখতে লাগলেন।

রাত্রি দ্বিপ্রহরে জলসা বসবে। মনে তাঁর উদ্বেগের সীমা নেই। না জানি সে কি রকম উৎসব! না জানি কত অপূর্ব রূপবতী সুন্দরীর সমাগম হবে সেখানে! রানীরাই বা কেমন সুন্দরী হবেন? দেখা যাবে কি সকলকে? শোনা যায়—ওখানে দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকে রাখাই নিয়ম। শুধু মহারানীরই মুখ দেখতে পাওয়া যায়।

তাঁকেও কি অতখানি ঘোমটা দিতে হবে?

তা হলে কিছুই দেখতে পাবে না। কিন্তু সখীরা 'পাত্রীরা' তো ঘোমটা দেয় না। উন্মনা উৎসুক শেঠানীজী প্রাসাদবাসিনীদের রূপ, তাদের জীবন, তাদের ঐশ্বর্যসুখ, তাদের বিলাস সাজ-সজ্জার কথা ভাবতে থাকেন।

৩

দ্বিতীয় প্রহর রাত্রে-লাল কাপড়ের ঘেরাটোপ পরা রঞ্জিত ভুজ-শৃঙ্গ, শুভ্র বলীবর্দ-বাহিত রাজ-রথ এলো আমন্ত্রিতার জন্য। শেঠানীজীর উৎসুক উৎসব-সজ্জা সন্ধ্যা থেকেই শুরু হয়েছিল। তিনি সঙ্গিনী ও পরিচারিণীদের সঙ্গে রাজ-রথে উঠলেন।

কানাত-ঘেরা অন্তঃপুর তোরণের সামনে রথ থামল। দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে মুখ আবৃত করে তিনি খোজা ও অন্যান্য অভ্যাগতদের সঙ্গে প্রাসাদের অন্তঃপুরের প্রাঙ্গণ, তারপর দীর্ঘ সুড়ঙ্গ পথ ও মহলের পর মহল অতিক্রম করে গন্তব্য প্রাসাদে পৌঁছলেন। তাঁদের নির্দিষ্ট পদানুসারে বসবার জায়গায় খোজা আর দাসীরা বসিয়ে দিল।

নিঃস্তব্ধ সভা। মাঝে মাঝে মহারানী রাজা ছাড়া আর কেউ কোন কথাই কইছে না। রানীদের সখীরা দলে দলে এক এক দিকে বসে আছে। কোন দলের নীল ওড়না, কোন দলের গোলাপী, কারো বা বেগুনী, অথবা ফিকে সবুজ ওড়না। এক এক রানীর সখীর দলের এক এক বিশেষ রং এক এক উৎসবের দিনে।

ঘোমটার আড়াল থেকে আঙুলের ফাঁক দিয়ে দিয়ে শেঠানী গল্পের মত সব দেখতে লাগলেন।

তারপর নজর ও পরিচয় আরম্ভ হ'ল। পদ অনুসারে প্রধান খোজার সঙ্গে এক এক জন এগিয়ে যায়। তিনবার নিচু হয়ে কুর্নিশ করে, রাজার সামনে গিয়ে নজর ভেট করে পিছিয়ে ফিরে যায় নিজের আসনে।

শেঠানীজীর আহ্বান এলো। খোজার নির্দেশ অনুসারে শেঠানীজীও নজর করলেন।

রাজা তাঁর হাতের মুদ্রা তুলে নিলেন এবং খোজার মুখে পরিচয় শুনলেন।

সূক্ষ্ম নীল গুণ্ঠনের আড়াল থেকে তাঁর গলার মুক্তার মালা, মাথার সিঁথি, কানের ঝুমকো ঝলমল করে উঠলো। হাতের নীলার পৈঁছি ঝাড়ের আলোতে

ঝিকমিক করতে লাগল। দুর্লভ ও বহুমূল্য স্বল্পাভরণে ভূষিত নবাগতার কুর্নিশ অবনমিত দেহশ্রী রাজার চোখে পড়ল। রাজার পাশে মহারানীও ভ্রুকুঞ্চিত করে তাঁকে দেখলেন ও নজর গ্রহণ করলেন।

৪

না, শেঠানীজীর ভুল হয় নি। দেরি হয় নি। তরুণী নারীর সরল ব্রীড়া-স্নিগ্ধ রূপ আর তাঁর নেই বটে, কিন্তু পরিণত-যৌবনা নারীর ইচ্ছাকৃত লজ্জানত অর্ধাবগুণ্ঠিত মুখে, সুরমা-আঁকা নত চোখে, সুন্দর করে ঈষৎ হাসিতে লাস্য লীলার অভাব নেই।

জলসা উৎসব আর তাঁর বাদ পড়ে না। ক্রমশঃ মহারানীর জলসার উৎসবেও শেঠানীজীর আহ্বান আসে। না হলে চলে না আর। মহলে মহলে বহির্জগতের নানাবিধ খবর এনে দেন, যা' সহজে অন্তঃপুরে পৌঁছায় না। অতিশয় মধুর নম্রভাবে সকলের সমান মনোরঞ্জন করেন। রানীদের জন্য ফুলের মালা গেঁথে বা গাঁথিয়ে নিয়ে আসেন, ফুলের তোড়া বাঁধিয়ে আনেন। গহনার নতুন গড়ন এনে দেখান, গড়িয়ে আনান। পাশাখেলায় তাসখেলায় সুবিবেচিত ভাবে হেরে যান' কেউ অসুস্থ হলে পরম মাধুর্য-ভরা মুখে তার কাছে এসে বসে থাকেন। সখীদের জন্য, কন্যাদের (পাত্রীদের) জন্য নানাবিধ আচার, ঝালমশলা দেওয়া পকৌড়ি বড়া নিয়ে আসেন বাড়ি থেকে রথে করে।

আর ওড়না কাঁচুলি ঘাগরার রঙে, অবগুণ্ঠনের ছায়ায় কাজল আঁকা নত নেত্রে, মধুর হাসিতে তাঁর মুখ নিত্যই নূতনতর শ্রীতে মণ্ডিত হয়ে ওঠে।

রাজাও মাঝে মাঝে শহরের খবর কাহিনীর কথা শেঠানীজীকে জিজ্ঞাসা করতে বলেন—বড় ঘরের, দরিদ্র ঘরের পারিবারিক কথা। তাদের সুখ দুঃখ স্বচ্ছন্দ সুন্দর মধুর জীবনের সে কথা; কত রকম গোপন দুর্বলতা কলঙ্কেরও কথা। শেঠানী তাঁর সুন্দর স্বল্প আভরণ, নিত্য নব নব রঙের সুন্দর আবরণ, বিনম্র মধুর হাসি, অকারণ করুণ ভঙ্গীতে মিশিয়ে যেন সমস্ত ইন্দ্রিয় অস্তিত্ব দিয়ে গল্প করেন, সত্যকে রচনা করে, মিথ্যাকে কল্পনা করে ঘটনাকে রঞ্জিত করে তুলে। সঙ্গে সঙ্গে ঘোমটার আড়ালে তাঁর কানের' ভূষণ দুলে ওঠে। মেহেদীর ফুল কাজ আঁকা কর-পল্লব লীলায়িত হয়ে ওঠে। কখনো বা মাথায় গুণ্ঠন অকারণেই টেনে

দেন, কিন্তু নামে না, শুধু জরির পাড়টুকু নড়েচড়ে ওঠে। আর কখনো মহারানী, কখনো অন্য রানীদের মধ্যস্থতায় রাজাও গল্প শোনেন।

অসংখ্য নারীবেষ্টিত পরিবারসুখহীন রাজা-রানীদেরও যেন সেই গল্পে কিসের মোহময় নেশা হয়। রানীদের লাস্যছলনাময়ী শেঠানীর ওপর ঈর্ষা হয়, বিতৃষ্ণার শেষ থাকে না। তবু বিপুল কৌতূহল ভরে সেই সব নগর-জীবন কথা শোনেন। যা' কোনদিন অন্তঃপুরে এসে পৌঁছতে পারে না।

ক্রমে শেঠানীজী রাজারই সখীর মত হয়ে ওঠেন। এবং দীর্ঘ অবগুণ্ঠন আর রানীদের মধ্যস্থতা অবান্তর হয়ে উঠলো সেদিন। রাজার প্রিয়তমাত্বের গৌরব বা গর্ব রানীদের নেই। তবু তাঁরা বিরক্ত হয়ে উঠলেন শেঠানীর উপর। এবং অবশ্য সকলেই বিরক্ত হলেন তৃতীয়া মহিষীর ওপর। সেইতো নিমন্ত্রণ করে এনেছে।

তৃতীয়া রানীও তিক্ত বিরক্ত হ'য়ে ওঠেন। কে জানত ওই নারী এমন! ওর স্বামী আছে সেই বা কেমন? খোজার দ্বারা শেঠজীর কাছে ইঙ্গিত করে পাঠান। ক্লীবের মত শেঠ নির্বোধের মতই শুধু হাসে; গায়ে মাখে না। তার স্ত্রী রাজার মনোহারিণী—এ কি তার কম গৌরব!

সখীরাও অসুখী হয়ে ওঠে। তাদের আর রাজার মাঝখানে শেঠানী যেন একটা যবনিকা। রাজা কবে তাদের দিকে চাইবেন? তাদের জীবনে আর কি আশা?

৫

অকস্মাৎ তৃতীয়া রাণীর প্রাসাদে একদিন এক বালিকা পাত্রী বল্লে, 'আপনার চুল বেঁধে দোব শেঠানীজী?' তারপর খেলাচ্ছলে মাথার ওড়না সরিয়ে দেয়। সোনার সিঁথি নামিয়ে রাখে। কানের গহনা আলগা করে দেয় চুল থেকে। জরি জড়ানো বেণীর জরি খোলে।

সোনার সিঁথি সরানো খালি জায়গায় কপালের পাশে কয়েক গাছি সরু সরু রূপালি চুল কালো চুলের মাঝে চিক্‌চিক্ করে ওঠে।

সরল হাস্যে উচ্চকণ্ঠে বালিকা বলে, 'ও শেঠানীজী, আপনার যে মাথায় পাকা চুল হয়েছে!'

শেঠানীজী ত্রস্তে অবগুণ্ঠন মাথায় তুলে দেন। তারপর অপ্রস্তুত ভাবে

নিজেই সিঁথি পরে নেন, কানের গহনা পরেন। আধ-বাঁধা বেণীতে জরি জড়িয়ে নেন।

সমুখের রৌদ্রোজ্জ্বল মুকুরে তাঁর অপ্রতিভ ত্রস্ত মুখের ছায়া পড়ে। চোখের পাশের সরু সরু রেখা স্পষ্টভাবে দেখতে পান।

ওদিকে রূপার খাটে বিশ্রামনিরতা অদূরবর্তিনী তৃতীয়া রানীর অধরে একটু সূক্ষ্ম হাসির রেখা ফুটে উঠে মিলিয়ে যায়। আস্তে আস্তে প্রাসাদ-সমুদ্রে কথার তরঙ্গ ওঠে আর ভেঙ্গে পড়ে। ছোট ছোট কথা হাসির বুদ্‌বুদ্ ওঠে মহলে মহলে।

তারপর রাজার কাছে একদিন লজ্জিত আহত শেঠানীজীর দু ফোঁটা চোখের জল পড়ল। আর সে চোখের জল বৃথা পড়ল না। তুচ্ছ কারণে তৃতীয়া মহিষীর পানখাবার জায়গীর বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল রাজ সরকারের। এবং অপমানিতা রাজকন্যা ও রাজমহিষী নিঃশব্দে স্বামীর দেওয়া অন্য অন্য জায়গীরের আয়ও ছেড়ে দিলেন।

অভিমানিনী তেজস্বিনী রানী অবশেষে পীড়িত হয়ে শয্যা গ্রহণ করলেন। মহারানী ও অন্যান্য সপত্নীরাও দেখতে এলেন। রাজার কানেও খবর পৌঁছল।

রাজা সমারোহে চিকিৎসা পথ্যের ব্যবস্থা করে দিলেন। প্রথামাফিক জিজ্ঞাসা করে পাঠালেন খোজা পাঠিয়ে কিছু 'ফরমাশ' আছে কি না?

দৃপ্তা রাজবংশের দুহিতা খোজাকে বল্লেন, 'হুজুর সাহেবের অনেক মেহেরবানি। কিছুই দরকার নেই আমার। শুধু তাঁকে ব'লো তিনি 'বাঁদীদের বান্দা' হয়ে থাকুন।'

কিছুদিন পরে যথারীতি সমারোহে রানীর মৃত্যু হ'ল। এবং তারও চেয়ে সমারোহে শোকযাত্রা ও শ্রাদ্ধ হ'য়ে গেল।

রাজার স্ত্রীর বা স্ত্রীলোকের কোনো অভাবই নেই। কাজেই বিয়োগ বিরহের কথা ওঠেই না।

কিন্তু বাঁদীর বান্দা হওয়ার তিক্ত শ্লেষ তাঁর মনে ছিল। আর শেঠানীর চুল বাঁধার কাহিনীও তাঁর কানে পৌঁছেছিল।

এবারে রাজা মাঝে মাঝে চেয়ে দেখেন শেঠানীর পানে। বহু-নারী-বিলাসীর মোহ যেন কেটে আসছিল।

সহসা একদিন জিজ্ঞাসা করলেন শেঠানীজীকে, 'তোমার কি ছেলে-মেয়ে আছে না? কত বড় তারা? মেয়েকে দেখতে কেমন? একদিন তাকে এনো।'

শেঠানী চকিত হয়ে উঠলেন। নিজেদের মধ্যে চটুল লঘু প্রকৃতি নারীদের

আড়াল থেকে যেন কোন চিরকালের জননী জেগে উঠল। মেয়েকে এই জায়গায় ?

একটু স্তব্ধ হয়ে থেকে বল্লেন, 'মেয়ে আমার ছোট। আর তার বিয়ে হয়ে গেছে।'

'ছোট! কত ছোট ? কত বয়স ?' ক্রূরভাবে কৌতূহলী রাজা জিজ্ঞাসা করলেন।

জননী শেঠানী নতমুখে বল্লেন, 'তা পনের-ষোল বছর হবে।'

'ও! তাহলে চন্দাবৎজীর পাত্রীরা তোমাকে ঠিকই বলেছিল বুড়ো হওয়ার কথা।' ওঁরই কথাতে চন্দাবৎজীর জায়গীর বাজেয়াপ্ত হয়, মনোমালিন্য হয়। তাই নিয়ে 'ভাঙ্গী' ঝাড়ুদারেরা চিরকালের প্রথামত গান বেঁধে গেয়ে বেড়ায়, শহর-রটিয়ে।

কিন্তু বাজেয়াপ্ত জায়গীর তো ফিরিয়ে দেওয়া গেল না তাই বলে। দিলে তিনি নিতেনও তিনি।

আরক্ত লজ্জিতমুখে শেঠানীজী অপমান গলাধঃকরণ করলেন।

রাজা বল্লেন, 'তোমার মেয়েকে আনতে রথ যাবে।'

সুসজ্জিত রথ গেলো কয়েক দিন পরে শেঠানীজীর বাড়ি এবং শুধু জননীকে নিয়েই ফিরে এলো।

খোজা গিয়ে জানালে রাজাকে। শেঠানীও করযোড়ে নিবেদন করলেন কন্যাকে তার শ্বশুরবাড়ি থেকে বিকানীরে নিয়ে গেছে। আজ আর তার মুখে লঘু লাস্যলীলাময় মধুর হাসি নেই; অভ্যস্ত সুসজ্জিত বসনভূষণের শোভা ও অবগুণ্ঠনের আড়ালে যেন ভীত বিবর্ণ-মুখ এক জননী মূর্তির আভাস পাওয়া যাচ্ছে। রাজা সখীদের নৃত্যগীতে নিমগ্নচিত্ত ছিলেন,—তাঁর দিকে চাইলেন না।

শুধু বাড়ি ফেরবার সময় খোজার মুখে হুকুম পেলেন শেঠানীজী, প্রতিদিন সন্ধ্যায় তাকে আসতে হবে। জলসার উৎসবে আমন্ত্রণ নয়। প্রতিদিনের উপস্থিতি ও অপেক্ষা, তারপর আদেশ হলে ফিরতে পাবেন।

সখীদের মহলের একটা ঘরে দিনের পর দিন হাজিরা দিতে বসে থাকেন শেঠানী। রাজদর্শন কোনোদিন মেলে, কোনোদিন না। আর লাস্যসঙ্গিনীও নয়, প্রোষিত-ভর্তৃকাও নয়, বহু-বিলাসীর পরিত্যক্ত বিলাস-ক্রীড়নক যেন। হাসির দীপ্তিহীন মুখে, ম্লান অধরের পাশে, চোখের কোণে বলীরেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। চোখে কাজল আর সুক্ষ্ম হয়ে আঁকা হয় না, নিত্য নূতন বসনভূষণের

শোভা আর ফোটে না ; করপল্লবে, চরণে মেহদীর নূতন নূতন ফুলকারী কাজ আর আঁকা থাকে না।

সখীরা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। কি যেন জিজ্ঞাসা করতে গিয়েও জিজ্ঞাসা করতে সাহস করে না, কয়েকদিন আগেও তিনি সম্মানিতা অতিথি ছিলেন। তাদের মনে হয় যেন কতদিন ধরে পীড়িত হয়েছেন তিনি।

অকস্মাৎ কার নিষ্ঠুর ইঙ্গিতে তার ভাণকরা যৌবনের দীপ্তি হেমন্তের আকস্মিক সন্ধ্যার মত ম্লান হয়ে গেছে যেন।

নিজেদের মধ্যে অন্তঃপুরবাসিনীরা প্রাসাদবাসিনীরা বলাবলি করে শেঠানীজী পীড়িত।

রাজাদেশে একদিন খোজা আসে কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করতে।

শেঠানী মিনতি করে বল্লেন, 'তাঁকে বাড়িতে গিয়ে কিছুদিন বিশ্রাম করার হুকুম হোক, রাজার কাছে আবেদন জানাতে। তিনি অসুস্থতা বোধ করছেন।'

খোজা চলে যায়। তারপর ফিরে আসে হাতে রূপার থালার ওপরে একটি মদিরা পাত্র নিয়ে। বলে, 'এই ঔষধ আপনার জন্য মহারাজা পাঠালেন। আর বল্লেন আপনার ইলাজ (চিকিৎসা) ও বিশ্রাম এখন থেকে এখানেই হবে। সেরে উঠে বাড়ি ফিরবেন।'

শেঠানী অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন ; জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখানে ?' তারপর বল্লেন, 'কি ওষুধ ?'

খোজা একটু চুপ করে থেকে তারপর বল্লে, 'তাতো জানি না।'

সখীদের মহলে একটা মহল শেঠানীজীর আরোগ্যশালা হল। প্রতিদিন সকালে রাজবৈদ্য আসেন, যবনিকার অন্তরাল থেকে নাড়ি দেখে যান। ঔষধের বিধান দিয়ে যান। আর সন্ধ্যায় আসে খোজার হাতে রূপার থালার উপরে এক গ্লাস ওষুধ। ঔষধ পান করা হলে দাসীরা পাত্র ধুয়ে নিয়ে আসে, তারপর খোজা ফিরে যায়।

দিনের পর দিন গেল। মাসও গেল। ম্লান আচ্ছন্নভাবে শেঠানীজী শুয়ে থাকেন। চলে যাবার কথা জিজ্ঞাসা করতে চান, সাহস হয় না। এখন আর পুরাতন ভরসা নেই। অবশেষে একদিন খোজাকে বল্লেন, 'আমি কবে যেতে পাব ? এ ওষুধ কতদিন খেতে হবে ? শরীর এতে যেন আরো খারাপ লাগছে। আর খাব না।'

খোজা নীরবে ওঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকে, 'ওষুধ তো আপনাকে খেতেই .হবে—মহারাজের হুকুম।' তারপর বলে ফেলে 'চন্দাবৎজীও তো খেয়েছেন।'

শেঠানীজীর কোটরাবিষ্ট চোখ বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। রানী চন্দাবৎজীও খেয়েছিলেন?—ভালতো হন নি? চকিতে মনে পড়ে যায়—রাজ-অন্তঃপুরের নানাবিধ কাহিনী, নানা জনশ্রুতি···।

ভীত অস্ফুটস্বরে কি বলতে যান; ততক্ষণে খোজা অতর্কিত বলা কথা সামলে নিয়ে ইঙ্গিতে দাসীদের সামনে কথা কইতে নিষেধ করে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

অদ্ভুত ভাবনায়, ভয়ে, আচ্ছন্নভাবে শেঠানীজীর রাত্রি কেটে যায়। প্রভাত হয়, যথারীতি রাজবৈদ্য আসেন। দাসী, সখীরা কুশলপ্রশ্ন করে চলে যায়। উৎসুকমুখে উৎকণ্ঠিত শেঠানী কেবলি ভাবেন, কাকে তিনি জিজ্ঞাসা করবেন, এ কি ঔষধ? কার মুখে তিনি রাজার কাছে বাড়ি ফিরে যাবার আবেদন জানাবেন? কে তাঁর এমন আছে এখানে? সৌভাগ্যের দিনে তিনি তো কারও প্রিয় ছিলেন না।

দাসীরা আহার্য আনে, পথ্য আনে নানাবিধ পাত্রে প্রকাণ্ড থালায় সাজিয়ে একটুও মুখে দিতে পারেন না।

নিঃশব্দ প্রাঙ্গণে নিঃস্তব্ধ রৌদ্রোজ্জ্বল দ্বিপ্রহর নেমে আসে। চুপ করে শুয়ে থেকে চোখ জলে ভেসে যায়। কুদর্শন নির্বোধ স্বামীর বিনীত নম্র সোহাগ, সমাদার, কিশোরকুমার তনয়, তরুণী কন্যা, তাদের হাসি কথা আলাপে মুখরিত নিজের গৃহখানির কথা মনে পড়ে।

হয়ত আর কোনোদিন সেখানে ফিরে যাবেন না।

কখন মুদিত চোখের আড়ালে সন্ধ্যা নেমে এলো। প্রদীপ জেলে দিয়ে গেল দাসীরা।

আর খোজার হাতে রুপার থালায় করে নিয়মিত ঔষধও এলো।

ব্যাকুলভাবে শেঠানীজী উঠে বসলেন, চোখ জলে ভরে গেল। মিনতিভরা চোখে তিনি খোজার পানে চাইলেন, অস্ফুটস্বরে বল্লেন, 'এ ঔষধে তো ভাল হব না; আর খাব না।'

সে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে তাঁর হাতে গ্লাসটা দিয়ে বল্লে, 'ভাল হবেন বৈকি। খেয়ে নিন। মহারাজার হুকুম।'

বিবর্ণ মুখে শেঠানীজী ঔষধ হাতে নিয়ে মুখে তুললেন খোজা ফিরে গেল শূন্য পাত্র নিয়ে।

বাল্যকাল থেকে পরম আকাঙ্ক্ষিত প্রাসাদের অন্তঃপুরের কক্ষে হাতির দাঁতের কাজ করা চমৎকার পালঙ্কে সুন্দর শয্যায় দাসী-সখীদের দ্বারা সেবিতা শেঠানীজী আবার শুয়ে পড়েন। ভয় আছে অথবা নেই, ভালো হবেন কি না, সব অনুভূতিই যেন অসাড় হয়ে গেছে। ভয়ে, ভাবনায় ও ঔষধের গুণে আচ্ছন্ন অভিভূত শেঠানীজীর মনের চোখের সামনে ভেসে আসে—তার পরদিন, তারও পরদিন,—রূপার থালায় ঔষধের গ্রাস রাখা আবর্তিত মালার মত শুধু এ একটি প্রতিদিন···। এর শেষ কবে ? আচ্ছন্নতা ও বিস্মৃতির মাঝে শেঠানীজী আর ভাবতে পারেন না।

রচনাকাল—১৩৫৪

সেপাই পিসিমা

চল্লিশ বছর আগের সেকাল। রাজস্থানের একটি শহর। সকালবেলা। একটি বাড়ির বাইরের আঙিনায় একটি পাথরের চৌকির ওপর বসে গৃহস্বামী সেকালের মতই 'বারদুয়ারে' বসেই দাঁতন করছেন, একপাশে নাপিত বসে আছে কামানোর সরঞ্জাম নিয়ে। দু-এক্জন ভৃত্য মুখ ধোবার জল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সেকালের মতই আবেদন-নিবেদনের পসরা নিয়ে, ব্যক্তিগত প্রয়োজন নিয়ে দু-চারজন দাঁড়িয়ে আছে। কারো নিজের চাকরি, কারো পদোন্নতি, কারুর বা কোনো বিশেষ বক্তব্য আছে।

সহসা একটি নারী এসে নত হয়ে সেলাম করে দাঁড়াল। কালো রং, মুখে বসন্তের দাগ, সোজা শক্ত, লম্বা চোস্ত চেহারা, দেখলে মনে হয় যেন নারী নয়, একজন সেপাই। মাথায় পাগড়ি নেই, এবং ঘাগরা 'লুগরী' (ওড়না) পরা তাই মেয়ে বলে স্বীকার করে নিতে হয়। হাতে, গলায়, কানে, নাকে, মাথায় কোন গহনা নেই। শুধু পায়ে রূপার মোটা কড়া (মল) আছে (পুরুষের মতই)। মাথার চুলগুলিও সৈন্যদের মত ছোট্ট করে ছাঁটা।

সঙ্গে একটি সুন্দর সুশ্রী দশ-বারো বছরের বালক। মস্ত পাগড়ি মাথায় আর প্রায় নিজের মতই দীর্ঘ প্রকাণ্ড একটি খাপেভরা তরোয়াল হাতে নিয়ে বিনীত ভাবে দাঁড়াল।

গৃহস্বামী জিজ্ঞাসু চোখে চাইলেন। নারী আবার দীর্ঘ অভিবাদন করে দাঁড়াল এদিকওদিক চেয়ে। যেন এতলোকের সামনে সে নিজের বক্তব্য বলতে সঙ্কোচ বোধ করছে।

গৃহস্বামীর ইঙ্গিতে বাইরের যাচকরা সরে গেল। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি চাই তোমার ?'

সে ছেলেটির হাত ধরে এগিয়ে এলো, তারপর ছেলেটির মাথার পাগড়িটি মাথা থেকে নামিয়ে আর তরোয়ালখানির সঙ্গে গৃহকর্তার সামনে রেখে বল্লে, 'আমি এদের নিয়ে আজ আপনার শরণ নিলাম। এ আমার ভাইপো। আমার ভাজ ও তার আর দুটি ছেলেমেয়ে আপনার বাড়ির পিছন দিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমার ভাইয়ের তিন বছর হ'ল মৃত্যু হয়েছে। ভাজের বয়স খুব কম। আমাদের আর কোনো নিকট আপনার লোক নেই। ভাই গ্রামের জমিদার ছিল। প্রায় তিনশো বিঘা ফসলের জমি ক্ষেত ও আটটা কূয়ো, কিছু প্রজা আমাদের আছে। কিন্তু এখন ভাইয়ের অবর্তমানে আমাদের জ্ঞাতিরা প্রজাদের দল বেঁধে আমাদের পিছনে লেগেছে। ফাঁকি দিয়ে নাবালক ভাইপোদের আশেপাশের জমি থেকে বঞ্চিত করার মতলবে আছে। আর··· ।'

তার সেপাইয়ের মত কঠিন চোখে এবারে জল এলো, একটু থেমে সামলে নিয়ে বল্লে, 'আর তাছাড়াও—ভাজের বয়স কম তার পেছনে দুষ্ট লোক লাগিয়েছে আমার বাপের বংশের মান-ইজ্জত নষ্ট করার মতলবে। আমাদের গাঁ-দেশে তো মাটির ঘরে খড়ের চাল, দরজা বেড়াও শক্ত নয়—কোনদিন আগুন লাগিয়ে দেবে কিম্বা অন্য কিছু গোলমাল করবে।

'আমি কোন উপায় না পেয়ে আপনি বাঙালী সজ্জন আপনার কাছে এলাম। আপনাদের ঘরে আমি ভাজকে দাসী রেখে গেলেও জানব মান-ইজ্জত বজায় থাকবে। আমাদের ঠাকুর (জমিদার) লোকদের ঘরে আমি সে-ভরসা পাই না। আমি রাজপুতের পাগড়ি তরোয়াল রেখে তার ইজ্জত বাঁচাবার জন্যে আপনার শরণ নিলাম। আমার দেশের বড়লোকদের ওপর আমার ভরসা নেই। শত্রুরা আমার বিপক্ষে বলে টাকা দিয়ে তাদের হাত করবে। ওদের এখানে রেখে দিয়ে আমি মামলার ব্যবস্থা করব আপনার পরামর্শ অনুসারে।' শান্তভাবে চোখ মুছে সে গৃহকর্তার দিকে চেয়ে রইল, কি তিনি বলেন।

সে আবার বল্লে, 'ওকে দাসী করে রাখুন। সব কাজই করবে, আটা পিষবে, আপনার ঘরে ছোট ছেলেমেয়েদের দেখবে, ঝাঁট মোছা ধোয়াও করতে পারবে শুধু

উচ্ছিষ্ট বাসন ধোবে না। কারুর সামনে বেরুবে না, বাইরে বেরুবে না। আর পুরুষ চাকরদের সঙ্গে কথা কইবে না। একটি পৃথক ঘর ওদের থাকবার জন্যে দেবেন, আর রাত্রিদিন ঘরের লোকের মতই সব কাজ করিয়ে নেবেন। যদিও পরের বাড়ির চাকরি আমাদের বংশের কেউ করেনি…।'

সে আবার চোখ নিচু করে নিলে। তারপরে বল্লে, 'তাদের এনে আপনাকে 'বন্দেগী' করিয়ে যাই?'

গৃহস্বামী বল্লেন, 'আনো।'

বাড়ির পিছন দিক থেকে সে তার ভাজ ও অল্প দুটি ছেলেমেয়েকে নিয়ে এলো।

দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে আবৃত পরিষ্কার ঘোর রঙের ঘাগরা ও ওড়না পরিধানে ও হাতে পায়ে পৈঁছা কঙ্কন, তাবিজবাজু, রূপার ও সোনার পদক দেওয়া হার গলায়, কোমরে রূপার মেখলা—পায়ে তিনচার গাছা করে মলজাতীয় গহনা পরা একটি তন্বী নারী একটি বছর তিনের মেয়ে কোলে আর একটি বালকের হাতে ধরে এসে দাঁড়িয়ে হাত যোড় করে নমস্কার করে মাথা নিচু করে দাঁড়াল। হাতে পায়ে সধবার চিহ্ন মেহেদি পরা নেই।

গৃহস্বামী বল্লেন, 'আচ্ছা থাকবে আমার বাড়ির মেয়েদের দিকেই। কিন্তু মাহিনা কি নেবে যদি কাজ কর.ে দাও।

ননদ অপ্রতিভ, বিব্রত মুখে বল্লে, 'যখন আপনার শরণাগত, দাসত্ব স্বীকার করেছি, তখন আপনি যা' বিবেচনা করবেন, হুকুম করবেন, তাই আমায় তামিল করতে হবে, যতদিন আমার ভাইয়ের বিষয়-সম্পত্তি উদ্ধার না-হয়। চাকরি তো আমরা কখনো করিনি বাবুজী। আমাদেরইতো কত লোকজন ছিল। কিন্তু আমাদের ইজ্জত মানের দায়ে আমরা আপনার তাঁবেদার খিদ্‌মৎগার হয়ে থাকব চিরদিন।'

গৃহস্বামী তাদের এক ভৃত্য দিয়ে অন্তঃপুরে পাঠিয়ে দিলেন। আর নিজের পিছনের দিকের ঘরের জালির, জানলার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কি কেউ এখানে আছ?'

জানলার কাছে স্ত্রী কন্যারা কেউ না কেউ মাঝে মাঝে সকালে বসে সেলাই বা পড়া শোনা করতেন।

কন্যা বল্লেন, 'আছি বাবা।'

পিতা বল্লেন, 'আচ্ছা এদের—ওই মেয়েটিকে ভিতরের দিকের আটা পেষার

ঘরটার অন্ত সব দিক—গরু, ঘোড়ার দানার দিক—খালি করিয়ে দাও। ও আজ থেকে এখানে রইল। আমি চা খেতে গিয়ে সব কথা বলছি।'

সেকালের চা খাওয়া, (টেবিল চেয়ার বয় বাবুর্চির যুগ তখনো চালু হয়নি) দালানে মাটিতে আসন পেতে বসে চায়ের ব্যাপার সমাধা হ'ত। চা পাঁউরুটি, কিম্বা চায়ের সঙ্গে লুচি তরকারী নিমকি মিষ্টি যাই হোক।

কর্তা ভিতরে এলেন।

গৃহিণী একটি পিঁড়ি পেতে বসেছিলেন চায়ের দেশী আসরের সামনে। বিধবা কন্যা জলখাবার ও চায়ের কেতলী এনে রাখলেন। গৃহিণী চা পরিবেশন করলেন।

খেতে বসে কর্তা বল্লেন, 'মেয়েটি ভিতরে এসেছে?'

মেয়ে বল্লেন, 'হ্যাঁ দানার কোঠ্যারে (ভাঁড়ার) বসতে বলেছি।'

গৃহস্বামী এবারের গৃহিণীর দিকে চেয়ে বল্লেন, 'একটি আশ্রিত তোমার হেফাজতে এলো! কাজকর্ম কিছু কিছু করবে বলেছে। বাসনটা মাজবে না, বাইরে বেরুবে না, বাজার পাঠানো চলবে না, এঁটো ছোঁবে না, ছাড়া কাপড়ও কাচবে না···অনেকটা 'দেবী-চৌধুরানী'র গোবরার মার মত মনে হচ্ছে।' কর্তা ঈষৎ হেসে স্ত্রী ও কন্যার দিকে চাইলেন।

তারপর কন্যাকে বল্লেন, 'তবে তোমার ছেলেমেয়েদের দেখবে, রান্না ঘরটাও ধোবে, আর বাড়ির সব আটা পিষবে। দেখো, যেন চাকররা কেউ ওর ঘরের দিকে না মাড়ায়। ওর ননদটি একেবারে সেপাই, কেউটে সাপও বলা যায়—ছোবলাবে তা হলে। তোমার ওপর ভার দিলাম ওর।' গৃহিণীকে বল্লেন, 'দেখেছো নাকি সেপাইটিকে?'

গৃহিণী বল্লেন, 'না আমি ওদিকে ছিলাম, রমা বলছিল। তা চাকরি করতে এসে অত পর্দা করলে কি করে চলবে। চাকর বাকর তো সব জায়গায় ঘুরচে।'

কর্তা একটু হাসলেন, বল্লেন, 'চাকরি ঠিক নয়—গহনা দেখলে না? আর ঘোমটার বহর তো দেখলে, ও নিজেই নিজের পর্দা রাখবে।' কর্তার চা পান হ'ল, উঠে গেলেন।

গৃহিণী কন্যার দিকে চেয়ে বল্লেন, 'গয়না তো এদেশে অমনি করেই সবাই পরে। ঝি চাকরানী মেথরানী সকলেরই গা-ভরা গহনা আছে। তা এত পর্দা নিয়ে কি আর চাকরি করা চলে। রকম দেখ! সব বাড়াবাড়ি'

কন্যা বল্লেন, 'আবার সব কাজও করবে না।'

[illegible] একটি 'গোবরার মাকে' রাখা তো হ'ল, আবার রক্ষাবেক্ষণ করতে

হবে চাকরদের চোখ থেকে। এটা ভাল লাগছিল না ওঁদের। সেপাই ননদটিও আছে মিলিটারী মেজাজ নিয়ে।

রমা দানার ভাঁড়ারে এসে দেখলেন, মেয়েটি মুখ খুলেছে, সুন্দর দেখতে এবং তার সেপাই ঠাকুরঝির হাত ধরে তার চোখ থেকে জল পড়ছে। ঘরে একটি টিনের বাক্স, এক ঝুড়ি বাসন, একটা চট মোড়া বিছানা খুলে রাখা রয়েছে। ছেলেমেয়েগুলি তাতে বসে দাঁড়িয়ে রয়েছে তলোয়ারখানি একদিকে রেখেছে।

সেপাইয়েরও চোখ শুকনো নেই। সে বলছে, 'তুই ভাবিসনি, বাবুজীর বাড়িতে তোর কোনো ভয় নেই। আর আমি তো আসা যাওয়া করবই। এখন যাই, দুষমনদের হাত থেকে আপনাদের জমি ক্ষেত, কোঠি (কুয়া) বাঁচাই। এখন তো আর তোদের জন্য ভাবনা রইল না।'

সেপাই পিসি গৃহস্বামীদের মেয়েকে দেখে হাত জোড় করলে। তারপর ভাইপো ভাইঝিদের একটু আদর করে বল্লে, 'কাঁদিসনি 'বিন্না' (বাছা) আমি খুব শীগগীরই আসব।'

ভাজ আবার তার হাত ধরে বল্লে, 'খুব শীগগীরই এসো বাইজী (ঠাকুরঝি)।' ননদকে 'বাইজী' বলা হয় রাজস্থানে।

৩

ভাজের চাকরি শুরু হ'ল। কি কি কাজ করতে হবে, কখন কখন করবে—তালিম চলল রমার সঙ্গে। কি কি করবে না—তাও সে বল্লে। চাকরদের দিয়ে কাজ শেখানো চলবে না, গৃহকর্তার আদেশ আছে। গৃহস্বামীর মেয়েই সব কাজ শেখাবেন ও করাবেন। কাজ করাতে গেলে একটি নাম বলে ডাকা চাইতো। কন্যা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি নাম তোমার ?'

গলা অবধি ঘোমটা একটু কমিয়ে কপাল অবধি তুলে সে রমার সঙ্গে ঘুরছিল।

'আমার নাম ? আমার নামে কি হবে ? আমাকে ধনজী—ধনপাল সিংয়ের মা বলে ডেকো।'

'কেন, তোমার নিজের নাম বল না ?' কন্যা বল্লেন, 'ও যে বড্ড বড় নাম হ'ল।'

সাধারণতঃ রাজপুতের মেয়ের নাম ধরে সবাই ডাকতে পারে না। বাপের

বাড়িতে বলবে 'বাইজী' (কন্যা), শ্বশুরবাড়িতে বলবে 'ভাবী', 'ভৌজী', 'বিন্দনী' (বউ), পরে বলবে সন্তানের নাম ধরে তার মা। নিজের নাম সেতো খারাপ মেয়েদের থাকে! নাম ডাক তো তাদের নিজের নামে হয়। ভদ্রগৃহস্থ ঘরে আবার মেয়েমানুষের নাম ধরে ডাকে নাকি? এতখানি প্রথার খবর জানা ছিল না মেয়ের।

ধনজীর মা একটু চুপ করে থেকে বল্লে, 'আমার নাম কমলাবাঈ। কিন্তু আমার নাম ধরে ডাকলে তোমাদের সব চাকর দাসী আমার নাম জানতে পারবে। আর তারা নাম ধরে ডাকে যদি সে বড় অপমান আমাদের বংশের। নাম ধরে ভদ্রলোকের মেয়েকে ডাকে না আমাদের।'

ঝিয়ের নাম আবার বাঈ। কন্যা শুনলেন নতুন কথা। ভাবলেন, তাতো ভালো, তা 'তুমি' 'তোমাদের' বলে কথা কও কেন? আপনি বলে কথা কওয়া উচিত তো। পিসি তো বেশ আদব কায়দা মত কথা কইল দেখলাম।

'আচ্ছা। এসো ধনজীর মা, গম ওজন করে নিয়ে যাও। বাড়ির জন্য তিন সের গম দিন পিষবে, তিন সের যবও পিষবে চাকরদের রুটির ও কুকুরের রুটির জন্য। এই রান্না ঘরটা ধোবে, শোবার ঘরগুলো ঝাঁট দেবে, আর মুছবে ইত্যাদি।' ঘোমটা থেকে এক চোখ বার করে রাজপুতের মেয়েদের মতই সে এঘর ওঘর ঘুরে কাজ দেখতে লাগল। গায়ের গহনা ঝলমল করতে লাগল। যেন রানী। যেন কেউ পরিদর্শিকা। যেন চাকরি করতে আসেনি, বাড়িতে বেড়াতে এসেছে।

রমার মনে যেমন বিরক্তি জাগে, তেমনি কৌতুক বোধ হয় ওর ধরন রকমে। কিন্তু পিতার আদেশ, কাজ ওকে দেখাতে হবে।

ঘরের পরিষ্কারের কাজ শেষ হলে ধনজীর মা দৈনিক পেষবার জন্য গম আর যব নিজের ঘরে নিয়ে এলো। ঘরের মস্ত ভারী যাঁতা বা 'চাক্কি'র পাশে সে সব নামাল। তারপর ভ্রূ কুঞ্চিত করে জিজ্ঞাসা করলে, 'আমি কোথায় রুটি করব, কখন করব? আমার ছেলেমেয়েরা কখন খাবে।'

রমা হেসে বল্ল, 'তুমি এইখানে রুটি করতে চাও, ক'রো। না হয় রান্না ঘরের উনুন খালি হলে রুটি করে নিও। ওরা তখন খাবে। পাথর দিয়ে উনুন করে নাও।' আদেশ পালনে, দাসী বৃত্তিতে অনভ্যস্ত রাজপুতের মেয়ের মন যেন দাসীত্বের জীবন মানতে চায় না। হুকুম স্বীকার করতে রাজী নয়। কোঁচকান ভ্রূর নীচে কালো চোখে আগুন না জল? ঝকঝক করে ওঠে। জল কি?

আহা। রমা কোমলভাবে বলে, 'আমি তোমায় তরকারী ডাল দিতে বলে যাচ্ছি। রুটি ক'রো আগেই। আমাদের রান্না ঘরের তরকারী সবাই পায় তুমিও নিও। রুটি করে নাও, নিয়ে তারপর ওদের খাওয়া হলে আটা পিষো। আমাদের তো রাত্রে রুটির দরকার।'

'কিন্তু এত গহনা পরে কাজ করবে কি করে, ভারী লাগবে না? ওগুলোর সব মিলিয়ে ওজন তো পাঁচ-সাত সের হবে।'

এবারে গহনার কথায় নারী কোমল ভাবে বলে, 'বাইজি, অনেক গহনা গেছে —স্বামীর অসুখে নানা বিপদে। এখন তো মাত্র এই কটাই আছে। কোথায় রাখব, চোরে নেবে তাই ননদ বল্লে পরেই থাক। আজকে বাক্সতে তুলে রাখব।'

৪

কিন্তু ঝিকে দিয়ে কাজ করানো সোজা, ও যেন ঝি নয় রানী। রানীর মত মেজাজওয়ালা কোনো ঘরের গৃহিণীকে দিয়ে কি কাজ করানো চলে।

তার পর্দা চাই—তার ছেলেমেয়ের নিয়মমত রক্ষণাবেক্ষণ চাই, খাদ্য চাই তাদের সুনিয়মে তার বাড়ীর ~ র্গী ভাবের ধরনটা যায় না। কিছু আদেশ করলেই ভ্রূকুঁচকে আদেশকারিণীর দিকে চায়। তারপর আবার নরম হয়ে যায়। দ্বিধা-দ্বন্দ্বের শেষ নেই তার মনেও, বাড়ির লোকের মনেও। বেশ বিবেচনার বিষয় যেন। আর বিপদ আসে কোনো না কোন পথে।

একদিন রাত্রে বাড়িতে জল্পনা হ'ল বেশ রাত্রে সকলে ছেলেমেয়েরা মিলে কাছাকাছি এক আত্মীয়ের বাড়ি হেঁটে বেড়াতে যাওয়া হবে পিছনের গেট দিয়ে। কেন না সামনের দিকে গেটে বহু লোকজন, ঘোর পর্দার দেশ, সকলে দেখতে পাবে। হাঁটা চলার প্রথা তখন এখানকার মত চলছিল না।

কর্ত্তা এলেন, ধনজীর মার ঘরে। সে ছেলেমেয়েদের শুইয়ে কাঁথা সেলাই করছে তেলের কুপিটির পাশে বসে। আমাদের দেশের দেশী কাঁথা নয়—ওদের কাঁথা।

কর্ত্তা বল্লেন, 'ধনজীর মা,—আমরা একটু বেড়াতে যাচ্ছি, আসতে রাত্রি এগারোটা হবে, তুমি একটু আমার ছেলেমেয়েদের ঘরে বসবে? নাহলে কাঁদবে, জাগলে মুস্কিল হবে।'

ধনজীর মা আশ্চর্যভাবে মনিব দুহিতার মুখের দিকে চেয়ে রইল। সে যাবে রাত্রে তার ঘর ছেড়ে! মনিবের মেয়ের আক্কেলটা কি। এই যেন ভাবটা।

উত্তরের অপেক্ষায় রমা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর বল্লেন, 'তাহলে এসো, আমি যাচ্ছি কাপড় বদলাতে।'

সে বল্লে, 'আর আমার ছেলেমেয়েরা একলা থাকবে এখানে?'

বিব্রত রমা বললেন, 'ওরা তো ঘুমিয়েছে, এক-আধবার না হয় দেখে যেও।'

সে বল্লে, 'তোমার ছেলেমেয়ে যদি একলা থাকতে না পারে, তাহলে আমার ছেলেমেয়েও পারবে না।'

একটি একটি করে সেকেণ্ড ও মিনিট তার হাতের কাঁথায় ছুঁচের ফোঁড় বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে কেটে যেতে লাগল। রমা দাঁড়িয়ে নীরবে চেয়ে আছেন, সেও নিঃশব্দে সেলাই করে চলেছে। বেশ বোঝা গেল সে উঠবে না। সেই মনিব কি বাড়ির লোকেরা মনিব তার ব্যবহারে বোঝা গেল না।

পরদিন কন্যা পিতার আহারের সময় বল্লেন ধনজীর মার উদ্ধত বাক্য ও স্পর্ধিত মেজাজের কথা।

গৃহিণীও বিরক্ত ভাবে বল্লেন, 'যদি রাত বিরেতে দরকার পড়লে কোনো কাজে না লাগে, তাহলে ও নবাব-নন্দিনী ঝি রেখে আমাদের কি উপকার। কাজ করতে এসে অত রানীগিরির মেজাজ দেখলে চলে না?'

কর্তার খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল।

তিনি একটু হাসলেন। 'কি বলেছে? তোমার ছেলেমেয়েও যদি একলা থাকতে না পারে তার ছেলেরাও পারবে না? খাঁটি রাজপুতের ঘরের মেয়ে সিংহের বাচ্চা যে। দারোগা নয়—(সঙ্কর) আসল সিংহির রক্ত শরীরে রয়েছে। সিংহির বাচ্চার মতই কথা বলেছে তো? তোমার রাগ করলে হবে কেন? ও কি আর ঝিয়ের মত ভয় পাবে, না কথা শুনবে? এত রাত্রে ওর ছেলেমেয়ে একলা রাখতে তাই চায় নি।'

কর্তার কথায় গৃহিণী ও কন্যা আশ্চর্য হলেন। কিছু রহস্য আছে নাকি ভিতরে? মৃদু হেসে গৃহিণী বল্লেন, 'এ যে প্রায় পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের গল্প দেখছি।'

'তাহলে একটি দ্রৌপদীর আগমন হয়েছে নাকি বাড়িতে?'

কর্তা অট্ট হেসে বল্লেন, 'প্রায় তাই। কীচকবধ না হলেই ভালো, ভীম নেই বটে, পঞ্চপাণ্ডবও নেই। কিন্তু যে সেপাই ঠাকুরঝি আছে সে সব পারে। ও

তোমাদের সব হুকুম না মানলেও কিছু ব'লো না—। আগে তো কখনো চাকরি করেনি, ব্যাপারটা কি ভাল করে জানে না।'

তবু ঘাত সংঘাতে দিন আসে যায়।

সেপাই ঠাকুরঝি মাঝে মাঝে আসে ভাজের ভাইপোদের কাছে। ভাইপোটি আর একটি জায়গায় বালক ভৃত্যের কাজ করে।

বাড়ির ভৃত্য দাসদাসীরাও তাঁর নাম দিয়েছে সিপাহী বাঈজী। সকালে গৃহস্বামীর দাঁতনের মুখ ধোবার আসরে সে এসে নিজের মামলা বৈষয়িক ব্যাপারের কথা বলে যায়, জানিয়ে যায়—

ধনজীর মার মেজাজ আর পর্দা দুই একটু কমে গেছে।—বাঙালী বাড়ির জীবনে অভ্যস্ত হয়ে এসেছে। মান সম্ভ্রম যাবার ভয়, পুরুষকে ভয়-আতঙ্ক আর যেন নেই। চাকরিজীবনও কিছুটা আয়ত্ত করে নিয়েছে।

হেনকালে সহসা একদিন সকালবেলা গেটের বাইরে একটি পুরাতন রথ এলো। যেমন মহাভারতের রথের ছবি দেখা যায়—ঠিক তেমনি দেখতে শুধু ঘোড়ায় টানা নয় বলীর্বদ বাহিত জীর্ণ বিবর্ণ ঘেরা টোপ ঢাকা একটি রথ এসে দাঁড়াল। এবং পিসী বা ঠাকুরঝি রথ থেকে নামল।

দ্বারবান—ভৃত্যবর্গ আজ সহসা সেপাই ঠাকুরানীকে ঘেরা টোপ পরা পর্দানসীন রথ থেকে নামতে দে'খ অবাক হয়ে চেয়ে রইল। এতদিন যাতায়াতে আর তাদের ভয় সমীহ ছিল না। দু-একজন এগিয়ে এল। কৌতুকভরে একজন জিজ্ঞাসা করলে, 'বাঈজী, আজ একি ব্যাপার, পর্দানসীন সেজেছো ?'

সেপাই বাঈজী শুধু হাসলে, কিছু বল্লে না।

তারপর গৃহস্বামীর মুখ ধোবার প্রাঙ্গণের দিকে এলো। আজ আর হাতযোড় করে নমস্কার বা সেলাম 'বন্দেগী' নয়, মাথা মাটিতে ঠেকিয়ে 'চোক' (প্রণাম) জানিয়ে উঠে দাঁড়াল।

কর্তা জিজ্ঞাসু নেত্রে চাই:লন।

সে বল্লে, 'আপনার কৃপায় আজ আমার পিতৃবংশের সম্পত্তি ও সম্মান উদ্ধার করতে ও রাখতে পেরেছি। ভাইবোকে আর কার কাছে রাখতাম? তার ইজ্জত মান কে রাখত আপনার বাড়ির মত করে।—তাকে নিয়ে ঘুরলে আমার বিষয় উদ্ধারও হত না। আজ আপনার শরণ নিয়ে সব ফিরে পেয়েছে এরা। এখন তাদের নিজের বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার হুকুম নিতে এসেছি। আপনার হুকুম হলে তাদের নিয়ে চলে যাই।'

সেপাই পিসিমার আর পুরুষোচিত সেই দৃঢ় বলিষ্ঠ চেহারা নেইও, রোগা হয়ে গেছে অনেক। চেহারাও কোমল হয়ে গেছে। ফিরে পাওয়া সম্পদ ও সম্মান তার মনকেও নরম করে দিয়েছে যেন। কৃতজ্ঞতায় তার চোখ ছলছল করে এলো।

গৃহস্বামী খুশি মনে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সব ফিরে পেয়েছ? সম্পত্তি জমিজমা?'

নারী বল্লে, 'হ্যাঁ প্রায় সবই পেয়েছি। তবে ক্ষেত খামারে গরু মহিষ চরিয়ে নষ্ট করে দিয়েছে অনেক। ঘাসের গুদামে আগুন লাগিয়ে নষ্ট করেছে। তবু মামলায় তাদেরই হার হয়েছে। আমরা আমাদের 'বাপোতা' (রাজস্থানের পৈতৃক বিষয়ের নাম) বাপের ভিটে ফিরে পেয়েছি।'

নারী ভিতরে এলো, গৃহিণীকেও আজ প্রণাম জানাল। বল্লে, 'মাজী, আপনার বাড়িতে এত পুরুষের মাঝেও আমার ভাইয়ের বৌয়ের জন্য ভয় ছিল না।···অন্য জায়গায় আমি এত নিশ্চিন্ত হতে পারতাম না। আপনার কাছে ওরা সন্তানের মত ছিল। আজ, আপনার কাছ থেকে নিয়ে যাবার হুকুম দিন।'

ধনজীর মা উঠান ধোবার ঝাঁটা ফেলে ননদকে জড়িয়ে ধরল। তাদের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

তারপর আবার ঝাঁটা হাতে নিয়ে ঘর ধুয়ে কাজ সেরে নিয়ে স্নান সেরে রঙীন নতুন ঘাগরা, জরি দেওয়া ওড়না, সূক্ষ্ম কাঁচুলির উপর হাতওয়ালা জামা পরে ছেলেমেয়েদের জরির জামা পাগড়ি পাজামা পরিয়ে সাজিয়ে এনে গৃহিণীকে প্রণাম করল। অন্য সকলকে নমস্কার করল। সে চাকরদের সঙ্গে কথা কইত না, রান্না ঘরের যে ব্রাহ্মণের কাছে ডাল তারকারী নিত, আজ অর্ধাবগুণ্ঠনে সজল চোখে সকলের কাছে বিদায় নিল করজোড়ে। কাপড় চোপড় গহনায় বিনীত নম্রতায় তাকে অভিজন দুহিতা বধূর মতই মনে হচ্ছিল আজ। কুল পরিচয় আজ তার ঔদ্ধত্যের অর্থ বহন করে এনেছে।

অন্তঃপুরের ভৃত্য মহলে সাড়া পড়ে গেল ধনজীর মার জমিদারীর কথা। গহনার কথা, জমিদারীর আয়ের কথা, তার নিজের ঘরের রথ এসেছে তাকে নিয়ে যেতে। সে পর্দানসীন ঠুক্‌রানী (ঠাকুরানী' ঠাকুর অর্থে জমিদার) ছিল, বিপদে পড়ে ঝাঁটা ছাতা হাতে ধরেছে। চাকরি করে মাহিনা নিয়েছে এক হাতে করে, চোখ-মুছেছে অন্য হাতে।

জমিদারী? জমিদারীর আয়? মুখে মুখে প্রশ্ন উত্তরে- জমিদারীর আয় সম্পদে সমারোহের কাহিনী শত থেকে সহস্রের অঙ্ক বেড়ে যেতে লাগল।

কেউ বলে ওদের জায়গিরের জমিদারীর আয় দু হাজার। অন্যজন বলে পাঁচ হাজার, কেউ বলে আরো বেশী।—সন্দিগ্ধ সঙ্কীর্ণমনা লোকেরা চুপ করে থাকে, বিশ্বাস হয় না, তাদের ভালোও লাগে না। তারা বলে বাজে কথা, একেবারেই চাষা। জমিদারী না আরও কিছু।

সে যতই হোক বা যাই হোক, ধনজীর মা ও তার সেপাই ঠাকুরঝি ছেলেমেয়েদের নিয়ে ছেলের হাতে তরোয়ালখানি দিয়ে দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে মুখ আবৃত করে বাড়ির বহিঃপ্রাঙ্গণের সীমানায় বাইরের পথে গিয়ে পূর্বপুরুষের রথের উপরে উঠে বসল। একদা মনিব। সেই মনিব বাড়িতে রথে ওঠা তাঁদের অসম্মান প্রকাশ করে যদি।

গ্রামে যেতে বেলা অপরাহ্ণে ঢলে পড়ল। রথ পিছনে জল্পনাপরায়ণ মানুষ রেখে আনন্দিত বালক শিশু, জননী পিতৃস্বসাকে নিয়ে চলে। ক্রমে শহরের পথ ছেড়ে গ্রামের বালিভরা ধূসর পথ ধরল আর খানিক দূরেই তাদের এলাকা সীমানা পড়ছে। বাতাসে আন্দোলিত লীলায়িত ভুট্টা বাজরা যবের ক্ষেতের আভাস সীমানা যেন চোখের সামনে ভেসে আসছে ঐ দূর দিগন্তের ক্ষেত্র সীমান্তে?

রথের জালির জানালা দিয়ে ধনজীর মা ও পিসিমা পিতৃপুরুষের পদধূলিতে পবিত্র স্মৃতিপূত গ্রামের ক্ষেতখামার দেখতে দেখতে চলে। নষ্ট করেছে ক্ষেত? ঘাসের গোলায় আগুন দিয়ে দিয়েছিল? ক্ষতি করেছে অনেক? কিন্তু কই? সে ক্ষতির ক্ষত মনে আর দাগ কাটতে পারছে না। কোথায় ক্ষত? কোথায় ক্ষতি? তারা চিরকালের তাদের মাটির, তাদের মৃণ্ময়ী জননীর কোলে ফিরে এসেছে। যেন মানস চক্ষে দেখতে পাচ্ছে ফনিমনসার বেড়া দেওয়া উঁচু মাটির দেওয়াল বেষ্টিত তাদের মৃণ্ময়ী অট্টালিকাখানি। কত যুগযুগান্তের জন্মমৃত্যু বিবাহ উৎসব শোকের স্মৃতি ভরা আছে যেখানে।

রচনাকাল—১৩৬১।

পুণ্য পরিক্রমা

তখনো ভোরের আলো ফোটেনি। অন্ধকার রয়েছে ঘোর ঘোর মত। শ্রাবণ মাস, বন পরিক্রমা শুরু হয়েছে।

শহরের গোপালজীর মন্দির থেকে পুণ্য পরিক্রমা দেবার বিরাট দল ভজন কীর্তন নাম করতে করতে বেরিয়েছে।

পান ফুলমে নারায়ণ। (জল ফুলে নারায়ণ)
তুলসী পত্রে নারায়ণ (তুলসী পাতায় নারায়ণ)
বোল্ বোল্ নারায়ণ। (বল বল নারায়ণ)
চাল কেঁউলি নারায়ণ। (চলনারে নারায়ণ) ধুয়া সহ।

পথে পথে প্রত্যেক গলির মুখ থেকে বেরিয়ে বেরিয়ে আসা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার দলে জনতা বিশাল হয়ে উঠছে।

আর রকম রকম সুরে নানা বাণী 'গোপাল গোবিন্দ বোল্, বোল্ রাম নারায়ণ।'

আবার 'ম্ঁয়নে রাম রতন ধন পায়ো। পায়োরে রাম রতন ধন: একজন গান ধরে, আর সকলে ধুয়া ধরে আবার গায় কীর্তনের ধুয়ার মত। আকণ্ঠ অবগুণ্ঠনে আবৃত মুখ মেয়েদের দল কখনো শ্রাবণ সঙ্গীত ঝুলন কাজরী গায়। কখনো মীরা বাঈ সুরদাসের বিরহ সঙ্গীত গায় 'মেরী রাধা প্যারী বোলো বংশী হমারি', 'মেরা লগন লগী হরি আওয়ান কী'।

ভোরের আলোয় ঠাণ্ডা ছায়া ভরা বড় বড় গাছওয়ালা পথ। পথে চলেছে নানা রংয়ের ঘাগ্‌রা ওড়না জামা কাঁচুলি পরা ভারী ওজনের মোটা মোটা গহনা পরা নানা রকমের নারী ও বালক বালিকার দল। আর জামা ধুতি পাগড়ি রূপার বালা মল পরা পুরুষদের দল। হাতে লাঠি কাঁধে গামছা বাঁধা পূজার তুলসী পাতা—ফল মূল অথবা পথের খাবার। আর সঙ্গে চলে বাঁশী বাজনা গান ও খেলনা-খাবারওয়ালার দল—যেন পার্বণ উৎসব মেলার প্রকাণ্ড একটি চলমান দল।

আর পল্লীতে পল্লীতে বড় বড় গাছে দোলনা টাঙানো হিন্দোলা রয়েছে। চেনা অচেনা ছেলেমেয়ের দল এক বারটি দোলবার নাম করে দোলনায় চাপছে। আর নামবার নাম করছে না।

সঙ্গীরা বৃদ্ধ বৃদ্ধারা কম বয়সী নরনারী নিরুপায় হয়ে সেখানে দাঁড়াচ্ছে।

পথে আছে 'পিয়াউ'। জল দানশালা। পুণ্য জলদানের কুটির পুণ্যকামীদের দানে। সেখানে আছে কলসী কলসী ঠাণ্ডা জল, বিরাট এক থলে ভরা ছোলা ভাজা, এবং প্রকাণ্ড একটি চাঙড় ভেলী গুড়। হাত পাতলেই সকলে পাবে।

আমাদের সুজনবাঈ বা সুজাবাঈও চলেছেন।

সহসা বাঈয়ের আঁচল ধরে টান্‌ল।

কে ডাকলে, বললে, 'দাদী।'

মুক্তাবাঈয়ের হাতের জলের ঘটি ফুলের সাজি নড়ে উঠল একটু জল চল্‌কে পড়ল।

অবাক হয়ে পিছন ফিরে চাইলেন। তাঁকে দাদী বলে কে ডাক্‌ল। তাঁর সঙ্গে কোনো নাতনী আসেনি। তাঁর তো নাতনী নেই। মিষ্ট কোমল কচি গলার মেয়ের ডাক।

জল চলকে লুগড়িও ভিজে গেল একটু। একটু বিরক্ত ও অবাক হয়ে 'কে রে?' বলে পিছনে দেখলেন একটি ফুটফুটে সুন্দর সাত-আট বছরের মেয়ে তাঁর ওড়না ধরে রয়েছে। কিন্তু এ তো তার দাদী নয়। কে ও!

তাঁর বিরক্ত ও আশ্চর্য মুখ দেখে সে অপ্রস্তুত ও ভীত হয়ে ওড়নার আঁচল ছেড়ে দিল।

এবারে দাদী সম্বোধিতার অবাক হবার পালা।

এত সুন্দর মেয়ে এমন মিষ্ট গলার স্বর যেন তিনি জীবনে দেখেননি বা শোনেন নি। সম্ভ্রান্ত রাজপুত ঘরের মেয়ে তিনি বৌ ও তেমনি সম্পন্ন ঘরের আত্মীয় স্বজনও বহু। তবু তাঁর মনে হল এমন রূপ বুঝি কখনো চোখে পড়েনি।

তাঁর বিরক্ত দৃষ্টি কোমল হয়ে এলো। তিনি তাঁর আঁচল ছেড়ে দেওয়া ছোট্ট হাতখানি ধরে নিলেন।

বললেন 'কাকে খুঁজছিস তুই? আমি তো তোর দাদী নই। দাদী কি এগিয়ে গেছে?'

ভোরের আকাশ নির্মল হয়ে আসছে। চারদিকে অচেনা চেনা যাত্রী যাত্রিনীরা চলেছে, হরিনাম ও গান চলেছে। পথ মুখর।

মেয়েটি হকচকিয়ে ভীতভাবে চারদিকে চাইতে লাগল। কোথায় তার ঠাকুমা!

মুক্তাবাঈয়ের ওড়নার রং তার দাদীর ওড়নার মত দেখে সে এসে লুগড়ী ধরেছিল। ভয় পেয়ে তার চোখ জলে ভরে গেল আশে পাশে ঠাকুমাকে দেখতে না পেয়ে।

বৃদ্ধা তার মুখটা দেখতে পেলেন, 'চল আমার সঙ্গে তোর দাদীকে খুঁজে দোব। একলা যাসনি হারিয়ে যাবি।'

এবং তাঁর লোল কুঞ্চিত চর্ম মুঠোয় ধরা ছোট কচি রাঙা হাতখানি আর ছাড়লেন না।

পরিক্রমা বাণী মুখে নারায়ণ নারায়ণ বলতে বলতে ও তাকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, 'থারি বাপ কি কাঁই নামছে? (তোর বাবার কি নাম?) তুই কাদের ঘরের মেয়ে? রাজপুত? সঙ্গে কে কে আছে দাদী ছাড়া? দাঁড়া এখনো সকাল হয় নি? আলো হোক ভাল করে তখন দেখতে পাওয়া যাবে। আমার মত লুগড়ি তো অনেক বুড়ী দাদীরই আছে। মুস্কিল তো তাই।'

আবার বললেন, 'নারায়ণ নারায়ণ হরে রাম হরে রাম।' ঠাকুরের নামেও খেই ছেড়ে যাচ্ছে।

মনে হচ্ছে মেয়েটি যেমন সুন্দর তেমনি শান্ত। ভয় পেয়েছে বড, কেমন হাত ধরে চলেছে।

আবার জিজ্ঞাসা করেন, 'যদি ঠাকুমাকে না পাই?' কোন গাঁ থেকে আসছিস—না, শহর থেকে? গাঁয়ের লোক আরো সঙ্গে আছে তো? তাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দোব।'

মেয়েটি বললে, 'শহর থেকে আসছি। গোপালজীর সড়ক থেকে।'

সুজাবাঈ বললেন 'শহর থেকে? এখানে জয়পুরেই বাড়ি? কোন রাস্তায়? গোপালজীর সড়ক? আমার বাড়িও তো বিদ্যাধরজীর সড়ক। ওই কাছেই। দাদীকে না পেলে বাড়ি চিনতে পারবি তো? বাপের নাম কি? ভাই বোন আছে? তোর নাম কি?'

এতক্ষণে মেয়েটি কাঁদতে ভুলে গেছে। বললে, 'বাবার নাম সমুদ্র সিং। আমার নাম কৃষ্ণ'। কিষণিবাঈ, লাড়লীবাঈও বলে। ভাই বোন আছে আরও তিনজন।'

লাড়লী হল আদরিনী। রাধিকার আর একটি নাম।

সকালের আলো হয়েছে। সুজাবাঈ তার মুখের দিকে চাইলেন। লাড়লীই বটে। বালিকা শ্রীরাধাই যেন তার হাত ধরে চলেছেন।

বল্লেন, 'তোর ঠাকুমার নামটা বল চেঁচিয়ে ডাকতে পারব। দেখতে পেলে দেখিয়ে দিস্।'

ঠাকুমার নাম তিজাবাই। 'তীজের' মেলার দিন জন্মেছিল কিনা।

কিষণি বা লাড়লীর আর ভয় নেই। বলতে শুরু করলে, 'আমি হারাই না কখনো। কত মেলায় গিয়েছি। মতিডুঙরিতে গণেশজীর মেলায় গিয়েছি। হঠাৎ এবার হারিয়ে গিয়েছি। এবারে দাদী কোথায় যে চলে গেল দেখতেই পেলাম না। ঠাকুমার লুগড়ীর মতই তো অনেক লোকের লুগড়ী। তাই বুঝতে পারিনি।'

লাডলীর মিষ্টি মিষ্টি কথা আর হাসি বুড়ী সুজাবাইয়ের তারি ভালো লাগছিল। ওঁদেরই ঘর রাজপুতের মেয়ে। সব ঠাকুমা দিদিমার মতই বিয়ের সম্বন্ধ করতে ইচ্ছে হল।

ভিজাবাইয়ের দলও 'নারায়ণ' 'নারায়ণ' মুখে, তার মাঝে 'আরে কোড়ে গিয়ো ছোরী' কিম্বা 'দৌড়কে চাল নারে বাই অর্থাৎ কোথায় গেলিরে খুকি' বা শীগগীর চল্ নারে খুকী বলছে। আর চারিধারে গান বা ভজনও চলছে। খাদ্য বিক্রির ও জলপানশালাতেও ছোট ছোট ছেলেরা দাঁড়াচ্ছে।

দেখতে দেখতে এসে পড়ল একটি বিশেষ জাগ্রত মহাদেবের মন্দির। ধূলেশ্বরজীর মন্দির।

ইনি শিব স্বয়ম্ভু। প্রতিষ্ঠা করা নয়। মস্ত বাগানের মাঝে সে মন্দিরের পথ। ধূসর পাথরের পাতাল ফোঁড়া শিব বলে লোকে।

পরিক্রমার দল, পথের সব মন্দির, সব দেবালয়, ঠাকুরের আস্তানা বা স্থানও পরিক্রমা করবে।

যারা সেই দিনেই পরিক্রমা শেষ করে বাড়ি ফিরবে তারা দাঁড়াবে না, ঠাকুর দর্শন করেই পথে চলবে। যারা তিনদিন বা সাতদিন কিম্বা একমাস ধরে পরিক্রমা করবে তারা ঐ সব নানা জায়গায় বনভোজন করবে। যদি কারুর আত্মীয়-বন্ধুর বাড়ি থাকে রাত্রিবাস করবে। জমায়েত হয়ে গান গাইবে।

মীরাবাঈয়ের গান 'মেরী লগন লগি হরি আওয়নকী'। সুরদাসের ভক্তিমূলক গান 'নন্দলালা ব্রজগোপালা, গিরধারজী নাগরের নামের সঙ্গীত।

ভিজাবাঈ গানে গল্পে এবং ভজনে অন্যমন ছিলেন।

নাতনী যে আঁচল ছেড়ে কখন বিচ্ছিন্ন সঙ্গ হয়ে গেছে জানতে পারেন নি।

অকস্মাৎ পিছন ফিরে দেখলেন কিষণি নেই।

চারিদিকে ভিড় আরো জমে উঠেছে বেলা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব পাড়া থেকেই আরো লোক বেরুচ্ছে। সামনে পিছনে অসংখ্য ছেলেমেয়ের দল ওড়নায় পাগড়িতে জামাতে নানা রংয়ের সমাবেশ। ছোট বড় বালকের ভিড়।

সঙ্গের লোকদের জিজ্ঞাসা করেন, কিষনি কই? কৃষ্ণা তাদের কাছে কি?

—না তো।

অচেনা ছোট ছোট মেয়ের হাত ধরে মুখ ফিরিয়ে দেখেন। ডাকেন আরে কিষণিবাঈ। না, কিষণি নেই। সাড়া পান না কিষণির।

চেনা অচেনা সহযাত্রী পথিক সকলকে জিজ্ঞাসা করেন। না, তারা দেখেনি,

ঠাকুরের নাম করতে করতে এগিয়ে যায়। বলে, না বাইজী আমরা কিষণকুমারী বলে কারুকে দেখিনি। সহৃদয় কেউ বলে, আচ্ছা দেখতে পাইতো পাঠিয়ে দোব। কি রকম ওড়না ঘাগরা পরে আছে, কেমন দেখতে বলো।

সজলনেত্রে বৃদ্ধা নাতনীর চেহারার বিবরণ দেন।

ক্রমাগত একে ওকে ধরেন। জিজ্ঞাসা করেন। কখনো বা কোনো ছোটো মেয়েকেই কিষণি বলে হাত ধরেন।

বুড়ী সহযাত্রিনীরা কেউ কেউ বলে, 'ছোকরী কাঁহিনে লাই' (খুকীকে আনলি কেন) যদি সামলাতে না পারবি।

কেউ বলে, এখনকার মেয়ে ছেলেরা যা বজ্জাত। আনাই ভুল। সামলানো দায়। সবাই এগিয়ে যায়।

তিজাবাঈও সামনে পিছনে চাইতে চাইতে এগিয়ে যেতে থাকেন। দাঁড়ানোও চলে না সে হয়তো এগিয়ে গেছে। পিছনেও ফিরে যেতে পারেন না।

ঘন্টা খানেকের মধ্যে তিজাবাঈয়ের আশে পাশে গুটিকয়েক কৃষ্ণকুমারী বা কিষণির মত মেয়ে এসে জড় হল।

দু-তিন জনের নাম কিষণি। যাদের নাম কিষণি নয়—কিন্তু ওড়না তাদের কিষণির মত। অথবা কারুর ঘাগরা কিষণির মত।

দয়ালু সহৃদয় লোকেরা ধমকে বকে ধরে এনেছে বুড়ীর পাশে। দাদীকে (ঠাকুমাকে) জ্বালাচ্ছিস্ বলে কিম্বা মিথ্যে কথা বলছিস্ কিষণি নাম নয় বলে।

কিন্তু তারা তো কিষণি নয় সত্যি। ফিরে যায় পথে।

এসে পড়ল কান্তিবাবুজীর গোপালজীর রাধাকৃষ্ণের মন্দির।

যাত্রীদল দর্শন করতে থামল।

তারপর আসবে বনের পথে নাগদেবজীর মন্দির। সেখানে কোনো কোনো দল জিরোবে হয়ত অনেকক্ষণ।

এর পরে আসবে বালানন্দজী পঞ্চমুখী হনুমানজীর থান। পথে মঙ্গলবার পড়লে মহাবীর ভক্তরা সেখানে থাকবেন। মঙ্গলবার পড়লে মহাবীরের বার। ব্রত উপবাস বা হনুমানজীর বার করবে অনেকে।

রাস্তায় রাস্তায় কুঁড়েঘর বেঁধে পিয়াউ বা পুণ্য জলদানশালা রয়েছে। একটি নারী বা পুরুষ সেই জলদানশালায় বসে থাকে যাত্রীদের জল দেবার জন্য। ঘটি করে জল ঢেলে দিচ্ছে হাতের অঞ্জলি ভরে পান করছে লোকে।

কিছু যাত্রী বেরিয়ে গেছে মতিডুঙরীর গণেশজীর মন্দির পথে। ছোট এক পাহাড়ের কেল্লার ধারে পাহাড়ের গায়েই খোদানো প্রকাণ্ড গণেশ মূর্তির মন্দির। বিরাট গণেশজী। কেউ বা ছেলেমেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করে তাঁকে নিমন্ত্রণ করে আসবে যাতে সুভালা ভালি মঙ্গল কাজটি হয়ে যায় সিদ্ধিদাতার কৃপায়।

অবাধ্য বৌ, বিয়ে, চাকরি, ব্যবসা, অসুখ, সন্তান আকাঙ্ক্ষা, আধি-ব্যাধি-মামলা মোকর্দমা বিষয় সব কামনারই পূরণ কর্তা তিনি সিদ্ধিদাতা। এবং গণেশজী আর হনুমানজীর কাছে সকলেরই আবেদন নিবেদন শরণ নেওয়া বেশী চলে। অতটা গোবিন্দজীর কাছেও নয় অম্বরেশ্বরী কালীর কাছেও নয়।

সেখান থেকে যাবে তারা কেউ কেউ ঝোটওয়াড়া গ্রামের পথে সেখানে আছেন ঢেঁড কী বালাজী নামে মহাবীর। কেউ বলে তিনি নগরপাল ভৈরবও। লালমূর্তি বিস্তৃত বদন গদা এক হাতে, প্রসারিত অন্য হাতে লাডডু দেয় লোক।

পথ মুখর গল্পে গানে। সবাই দল বেঁধে যাচ্ছে পুরুষ মেয়ে শিশু বালক বালিকারা। ভক্ত হনুমানেরও ভজন গান আছে, যিনি সাগর পার হয়ে সীতামায়ার খবর এনে দিয়েছিলেন রামজীকে।

বুড়ী তিজ্জাবাঈ রাগে আগুন হয়ে উঠেছেন। ক্রমে রোদ বাড়ার সঙ্গে ক্ষুধা তৃষ্ণায় আকুল হয়ে এক জায়গায় বসে পড়লেন।

এবারে রাগ কমে ভাবনা লজ্জা ভয় মনে এলো। বাড়ীতে ছেলে বৌয়ের কাছে কি বলবেন? সকলে কি বলবে? কত বকবে। সব ভাবনার সঙ্গে মনে হয় সত্যি কি মেয়েটা হারিয়েই যাবে চিরকালের মত। কে ধরে নিয়ে যাবে সুন্দর মেয়ে, বিক্রী করেও তো দেয় লোকে। এক কূয়ার ধারে বসে বুড়ী অঝোর ঝরে কাঁদে।

বৃদ্ধ বয়সে বুড়ীর কলঙ্ক মেয়ে এনে হারিয়ে ফেলার। বাড়ীর কলঙ্ক মেয়ে হারানোর। মেয়ের সাত বছর বয়স তো হয়েছে ওঁদের বংশের মতে বিয়ের বয়স এসেছে।

বুড়ীর লজ্জা ভয়ের আর সীমা নেই। কে কি বলবে। আশে পাশে আরো সহযাত্রিনী সমব্যথিনী বুড়ী ও নরনারী জড় হয়ে নানা সান্ত্বনা বাক্য বলছে।

কেউ বলছে, 'পূজো মান্ মহাবীরের, সীতা উদ্ধার হয়েছিল আর তোর মেয়ে উদ্ধার করে দেবেন না।'

আবার বলে দেয়, 'হনুমানজীর দুহাতে দুটো আর মুখে একটা এক এক পোয়া ওজনের লাডডু দিস্। দক্ষিণা দিস ভাল করে।'

কেউ বলে, 'মেয়ের গায়ে গহনা ছিল ? কি ছিল বলেওত্তা চাঁদির ? কানে সোনার মাকড়ি নাকে নথ ছিল ?'

'যা: ওকি আর পাবি, মেয়েই চুরি হয়ে যাবে।'

ভীত বুড়ী আকুল হয়ে কাঁদে।

কেউ সান্ত্বনা দেয়, 'গনেশজীর মতি ভুলয়ী ছাড়িয়ে এলি। গড় গনেশজীর কাছে আমেরএ (অম্বর) মানত কর। পাবি, ফিরে পাবি। কাঁদিস্নি।'

এদিকে সুজাবাঈয়ের দল মাইল খানেক পথ এগিয়েই আছে। কাজেই কিষণি তাঁর সঙ্গেই চলছে। বুড়ীর ওড়না সে ছাড়ে নি। বুড়িও হাত ছাড়ে নি।

হঠাৎ পিছন থেকে কারা ডাকল, 'কিষণি, আরে কিষণি বাই কার সঙ্গে যাচ্ছিস ?

সুজাবাঈ থামলেন কিষণির হাত ধরেই ভ্রূ কুঁচকে বল্লেন, 'কে তোরা ?'

কিষণিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে ওরা চিনিস্ ?'

কিষণি বললে, 'আমাদের পাড়ায় বামুনদের ছেলে ওর বোনকে চিনি। আমাদের সঙ্গে খেলতে আসে।'

সুজাবাঈ বললেন, 'সে বোন আছে সঙ্গে ? তোর ঠাকুমা চেনে ওদের ?'

কিষণি বললে, 'জানি না তো। বোন নেই।'

ছেলেগুলো তিন চারজন, চেনা অচেনা, ওদের ঘিরে দাঁড়াল। একটা বড় ছেলে বললে, 'কিষণি তোমার কে হয় ? তোমার সঙ্গে কোথায় যাচ্ছে।

বৃদ্ধাও বললেন, 'তোরা ওর কেউ হোস্ কি ?'

তারা বললে, 'না। আমরা ওদের পাড়ার লোক। কিন্তু তোমাকে তো কখনো দেখিনি।'

আশে পাশে লোক জমতে লাগল।

একজন গিন্নি-বান্নি মত মেয়ে বল্লে, 'তোমার কেউ হয় নাকি মেয়েটা ? ওকে নিয়ে যাচ্ছ যে ? ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছ নাত ?'

আর একজন বললে খুব চুপি চুপি, 'বুড়ী ডাইনী বোধ হয়। 'তুক তুণ' করেছে। না হলে অচেনা মেয়ে ওর সঙ্গে চলে যাচ্ছে!'

কিষণির মুখ ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল, সুজাবাঈ রেগে উঠলেন। 'ডাইনী' কথার মানে ছোট হলেও কিষণি বোঝে। সুজাবাঈও ইঙ্গিত বুঝলেন। রেগে গম্ভীর মুখে বুড়ীকে যারা ডাইনী বলছিল তাদের বল্লেন, 'তোরা নিয়ে যাবি

তোদের সঙ্গে? তা ভাইনি তো ওরাও হতে পারিস্।' আর কিষণিকে বললেন, 'যাবি ওদের সঙ্গে—চিনিস্? তাহলে যা। ওরাও তোকে রক্ত শুষে খেয়ে নিতে পারে—রাত্রির বেলা মশানে নিয়ে গিয়ে।' এবং কিষণির হাত ছেড়ে দিলেন।

দেখতে দেখতে চারিদিকে লোক জমছে। কিছু লোক সুজাবাঈয়ের চেনা ও দলেরও। তারা ধমক দিয়ে আগন্তুকদের বললে, 'মেয়েটা তো তোদেরও কেউ নয়। যদি চিনিস্ই তো ওর নিজের দাদীকে খুঁজে বের করে আন। তার হাতেই ছেড়ে দোব। এমনি লোকের হাতে কেন দোব।

কিষণি বিবর্ণ মুখে সুজাবাঈয়ের আঁচল ধরেছিল। ছাড়তে পারে নি। সুজাবাঈ তো তার হাত ছেড়ে দিয়েছিলেন আগেই রাগ করে।

জনতা গান গল্প নাম সঙ্কীর্তন করতে করতে চলল। সর্পদেবতা নাগদেবজীর মন্দির আসবে। তারপর পঞ্চমুখী হনুমান—বালানন্দজী নামের তাঁকেও এক পলকের জন্য দর্শন করে নিতে হবে।

বুড়ী সুজাবাঈয়ের মনে ভাবনা তাড়া উদ্বেগ একসঙ্গে জমাট বেঁধেছে। পরিক্রমা মাথায় উঠেছে। দর্শন নাম গানও বারে বারে গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

কি জ্বালা। পরের লেঠা নিয়ে। অন্য মেয়ের হাতে ছেড়ে দিতেও পারবেন না। কাকে বিশ্বাস, কাকে ভরসা করবেন। সুন্দর মেয়ে চুরি কিম্বা বিক্রীর খবর কি তিনি কখনো এত বয়সে শোনেন নি? সবই তো জানেন তিনিও। দুষ্টলোক কখনো এমন শিষ্ট লোক হয়ে সামনে দাঁড়ায় তাও তো জানেন। এই তো রাম বক্সা ছোঁড়া বলছিল, 'মাজী আমার সঙ্গে দাও। গোপালজীর সড়ক আমি চিনি ওর বাবার কাছে পোঁছে দোব। তুমি মন্দির টন্দির দেখে শুনে সন্ধ্যে বেলা যেও।'

ভ্রূ-কুঁচকে চেয়ে রইলেন তার দিকে।

মনে মনে বললেন, হ্যাঁ পৌঁছে দেবে বললেই আমি বিশ্বাস করব আর কি? ও মেয়ের অত রূপ। আর ওর বড় হতে কতক্ষণ? কার কাছে কোন্ নাচনেওয়ালী বাঈজীর কাছে বেচে দেবে। কি কোন বড় মানুষ ঠাকুরলোকদের ঘরে বেশ মোটা টাকা দিয়ে বেচে দেবে। কে জানে। আর 'শুদ্ধ' হয়ে যাবে।

ধর্ম! ধর্ম কি আর এই কলিযুগে কারুর আছে। তুই জোয়ান ছোঁড়া তোকে বিশ্বাস করে মেয়ে দিই আর কি? আর মুখে বললেন, না বেটা। ওতো আমার লুগড়ীর পাল্লা (খুঁট) আঁকড়ে ধরে আছে। আমার শরণ নিয়েছে ও।

'বালছে' (শিশু) ওকে ছেড়ে দিতে পারব না। ওর বাপ মার কাছে কি দাদীর কাছেই দোব। নইলে আমার পাপ হবে।'

এই বার ফ্যালফ্যালে মুখ কিষণির হাত খানি নিজের হাতে কঠিন করে ধরে নিলেন।

এদিকে তিজাবাঈয়ের কাছে সেই বামুনদের ছেলের গোপ্যা, রামনাথ, গণেশা, নান্‌গাদের (মামার বাড়ীতে জন্মালে অনেক সময়ে নান্‌গা নাম ধরে ডাকে) দল পিছু হেঁটে তৎক্ষণাৎ খবরটা পৌঁছে দিল।

একসঙ্গে সবাই বলতে আরম্ভ করল, আরে ডোকরী, থারি ছোরিনে ঔর এক ডোকরিকে সাথ দেখা, কাঁই ঠিক কুনছে, মালুম ডাকন্ ইছে। চাইলাম দিলে না। ইত্যাদি।

যার মানে হল, ওরে বুড়ী তোর মেয়েটাকে আর একটা বুড়ীর সঙ্গে যাচ্ছে দেখতে পেলাম। ডাকলাম এলো না কে জানে কোনো ডাইনী বুড়ীই ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে হয়ত।

তিজাবাঈ এবারে একেবারে আশ্চর্য ও স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কে বুড়ী আছে এপথে যাবার মত চেনা জানা—যাকে কিষণি চেনে? কই কারুকে তো মনে পড়ে না।

যা: একেবারে সর্বনাশ হয়ে গেল। কেউ ভুলিয়ে গুণ করে তুক তাক করে নিয়ে যাচ্ছে বুঝি।

হতবুদ্ধি বুড়ী গাছতলায় বসে পড়ল

কেবল কাঁদে। কথা মুখে বেরোয় না।

শেষে বললে, 'তা তোরা ডাকলিনি? ধরে নিয়ে এলি না কেন?'

ছেলের দল বললে, 'সে এলো না নিশ্চয় কিছু তুকতাক করেছে বুড়ীটা।'

তিজা বুড়ী উঠে দাঁড়াল। কত দূরে তারা আছে? যেতে পারব কি? পৌঁছতে পারব? না, তারা আরো এগিয়ে যাবে।

ছেলেরা বললে, 'তুই পারবি নি। মোট্যার (পুরুষ) কেউ হলে অত হাঁটতে পারত। তোর সঙ্গে কে কে আছে?'

কেউ নেই। বুড়ী কেঁদে ফেললে।

একটা বড় ছেলে বললে, 'তাদের দলে অনেক লোক। তা আমরা একটু দূরে দূরে তাদের সঙ্গে যাই। মায়ি তুমি পিছনে এসো। আমাদের দেখতে পেলে তারা ধমকে দেবে। তোমাকে দেখলে কিছু বলবে না।'

তিজাবাঈয়ের আশপাশেও ডাইনীর ভুলিয়ে নিয়ে যাওয়ার চমকপ্রদ গল্পে লোকের গান ভজন কীর্তন গল্প গুজব পথ ভুলে থমকে গেল।

হ্যাঁ। তারা সকলেই ডাইনী ডাকিনীর কথা গল্প অনেক শুনেছে। কারুর ঠাকুমা, কারুর দিদিমা, মাসী, পিসি, সখি, সঙ্গিনী কারুর কুটুম্ব আত্মীয় গ্রামের লোক পাড়ার লোকেরা বলেছে।

এমন অনেক গল্প তারা জানে। ডাইনী তাকালেই ছেলে মেয়েরা পোষ মানা জন্তুর মত বোবা হয়ে তার সঙ্গে চলে যায়। অসুখে পড়ে যায়। আপনার লোকেদের চিনতে পারে না আর।

আর ডাইনীরা তাদের যদি সঙ্গে নিয়ে যেতে না পারে তাহলে শুধু চোখের দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়েই তাদের সব রক্ত শুষে নেয়। রাত্তির বেলা ঘরে বিছানাতে শুয়ে মরে যায়।

কেউ বললে, আমাদের সীতারামের ছেলের কথা শুনিস নি? ডাইনী মাসী আপনার লোক। বোনের শাশুড়ী। ছেলে খেলা করছে উঠানে, বাস। যেমন দেখতে পাওয়া আর ছেলের সেদিন জ্বর।

তারপর বিকার। কত ঝাড়ফুঁক করে বিকানের থেকে এক বড় গুণিন এনে তবে বাঁচল। ও তার টাকা আছে। আর একেবারে রক্ত চুষে নিতে পারে নি।

আর একজন বলে আর সেই নারঙ্গী বাঈয়ের—মেয়ের সঙ্গের কর্তা ধমক দিল, 'আরে, আরে গল্প করতে শুনতে বসলে আজ আর 'পরকম্মা' (পরিক্রমা) শেষ হবে না।'

'তাই তো।' দল ভেঙে কিছু লোক এগিয়ে চললো।

তিজাবাঈও উঠল। পা চলে না বয়সের জন্য ও মনের ভাবনার জন্য।

চলতে চলতে এলো নাহারগড়ের নীচের লোহার মস্ত দরজা—গনেশ পোল যার নাম। সে পথ এখন অরণ্যে জঙ্গলে ঝোপেঝাড়ে কাঁটাবনে চিরকালের মতই প্রায় বন্ধ হয়ে আছে। আগের দিনে ওসব দরজা খোলা হত। নাহারগড় কেল্লায় নানা প্রবেশ পথের সেটাও একটা। এখন শহর নিচে নেমে এসেছে। এবং আরো বিস্তৃত হয়েছে। দিকে দিকে পাহাড়ে পাহাড়ে কেল্লাও আছে।

কোথাও কোষাগার আছে। সৈন্য সেপাই শান্ত্রীও আছে কিন্তু আর তো রাজায় রাজায় যুদ্ধ নেই। কাজেই তাদের তেমন দরকার হয় না। কেল্লায় রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়া।

কেল্লার পিছন দিকে গনেশ মন্দির। কেল্লার নাম গনেশগড়। সাধারণ লোকের প্রায় অগম্য নিষিদ্ধও বটে।

নীল পাহাড়ের নিচে নিচে কাঁকর বিছানো সঙ্কীর্ণ রাজপথ। আবার বনময় সরু সরু চলন পথেও মানুষ চলে যাচ্ছে। সেগুলো শুঁড়ি পথ।

এসে পড়ল একটা বাঁধ বা জলাশয়। বজাজোঁ কি বাউড়ী। (ব্যবসায়ীদের বাঁধ) কবে কোন্ ব্যাপারীদের তৈরী বাঁধ। পাহাড়ের জল জমিয়ে জলাশয় একটি কুণ্ডের মতন। বর্ষায় ভরে যায়। যাত্রীরা জলের ধারে জিরোলো। জল খেল। হাত মুখ ধূলো। ঠাকুর মন্দিরও আছে গ্রামদেবতা মহাবীর বা ভৈরব।

তিজাবাঈয়ের জিরোবার সময় নেই। সব দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম করছেন। আর মানসিকের অঙ্ক বেড়ে চলেছে পয়সা টাকা আনায়।

হঠাৎ এসে পড়ল বদরীনাথজীর মন্দির। পাহাড় দেশ তো। নাইবা হল হিমালয়। নাইবা হল সেই বদরিকাশ্রম। বদরীনাথজী তাবলে পাহাড় দেশের গ্রামে থাকবেন না। কবেকার কে জানে মন্দির। কোন্ ভক্ত, কোনো সন্ন্যাসী বা রাজা জমিদার কে কবে একটি ডুঙ্গরীকে (ক্ষুদ্র গণ্ড শৈল) বদরীনাথজী বলে গেছেন, আর বদরিকাশ্রমের নাম না জানে এমন হিন্দু .ক আছে। সবাই দাঁড়াল জয়-বদরী বিশাল কি জয় বদরীনাথজী বলে।

তারপর গলতা পাহাড়। পাথর বাঁধানো পরিষ্কার পথ। ওপরে সূর্য মন্দির। আবার খানিক নেবে সাদা গোমুখ-বাঁধানো ঝরনা থেকে পাহাড়ের ওপর থেকে অবিরাম জলধারা পড়ছে অনেক নিচে একটি কালো গভীর কুণ্ডে কুণ্ডের পাশে সারি সারি নানা দেবতার মন্দির। দালান বাড়ির মত। লোকে বলে পুরাণের গালব মুনির আশ্রম ওটি। সে যাঁরই আশ্রম হোক। ওটি অনেক দিনের পবিত্র জলকুণ্ড দেবালয়গৃহ, একটি স্নানতীর্থ চিরকালের। গঙ্গা যমুনার মতই পাপহারিনী পাপনাশিনী। গোদাবরী নর্মদার মতই পুণ্য তীর্থ সলিল।।

তিজাবাঈ পাহাড়ের নীচে থেকেই নমস্কার করে বাহির দরজার হনুমানজীকে প্রণাম করে আবার একসেরী লাড্ডু মানসিক করে সুরযপোল গেট দিয়ে শহরে ঢুকলেন ব্রহ্মপুরী (বিরমপুরী) পথে। পাহাড়ে উঠতে পারলেন না। কিছু ভাববার ক্ষমতা নেই। চোখেও জল নেই। পরনের বসন এলোমেলো। বার্ধক্যের শীর্ণ মুখ শুকিয়ে আরো তুবড়ে গেছে।

সঙ্গে অনেক চেনা-অচেনা সহযাত্রী। কিছু ছেলের দলও আছে। নাতনী

হারানো দাদী এতক্ষণে সকলেরই চেনা হয়ে গেছেন। যারা কিষণিকে খুঁজতে গিয়েছিল তারা অবশ্য ফিরে আসেনি তখনো।

শ্রাবণের সন্ধ্যে। তখনো ঘোর ঘোর হয়নি। গোপালজীর সড়কে এসে পৌঁছলেন। গোপাল মন্দিরের সামনে থমকে দাঁড়ালেন। চোখে জল নেমে এলো অজস্রধারায় দেবতার ওপর ক্ষোভের অভিমানের।

কি করে বাড়ি ঢুকবেন নাতনীকে হারিয়ে এসে।

লজ্জা ধিক্কারের ভয়ে ভাবনায় জটিল মন নিয়ে স্থাণুমূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইলেন। বাড়ির লোক পাড়ার লোকেরা কি বলবে। কি জবাব দেবেন।

সহসা কে ডাকল, 'আরে ডোকরী, থারি ছোরি তো আ গয়ি' (ও বুড়ী, খুকী এসে পড়েছে) চমকে উঠলেন তিজাবাঈ।

কে হাত ধরল, বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেল, তা তিনি জানেন না। বুঝতে পারলেন না। চোখের জল ধার তখনো শুকোয়নি।

দেখতে পেলেন ভিতরের সামনের তেবারাতে (দালানে) তাঁরই মত বেগুনী ঘাগর পরা খয়েরী ওড়না গায়ে তাঁরই মত শীর্ণ দেহ একটি বৃদ্ধা বসে। তাঁর চারদিকে তাঁর বাড়ির লোকেরা দাঁড়িয়ে বসে কথা কইছে।

এবং কিষণির হাতে হনুমানজীর প্রসাদের একটি বড়সড় লাড্ডু, সে অবাক হয়ে এক একবার খাচ্ছে আর চারদিকে তাকাচ্ছে।

লোকজনের কলরবসহ তিজাবাঈ ভেতরে ঢুকতেই সেই বুড়ীও মুখ ফেরালো সকলের সঙ্গে সেদিকে।

কাছে এসে তারপর দুজনেই অবাক।

আশ্চর্য হয়ে দুজনেই বলেন এককথা, 'আরে ভাইলি, ভাইলি (আরে সই, সই)। এ কি রকম হ'ল সই, তুমি এখানে এলে কি করে।'

দুজনের চোখের জল আঁচলের মানসিকের পয়সা, আর সারাদিনের উদ্বেগের কাহিনী, আর সমবেত পরিজন পাড়ার লোক মিলে প্রায় একটি বিয়ে বাড়ীর গোলমালে পরিণত হ'ল ব্যাপারটা।

সেই সই পাতানো কবেকার মাসুর বাল্যসঙ্গিনী মামার বাড়ীর দেশে—কতবার দেখা হয়েছে। আবার কত দীর্ঘ কাল দেখা শোনা নেই।

কি আশ্চর্য ঘটনা!

কেমন করে কখন যেয়ে হারালো, কি করে পথে আর দেখাও হ'ল না, আর আশ্চর্য কেন যে দাদী বলে, দাদীর সইকেই ডাকল। একে বারে অবাক কাণ্ড।

আর দুজনেই বিদ্যাধরজীর রাস্তা আর গোপালজীর সড়কে এত কাছাকাছি রয়েছি।

দুই বুড়ির মানতের পয়সা জমে পাল্লা (আঁচল) ভারি। দেবতাদের ঋণ, আবার কাছাকাছি নয়। সেই গলতা পাহাড়, গনেশ গড়, ঢেঁডকী বালাজী, হনুমানজী, সব পাহাড়ের, সব পথের সমতলের, পুণ্য জলকুণ্ডের কোন দেবতার কাছেই আর মানসিক করতে তাঁরা বাকি রাখেননি।

বেটী কা বাপ

বিশাল এক অশ্বত্থ গাছের তলায় এক প্রকাণ্ড কুয়ো। কুয়োর মুখের বেড়টাই প্রায় সাত-আট হাত। আর গভীরতা প্রায় একশো হাত বা আরো বেশী।

রাজস্থানের সব কুয়োর মতই সে কুয়োর জলও বলদে টেনে তোলে। একটা চামড়ার থলে করে প্রকাণ্ড কাছি দিয়ে বেঁধে। গরু বা বলদে সেই দড়ি বাঁধা গলায় নীচু একটা ঢালু জমিতে নেমে যায় আর কুয়ো থেকে চামড়ার চড়স বা থলে ভর্তি জল উঠে এসে নালা প্রণালী বেয়ে ছোট চৌবাচ্চা ও ক্ষেতে ক্ষেতে চলে যায়। কুয়োর চারিদিকে লোকের ভিড়। জলের প্রয়োজন সকলেরই। মাথার উপর পিতল তামা-মাটির কলসী নিয়ে গ্রামের মেয়েরা এসেছে পুরুষরা আশ বেঁধে জল নিচ্ছে।

সারা গ্রামের সব অধিবাসীরই জন্য এই কুয়োতলা। কোন গ্রামের দুটি-তিনটি কুয়ো কোথাও আরও বেশী, যদি ধনী সম্প্রদায় থাকে অবশ্য

ভোর থেকে কুয়ো চালানোর গান শুরু হয়। 'আরে কীলে চলিও পানি ভরিও।' 'কুয়া চলিও' বলেও কেউ কেউ গান গায়। আরো গ্রামসঙ্গীত লোকসঙ্গীত গায় মেয়েরা পুরুষরা। তবে গরু খেদিয়ে চড়স ভরার গান প্রায় দু'লাইনেই সারা, দু'টি মানুষ গায়।

আর অশ্বত্থতলায় অন্যদিকে গল্প গান বচসা বাক্‌বিতণ্ডা নিয়ে বসে থাকে, জল ভরে নেওয়া নানা বয়সের মেয়ে।

জলের দরকারে সমস্ত সকাল আর বিকাল যেন সারা গ্রামটি জড় হয় ঐ কুয়োতলায়।

চাষী কৃষক পুরুষ ও থাকে আশে পাশে। তাদের কাজের অবসরে তামাক খাওয়া দু-চারটে কথা বলার চেষ্টা—অবসর নেই অবশ্য।

সেদিনও কোন মেয়ে বাসন মেজে নিচ্ছে 'শুকমঞ্জন' (শুষ্ক মার্জনা) করে। জল পড়লেই অশুচি হয়ে যায় সে দেশে। জলে শুদ্ধ হয় না। শুকনো বালিতেই শুদ্ধ। কোনো মেয়ের দল জল ভরে তিনটে কলসী উপরি উপরি মাথায় নিয়ে বাড়ি ফিরছে।

সহসা দেখা গেল একটা দীর্ঘাঙ্গী প্রৌঢ়া নারী তিনটি বালিকার সঙ্গে আসছে।

কুয়োতলার কর্ম ও গল্পব্যস্ত সকলেরই সেদিকে চোখ পড়ল। তার অবাক হয়ে চাইল।

শোনা গেল ঐ বৃদ্ধা রোজ কুয়োর পাড়ে আসে না। কুয়োর ধারে দু-একজন তার সমবয়সী নারী ছিল। নিজেদের মধ্যে তারা কি যেন বললে। একজনের মুখে যেন কুটিল দুষ্ট হাসির আভাস খেলে গেল।

তারপর সে এগিয়ে এসে তাকে বললে, 'কি ভাই নাতি হয়েছে ?'

প্রৌঢ়া ভ্রূকুঞ্চিত করে তার দিকে চাইল। তারপর বেশ বিরক্ত ভাবে বললে, 'কেন কি হয়েছে তাতো তুমি দেখেই এলে সকালে। আবার জিজ্ঞেস করছ কেন ? তামাসা করছ ?'

সে বললে, 'ওমা, আমি আবার কখন দেখলাম !'

প্রৌঢ়া বললে, 'কেন সবারি সঙ্গে দাঁড়িয়ে গল্প করছিলে হাসছিলে। বলছিলে—এবারও মেয়ে হয়েছে। ছটা মেয়ে হয়েছে। মজা বুঝবে। সবই আমার ছোট ছেলে শুনেছে। আমি 'জাপায়' (আঁতুড়ঘর) ছিলাম। পরে শুনলাম। এখন নাইতে এলাম।'

অন্য বুড়ী গালে হাত দিল। গলার স্বর উঁচু করল। উঠে দাঁড়িয়ে চারিদিকে চেয়ে বললে, 'দেখ একবার। গায়ে পড়ে ঝগড়া করার রকম দেখ কুশল সিংয়ের মার ! কি কাণ্ড। আমি তো বাড়ি থেকে সোজা কুয়োতেই আসছি। তা তোমার বাড়ি পথে পড়ে, এক পলক মাত্র দাঁড়িয়েছিলাম। তার মাঝে অত কথা কখন বা বললাম, কার কাছেই বা বললাম ? তোমার ছোট ছেলে সন্ত সিং তো দেখি খুব খারাপ লোক ! আর ছেলে হয়েছে কি মেয়ে হয়েছে বললে দোষটাই বা কি ?'

চারিদিকের মেয়েদের ততক্ষণে কুয়োর জল তোলা বন্ধ হয়ে গেছে। বেশী ঘোমটা দিয়ে কম ঘোমটা দিয়ে সবাই দুই বুড়ীকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে।

সন্ত সিংয়ের মা রাগে আগুন হয়ে গেছে। তার মুখে কথা বেরুচ্ছে না।

অন্ত বুড়ীটি বিনিয়ে বিনিয়ে নানারকম কথা বলে চলেছে। যার প্রতিপাদ্য বিষয় হ'ল, মেয়ে হয়েছে কি ছেলে হয়েছে লোকে দেখতেও যায়, মুখেও বলে থাকে। তাতে তো কোনো কেউই কখনো রাগ করে না। তুই বুড়ী বাতাসে দড়ি বেঁধে ঝগড়া করছিস কেন? কি ঝগড়াটে গো! বেশ হয়েছে মেয়ে হয়েছে! রাজপুতের ঘরে গণ্ডা গণ্ডা মেয়ে হওয়ার ফল ভোগ কর্ সবাই! মনে নেই সেবার তোর মা আমার পিসিকে কি বলেছিল—চার মেয়ের মা হয়েছে বলে।

সন্ত সিংয়ের মা অবাক। মা কবে বলেছে তোর পিসিকে ওকথা? আমিই বা তাকে কবে দেখলাম? তুই তো কম মিথ্যাবাদী নস!

তুমুল বচসার মাঝে শোনা গেল। অন্ত বুড়ীকে পাড়ার মোতিবাঈ সে কথা বলেছে। রাজপুতের ঘরের মেয়ে বেশী হবার খোঁট, আর টিটকারী বুঝি ওরাই কে কবে দিয়েছিল সন্ত সিংয়ের বাড়ি থেকে। ওর পিসির নাম করেনি বটে কিন্তু তাকে দেখেই বলেছিল, এবং সে কথা তে, এ বুড়ী ভোলেনি—আজ পাল্টা টিটকিরি দিয়েছে তাই। মেয়ে হয়েছে জেনেও ছেলে হয়েছে বলে ডাক সেজে আনন্দ জানিয়েছে বেশ বেশ বলে।

কুয়োর পাড়ের পুরুষেরা বিরক্ত বিরক্ত হয়ে উঠল পাড়ার ঝগড়ায়। কিন্তু কেউই মেয়েলী ব্যক্তিগত ঝগড়ার মাঝে কথা কইতে চাইল না। তাতে আবার অন্ত বুড়ী ভীম সিংয়ের মা প্রসিদ্ধ মুখরা। কিন্তু ঝগড়া, জলতোলা, জলভরা কিছুই থামল না। এবং ক্রমেই রোদ উঠল বালি তাতল, বেলাও হল। বুড়ীর বাড়িতে আঁতুড় ঘরে কাজও আছে। তিনটি শিশু নাতনীও সঙ্গে সুতরাং সন্ত সিংয়ের মা বাড়ি ফিরল রাগের আগুনে জলতে জলতেই।

২

বুড়ীর বড় ছেলে কুশল সিং সেপাইতে কাজ করে। তার দুই মেয়ে এক ছেলে। ছোট ছেলে গ্রামের ক্ষেতখামার দেখে। শহর হাটবাজার যাওয়া আছে। তাও করে, আবার মামলাবাজিও মাঝে মাঝে করে।

বুড়ীই বাড়ির গিন্নী! দু বৌ আর নাতি-নাতনী নিয়ে। তা বড়ছেলের

বৌর দুটো মেয়ে হলেও একটা ছেলে আছে। রাজপুতের ঘরের বংশধর। মুখ রেখেছে। ছোট বৌটির এবারে নিয়ে চারটে মেয়ে হ'ল। সবাই ভেবেছিল এবার একটি ছেলেই হবে। তাই হিংসুটে জ্ঞাতিগোত্রের গ্রামের লোকের আনন্দের সীমা নেই।

সন্ত সিংয়ের মা ভুরিবাঈয়ের বড় ছেলে সেপাইতে 'অপ্‌সর' সামান্য উঁচু পদের (অফিসার)। ছোট ছেলে গাঁয়ের মোড়ল। সকলেরই বেজায় মেজাজ। আবার কুটুম্বরাও পাশের গ্রামের সম্পন্ন গৃহস্থ। ছোটখাটো জমিদার বিশেষ।

জ্ঞাতিদের আর কত সয়। কুয়োপাড়ার অন্য বুড়ী গণেশীবাঈ ভুরিবাঈয়ের জ্ঞাতি ননদ।

মনে মনে রাগ আর নানারকমের কল্পনাভাবনা নিয়ে বুড়ী ভুরিবাঈ বাড়ি এসে আঁতুড়ের চালায় উঁকি মারল।

পোয়াতি ঘুমোচ্ছে। আর তার পাশে এক রাশ ফুলের মত নতুন শিশুটিও ঘুমচ্ছে।

হাঁ, খুব সুন্দর হয়েছে। পাশ থেকে নাতনীরাও বলছে, 'দেখ দাদী, কি সুন্দর মেয়ে হয়েছে মার।'

বুড়ীর মুখে হাসি ফুটেছে। বুড়ী বললে, 'হ্যাঁ।'

তার এ নাতনীরাও সুন্দরী। আর সেই জন্যই তো—কি সেইজন্য? বুড়ী মনে মনে যেন কি বলল।

তারপর বড়বৌকে ডেকে বললে, ছোটি বিন্দনীকে চা পানি ঝাল গুঁড়ো সব দিয়েছিস? দাই এসেছিল, আবার কখন আসবে? সেঁক তাপ করবে তো?

বড়বৌ আধ ঘোমটা টেনে শাশুড়ীর কথায় উত্তর দিলে। পাঁচ নাতনী এক নাতি নিয়ে শাশুড়ি বসলে দাওয়ায়। বৌ রুটি করছে রান্নাঘরে। ছেলেরা দুজনেই বাড়ী নেই কাজে বেরিয়েছে। বুড়ীর মনের মধ্যে কুয়োর পাড়ের রাগ ঝগড়া সত্ত্বেও বাইরে পাশে ফুটফুটে পাঁচটি রাজপুত কন্যা আর একটি সুন্দর কিশোর পৌত্র মনকে বারে বারে কোমল করে দিচ্ছে।

কিন্তু রাজপুতের ঘরে এত মেয়ে। গালাগালির মত ব্যাপার। একে তো তার কথায় কথায় 'বেটী কা বাপ' বলে শ্লেষ করে কথা বলে। ভুরিবাঈ নাতনীদের চুল বেঁধে দিতে বসে বহু পুরানো বংশের খানদানী ঘরের অনেক কাহিনী মনে করতে লাগল।

সবাই তো তার জানা আছে। লোকে বলে কাল বদলেছে কই আর

বদলেছে ? তাহলে কি আর গণেশী মাগী গায়ে পড়ে কথা শুনিয়ে ঝগড়া বাধাতে পারে !

হোক সুন্দর মেয়ে...... ।

আজ ছেলেদের বলবে ঝগড়ার কথা—একটা বিহিত করতেই হবে ।

বিকেলে বড়ছেলে বলে, 'কি বিহিত ?'

মা বল্লে, 'সে যা-হয় করব কিছু তখন বলব । দাঁড়া, আগে কুয়ো পূজোটা হয়ে যাক—আঁতুড় থেকে বৌ বেরিয়ে আসুক ।'

৩

'কুয়ো পূজো' ব্যাপারটা যেন অনেকটা আমাদের ষষ্ঠীপূজোর মত শুচিশুদ্ধ হওয়া । পাঁচ-সাত জন সধবা মেয়ে পোয়াতিকে ধরে উঠিয়ে কুয়োর ধারে আকণ্ঠ ঘোমটা টেনে আনে তারপর শুভজন্মমঙ্গল সঙ্গীত গাইতে গাইতে তার ঘরে যায় । একজনের কোলে থাকে শিশুটি ।

মা ও শিশুর সর্বাঙ্গ ঢাকা, কেউ যেন দেখতে না পায় 'নজর' লাগবে 'সোঁদা' নতুন শরীরে । আর এই কুয়ো পূজোটি করতে হয় শিশুজন্মের ছ'দিনের দিন । অনেকটা 'ষেটের পূজা'র মত ।

নবজাতকের জননী টলতে টলতে যাবে । গায়ে জোর নেই বটেও । আর সেটি দেখাতেও হবে । না হলেই পাড়াপড়শীতে 'ডাইনী' ও থাকতে পারে কেউ—সে ঠিক 'নজর' দিয়ে শিশুর রক্ত অদৃশ্য উপায়ে শোষণ করে নেবে । পোয়াতির ক্ষতি করে দেবে কোনো কিছু ।

কুয়ো পূজোও হয়ে গেল নিয়ম মত ।

নতুন শিশু শুয়ে থাকে ঘরের সামনের দাওয়াতে ছোট্ট খাটিয়ায় । আর রাজ্যের শিশু বালক বালিকা এসে তাকে ঘিরে বসে । কেউ বলে কি সুন্দর, কেউ বলে কোলে নেবে । কেউ একটি লাল ফুল নিয়ে আসে তাকে নবজাতক দেখবে । কেউ আবার বাতাসা মিষ্টিও আনে খাওয়াবে বলে ।

বুড়ী ঠাকুমা তুরিবাঈয়ের আর নড়বার উপায় নেই । পাছে সত্যিই ওরা মেয়ের মুখে বাতাসা পুরে দেয় । চোখে ফুল বুলিয়ে খোঁচা দেয় ।

যদিও কিছুই মায়াদয়া নেই মেয়েটার ওপর । চার-পাঁচটা মেয়ের ওপর

মেয়ে! দুই ভাইয়ের ঘরে ছ' মেয়ে। রাজপুতের ঘরে মেয়ের ব্যাপার তো সবাই জানে। আজই না হয় ওরা গেরস্থ। নইলে ওদের বংশ তো খুব বড়। বড়ঘরও বটে। তেমনি ঘরের সঙ্গেই তো কুটুম্বিতা করতে হবে। ছেলেদের অত ধন কোথায়? আর মনেও তো খাটো হয় মেয়ের বাপকে।

কুশল সিং এসে দাঁড়াল প্রাঙ্গণে।

খাটের ওপর এক মাসের মেয়ে ঘুমোচ্ছে।

ঘুমন্ত মেয়ের দিকে চেয়ে রইল জ্যেঠা। তার চোখ যেন ফেরে না। মাকে বললে, 'এই মেয়েটা সকলের চেয়ে সুন্দর হয়েছে! যেন পদ্মফুল। এর নাম রাখ পদ্মিনী।'

একটু দূরে বসে মা চরকা কাটছিল।

একটু বিরসভাবে ছেলেকে বললে, 'তুই তো সবগুলোকেই সবচেয়ে সুন্দর হয়েছে বলেছিস ছোটবেলায়। আর সবাইকেই 'পদ্মিনী' বলতিস্। ছটা পদ্মিনীর জন্যে ছটা ভীম সিংয়ের যোগাড় তো করতে হবে। মাথা আর মান তাতে তো বিকিয়ে যাবে তোদের।'

ছোটছেলে এসে দাঁড়িয়েছিল। সেও হেসে বললে, 'আর আলাউদ্দিনের ভয়ও আছে পদ্মিনীদের জন্যে।'

মেয়ে জেগে উঠেছিল। জ্যেঠা কোলে তুলে নিয়ে বললে, 'একালে আর আলাউদ্দিন নেই। তার ভয়ও নেই। হোক না ছটা মেয়ে। কেন অত বারবার ছটা মেয়ে বলছ।'

মা তিক্ত মুখে বললে, এখন আদর করতে ভাল লাগছে। পরে বুঝবি। এখন তো পাড়ার লোকে হাসি তামাসা করছে। সেদিন কুয়োতলায় ভীমের মা কত কথাই বললে। বলে, 'আমি বলি ছেলে হয়েছে। ও এবারেও মেয়ে!'

দুই ভাইয়ের মুখই গম্ভীর হয়ে গেল।

কুশল সিং শিশুকে বিছানায় নাবিয়ে বললে, 'একালে আর অত ভাবে না লোকে। তুমি কেন কথা বল ওদের সঙ্গে। আমাদের মেয়ে আমরা বুঝবো। লোকের 'পচাইয়ের' দরকার এত কিসের!'

জ্যেঠার পদ্মিনী ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে একটু হাসল যেন। আবার ছোট্ট দুখানি টুকটুকে ঠোঁট দুধ খাবার মত চুষল।

যুব জ্যেঠা রাগ ভুলে গেল প্রতিবেশীদের ওপর। আবার নীচু হয়ে বহু

আঙুলে মেয়ের গায় হাত দিয়ে বললে, 'সত্যিই পদ্মিনীবাঈ আমাদের। রানী পদ্মিনীই হবে দেখিস্।'

৪

মেয়েটা দু'মাসের হয়ে গেল। যেমন শান্ত তেমনি সুন্দর আর মোটাসোটা বড় হয়ে উঠেছে। গ্রামে, মোতি-জ্বরা (টাইফয়েড) লেগে গেল—ঘরে ঘরে কারুর অসুখ। আবার হাম বসন্ত দেখা দিল—মাতা, ফুলমাতা, ছোটি মাতা নানা নামে মায়ের দয়া দেবী শীতলা রূপে।

না, ভূরিবাঈদের ঘরের চৌকাঠও কোনো অসুখ আর মাতা ফুলমাতা কোনো মাতাদেবীই মাড়ালেন না।

ছ-ছটা মেয়ে কারুর গায়ে একটু আঁচড় লাগে না অসুখ-বিসুখের। যদিও প্রথম চারটে নাতনী ঠাকুমার ভারী আদরের। গোদাবরী গঙ্গা জানকী যমুনা আর গৌরীও। সবাইকেই ভূরিবাঈ ভালবাসে। মায়া পড়ে গেছে। মরে যাক্ সেটা খুব মনে হয় না। তবে এই নতুন ছোট্টটা এটার কোন অসুখ হলে তার দুঃখ ছিল না···বরং সুবিধাই হ'ত···। কি সুবিধা? সে ভূরিবাঈই জানে।

মেয়েটা যত সুন্দর হয়ে ওঠে তত জ্যেঠার আদরের হয়। আদিখ্যেতার চয় মুখ রং চেহারা যেন নিখুঁত 'গঙ্গোরের' (গণগৌরী দেবীর) মত।

ঠাকুমা নাতনীদের নিয়ে বসে সকলের চোটী বিনুনী বেঁধে দেয়। আঁচড়ে দেয় মাথায় ঘি মাখিয়ে। আর নানারকম রূপকথা বলে। সোনে কি মক্কা (সোনার ভুট্টা), রাজা কি কুমার ঔর জাঠকী ছোরীর, (রাজার ছেলে আর চাষার মেয়ে) চমকপ্রদ রূপকথা। আবার ইতিহাসের গল্পও বলে—রাজা হাম্বীর রানী কমলাবতী কর্ণাবতী রাজকুমারী কৃষ্ণকুমারী। যাকে আফিম ফুলের কুসুম্ভ ফুলের বিষ দুধের বাটিতে গুলে খাওয়ানো হ'ল মেরে ফেলার জন্ত।

নাতনী গোদবরী বারো বছরের হয়েছে। আর সকলেও বড় হয়েছে।

তাদের যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। বিষ? কেন দাদী? মরে গেল কৃষ্ণকুমারী? সত্যি বিষ খাইয়ে দিল? কে দিল বাবা, কাকা? কেন দিল?

নির্লিপ্ত মুখে ঠাকুমা বলে, 'আর কেন! রাজপুতের মেয়ে! তারা রাজার মেয়ে হলেও মেয়ের দায় তো। আর করম তো একটা আছে। করমফল আগের জন্মের ছিল তার।'

রাজপুতের ঘরে বেশী বেটীকা বাপ হওয়া কি কম অপমানের কথা…। তাতে রাজকন্যা? রাজা বাপকেও ছোট হতে হয় তো মেয়ের জন্যে!

নতুন খুকীর দিকে চোখে পড়ে বুড়ীর। সত্যি। সত্যি যেন কৃষ্ণকুমারী না পদ্মিনীর মতই সুন্দর মেয়েটা। কি সুন্দর যে দিনে দিনে ভাল লাগে দেখতে কিন্তু তার মায়া হয় না। তবু দয়া হয় একটু যেন। থাকে থাক বেঁচে। যদি রামজীর তাই ইচ্ছে হয়।

গোদাবরী ভীতভাবে ঠাকুরমার ঐ কথাকাহিনী শোনে! কিন্তু তার মনে হয় এর চেয়ে আরব্য উপন্যাস রামায়ণ মহাভারতের গল্প ভালো! তাতে রমণীদের জহরব্রত কিংবা বিষ খাওয়ানো, মেরে ফেলা, মরে যাওয়ার তো গল্প নেই। রানীরাও পুড়ে মরতেন? সভয়ে জিজ্ঞাসা করে।

৫

কুশল সিংয়ের শহরে ডাক পড়ছে কুচ্‌কাওয়াজের জন্য, শীতকাল তো। সে এসে বললে, 'জিজি, (মা), আমি কাল ভোরে শহরে যাব ফিরে আসতে দিন দশ বারো হবে। আরো কোথায় পাঠায় কিনা কে জানে' আবার সন্তও যাবে একটা মামলা আছে। একটু হাটবাজারও আছে। এখন তো 'রবির' (রবিশস্য) দেরী আছে ততদিন বাইরে ক্ষেতখামারে বেশী কাজ নেই। শুধু ঘর। আর এই তোর নাতি আর ছটা নাতনী। শীতকালে সাবধানে কাটাস।'

স্নেহশীল কুশল সিং মেয়েদের দিকে চাইল হাসিমুখে। আর ঘুমন্ত খুকীটাকে একবার কোলে তুলে নিল।

দুর্ধর্ষ, অপসর (অফিসার), সেপাই জ্যেঠা বললে, এই পদ্মিনীটার জন্যেই আমার মন কেমন করবে খুব। আমি ফিরতে ফিরতে এটা আরো বড় হয়ে যাবে। আর সুন্দর হবে আরো। যদি দেরি হয় ফিরতে।

তার নিজের মেয়ে অন্য ভাইঝিরা তাকে তখন ঘিরে দাঁড়িয়েছে। শহর থেকে বাবা কি কি আনবে তাদের জন্য। গুড়িয়া, (নেকড়ার তৈরি পুতুল) কাঠের খেলনা রান্নাবাড়ির সরঞ্জাম 'চাকি' 'চুলা' তাওয়া থালা সবরকম হওয়া চাই খেলনাগুলি।

ছেলে বীর সিং বললে তার একটা হাওয়াগাড়ী চাই কলের।

৬

বড়ছেলে শহরে গেল। কয়েকদিন বাদে সন্তু সিং মামলা করতে গেল।

দেশে রোগ নেই। শীতের হাওয়া নিমের বাতাস গরু মহিষের দুধ ঘি ছাচ (দই ঘোল) আর ঘরের গমের বেজড়ের রুটি (যব, ছোলা, গম মেশানো রুটি) বাজরার খিচুড়ি দলিয়া লৌঞ্জি (আচার) দিয়ে সামান্য ডাল তরকারী দিয়ে খেয়েও তাদের স্বাস্থ্য আর রং যেন ফেটে পড়েছে।

পাঁচটা মেয়ে যেন পাঁচটি গণগৌরী প্রতিমা। বৌদুটিরও রূপ ধরে না শরীরে।

রাজপুত ঘরের মত বুড়ীও সন্ধ্যেবেলা একবাটি আফিম-গোলা জল খায় আর ঝিমোয়। ঝিমোতে ঝিমোতে ওদের কাহিনী শোনায়।

আর ভাবে, না, কোনো মেয়েরই গা গরম হয় না শীতের ঠাণ্ডা লেগে।

সর্দি কাশি হয় না। কিছু হয় না।

ত কারুর না হোক ছোট্ট ঐ 'সোঁদা' নতুনটারও গায়ে ঠাণ্ডা লাগে না?

এদিকে ছেলেরা চলে গেছে। শাশুড়ী হুকুম করলে এখন থেকে বিকালে ছোট বিন্দনী (বধূ) রান্নাঘরের কাজ করবে। ওর কাছে মেয়ে দিয়ে। সকালে বড়বউ রাঁধবে।

বুড়ী যেন কি ভাবছে কি ভাবছে বুড়ী? বড় বৌ ভাবে শঙ্কিত মনে।

৭

কদিন গেল কুশল সিং আর সন্তু সিং একসঙ্গেই ফিরল।

ছেলেমেয়েরা সব প্রাঙ্গণে খেলা করছিল। এসে কাছে দাঁড়াল। কাকা ও বাপের হাতে মস্ত ঝোলা-ঝুলি। কিন্তু তারা চেঁচামেচি হৈচৈ কিছু না করে চুপ করেই দাঁড়িয়ে রইল।

পিতা হাসিমুখে ঝোলা থেকে এটা সেটা বার করতে লাগল। খেলনা, পুতুল, খেলার-মোটরগাড়ি, একটা লাল ঝুমঝুমিও।

এবারে হঠাৎ চোখে পড়ল দাওয়ার উপর ছোট খাটুলীটা খালি। খুকীটা কই? পদ্মিনী কই তার?

জিজ্ঞাসা করলে, 'কোথায় পদ্মিনী? ভেতরে?'

মা বসেছিল চুপ করে রোয়াকে। কেঁদে উঠল অস্ফুট চেঁচিয়ে মুখটা ঢেকে।

ছোট ছেলেরা খেলনায় হাত দিয়েই দাঁড়িয়েছিল। বড় মেয়েরা চোখ মুছতে

লাগল। বৌ দুজন রান্নাঘরের দরজার কাছে ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়ে গুনগুন করে কাঁদতে লাগল।

কুশল সিং উঠানের একটা খাটিয়ার ওপর বসে পড়ল। সন্ত সিং বিহ্বল ভাবে রোয়াকে মার কাছে বসল।

কুশল সিংয়ের হাতে লাল ঝুমঝুমিটা। আর ওদিকে পদ্মিনীর খালি খাট বিছানা। সে অন্যদিকে তাকিয়ে রইল। চোখ দুটো লাল হয়ে গেল। তার সেপাইয়ের চোস্ত দাড়ি গোঁফ বেয়ে টপটপ করে চোখের জল পড়তে লাগল।

তারপর চোখ মুছে সহসা গম্ভীর হয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে, 'কব গুজরি বাই? ছোরী কদ্ গুজ্রী (কবে মারা গেছে মেয়ে)?'

জননী বললে, 'এই পাঁচ দিন হল—তোরা যাবার চার দিন পরে কাছে।'

ছেলে বললে, 'কি অসুখ হয়েছিল?'

'কিছুই না। একদিন একটু গা গরম হয়েছিল।'

ছেলেরা সন্দিগ্ধ ভাবে মার দিকে চাইল। 'ওষুধ এনেছিলে?'

'তোরা নেই। আর একটু জ্বর। ওষুধ কিছু আনিনি। কে আনে। হঠাৎই মরে গেল তো।'

হঠাৎ কুশল সিং গম্ভীর হয়ে গেল। যেন কি একটা কথা মনে হল আর কিন্তু কিছু বললে না। ঘর উঠে গেল।

৮

দিনের কাজ খাওয়াদাওয়া শেষ হল। সন্ধ্যাও শেষ হল। রাত্রি হল। অনেক রাত্রি।

ছেলেমেয়েরা সব শুয়েছে। ছোটবৌ বড়বৌ ঘরে। সন্ত সিংও শুতে গেছে। কুশল সিং মার ঘরে এসে বসল।

সহসা বললে, 'আর দুটি মেয়ের ভাবনা রইল না তোর।'

মা চকিত হয়ে উঠল। কিছু বলতে পারল না যেন কি রকম হয়ে গেল মুখটা। তারপর বললে, 'তা রামজী দিয়েছিল। সেই আবার কেড়ে নিল।' বলে চোখ দুটো একটু মোছবার মত করলে।

ছেলে কঠিন মুখে মার দিকে চেয়েছিল। 'হ্যাঁ, তা নিয়েছে। তুভি থোড়ি খনি অফল খালি ছি? (তুইও আফিম দিয়েছিস একটু বেশী করে) তাই ঠিক না?'

মা চমকে উঠে অপ্রস্তুত হয়ে গেল। তারপর রেগে উঠল।

'আফিং কি আজ আমি নতুন দিচ্ছি ছেলেমেয়েদের? তোদের সব ছেলেমেয়েই তো আমার কাছেই অম্বল খেয়ে ঘুমিয়েছে। বারো মাসই তো আমি ঘুম পাড়িয়েছি।'

'হ্যাঁ, তা' আমি জানি। তবে এবারে দুটি মেয়ে দেখে একটু বেশী অম্বল দিয়েছিস্। বেশী বেশী ভেবেছিলি কিনা। তাই মাত্রা বেশী হয়ে গেছে।'

কুশল সিং উঠে গেল ঘর থেকে।

সেই ছেলেটা

দিল্লীর বয়স্ক-শিক্ষাকেন্দ্র। কুইন্‌স্ পার্কের মাঝে জায়গাটা।

চারিদিকে লোক যাওয়া-আসা করছে, বসেও আছে। তিনটি মেয়ে শিক্ষাকেন্দ্রের বাড়ীটার কাছে দাঁড়িয়ে কথা কইছিল। শীতের সকাল, রোদ্দুরটা ভালই লাগছিল।

তাদের আলোচ্য বিষয়টি হ'ল, দু'একটা চাকরি খালি হয়েছে—বয়স্ক মেয়েদের শিক্ষা বিভাগে। মেয়ে চাই। মাইনে এখন ৫০ টা. ক'রে। পরে পাকা চাকরি হ'লে ৮০ টা. হবে, কোয়ার্টার পাবে। উন্নতির আশাও থাকবে। গুণপণা বা বিদ্যাবুদ্ধি ম্যাট্রিক হ'লেই চলবে আপাততঃ। স্কুল বা পাঠশালা বসে দুপুরে ঘণ্টা তিনেক ক'রে—সেলিমগড়ে, বিড়লামন্দির-এ, খাড়িবাউলীতে, কারোলবাগে, বাল্মীকি মন্দিরের হরিজন কলোনীতে বা অন্যত্র যেখানে লোক পড়াতে হবে। ছাত্রীদের ১৪ বছরের ওপর থেকে ৬০।৭০।৮০ বছর বয়স অবধি চলতে পারে। ১৪ বছরের নিচে বয়স চলবে না।

দাঁড়িয়ে ছিল বরুণা গুপ্ত, সুজাতা মিত্র আর রাজকুমারী (ক্ষেত্রী) মেয়েরা—তিনজনই ম্যাট্রিক পাস ক'রে কলেজের ফার্স্ট ইয়ারের, সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্রী।

চাকরিটায় ভারি সুবিধা। সকালে কলেজ ক'রে দুপুরে ১টার পর বয়স্কদের স্কুলে—'পহেলী কিতাব' আর 'দুসরী কিতাব' আর পাহাড়া পড়ান—(প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ আর নামতা)। ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রীর কাছে ত এ পড়ান 'ডাল-ভাতের' চেয়েও সোজা।

এতেই মাস গেলে ৫০টি টাকা। এরা তিনজনেই দরখাস্ত দিয়েছে।

আরও কত জন দিয়েছে ওরা জানে না। তবে মনে হয় ওরাই ক'জন দিয়েছে। সকলে ত খবরও জানে না, আর সকলের ত সময়-সুযোগও হয় না।।

এরা তিনজনেই ইন্দ্রপ্রস্থ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী। চেনাশোনা আছে।

বরুণা জিজ্ঞাসা করলে রাজকে আর সুজাতাকে—'তোরাও কি এখানেই দরখাস্ত দিয়েছিস্?'

সুজাতা বললে, 'হ্যাঁ, গুপ্তর আপিসে।'

রাজকুমারীরই বয়স সবচেয়ে কম। সে বললে, 'আমিও ত এখানেই দিলাম। সেদিন আমার কাকা দিয়ে গেছেন। কিন্তু গুপ্তজী কি বাঙালী? তোমাদের কেউ আপনার লোক হন কি? বরুণা বিবিজীও ত গুপ্ত? তা হলে, তোমাদেরই চাকবি হবে, তাতে এবারে সেকেণ্ড ইযারে উঠেছ তোমরা।'

সুজাতা হাসলে, বললে, 'না, গুপ্তজী বাঙালী নন। ইউ. পি-র লোক বোধ হয়। লোকটিকে কেমন যেন লাগল। টেবিলের ওপর পা তুলে বসে দাঁত খুঁটছিলেন। আমরা ক'জন মেয়ে ঘরে ঢুকলাম নানা কাজে। আমার হাতে দরখাস্ত ছিল, দিলাম। তা যেমন ব'সে ছিলেন তেমনিই ব'সে রইলেন। দরখাস্ত দেখে বললেন, আপ বাঙালী? কোন্ দেশে থাকেন? বললাম, হ্যাঁ, আমি বাঙালী। বহুদিন দিল্লীতে আছি। পড়াশুনা দিল্লীতেই করেছি, হিন্দীও জানি। ভদ্রলোক বললেন, আপকি হিন্দী জোবান ত অচ্ছি নেহি' (আপনার হিন্দী উচ্চারণ ভাল নয়)। সাবনয়ে বললাম, হ্যাঁ আমি ত বাঙালী, কাজেই তা হ'তে পারে। কিন্তু হিন্দী পড়াতে পারব। হিন্দীতেই পাশ করেছি, এখানেই ইন্দ্রপ্রস্থ স্কুল থেকে।'

সুজাতা হাসতে লাগল। বললে, 'আমাদের কাজ পাবার ভরসা নেই। রাজ পাঞ্জাবী, তাতে উদ্বাস্তুও। তুমি পেলেও পেতে পার।'

রাজ অন্য মনে বাগানের ফুলের কেয়ারীর দিকে চেয়েছিল। চোখে যেন জল। একটু ম্লান ভাবে বন্ধুদের দিকে চেয়ে বললে, 'এই চাকরিটা পেলে আমার কলেজে পড়া হবে, নইলে বাবা আর পড়াতে পারবেন না। কোনও রকমে ভর্তি হয়েছি বটে—কিন্তু বই, কলেজের মাহিনা নানা খরচের জন্ম বাড়ীতে কারুর মত নেই পড়ার। আমাদের ত সব ফেলে পালিয়ে আসতে হয়েছে। এখন খুবই অসুবিধা।'

বরুণা বললে, 'তোমার মা কি বলেন? ঐ অসুবিধার জন্যেই পড়া আরও দরকার।'

রাজ আরও ম্লান হয়ে গেল। বললে, 'মা নেই—মা থাকলে…।'

বন্ধুরা বললে, 'আহা। তা হলে বাড়ীতে কে আছে?'

'অনেক লোক। বাবা, ঠাকুমা, কাকারা, কাকীরা, তাদের ছেলেমেয়ে, আমার ভাই-বোনেরা, সবাই আছে।'

ওরা কেন্দ্রের আপিসে ঢুকল। সেখানকার প্রধানার কাছে শুনল, দু'তিন দিনের মধ্যে খবর পাবে। দরখাস্তের জবাব। দু'টো কাজ খালি আছে।

২

এবং আমুয়ারীর গোডাতেঙ রাজকুমারী আর অন্য একটি মেয়ে কাজ পেয়ে গেল।

সুজাতা ও বরুণা রাজের হাসিমুখ দেখে খুব খুশী হ'ল। রাজ পেল 'বিল্লীমারম' গলিতে একটি ছোট্ট কেন্দ্রে কাজ।

সকলেই নানা জায়গার অধিবাসিনী হ'লেও কুইন্‌স্ পার্কে কর্মসূত্রে আসা-যাওয়া করে।

কাজের শেষে পার্কের ওদিকের গেটে বাস স্ট্যাণ্ডে যায়। এক সঙ্গে বাড়ীর দিকের বাসে ওঠে বাগানে বেড়ায়। চিনে বাদাম কিনে খায়। চাঁদনীচকের ঘন্টাওয়ালার দোকানের প্রসিদ্ধ 'ডালমোট'ও খায়। দই-বড়া খায়। ভালমন্দ যা খুশি খায়।

বাস স্ট্যাণ্ডের আশে পাশে বাগানের ঝোপঝাড়ের পাশে অসংখ্য ভিখিরী থাকে নানারকম ধরনের।

সেদিন ওরা বাগানে রোদ্দুরে ব'সে বাদাম খেয়ে বাসের দিকের গেটে এল।

সহসা একটা ভিখিরী মেয়ে একটি ছেলের হাত ধ'রে এসে ওদের সামনে দাঁড়াল, 'বিবি, কুছ দে।' ছেলেটা হাত পাতল না, মা-র ওড়না ধ'রে দাঁড়িয়ে রইল।

মা হাত পাতল।

বরুণা বললে সুজাতাকে, তোর কাছে খুচরো আছে? তা হ'লে দু'টো পয়সা দিয়ে দে। আমার খুচরো নেই।'

রাজ বাদাম ছাড়াতে ছাড়াতে আসছিল একটু পিছনে।

সুজাতা থলে থেকে ব্যাগ বের করল।

বরুণার হাতে পয়সা দিল, নিজেও দুটো নিল।

ভিখিরী মেয়েটি পয়সা নিল। এবারে রাজ এসে পৌঁছেছে। তাকে দেখে বললে, 'বিবি, তুঁহু দে কুছ।' (তুইও কিছু দে।) 'সেলাওয়ার কামিজ' দেখে স্বদেশিনী ব'লে একটু হেসে বললে, 'কুছ ওড়নে-কা দে বিবি' (গায়ের কাপড়)।

রাজও পয়সা বের করছিল 'ওড়নেকা কুছ' শুনে একটু হাসল। 'শোনো কথা! তোর জন্যে যেন ওড়না নিয়ে আমরা এখানে এসেছি।'

তারপর ছেলেটিকে দেখে বললে, 'মুঙ্‌ফলি (চিনেবাদাম) খাবি? এই নে।' নিজের ওড়নার আঁচল থেকে ছেলেটির হাতে দিতে গেল।

সুজাতা হাসল, 'ও চাইছে 'চুন্‌নী' (ওড়না) আর রাজ দিচ্ছে মুঙ্‌ফলি (বাদাম)।'

ভিখারিণী চিনেবাদাম নিতে এগিয়ে এল। তারপর হঠাৎ বললে, 'বিবি, তোর ঘর কোথা?'

রাজ আবার হাসল···'আমার ঘর সেলিমগড, তুই যাবি সেখানে? ওড়না নিতে?' ঠাট্টার সুরে বলল।

ভিখারিণী বললে, 'না তোর পিণ্ড্‌ (দেশ) কোথায়—জিজ্ঞেস করছি।'

রাজ বললে, 'আমার দেশ' লাহোর। তোরও কি লাহোরে দেশ?'

বরুণা আর সুজাতা এবারে একসঙ্গে হেসে বলে উঠল, 'ওরে রাজ, তুই ওর দেশের লোক কি না জানতে চায়, কি মুশকিল। আমরা বাঙালী তাই পয়সা দিয়েই খালাস পেয়েছি।'

ভিখারিণী একটু থমকে গিয়ে যেন নিজের মনেই বললে, 'খা রাজ? তোর নাম রাজ? লাহোর তোর দেশ?'

রাজকুমারী হেসে উঠল, 'হ্যাঁ, রাজকুমারী লাহোরে আমার কলি বাগের কাছে। তা তোর কি হ'ল? নে পয়সা, আয়—'

ভিখারিণী ওড়না পেতে চিনেবাদাম নিতে বা পয়সা নিতে এগিয়ে আর এল না! আস্তে আস্তে পিছিয়ে গেল ছেলের হাত ধ'রে। একবার যেন বললে, 'আ মেরি রাজ!'

ওদিকে বাস্ এসে দাঁড়িয়েছে, গন্তব্য পথের নম্বর মাথায়। রাজ বললে, 'কি হ'ল? নে পয়সা!'

সুজাতা বরুণা ডাকলে, বললে, 'রাজ আয়, আমাদের বাস এল।'

কিন্তু ভিখারিণী কোথায়? সহসা কোন্ ঝোপের আড়ালে চ'লে গেছে। আর দেখা গেল না। পয়সা নিতে এল না আর।

ওরা অবাক হয়ে গেল তিন জনেই।

বরুণা বললে, 'ও তোকে চেনে নাকি? 'রাজ বললে যেন?'

সুজাতা বললে, 'হ্যাঁ শুনলাম 'রাজ' রাজ বললে যেন।'

পয়সা হাতে একটু চুপ ক'রে থেকে রাজ বললে, 'কি জানি তোরা নাম ধ'রে ডাকলি, তাই হয়ত শুনে ও রাজ বললে।'

আর দাঁড়াবার সময় নেই। সকলে বাসে উঠে পড়ল।

৩

রাজের বাড়ী করালবাগে উদ্বাস্তু কলোনীতে। সেলিমগড়ে নয়।

বাড়ী ফিরে অনেক কাজ তার। আটা মাখতে হবে। তুন্দুরে রুটি হবে। উঠানের কোণে মুখ ভাঙা জালার মত প্রকাণ্ড তুন্দুরে ঘুঁটের আগুন জেলে দিয়ে সে ওড়না কামিজ বদলে রান্নাঘরে আটা মাখতে এল। সন্ধ্যোবেলাতেই সব খাওয়া হয়ে যায়, ওদের পাঞ্জাবীদের। এক্ষুণি ভাইরা, বোনেরা, ঠাকুমা খাবে। তারপর বাবা কাকারাও খেতে আসবে। দেখলে, মেজ খুড়িমা 'মাই-কী দাল' (মাস কলাই) রান্না ক'রে রেখেছিল, আটাও মেখেছে।

ওকে দেখে সে নিজের অন্য কাজে গেল ছেলেমেয়ে দেখতে।

রাজ আটার থালা নিয়ে উঠানে তুন্দুরের পাশে দাঁড়াল। তারপর এক-একটা মোটা মোটা রুটির তাল হাতে করে তুন্দুরের গায়ে চেপটে লাগিয়ে দিতে লাগল। সেগুলি উনানের গরম গায়ে সেঁকা হয়ে আগুনে পড়ে যায়। আর সে চিমটেতে, নয়ত হাতে নেকড়া জড়িয়ে তুলে নেয়।

আড়াই সের আটার রুটি সেঁকা হ'ল। থালার মধ্যে নেকড়া জড়িয়ে সেগুলো গরমে রাখল, পরে ঘি মাখাবে। পাঞ্জাবে ঘি-এ বা মাখনে ডুবিয়ে তুলত। এখানে আর সেদিন নেই।

ভাই-বোনেরা খেতে এল। রুটি ডাল আচার আর দুধ দিয়ে খাওয়া হ'ল। দাদী বাবা কাকারা খেয়ে নিল।

দেখতে দেখতে শীতের রাত ঘনিয়ে অন্ধকার হয়ে গেছে। পাঞ্জাবী পাড়ায়

সবারই খাওয়া শেষ হয়েছে। রাজ আর কাকীরা দুজনে খেতে বসল। সেজ কাকী বললে, তোর মুখটা আজ ভারি শুকনো লাগছে। আর রুটিও তো কম নিয়েছিস্ দেখছি। কেন, অসুখ করেছে ?

রাজ একখানা রুটিই নিয়ে বসেছিল। ছিঁড়তে ছিঁড়তে বললে, না, অসুখ করে নি। তবে ভাল লাগছে না যেন।

ছোট খুড়ি বললে, 'আজ তা হলে শুয়ে পড়্‌গে শীগ্‌গির ক'রে। আমি বাসনগুলো মেজে রাখব।'

পালা ক'রে ভাগে ভাগে কাজ করে সবাই। তবে ওরই ভাই-বোন নিয়ে কাজ বেশী পড়ে।

শীতের রাত। সকলেরই ছোট ছোট খাটিয়াতে বিছানা। দিল্লীর শীত, লেপ-কম্বল নিয়ে সব ভাই-বোন ঠাকুমা বাবা একটা ঘরেই শুয়েছে।

'সেলাওয়ার' কামিজ-ওড়না ছেড়ে রেখে ছোট-জামা আর 'কাছেড়া' বা পাজামা প'রে রাজও নিজের খাটিয়াতে শুয়ে পড়ল।

নিরালোক নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার ঘর, কোনদিকের একটা জানলার ফাঁক থেকে রাস্তার একটু আলোর চিলতে এসে পড়েছে।

রাজ সেই দিকে চেয়ে রইল।

এতক্ষণে ওর হাতের কর্মচক্র থেমেছে। মন যেন স্থির হয়ে দাঁড়াতে পেরেছে এক জায়গায়। সেটা কোন্ জায়গা ?···মন জানে, সেটা কোথায়। রাজও জানে কোথায়। কিন্তু রাজের গলা থেকে ঠোঁট দু'খানা অবধি যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল হঠাৎ। ভাবতে ইচ্ছে করছে না সেই জায়গাটির কথা।

তা হলে কি উঠে জল খাবে ? যদি ভাবনাটা ন'ড়ে যায় ? উঠল, জল খেল। ঘুমের মাঝে ঠাকুমা বললেন, 'কে, রাজ ?'

এবারে শুয়ে পড়ল আবার। আজ আর শীত করছে না। ঘরটা যেন সব গরম হয়ে গেছে।

গরম হোক, শীত হোক, তেষ্টা পাক, গলা শুকোক, কিন্তু সেই জায়গাটা আর রাজের মনের চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে যায় না।

রাজ বালিশে শুকনো মুখ গুঁজে যেন কাঁদতে চাইলে। কিন্তু কান্না এল না। অশ্রুহীন মুদিত চোখের সামনে ভেসে এল কুইন্‌স্ পার্কের সেই জায়গা ও সেই ভিখারিণী··· । ছেঁড়া বিবর্ণ ওড়না, ময়লা জামা সেলাওয়ার পরা, বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে 'আ রাজ ? 'বেবি রাজ' বলে পিছন দিকে সরে-যাওয়া সেই ভিখারিণী

হ্যাঁ, রাজ চিনেছে তাকে। তার নাম বলাতেই যেন মনে হয় চিনতে পেরেছিল সে কে। প্রথমটা বুঝতে পারে নি।

একবারে চোখে জল এল। রাজ নিঃশব্দে নিংশ্বাসের মত শব্দহীন গলায় বললে, 'মা'। হ্যাঁ মা-ই তো যেন।

এবারে ঝর্‌ঝর্‌ ক'রে চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

৪

আর চোখের জলের সাগরে প্রতিবিম্বের মত ফুটে উঠতে লাগল সেই' ৪৬ সালের লাহোরের দুর্যোগের দুর্দিনের ছবি।

অনেক রাত্রি তখন। কত রাত্রি কে জানে? সব ঘুমিয়েছে ঘরে ঘরে কাকারা ঠাকুমা। মা-র ঘরে মা বাবা ভাই-বোন ওরা সব।

সহসা এক কাকা ডাকলেন ত্রস্ত শঙ্কিত স্বরে—ঘরে ধাক্কা দিয়ে, 'ওঠ ওঠ সব, শীগ্‌গির ওঠ। মুসলমানরা এদিকে আসছে।'

বাবা-মা উঠলেন। ঠাকুমা কাকীরা বাড়ীসুদ্ধ সব যে যেখানে ছিল, মস্ত বাড়ী বাগান কত দাসদাসী লোক-জন, সব একে একে জেগে উঠে নিঃশব্দে সভয়ে বাইরের প্রাঙ্গণে দাঁড়াল একত্র হয়ে।

খবর দিতে পুলিসের লোক এসেছে। তিন-চারখানা ট্রাকও এসেছে। এই রাত্রেই লাহোরের সীমানা ছাড়িয়ে যেতে পারলে বাঁচতে পারে। না হ'লে তাদের কোনো দায়-দায়িত্ব নেই। 'যার যা দরকারী জিনিস, টাকা-কড়ি গহনা নিতে পার নিয়ে নাও।' আরও বললে, বেশীক্ষণ সময় নেই। বাইরে আলো জ্বেলো না, কথা ব'লো না, দেরী ক'রো না। 'জানানা'দের ইজ্জৎ, প্রাণ বাঁচাতে তারা পারবে তাড়াতাড়ি ক'রলে। নইলে খোদা জানেন, কি হবে।'

আতঙ্কে অভিভূত ঠাকুমা থর্‌থর্‌ ক'রে কাঁপতে লাগল। তাকে বাবা আর কাকারা ধ'রে ধ'রে নিয়ে এসে খোলা ট্রাকের ওপর বসিয়ে দিলেন। সেখানেও রাস্তায় অসংখ্য লোক জমেছে, সকলেই গাড়ীতে ওঠবার জন্য ব্যাকুল। ঠাণ্ডা কন্‌কনে শীতের রাত্রি। পৌষের না মাঘের রাত্রি। পথের সবাই ভূতের ছায়ার মত নিঃশব্দে মিনতি-ভরা মুখে চেয়ে আছে পুলিসদের দিকে। যদি তাদেরও নেয়!

পুলিসরা বললে, 'আমরা সারারাত ধ'রে সকলকে যত পারব অমৃতসরের

সীমান্তে পৌঁছে দিয়ে আসব। কিন্তু আগে কিছু বুড়ো মানুষ আর বাচ্চাদের, মেয়েদের দলদের দিয়ে আসি। পরে অন্য সবাইকে নেব। তাই হুকুম আছে।'

'ওঠ ওঠ' করতে করতে কাকারা কে ওকে গাড়ীতে তুলে দিলেন। কাকীরাও উঠে বসেছে। ছোট ছোট ভাই-বোনেরা ভয়ে শীতে কাঁদতেও যেন ভুলে গেছে। ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ চোখে চেয়ে ব'সে আছে।

বাবা কাকারা সব উঠলেন।

পুলিস বললে, 'গাড়ী ছাড়ছি।'

সহসা বুড়ী ঠাকুমা বললে, 'সবাই এসেছে? বিবি? বড়ি বিবি কোথায় মু)' ? (অর্থাৎ বড়বৌ।)

বাবা বললে, উঠেছে সব। ওঠে নি? ভিড আর অন্ধকারে দেখা যায় না মানুষ।'

সহসা এক কাকা বললেন, 'না, আসেন নি বিবিজী। দেখছি না ত।' অন্ধকারে এক খুড়ীও বললে, 'হ্যাঁ, তিনি ওপরের ঘরে কি আনতে গিয়েছিলেন।' অন্য এক কাকা ডাকলেন, বিবিজী? সাড়া নেই।

বাবা পুলিসকে বললেন, 'দাঁড়াও একটুখানি, তাকে ডেকে আনি!'

সহসা দূরের মোড়ের কাছে মশালের জোর আলো দেখা গেল। আর 'আল্লা হো আকবর' শোনা গেল।

পুলিস হাত ধ'রে নিলে। বললে, 'আর নহে বাবা না। তিনি পরের গাড়ীতে আসবেন। হয়ত বা অন্য গাড়ীতে উঠেছেন। শীঘ্র গাড়ী ছাড়। ওরা এক্ষুণি এসে পড়লে আমি কারুকে বাঁচাতে পারব না। তুমিও মরে যাবে নামলেই।'

বাবা অস্থিরভাবে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে লাফিয়ে পড়তে গেলেন।

কিন্তু, পুলিসরা তাঁকে জোর করে ধ'রে রেখে ড্রাইভারকে জোরে গাড়ী চালিয়ে দিতে বললে। বললে আপনার জন্যে এত লোক বিপদে পড়বে! বিবিজী এতক্ষণে নিশ্চয় অন্য গাড়ীতে উঠে গেছেন। বর্ডারে গিয়ে খুঁজে নেবেন।'

যে সব রাস্তায় আলো সব জায়গায় নেই, গলি ঘুঁজি দিয়ে অন্ধকার সেই সব রাস্তায় আতঙ্কে প্রাণভয়ে ভীত নিঃশব্দ মানুষদের নিয়ে তিন চারখানা ট্রাক অন্ধকার নরকের পথের ভুতুড়ে গাড়ীর মত চলতে লাগল। সারি সারি পায়ে চলা অসংখ্য নিঃশব্দ মানুষও চলেছে সেই সব পথে। কারুর মুখে কথা নেই,

কেউ কারুকে দেখতে পাচ্ছে না। কারুর মনে আর কোন ভাবনা চিন্তাই নেই, কোনক্রমে অমৃতসরের সীমানায় খানা-গ্রামে পৌঁছন ছাড়া। অনন্তকালের পিতৃলোকের বাস করা দেশ, কত নিদ্রিত সুপ্ত স্বজন বন্ধু, যারা এখনও পথে বেরিয়ে আসে নি, ঠিক জানে না ব্যাপারটা, তারা ছাড়া ধনধান্য ঘর বাড়ী ঐশ্বর্য সম্পদ চিরকালের বাস নিবাস স্বদেশ ছেড়ে সকলেই পথে বেরিয়ে পড়েছে —দীনদরিদ্র ভিখিরী থেকে ধনী শেঠ প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার অবধি। এত কথা তখন রাজ ভাবতে জানত না। পরে ভেবেছে, পরে দেখেছে তাদের। পরে জেনেছে। নরক কেমন কেউ জানে না, রাজও জানে না। কিন্তু যমযন্ত্রণার ভয়ই যদি নরকের ভয় হয়, সেই আতঙ্কময় অন্ধকারময় নরকের পথের সহসা শেষ হ'ল। দম বন্ধ ক'রে ছোট ট্রাকগুলি একেবারে সীমান্তে এসে খানা-গ্রামে দম ফেলল যেন।

কে কি ভাবছিল কেউই জানে না। রাজের কোলের ওপর ছোট দু'টি ভাইবোন নেতিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। মা-র কথা কেউ জিজ্ঞাসা করে নি। কাঁদে নি। তাকে ডাকে নি। তারাও কি ভয় পেয়েছিল? কিসের ভয়? রাজও কিছুই ভাবে নি। অস্পষ্ট ভাবনা—আজকে স্পষ্ট হয়েছে। সেদিন কিছু ছিল না। দশ-এগার মাত্র বয়স তখন।

শুধু দাদী কাঁদছিল ফোঁস্ ফোঁস্ ক'রে। কাকীদের সঙ্গে দু-একটা কথাও বলছিল। শুনতে পেয়েছিল রাজ—'কি আনতে ন্যু (বৌ) ওপরে গিয়েছিল? 'জেওর জেওরাত' (গহনাপত্র) সোনা মতি?…হায় হায়।…কি হবে সে সব—যদি 'জান' আর 'ইজ্জৎ' চলে যায়…এমন বেহিসাব আক্কেল কেমন করে হ'ল।'

কাকা ধমক দিলেন 'চুপ কর'। পরের গাড়ীতে হয়ত আসছেন।'

বাবা পাথরের মত বসে ছিলেন। পুলিশটা বাবার কাছ ছাড়ে নি।

দু'ঘণ্টার জায়গা এক ঘণ্টায় গাড়ী এসে পৌঁছেছিল। একে একে সব গাড়ী থামল। প্রাইভেট গাড়ীও ছিল সামনে পিছনে ক'খানা। লোকেরা ক্লান্ত অবসন্ন দেহে নাবল—ঘুমন্ত শিশু বালক-বালিকাদের হাত ধ'রে—কোলে নিয়ে। জিনিসপত্র প্রায় কিছুই নেই। একবস্ত্রে অর্থাৎ যা পরেছিল তাই জড়িয়ে সব চলে এসেছে।

বাবা নাবলেন সবারি আগে। ওদের কারুর দিকে তাকালেন না। কিছু বললেন না। শুধু অন্য গাড়ীগুলির কাছে গিয়ে দেখতে লাগলেন। তারপর ডাকতে লাগলেন, 'বিবি, বিবি, বিবি তুমি কি এসেছ এখানে?'

কেউ সাড়া দিল না। কাকারা নেবেছেন, তাদেরও নাবিয়েছেন। ট্রাকগুলো এখুনি ফিরে যাবে আরও বিপন্ন পলাতক যাত্রী আনতে। তখনও তারা ভরা আকাশ। রাত্রি শেষ হয় নি। গাড়ীগুলো যাত্রী নাবিয়ে পথে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

বাবা কাকারা যাত্রীদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। ডাকতে লাগলেন, 'বিবিজী 'বিবিজী' ব'লে। ঘোম্‌টা দেওয়া, মাথায় ওড়না দেওয়া, শাল জড়ানো চেহারা মেয়েদের যাকেই দেখেন বাবা তাকেই সামনে গিয়ে দেখেন। যেন মনে করেন সেই বুঝি বিবিজী, ওদের মা। তারা অচেনা মুখে পিছন ফিরে তাঁর দিকে চায়।

তিনি অপ্রস্তুত হয়ে মাপ চেয়ে আবার অন্য মেয়েদের দিকে যান। ঠাকুমাও ভাঙা গলায় বৌটি (বউ) বলে ডাকেন। কাকীরা 'জিঠানী জী' (জ্যেঠানী) 'হো জিঠানীজী' বলে ডাকেন। কেউ 'আ হো' (হ্যাঁ) 'এই যে' এখানে বলে সাড়া দেয় না।

যাত্রীরা একে একে সবাই যে যেখানে পারল গ্রামের মাঝে সহরের পথে চ'লে গেল। ভোর হয়ে এল। ওরা ছোটরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শীতে কাঁপতে লাগল। কাকারা জোরে জোরে 'বিবিজী' 'বিবিজী' বলে ডাকতে ডাকতে গ্রামের বাইরে জঙ্গল ক্ষেত সব দিকে ঘুরতে লাগলেন। ভাবলেন, যদি অন্ধকারে এসে থাকেন—পথ আর মানুষ চি...ত না পেরে গ্রামে কি অন্যদিকে চ'লে গিয়ে থাকেন।

যদি ও মনে জানছিলেন সবাই, যে, তিনি আসেন নি। আসতে পারেন নি। মা-র গাড়ীতে ওঠা হয় নি। এখানে পথ ভোলেন নি। চিরকালের মত লাহোরেই রয়ে গেছেন। হারিয়ে গেছেন। সেই বাড়ী থেকে বেরুতে পারেন নি আর। বিপদে পড়েছেন।

কিন্তু মনকে মন মিথ্যা আশাময় সান্ত্বনা দেয়। আছে সে, আছে। আসবে। হয় ত আসবে সে পরের গাড়ীতে।

পরের গাড়ী এল। আরও কত গাড়ী, হাঁটা লোক এল। সারা সকাল—সারা দিন ধ'রে কত লোক এল, চেনা—অচেনা। বাবা উদ্‌ভ্রান্ত মুখে ঘুরে ঘুরে দেখলেন। তাদের জিজ্ঞাসা করলেন' পথে মা-র মত দেখতে সুন্দর চেহারা দামী জামা-কাপড় পরা কারুকে দেখেছে কি না? কেউ কি হেঁটে আসছে সে রকম?

কাকারাও সারাদিন খুঁজে খুঁজে বেড়ালেন...। ক্রমে আর যাত্রী আসা

কমে এল। লোক-মুখে শোনা গেল সেখানে মহল্লায় মহল্লায়, পাড়ায় পাড়ায়, আগুন লাগানো লুটপাট সুরু হয়ে গেছে। মেয়েরা অপমানের ভয়ে কেউ কুয়োয় পড়েছে। নদীতে ঝাঁপ দিয়েছে। বিষ খেয়েছে। অন্য রকমে মরেছে। আর যারা তা পারে নি, তাদের 'লুটেরা'রা ধ'রে নিয়ে গিয়েছে…।

রাজের চোখ এখন শুক্‌নো। আর জল নেই। চুপি চুপি যেন নিজের মনকে ও না জানিয়ে ভাবে, তা হলে কি মা-ও পালাতে পারে নি—মরতে পারে নি। বেঁচে রয়েছে ?

আবার চকিতভাবে ভাবে, না, তার হয়ত ভুল হয়েছে। ও মা নয়, অন্য কেউ। এমন ত এক রকম দেখতে হয়। আর এ ত রোগা, মা-র্‌ মত ফরসাও নয়, মোটাসোটা সুন্দর দেখতেও নয়। আর ঐ ছেলেটি ?…মা-র সঙ্গে ছেলেটি কেন ? কার ছেলে ? নাঃ। নিশ্চয়ই ও মা নয় তাহলে।

মনটায় যেন একটু ভাল লাগল, 'তাকে' মা নয় ভাবতে। কি ক'রে মা হ'তে পারে যখন ঐ ছেলেটা রয়েছে। এবারে রাজ ঘুমিয়ে পড়ল।

সহসা যেন দেখল, লাহোরের সেই বাড়ী, সব ভাই-বোন সকালে খেতে বসেছে। ইস্কুলের তাড়া সকলেরই। মা রুটি পরোটা আচার দুধ নিয়ে সকলকে ভাগ ক'রে দিচ্ছেন। আর হাসছেন, গল্প করছেন। সাদা সেলা-ওয়ার, রঙীন রেশমের জামা, হাল্‌কা ফিকে নীল রঙের 'চুনুনী' (ওড়না) পরা।

ওরা সকলেই খাচ্ছে। কিন্তু…কিন্তু মা-র কাছে মা-র হাঁটু জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে কে একটা ছেলে। সে ত ওর ছোট ভাই নয় ? কে ওটা ? সেই ছেলেটা কি ? সেইটেই তো যেন।

কিরকম গলা শুকিয়ে ঘুমটা ভেঙে গেল। দেখল, অনেক বেলা হয়েছে, কেউ ঘরে নেই।

কাকী ডাকছে, 'রাজ, ওঠ, বেলা হয়েছে।'

৫

কায়ালবাগের বাস্ এসে থামল চাঁদনীচকের দিকে। রাজ 'বিজিমারদ্'-এর স্কুলের দিকে তখনই গেল না। এখনও বাকী ছাত্রী সবাই আসে নি জানে। সংসারের কাজ সেরে তারা আসে।

সে কুইন্‌স্ পার্কের ভেতরে ঢুকল। শীতের রৌদ্রে অনেক লোক বেঞ্চিতে

ব'সে, ঘাসে ব'সে রোদ পোয়াচ্ছে। ঝোপঝাড়ের দিকে ভিখারী-ভিখারিণীরাও ছেলেমেয়ে ছেঁড়া নেকড়া জড়িয়ে নোংরা থালা ঘটি বাটিতে ভিক্ষালব্ধ রুটি মুড়ি অন্ন খাবার নিয়ে—কেউ বা গেলাসে চা নিয়ে খাচ্ছে। কারুর খাওয়া হয়ে গেছে, ছেলেমেয়ের মাথা নিয়ে বসেছে উকুন বাছতে। কেউ কেউ ঘুমিয়ে পড়েছে।

পরিপূর্ণ স্তব্ধ দুপুর।

রাজ চেয়ে চেয়ে দেখে তাদের। স্বপ্নটাও মনে আছে। ভিখারিণীকে সে আজ খুঁজে বার করবে। কাল বন্ধুরাও ছিল, আর ঠিক বুঝতেও প্রথমটা পারে নি বটে। তা আজও মনে সন্দেহ আছে, মা না হতেও ত পারে? আর হয় যদি?…না:, সেকথা ভাবতে মন চায় না। তবু ভাল ক'রে আজ দেখে বাড়ী ফিরবে, স্কুলে যাবে।

না। সেই ভিকারিণী কোথাও নেই। আর সেই ছেলেটাও তো নেই। তা হ'লে আর কোথাও ভিক্ষা করতে গেছে। বোধ হয় আসবে সন্ধ্যার দিকে। যেমন সেদিন দেখছিল। ফেবার সময়ে দেখতে পাবে নিশ্চয়।

তবে আজ আর অন্য সঙ্গিনীদের সঙ্গে সে আসবে না। তা হ'লে কথা কইতে পারবে তার সঙ্গে।

সকাল সকাল স্কুলের পড়ানো সেরে সে আবাব ফিরল। তখনো বরুণা সুজাতাদের দলের কেউ বাগা ''র দিকে এসে পৌছয় নি। বোধ হয় কেন্দ্রের ক্লাস হয় নি। কলেজ সেরে তারা বয়স্ক কেন্দ্রে আসে সেলাইয়ের, বোনার কাজে।

বিকাল শেষ হয়ে এল। ভিখারীব দলও ভিক্ষা চেয়ে বেড়াল। ঠাণ্ডা পড়বাব আগেই অনেকে ফিরে গেল প্রতিদিনের মত।

কিন্তু সেই ভিখারিণী মেয়েটি নেই, আসে নি।

তা হ'লে কোনো দূর জায়গায় ভিক্ষা করতে গেছে।

সহসা পিছন থেকে বন্ধুরা এসে ডাকল, 'এই রাজ, কি করছিস ওই নোংরা ঝোপের কাছে? আয় একটু "জলজির." ফুচকা খাই।'

রাজ চমকে পিছন ফিরে তাকাল হঠাৎ তাদের ডাকায়।

তারা হেসেই আকুল, 'কি রে, ভয় পেয়েছিস? যেন ভূত দেখলি?'

সেও হাসল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে 'জলজিরা' কচুরী (ফুচ্কা) খেল। গল্প করল শুক্‌নো মুখে, অন্যমনস্ক ভাবে।

তারপর বাসে উঠল। সেদিন গেল, তার পরদিনও গেল। তার পরের

দিনও ওই ভাবেই সে খুঁজল। কিন্তু সেই ভিখারিণী আর তার সেই ছেলেটাকে কোথাও দেখা গেল না।

তা হলে কি দরিয়াগঞ্জের মন্দিরগুলোর কাছে ভিক্ষা করতে গেছে? অথবা কেল্লার কাছে প্যারেড ময়দানের সামনের 'সাউজী' 'গোপালজী'র মন্দিরের কাছে যায় ভিক্ষা করতে? সেখানে সন্ধ্যেবেলা কথকতা হয়, অনেক মেয়ে আসে। মিষ্টির দোকানীরাও বেশ ভিক্ষা দেয়, রুটি পয়সা, ইত্যাদি।

ঘুরে ঘুরে রাজের মুখ শুকিয়ে সরু লম্বা হয়ে যায়। ক্ষেত্রী মেয়ের অত উজ্জ্বল রঙ, রোদ-পোড়া রাঙা হয়ে উঠেছে।

কাকীরা ভাবে, চাকরি আর পড়া দু'য়ের খাটুনী। আর বাড়ীরও কাজ তো কম নয়। যেদিন, রুটি না করে, সাবান কাচে, ইস্ত্রি করে। চরকায় সুতোও কাটতে হয় মাঝে মাঝে। পুরাণো তুলো জমেছে অনেক, সেগুলোর সুতো থেকে 'খেস' বা সুজনী তৈরী হবে। রাজের কাজের শেষ নেই।

এবং রাত্রে ঐ ভাবনা যেন ঘুমের আড়ালেও মনে জেগে থাকে। কিন্তু এখন যেন ওর মনে আর একটা সন্দেহ উঁকি মারে। তা হলে নিশ্চয় সে মা। তাই আর এ পথে আসে না, আর সেই জন্যেই সেদিন ভিক্ষে না নিয়েই চ'লে গিয়েছিল।

রাজের নিজেকে যেন অপরাধিনী মনে হয় ভিখারিণীটার পরিচয় না নেওয়ার জন্য। কেন সেদিন তার 'রাজ' বলা শুনেও ও এগিয়ে যায় নি? সঙ্গিনীদের জেনে ফেলার ভয়ে অথবা কিসের সঙ্কোচে? ওই ছেলেটার জন্যে? না মা মরে গেছে বলেছিল বন্ধুদের, সেই জন্যে? একটা কিছু সম্পর্কও তো বলতে পারত?

রাজ বিনিদ্র চোখে শুয়ে শুয়ে ছেঁড়া ময়লা জামা-কাপড়-পরা ভিখারিণীর মুখটা স্পষ্ট ক'রে মনে করবার চেষ্টা করে। চোখে জল আসে। আবার কখন ঘুমিয়ে প'ড়ে সহসা আচমকা জেগে ওঠে। মনে হয়, কি অন্যায় ক'রে ফেলেছে যেন। কখনও আর সে ভুল শুধরানো যাবে না। কিন্তু··· ।

৬

সেদিন একটা শনিবারের বিকাল। রাজ তেমনি আগে এসেছে, এদিক-ওদিক ঘুরছে।

সহসা পিছন থেকে তার কাঁধে হাত রাখল কে। ফিরে চেয়ে দেখল বরুণা।

বরুণা বললে, 'তোর কি হয়েছে রাজ—কেবলই ঘুরে ঘুরে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াস্ আজকাল। বাড়ীতে কিছু হয়েছে? না কোন কিছু দরকার পড়েছে? চল্, একটু ওই ঘাসে বসি।'

রাজ শুক্‌নো মুখে ঘাসে বসে। বরুণা বলে, 'খাবি কিছু?'

সে বললে, 'না, এবারে বাড়ী যাই।'

বরুণা বললে, 'একটু পরে যাব। সুজাতা আসুক। তার আগে তুই বল্ ত, কেন একলা এই ভিখারী-পাড়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছিস। সেদিন দরিয়াগঞ্জে দেখলাম মন্দিরের সামনে। তার আগে কেল্লার ময়দানের সামনেও দেখেছি। কি হয়েছে বল্ তুই। কারুকে খুঁজছিস্ কি?'

এবারে রাজের চোখে জল এসে পড়ল। আত্মীয় নয়, আপনজন কেউ নয় বটে, কিন্তু ওরা ওকে ভালবাসে, ইস্কুল থেকে চেনা-জানা। এক ক্লাসে পড়া বন্ধু। হয়ত ওকে একথা বলা যায়। ওরা তো আপনার লোক নয় তাই বলা যায়। কিন্তু কিছুই বলতে পারল না। শুধু দু'ফোঁটা জল এসে পড়ল চোখে।

বরুণা তার পিঠের ওপর হাত রেখে বললে, 'কি হয়েছে বল্ তুই। আমি কারুকে বলব না। বাড়ীতে গোলমাল হয়েছে?'

রাজ চোখ মুছে বললে, 'না, আজ নয়, পরে বলব।'

বরুণা বললে, 'কারুকে খুঁজছিস?'

রাজ ঘাড় নাড়লে।

'কাল থেকে আমিও তোর সঙ্গে যাব, একলা একলা ভিখিরী পাড়ায় ঘুরে বেড়াস্ নি।'

এবারও রাজ শুধু ঘাড় নাড়লে।

সুজাতা এসে পড়ল, দু'জনেই চুপ করল।

পর দিন আবার বরুণা এসে রাজকে ধরল।

বললে, 'আজ কোথায় যাবি?'

রাজ বললে একটু ভেবে, 'চল্, বিড়লা মন্দিরের দিকে যাই। তারপর তোদের কালীবাড়ীর কাছে যাব।'

তারপর দিন যমুনার তীর, তারপর হনুমানজীর মন্দির, যেখানে মনে হয় সেখানে যায়, ছোট ছেলে সঙ্গে ভিখিরী মেয়ে দেখলে চকিত হয়ে এগিয়ে যায়, তারপর বিমনা ভাবে ফিরে আসে।

দিল্লীর মন্দির-পাড়া, ভিখারী-পল্লী যেন আর বাকি রইল না।

সন্ধ্যাবেলা হু'জনে ফিরে এসে কোনদিন কুইন্‌স্ পার্কের কোনখানে, কোনদিন 'আজমল খাঁ' বাজারের দিকের প্রকাণ্ড পার্কে ব'সে পড়ে ক্লান্ত ভাবে।

ক'দিন গেল। এবারে সহসা বরুণা জিজ্ঞাসা করলে একদিন, 'রাজ, তুই কি সেই ভিখিরী মেয়েটাকে খুঁজছিস? যে তোকে 'রাজ' ব'লে ডাকল—আর ভিক্ষে নিল না?'

রাজ হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে নিল। কিছু বলতে পারল না।

বরুণা তার একটা হাত নিজের হাতে জড়িয়ে নিয়ে বললে, 'সেই মেয়েটাই ত? সে কি কেউ হয় তোর রাজ? এক মাস হয়ে গেল, তাকেই খুঁজছিস ত? তাই না?,

রাজ মুখ গুঁজেই ঘাড় নাড়লে।

বরুণা বললে, 'কে সে? আমাকে বল্, আমি কারুকে বলব না।'

রাজ তেমনি ভাবেই মুখ না তুলে খুব আস্তে মৃদু স্বরে অনেকক্ষণ পরে বললে, 'মা'।

যে কথা কোন আপনার জনকে আজ অবধি বলে নি। বাপকে নয়। কাকাদের ভাইবোনদেব নয়—আজ বিদেশিনী বান্ধবীকে না ব'লে যেন আর পারছিল না।

বরুণা স্তম্ভিত হয়ে গেল। 'মা!' একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, মা, ত তোর নেই বলেছিলি?'

সে তেমনি ভাবেই মুখ নীচু ক'রে বললে, 'ঠিক কথা বলি নি। ও আমার মা। সেদিন প্রথম ও দূরে ছিল আর আমিও তোদের অনেক পিছনে আসছিলাম, চিনতে পারি নি। পরে যখন ভিক্ষা নিতে এগিয়ে এসে বাড়ী কোথায় জিজ্ঞাসা করলে, তখনও ত বুঝতে পারি নি। খুব রোগা আর কালো হয়ে গেছে। খুব ভালো দেখতে ছিল আগে। তারপর যখন তোমরা রাজ ব'লে ডাকলে, আর ও অবাক্ হয়ে যেন খুব আস্তে বললে, 'আ মেরি রাজ। মেরি বিবি' বলতে বলতে পেছিয়ে গেল, আর ভিক্ষে নিল না। তখন একটু সন্দেহ হ'ল যেন। তখন আমাদের বাস্ এসে গেছে। আর আমরা দাঁড়ালাম না, সেও আর ত এগিয়ে এল না...। রাত্রে বাড়ীতে গিয়ে যেন সব স্পষ্ট মনে পড়ল।'

বরুণা বললে, 'কিন্তু মা কি লাহোর থেকে তখন তোদের সঙ্গে আসে নি?'

রাজ মুখ তুলল। বললে, 'মা কি গহনাপত্র আনতে বাড়ীর ভিতর

গিয়েছিলেন, আর আসতে পারেন নি। লোকেরা ভয়ে গাড়ী ছেড়ে দিয়েছিল। তারপর আমরা ধ'রে নিয়েছিলাম, মা মারাই গেছেন দাঙ্গার সময়ে…।'

'তা সেদিন কেন তখুনি বললি নে? তাহলে ত বাড়ী নিয়ে যেতে পারতিস্।

রাজ চুপ ক'রে রইল।

সহসা বরুণা যেন সন্দিগ্ধ ভাবে কি ভাবে। বললে, 'আর ঐ ছেলেটা? ওটা কে তোর? তোর ভাই?

রাজ মাথা নাড়ল। শুধু বললে, 'আমার ভাই নয়।'

এবারে যেন কি একটা কথা স্পষ্ট হয়ে উঠল বরুণার কাছে। বরুণা অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে, 'তুমি বোধ হয় ঠিক চিনতে পার নি রাজ। তোমার মা ও নয়।'

রাজ সে কথার জবাব দিল না। আর মনে মনে বরুণাও যেন জানে তার কথা ঠিক নয়।…

কিন্তু বরুণা আবার বললে, 'তুই তখন কত ছোট ছিলি—তোর কি আর মনে আছে মাকে? তোর নিশ্চয় ভুল হয়েছে। আর মা হ'লে ত চিনতে পেরে এগিয়ে আসত …।'

এবারে রাজ বললে, 'চিনতে পেরেছিল ব'লেই বোধ হয় আর এগিয়ে এল না!

দু'জনেই যেন মনে মনে বুঝতে পারে কেন এগিয়ে এল না।

শীতের সন্ধ্যা। বাগান খালি হয়ে এসেছে। অন্ধকারও ঘনিয়ে এসেছে। গেটের ওপারে বাস্ এসে দাঁড়িয়েছে কয়েকটা। ওরাও বাগান থেকে বেরুল। নিজেদের বাস্ দেখে দেখে উঠে পড়ল।

নাববার সময় বরুণা বললে, 'আচ্ছা কাল আবার খুঁজব।' তার পর সান্ত্বনার ভাবে বললে, 'কিন্তু ও তোর মা নিশ্চয়ই নয়।'

রাজ শীর্ণ মুখে হাসল একটু। তার মন জানে, সে তার মা। আর জানে তার খোঁজ আর কোনদিনই পাওয়া যাবে না…। কেন যে পাওয়া যাবে না তাও যেন মন জানে।

রাজ বাড়ী ফিরল। কাজকর্ম সেরে শুতে কত রাত্রি হ'ল। তার পর নিঃশব্দে নিজের খাটিয়াতে শুয়ে পড়ল। নিশুতি ঘর। পাড়া শহরও ঘুমিয়ে পড়েছে যেন।

তার ঘুম আসে না। চোখের সামনে ভেসে আসে জীর্ণ মলিন সেলাওয়ার

কামিজ পরা ছেঁড়া চুন্‌নী (ওড়না) মাথায়, দীন মিনতি-ভরা মুখ, ভিখারীর মতই শীর্ণ একটি ছেলের হাত ধরা সেই ভিখারিণীর। কতদিন ভিক্ষা করছে সে? কতদিন ভিক্ষা ক'রে তার মুখের হাসি কথা এমন ভিখারীর মত হয়েছে!...

কেনই বা ভিক্ষা করতে আরম্ভ করল? তার বাপের বাড়ী, রাজের মামার বাড়ীর সবাই ত কত বড় লোক। এখনও মা-র বাবা মা আছে। ভাইবোনও আছে কতজন। শ্বশুরবাড়ীতে এদিকেও ওরা ছিল। কেন খোঁজ ক'রে আসে নি? নিজের বাপের বাড়ীর ঠিকানা ত জানে সে। লুধিয়ানায় তাদের বাড়ী খুব বড় বংশ।

'কেন'র কথা—আর সে ভাবতে পারে না। সমস্ত ভাবনা যেন জটিল হয়ে ওঠে তার তরুণ মনের পক্ষে। মনে হয়, বাবাকে বা কাকাদের কারুকে বলে এই কথা। কিন্তু তাঁরা যদি জিজ্ঞাসা করেন কেন আগে বলে নি?

কি বলবে সে? চিনতে পারে নি ঠিক? না...কি?

মনে পড়ে যায় সেই ছেলেটাকে। কি বলত ছেলেটার কথা? ছেলেটা কার? মা-র কি? মা কি আসতে পারত? তাহলে লুকিয়ে পড়ল কেন?

তা হলে ও কি মা নয়?...তাই হবে। তাই বোধ হয়। রাজ বেশ আশ্বস্ত হয় যেন মনে মনে।

কিন্তু তার মনের কোন্ অতলে শীর্ণ মলিন মুখ, জীর্ণ বিবর্ণ বেশ-বাস, দীন করুণ নেত্র একটি ভিখারিণী নারী একটি ছোট ছেলের হাত ধ'রে স্থির হয়ে তার দিকে চেয়ে থাকে কুইন্‌স্ পার্কের ঝোপের সামনে।

যে তার মা। আর যে ছেলেটা তার ভাই নয়।

সতী

ঊনিশ শতকের প্রথমদশক।

অলকমণি আরো দুজন সপত্নীসহ স্বামীর শবদেহকে তাঁর দেহের কাছে কেউ বা পাশে নিজ নিজ ঘরে শোকাভিভূত আচ্ছন্ন ভাবে বাহুতে মুখ আবৃত করে পড়েছিলেন।

সহসা কারা ঘরে প্রবেশ করলেন। প্রাচীন পুরুষ এবং নারীও।

শোনা গেল কুলগুরুদেবের ভারি গলার স্বর। "হ্যাঁ, যখন তিনটি ধর্মপত্নী ওঁর রয়েছে সব বিবেচনা করে একটির নিশ্চয়ই সহগমন শাস্ত্রমত বিধেয়। যদি কোন পারিবারিক বাধা না থাকে যেমন স্তনন্ধয় শিশু অথবা আতুর শিশু বা বালক।"

কুলপুরোহিতের কণ্ঠস্বর শোনা গেল "এ বিষয়ে কর্ত্রী অর্থাৎ লোকান্তরিতের জননীর অভিমতই সর্বাগ্রগণ্য হওয়া উচিত। আপনারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করুন।"

আরো দু-একটি জানা-অজানা কণ্ঠ কিছু মন্তব্য শোনা গেল। একজন বর্ষীয়সী নারীকণ্ঠ শোনা গেল বড়-বৌ ঠাকরুণ ঘরণী সংসারের, শাশুড়ীর ডানহাত ছোট বধূমাতার কোলে শিশু সন্তান……।

কথা খানিকক্ষণের জন্য নীরব হয়ে গেল অথবা অন্যত্র চলে গেল কোন বধূই বুঝতে পারলেন না।

শোকার্ত্ত অন্তঃপুর। কখনো বিলাপের মৃদুগুঞ্জন শোনা যাচ্ছে, কখনো শ্মশানের মত স্তব্ধ।

কারা যেন অলকমণির ঘরে এল। বিধবা বর্ষীয়সী কে একজন ডাকলেন "মেজ-বৌ ওঠো। একবার উঠে এসো গুরুদেব বললেন।"

অলকমণি উঠে বসলেন। মুখ অবগুণ্ঠনে অর্ধাবৃত। চুলগুলি রুক্ষ ধূলোয় ধূসর। অধর বিবর্ণ। মুখ যেটুকু অনাবৃত দেখা যাচ্ছে তাতে ভয়ের মত বিবর্ণ কপোল, তখনও মাথায় অম্লান সিঁদুর। ঘোমটার ফাঁকে একটি রূপ আর শ্রী তখনও থেমে আছে সৌভাগ্যের চিহ্ন নিয়ে।

যাঁরা ঘরে এসে দাঁড়িয়েছেন সবাই দুর্ভাগা ভাগ্যহীনা নারী। বিধবাই বেশী। বর্ষীয়সী অনূঢ়া কুলীনকন্যাও আছেন। একজন মৃদুকণ্ঠে বললেন, "তোমাকে একবার ঘাটে যেতে হবে। স্নান করতে হবে।"

অলকমণি মূঢ়ভাবে মুখ তুললেন। স্নান? নাইতে হবে? তাঁকে? অন্য সপত্নীরা কই?

কিন্তু সেই সেকালে বর্ষীয়সী নারী গুরুজনদের সঙ্গে কথা কওয়ার প্রথা ছিল না। মুখের ঘোমটাও খোলার নিয়ম ছিল না। তারা কে তাঁকে হাত ধরে নিয়ে গেল মেয়েদের স্নানের ঘাটে। মুক্তোবসানো সোনার ও ঝিকাটি গোঁজা খোঁপা ভেঙে পিঠে ছড়িয়ে পড়ল। ডুব দেওয়া হল। বিহ্বল মূক নারী ঘরে ফিরে এলেন। শয়নঘরে মাদুরের ওপর যত মাঙ্গলিক জিনিষ। পালঙ্কের

ওপর রয়েছে লালচেলী আর গহনার বাক্স। শাশুড়ীর ঘরের সিন্দুক থেকে আনা হয়েছে।

কে তাঁর সিক্ত বস্ত্র ছাড়িয়ে লালচেলীখানি গায়ে জড়িয়ে দিয়ে মাদুরে বসিয়ে দিলে।

কে একজন বললে "এবারে? এবার কি করতে হবে? আর একজন মৃদুস্বরে বললেন "গুরুদেব, পুরুত ঠাকুরদের জিজ্ঞাসা কর।"

অলকমণি যেন এবারে বুঝতে পারছেন এবারে কি করতে হবে······প্রশ্নের অর্থ। মূঢ়ভাবে এদিকে ওদিকে চাইলেন। গায়ে জড়ানো রাঙা চেলীখানি, মাদুরের ওপর রাঙা আলতাপাতার স্তূপ, চন্দন সিঁদুর কৌটো, সিঁদুরের থাল, গহনার বাক্স, কাজললতা, মঙ্গলঘট ও ফুলের মালার মানে বুঝতে পারলেন।······ তাহলে? তাহলে? তাঁকে ওরা সতী? সতী সাজাচ্ছে।

কখনো কারুকে সতীসাজাতে তিনি দেখেননি। কিন্তু গ্রামের মেয়ে, বড় ঘরের বধূ কন্যা তিনিও তো। বাল্যকাল থেকেই কত গল্প-কাহিনী তিনিও কি শোনেন নি। পিত্রালয়ের গ্রামে, মাতুলালয়ের দেশে, পতিগৃহেরও কত কাহিনী তাঁর মনের পাতায় ঝলমল করে উঠল। সেই সতী লোকেরই আগুনের আলোয়।

তারা আস্তে আস্তে গহনার বাক্স খুলল। গহনা পরাতে লাগল। নীচের হাতে গুজরীপঞ্চম, বাউটি, তাগাবাজু পরাল বাহুতে। আঙুলে আংটি। গলায় কণ্ঠমালা, মুড়কী মাদুলী হার। কানে সারি মাকড়ি ছিলই, আবার চৌদানী পরাল। কোমরে রূপার চন্দ্রহার গেটে। পায়ে চরণপদ্ম, মল, চুটকী।

চুলে এলো খোঁপা হল। কাজললতা হাতে বা খোঁপায় দেওয়া হল। সবশেষে মাথায় সিঁদুর ঢেলে লাল করে দেওয়া হল। মুখে পান দিল কে! পান? কি করে পান খাবেন? মুখ কাঠ হয়ে আছে। পায়ে আলতা দিয়ে পদ্মের মত শুভ্র পা দুখানি লাল করে দিল সবাই মিলে। কেউ বা চোখ মুছতে মুছতে, কেউ বা যন্ত্রের মত নীরব হাতে।

অলকমণির আটবছরের শিশু মেয়েটি জননীর পাশে এসে বসেছিল। এক বছর আগে তার বিবাহ হয়েছে সে কিছুই বুঝতে পারছে না। মা কি কোথাও নিমন্ত্রণে যাচ্ছে? সে তাহলে গহনা কাপড় পরে সঙ্গে যাবে। বিয়োগ শোক মৃত্যু বোঝবার বয়স তার হয়নি। মৃত্যু যদি তো অত গহনা কাপড় কেন? পিতা কি নিদ্রিত? ঘুমোচ্ছেন? বড়দের জিজ্ঞাসা করলে কেউ উত্তর দেয় না।

ছোটবড় বৈমাত্র ভাইবোনগুলিও হতবুদ্ধিভাবে চারিদিকে যেন ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে। গুরুদেব জিজ্ঞাসা করলেন "তোমাদের সতীসজ্জা হয়েছে? তাহলে আর বিলম্বের দরকার নেই।" একজন বিধবা বর্ষীয়সী জিজ্ঞাসা করলেন "তা বৌমা কি করে যাবেন বাবা?

কর্তাস্থানীয় সমবেত পুরুষদল চিন্তিত হলেন। হেঁটে? অতটা শ্মশান-ঘাটের পথ—এতবড় বাড়ীর বধূ যাবেন কি করে? আবার হাঁটতেই বা পারবেন কি করে? এই প্রচণ্ড আঘাতের পর মনের কি শরীরের আর শক্তি আছে কিছু? জগমোহনই তো বাড়ীর বড়। তাঁরই বিয়োগ হয়েছে। একজন কে বলল "অন্তঃপুরে জিজ্ঞাসা কর। জননীকে।"

আর একজন গ্রামবৃদ্ধ বললেন "না, তার আর দরকার নেই, তাঁকে কষ্ট দেবার। একটা শিবিকায় করে বধূমাতা সতীযাত্রা করবেন। তাই তো নিয়ম।"

পুরোহিত বললেন "বধূমাতাকে একবার স্বামীকে প্রদক্ষিণ করে নিতে বলো:

গুরু বললেন "সে তো শ্মশানে করতে হবেই। এখানে আর কেন!" পুরোহিত বললেন "না বাড়ী থেকে যাত্রা করবেন তো। এটিও বিধি একটি!"

অলকমণিকে সাজানো হয়েছে। ছাইয়ের মত বিবর্ণ মুখখানি কিন্তু বসনে-ভূষণে সিঁদুরে আলতায় যেন তাঁকে নবযৌবনা পঞ্চতপা পার্বতীর মতই দেখাচ্ছে। মৃত্যু বাড়ীতে দক্ষযজ্ঞ করে গেল। মৃত সতীদেহখানি সাজিয়ে গুছিয়ে এবারে শিবের স্কন্ধে তুলে দেওয়ার মত পতির সঙ্গে দিয়ে দেবে সবাই তাঁকেও। নববিবাহিতা নারীর সাজে তাঁকে পতির পাশে নিয়ে আসা হল। এখানকার কাজ অমাঙ্গলিক, এ কাজে কোন সৌভাগ্যবতী নারী নেই। দু'একজন গ্রাম বিধবা তাঁর হাত ধরে প্রদক্ষিণ করাতে এলেন।

অলকমণির কোন অনুভূতিই নেই। তিনি যেন জীবিত নেই। তবু পরিক্রমা দিয়ে স্বামীর পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে একেবারে ভেঙে পড়লেন তাঁর পায়ে মুখ রেখে। পৃথিবীতে আজ কেউ নেই তাঁর। ভয়-শোক-বিয়োগ—ভাবনা একটি অজ্ঞাত জীবিত মরণের দেহ যন্ত্রণার মহাআতঙ্ক থেকে কেউ তাঁকে আজ রক্ষা করবার নেই।

কেউ নেই। কেউ আর বলবে না "ভয় নেই, ভয় নেই তোমার, আমি আছি।"

সমবেত জনতা গুরুদেব পুরোহিত গম্ভীর স্তব্ধ। শোকার্ত নীরব। অবশেষে

তাঁরাই কেউ কেউ বলতে লাগলেন "মা আপনার এ মহাসৌভাগ্য। যথার্থ সহধর্মিণী তো আজ আপনিই। জ্যেষ্ঠাপত্নী না হয়েও…।

"সশরীরে সতীলোকে গমন করছেন।"

"জন্মান্তরে আর বৈধব্য ঘটবে না………। এ আপনার দেবীজন্ম হল মা।"

"আপনি সাক্ষাৎ দক্ষসুতা সতীর মত……………পতির জন্য দেহত্যাগ করবেন।"

চারদিকে প্রশস্তি সান্ত্বনাবাক্য ছড়িয়ে পড়ছে। কিন্তু আশ্বাসবাণী? না। কই, কেউ তো বলছে না ভয় কি? আমি আছি তোমার কাছে। লাগবে না তোমার দগ্ধ হতে, জ্বলে পুড়ে যেতে।

সহসা অলকমণির মনে হল আরো কত কত শোনা সতীকাহিনী, সহমৃতা কাহিনী। তাঁরা কি ভয় পেয়েছিলেন জীবিত দগ্ধ হতে?

পাননি তো। পাননি, নিশ্চয়ই পাননি। নিশ্চয়ই তাহলে ভয় বা কষ্ট নেই সহমৃতা সতী হতে। অলকমণি উঠে দাঁড়ালেন। অবচেতনমনে লোকলজ্জা আর দেহযন্ত্রণার ভয় ছড়িয়ে আছে। না, তো পৃথক করা যাচ্ছে না দেহ এবং নারীসত্তার সংস্কার থেকে। শুধু ভাবছে, না, ভয় নেই। তবু বিহ্বলদৃষ্টি যেন কারো সাহায্য চায়। কারুর খুব কাছে দাঁড়াতে চায়। কারুর হাতে ধরেই সতী হতে যেতে চায়! কেউ বলুক কোন কষ্ট হবেনা। প্রাণ, মৃত্যু ভয় বিয়োগের দুঃখে মূঢ় হয়ে আছে কিন্তু জীবিত চিতাদগ্ধ…সে কেমন…। কেউ হাত ধরে নিয়ে চলুক। যেতে পারবেন তাহলে।

এবারে পুরোহিত কাকে বললেন "বাবা, তোমরা কেউ মেজমার হাত ধরো।

একটি কিশোর আর একটি বালক এসে অলকমণির হাত ধরল। কিশোরটি জ্যেষ্ঠা সপত্নীর পুত্র। বালকটি তাঁর নিজের পুত্র। অলকমণি পুত্রদের শুষ্ক দুঃখম্লান মুখের দিকে চেয়ে আবার ভেঙে পড়লেন। বড়টি সপত্নী সন্তান। তার কাঁধে হাত রাখলেন অলকমণি। নিজের পুত্র মাকে জড়িয়ে ধরল। তিনজন তিনজনকে জড়িয়ে ধরলেন ব্যাকুলভাবে।

তারা দুজনেই মায়ের সতীসজ্জার অর্থ বুঝতে পেরেছে। তিনজনেরই চোখ এবারে জলে ভেসে গেল।

গুরুদেব বললেন "আর বিলম্ব করা উচিত নয় বাবা। তোমরা শিবিকাতে জননীকে নিয়ে বসাও"।

মাঙ্গলিক উলুধ্বনি শঙ্খধ্বনি নয়। হরিধ্বনি আর পরিজনদের ক্রন্দনের রোলের সঙ্গে মৃত্যু মহাবিবাহের বর শব ও সতীযাত্রা নিক্রান্ত হল। সতীশিবিকায় দু'টি বালকের কোলে মুখ রেখে অলকমনি নীরব নিস্পন্দ দেহে বসে আছেন। জড় দেহে কোন অনুভূতি বুঝতে পারছেন না। শুধু মনে হচ্ছে ওরা, এই বালকেরাই তাঁকে সতীযাত্রায় পৌঁছে দেবে। লোকলজ্জা ও ভয়ের সময়ে পাশে থাকবে। লোকলজ্জা? হঁ্যা, যদি আগুন দেখে ভয় পান। যদি চিতারোহণে ভীত হন। যদি কেঁদে ফেলেন। চেঁচিয়ে ওঠেন। ধিক্কার দেবে সবাই। শ্মশানঘাট। লোক-সমাবেশ সমারোহ যেন উত্তাল সিন্ধুর মত হয়েছে। যে অসূর্য্যম্পশ্যা নারীদের লোকে দেখতে পায় না সেই রূপবতী রাজকন্যা রাজরাণীদের একজনকে সতী-সজ্জায় গহনা কাপড়ে বসনভূষণে সাজানো দেখবে······আবার চিতায় বসে জীবিত দগ্ধও হতে দেখবে······।

অনাত্মীয় উচ্চ নিম্নবর্ণের পুরুষের জনতার সীমা নেই। নিম্নবর্ণের নারীও কম নয়।

"আহা মাগো। সতী হবে গো।······আহা সাবিত্রী রে······আহা কি রূপ রে মার।

কেউ বলল···হঁ্যা গা, ভয় লাগবে না মার?······কেউ বলে এই গেল বছর মেয়ের বিয়ে দিয়েছে গো।···আহা কিসের বয়স।···তা বিধবা হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যু ভালো। একবারই পুড়বে। চিরকাল জ্বলে পুড়ে মরবে না বামুনের ঘরের বিধবা হয়ে। সব্ব সুখে বঞ্চিত হয়ে।······তা আরো তো বউ আছে কর্তার।

······এটাকে বুঝি বেশী ভালবাসত।

······গুঞ্জনের, মন্তব্যের শেষ নেই।

গুরু পুরোহিতের সঙ্গে পুত্রদের বাহু জড়িয়ে ধরে সিঁদুর-চুবড়ী ঝারি হাতে দিয়ে সাতবার প্রদক্ষিণ করানো বাজনা শাঁক উলুধ্বনির সঙ্গে থালায় থালায়, তামার পুষ্পপাত্রে ফুলের স্তূপ, মালা চন্দন সিন্দুর আলতা শাঁক ঘণ্টা কাঁসর, সোনার কুচি মধু পঞ্চরত্ন পঞ্চামৃত, পঞ্চগব্য ইত্যাদি। কোন কিছুই বাকি নেই।—এদিকে কলসীভরা ঘৃত চন্দন কাঠ রাখা আছে।

চারদিকে ঢাকী ঢুলী কাঁধে গামছা বস্ত্রখণ্ড.পরা। রাজবাড়ীর পাইক বরকন্দাজের গোমস্তা দারোয়ান ঘেরা চিতা যজ্ঞশালা। আত্মীয় বান্ধব-স্বজন পরিজনও

সঙ্গে সঙ্গে আছেন। কেউ কাতর শোকার্ত। আছে কতক কৌতূহলী ও কৌতুক দর্শক জনতা।

রাজকন্যার মত তপস্বিনী পার্বতীর মত অসূর্য্যম্পশ্যা রূপবতী রাণীর মত অলকমণি দুটি সন্তানের বাহুবেষ্টনের মধ্যে শিবিকা থেকে নেবে দাঁড়িয়েছেন চিতার পাশে মাঙ্গলিক সম্ভারের পাশে। তিনি নিজেও একটী মাঙ্গলিক সম্ভার বিশেষ তিনি তা বুঝতে পারছেন না। প্রদক্ষিণ শেষ হল।

ছাব্বিশ-সাতাশ বছর বয়স। পূর্ণ যৌবন তখনো দেহে তন্বী রূপবতী নারী। মাথায় গুণ্ঠন নড়ে সরে গেছে। দুর্বলতায় ও ভয়ে পা শরীর টলমল করছে। যেন ঐ চারখানি কচি কোমল বাহুই তাঁকে মাটিতে দাঁড় করিয়ে রেখেছে।

পুরোহিত বড় একজন কাকে বললেন "মাকে তোমরা চিতায় স্বামীর পায়ের কাছে বসিয়ে দাও"।

গুরুদেব বললেন "মা আপনি পতির চরণদুটী কোলে করে বসুন। তাঁকেই ধ্যান করুন। স্মরণ করুন কোনো ভয় নেই; মহাসতী লোক আপনাদের জন্যই মা।" কিন্তু তাঁরও কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেল। চিতা বিবাহসজ্জায় সজ্জিত অলকমণির বিভ্রান্ত কোমল মুখখানির দিকে চেয়ে। আগে তাঁরা কেউই অলকমণিকে দেখেননি।

সকলেরই চোখ সজল ব্যাকুল হয়ে উঠল।

একজন বললেন "এবারে মায়ের অলংকারগুলি শিথিল করে নেওয়া হোক, সিঁথলে দেও মা, দাও মা গলার হার গুরুদেবের হাতে দাও। হাতের গুজরী-পঞ্চম পুরোহিতের প্রাপ্য। নাকের নথ, কানের গহনা যাকে ইচ্ছা দাও। অন্য সব গহনা বাড়ীতে ফিরে যাবে। যা ইচ্ছে সুবর্ণ দান করে দাও। ঐ দানই তো কীর্ত্তি হয়ে থাকে।" ইচ্ছা? দান? ইচ্ছে? গহনা? বাড়ীতে ফিরিয়ে নেওয়া? কার গহনা? কোথায় বাড়ী? কার বাড়ী? অলকমণি কোনো কথার মানে আর বুঝতে পারছেন না।

তারা গহনা খুলে নিচ্ছে শুধু দেখছেন। আর ফুলের মালা পরিয়ে দিচ্ছে। শাঁখা লাল কড় চন্দন সিঁদুর পরিয়ে দিচ্ছে জনে জনে।

সতীকে স্পর্শ পুণ্য, সতী দর্শন পুণ্য। সতী নাম শ্রবণও পুণ্য।

গুরু পুরোহিতরা বলছেন, 'মা পতির চরণ ধ্যান করো। ভয় নেই কিছু।'

অলকমণি নিস্পন্দ মূর্ত্তির মত চোখ বুজে মাথা নিচু করে বসে আছেন। ভাবনা? ভয়? কোনো কিছুই মনে নেই।

সহসা মনে হয় কত দেরী—আর কত দেরী ? শেষ হয়ে যাক্ ! কেন দেরী আর ? অকস্মাৎ চারদিকে উলুধ্বনি ও হরিধ্বনির সঙ্গে একসঙ্গে কাঁসর ঘণ্টা শাঁক ঢাক ঢোল তুমুল রবে বেজে উঠল।

অলকমণি চমকে চোখ খুললেন। আলো হয়ে গেছে চারদিক গরম হলুদ রঙের আলো। সূর্য্যের আলো ? না—আগুন ?

সভয়ে অলকমণি ভীত মাথাটি স্বামীর হাঁটুর ওপর পা ছড়ানো কোলের উপর রাখলেন। জড়িয়ে ধরলেন কঠিন হাঁটু দুটো।

হঠাৎ এবারে পিঠে কি একটা ভারি স্পর্শ অনুভব করলেন। স্বামীর হাত ? স্বপ্নের মত মনে হল, তিনি কি বেঁচে উঠেছেন, পিঠে হাত রেখেছেন ? এবারে বলবেন, "ভয় পেয়েছো ? এই তো আমি রয়েছি।" আরো ভারি কঠিন ছোঁয়া পিঠ স্পর্শ করছে।

তিনি জানেন না, ওটা স্বামীর বলিষ্ট হাত নয়। চন্দন কাঠ। ঘৃতসিক্ত চন্দন কাঠের টুকরা তাঁর পিঠের ওপর সাজিয়ে ঠেলে দিচ্ছে লোকেরা।

এবার একবার আরো অলকমণি মাথা উঁচু করতে চেষ্টা করলেন। পারলেন না। চোখ খুলতে পারলেন না। এবারে মাথাতেও স্বামীর স্পর্শ কি। না চন্দন কাঠই, জানেন না তিনি। এত আলো কেন বন্ধ চোখের সামনে। বাদ্যভাণ্ড। শব্দ কোলাহল। আগুন। অলকমণির সংজ্ঞা আস্তে আস্তে বিলুপ্ত আচ্ছন্ন হয়ে গেল। নিঃশব্দে নীরবমুখে অলকমণি সতীলোকে যাত্রা করলেন। নিঃশব্দে দেহ পুড়তে লাগল। মহাভয় ছিল লজ্জা ছিল, তাঁর সতীযাত্রাতে অসঙ্গত কোনো অসংযম, অস্থিরতা চঞ্চলতা প্রকাশ পায় যদি।

[কয়েকদিন কেটে গেছে। রংপুর কর্মক্ষেত্র থেকে ভ্রাতার বিয়োগ খবর পেয়ে রামমোহন এসে পড়েছেন।

শোকার্ত্ত পুরী। অন্তঃপুর নীরব শোকে মূঢ়। বহির্বাটীর পরিজন, আত্মীয় স্বজন বন্ধু সসঙ্কোচে স্তব্ধ তাঁর সামনে। জগমোহনের তিন স্ত্রীর সন্তান পিতৃহীন বালকবালিকার দল বিক্ষিপ্ত উদ্‌ভ্রান্তভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সতী অলকমণির সহমরণ কথা অস্পষ্টভাবে কর্ণগোচর তাঁর হয়েছে। রামমোহন শোকার্ত্ত অন্তঃপুরে জননীর কাছে এসে দাঁড়ালেন। অলকমণির কন্যাপুত্রদের হাত ধরে।

শোকে ক্ষোভে রুদ্ধ কণ্ঠে জননীকে জিজ্ঞাসা করলেন "মা মেজ বঠাকুরাণীর সহমরণে ওরা তোমার অনুমতি নিয়েছিল ?"

জননী নীরবে চোখের জল মুছতে লাগলেন। উত্তর দিলেন না।*]

কালো মেম

১২৬১।৬২ সাল। কলকাতা শহর লোকবিরল। পাড়ায় পাড়ায় ছড়ানো ছোট বড় বাড়ি। পাড়ার নামও স্ট্রীট রোড লেন নামে খুব চালু হয়নি। নম্বর ছিল কিনা জানি নে। পাড়াগুলোও পটলডাঙা, উল্টোডাঙা, ঘুঘুডাঙা, বাদুড়বাগান, হাতিবাগান, সিকদার বাগান, বকুল বাগান ধরনের নামে অভিহিত ছিল। এখনও কোথাও কোথাও সে-সংজ্ঞা আছে। আবার বদলেছে। বদলাচ্ছে নিত্য নব নামে।

বহুবাজার (বউবাজার)-টা ছিল। কাছেই তালতলা। সেখানে একটা ভাঙাচোরা বনেদী বাড়ির দুয়ার দালানে একটি মেয়েদের স্কুল। পাঠশালা বলাই ঠিক। মিশনারী মেমেদের চেষ্টায় স্থাপিত হয়েছে।

কিছু একটা নাম হয়ত ছিল। কিন্তু নামটা চলেনি।

স্কুলের পথে সকালে দুপুরে প্রায়ই দেখা যেত একটি শ্যামবর্ণা বা কালো রংয়ের অল্পবয়সী নারী একটা সস্তা ছিটের গাউন পরা, মাথায় পালক গোঁজা, বেতের খেলো টুপি পরা, পায়ে চিনেবাড়ির জুতো, আড়ষ্ট পায়ে পথে চলেছেন। আর তাঁর পাশে ধব্‌ধবে সাদা রংয়ের প্রায়-বৃদ্ধা সুশ্রী বেশবাস সুশ্রী চেহারা একটি মেমসাহেবও চলেছেন। মাথায় সুশ্রী সুন্দর টুপি। হাতে ছাতি।

এবং তাঁরা স্কুলের পথে বেরুলেই রাস্তায় রাস্তায় পাড়ার অর্ধনগ্ন ছেলেরা, একেবারে উলঙ্গ শিশুরা দাঁড়িয়ে পড়ত। নয়ত সঙ্গে সঙ্গে চলত।

আর বলত, 'ঐ যে, ঐ যে কালো মেম। আর ঐ দেখ্‌ একটা সাদা মেম।

ঐ যে পালক দেওয়া টুপি দেখ্। কোন্ পাখীর পালক ভাই। কেমন রং দেখ্।

আর খোলা খাপরার ঘর থেকে তাদের ময়লা কাপড় পরা খালি-পা মায়েরা, ডুরে শাড়ি পরা ছোট বড় বোনেরা, জলের ঘড়া কাঁখে মলিন চেঁটি পরা, হয়ত গোবরের ঝুড়ি হাতে বৃদ্ধা গৃহিণীরাও বেরিয়ে এসে উঁকি দিত। আর বড় বড় বাড়ির বন্ধ দরজা-জানালার পিছন থেকে দেখা যেত পর্দাশীন সুশ্রী কোমলমুখী রূপবতী, রূপহীনা, একবস্ত্রা, গহনাগাঁটি পরা, নোলক নথ পরা সিঁদুর পরা বালিকা যুবতী বধূ কন্যাদের।

বস্তিবাড়ির রকে ও দাওয়ায় দেখা যেত কিছু বর্ষীয়ান পুরুষ তামাক খাচ্ছেন অথবা গল্প করছেন। মাঝারি বয়সীরা কাজে বেরিয়েছে।

* * * *

কালো মেম তাকিয়ে তাকিয়ে সবাইকে দেখতেন।

কোন কোন জায়গায় একটু দাঁড়াতেন, কি যেন ভেবে। সঙ্গে সঙ্গে সাদা মেমও দাঁড়াতেন। আর চারদিকে ছোট বড় মাঝারি বালক বালিকা শিশুর দলও দাঁড়িয়ে পড়ত।

সাদা মেম হেসে হেসে ভাঙা বাংলা আর ইংরেজিতে মেয়েদের দিকে চেয়ে বলতেন, 'টোমরা আমার ইস্কুলে পড়িবে ?'

তারা অবাক হয়ে তাকাত। জবাব দিত না, রকে বসা লোকেদের দিকে চাইত। হয়ত গুরুজন তাদের।

সাদা মেমও সেদিকে তাকিয়ে বলতেন, 'ইয়েস, হামার ইস্কুল ভাল আছে।'

কালো মেমের দিকে চাইতেন। যেন তুমি ভাল করে বুঝিয়ে বল।

তখন কালো মেম রকের ওপরের পুরুষদের দিকে চেয়ে বলতেন, 'আমরা একটু ভেতরে দেখা করব কি ? আপনাদের বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে ? আমরা বিনা বেতনে মেয়ে-স্কুল করেছি। এই মেমসাহেবরা করেছেন।'

অনেকেই তাঁরা দ্বিধাভরে চেয়ে থাকতেন। ম্লেচ্ছ। কিরিস্তান (খ্রীষ্টান)। মেমসাহেব! কোথায় বসবে। যদি কিছু ছোঁয়া যায়! সবই তো আছে, রান্না, ভাঁড়ার, ঠাকুর, বিছানা, মাদুর, কাচা কাপড়, বিধবা, বামুন!

কেউবা সাদা মুখের সম্মান রেখে বলতেন, 'আসুন।' এই সামনের ঘরের একটু ছোট বসবার জায়গায় বসতে দিতেন।

সাদা মেমসাহেবের মুখে সব দাঁত নেই। তিনি একটি 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলে স্বল্পদন্ত স্নিগ্ধ হাসিমুখে ঘরের তক্তাপোশের ওপর বসে বসে চারদিকে দেখতেন আর শুধু হাসতেন।

মাঝে মাঝে 'কালো মেমে'র কথায় সঙ্গে একটা দুটো 'ইয়েস' 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলতেন। কালো মেমেই কন্যা সংগ্রহ করে। কথা বলে, লেখাপড়া শেখার গুণাবলী বলে। প্রাইজের পুতুলের লোভ দেখায়।

* * * *

কালো মেয়ের দেশী নাম ছিল 'সোনামণি'। ধর্মান্তরিত হওয়ার পরের নাম হল মার্থা। মেমসাহেব রাখেন।

বাইবেলের বিখ্যাত কর্মশীলা মার্থার নামে।

যাহোক, কালো মেমের আর সাদা মেমের অন্যবারের মত এবারও কন্যা সংগ্রহ সাধনায় সিদ্ধিলাভ হল।

তিনটি মেয়ে তাঁরা পেলেন। ছ-সাত বছরের বেশী বয়স নয়। আট-ন বছরেই বিয়ে দিতে হবে। তা ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থই হোক বা নবশাখ সম্প্রদায়ই হোক।

প্রথমেই পেলেন এক দরিদ্র গৃহস্থ ব্রাহ্মণের মেয়ে, নাম ক্ষীরোদবাসিনী।

আর আস্তে আস্তে ডুরে শাড়ি নাকে নোলক হাতে আইবুড়ো লোহা রুপোর চুড়ি গলায়, সোনা ও পলা মেশানো কণ্ঠমালা পরা আরও কয়েকটি মেয়ে এসে ক্ষীরোদবাসিনীর পাশে দাঁড়াল।

মেমের ইস্কুল! ওই মাথায় টুপিতে সুন্দর সুন্দর পালক গোঁজা মেমসাহেবরা। কালো মেম আর সাদা মেম। আরও কত মেমসাহেবদের দেখতে পাবার কৌতূহলে তাদের মন ভরে উঠেছে। যারা কাপড় পরে না, ঘাগরা পরে। দুধের মত সাদা রং।

সবাই চুপিচুপি গুরুজনদের বলে, 'ওই তো ক্ষীরোদিদি ইস্কুলে যাবে। আমাদেরও ভর্তি করে দাও।'

এবারে দ্বিধান্বিত পরিজনদের কাছ থেকে দেখাদেখি আরও দুটি মেয়ে এল। নিস্তারিণী ও কালীতারা।

* * * *

গুনে গেঁথে ছ থেকে আট বছর অবধি দিনের ক্লাসে আসা ছাত্রী এপাড়া ওপাড়া খুঁজে—বদলা লেন তালতলা লেনের গলিঘুঁজি থেকে জড় হয়েছে সবশুদ্ধ সতেরটি।

আর আছে অনাথ ক্রিশ্চান মেয়ে চারটি। সেগুলি হারিয়ে যাওয়া কুড়িয়ে পাওয়া সরকারী অনাথ বালিকা।

তারা সব কালো মেমের হেফাজতে।

ঘরের কাজ করে। ঝাড়ে মোছে রান্না করে তরকারি কোটে। বাসন মাজে। আগুন্ দেয় উনানে। নাম তাদেরও মেমসাহেবের দেওয়া। মেরী, রুথ, রেবেকা, অ্যান্।

পড়ে তারা সবাই একসঙ্গে। পরনে ডুরে শাড়ি। কারও গায়ে একটা জামা, কারও গা খালি।

বাজারে তখন বিদ্যাসাগরের প্রথম দ্বিতীয় ভাগ বেরিয়েছে। পড়ানো হয়।

না:, রামায়ণ, মহাভারত, শিশুবোধক নয়।

বাইবেল পড়ানো হয়। স্কুল বসার আগে 'সদাপ্রভু' পরমপ্রভুর নাম করে হাঁটু গেড়ে (নীলডাউন) উপাসনা করানো হয়।

কিন্তু ক্ষীরোদবাসিনীরা উপাসনা করে না। যদিও বাইবেল পড়ে, উপাসনা চুপ করে শোনে শুধু। কিন্তু বাড়িতে সবাই জানেন না ওদের বাইবেল ও 'সদাপ্রভু'র কথা পড়তে হয়।

সেকালের মেয়েরা পাকা ছিল বটে। কিন্তু কি ভেবে বাড়িতে সব বলত না। স্কুলের সঙ্গিনী সঙ্গ বন্ধুত্ব ছেড়ে যেতে হয় যদি।

তবু মাঝে মাঝে কোন কোন পাড়ায় রটে যায়, 'ওরে ওরা কিরিস্তান হয়ে যাবে রে। গাউন পরবে। গরু খাবে।'

কেউ বা বলত 'সদাপ্রভু' কি রে বাবা! 'সদাপ্রভু' কাকে বলে?

'সদাপ্রভু' উপাসনা হয় শুনে দেখতে দেখতে নিস্তারিণী কালীতারা মঙ্গলা শিবানী নামে কটি এপাড়া-ওপাড়ার মেয়ে স্কুল ছেড়ে চলে যায়।

বাবা কাকারা এসে বলে, 'বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক হয়ে গেছে মেমসাহেব।' সাদা মেম 'ও ইয়েস' 'খুব খুশীর কথা' বলে ফোকলা মুখে হাসেন। আর সাত-আট বছরের ছোট্ট ছোট্ট ডুরে কাপড় পরা মেয়েগুলি গহনা পরে নোলক-নথ সিঁদুর-আলতা পরে কোন্ এক শ্বশুরবাড়িতে চলে যায়।

* * * *

তবে কালো মেম জানেন বিয়ের ঠিক হয়েছে সব সময়ে সে-সব কথা সত্য নয়।

ক্রিশ্চান স্কুল আর মেমসাহেবদের ভজন গান উপাসনায় জাত যাবার ভয়ে বিয়েতে 'ভাঙচি' হবার ভয়ে তাদের ছাড়িয়ে নেওয়া হয়।

তবু কয়েকটি উচ্চবর্ণ ক্ষীরোদবাসিনী, কামিনী, তারিণী, শ্যামা, বামা, সুন্দরীরা স্কুল ছাড়ে না।

দিনে দিনে অনাথ মেয়েও দুটি-একটি করে আসে। নিম্নবর্ণরা 'যিশু'র কৃপা এবং ক্রিশ্চানিটির আশ্রয়ে ভাল কাজ পাবার জন্য আসে। ধর্মান্তরিত হয়। সাঁওতাল বুনো হাড়িরা আসে।

সহসা সাদা মেমের বিলাত যাওয়ার একটি কথা উঠল। বয়স হয়েছে, কোন কম বয়সের মিশনারী মেয়েকে কর্মভার দিয়ে তিনি স্বদেশে য়ুরোপে ফিরে যাবেন। তাঁদের মিশনের প্রথামত।

আর কালো মেম কেঁদে আকুল হতে লাগলেন। প্রকাশ্যে এবং লুকিয়ে। কোথা থেকে কোন্ এক সাদা মেম আসবেন। কেমন হবেন তিনি! এমন মধুর মিষ্টভাষিণী হাসিমুখ সহৃদয় হবেন কিনা⋯।

⋯আরও কত কথা⋯। বিপন্নদের আশ্রয়দান। অনাথকে প্রতিপালন। হোক ধর্মান্তর করা!⋯এবং কালো মেম চুপি চুপি কাঁদেন আর চোখ মোছেন।

বলতে ইচ্ছে হয় 'মাদার' (তিনি মাদারও বলেন), আমাকে তোমার ঝি করে নিয়ে চল। কিন্তু দেশ ঘর আর ঐ লালনপালন করা অনাথ মেয়েগুলির কথা মনে হয়।

শুধু চোখ মোছেন। সাহস করে বলতে ইচ্ছে হয়, 'মাদার তুমি যেও না। তুমি থাক। এখানে সব অন্ধকার হয়ে যাবে।' বললেন একদিন সেকথা। বললেন, 'সেখানে কে আছে মাদার তোমার?'

মাদার হাসেন, ভাঙা বাংলায় ইংরাজী মিশিয়ে হেসে বলেন, 'ওঃ, আমার সিস্টার আর ব্রাদার আছে। তাদের ছেলেমেয়েরা আছে। শিশু এবং বড় বড়। আর আমার দেশ। আমাদের হোমকন্ট্রি।' আর বলেন, 'আমাদের তো প্রচুর কাজ শেষ করে ফিরে যাবার নিয়ম। অন্যজন আবার আসবেন তাঁর কাজই করতে মিশনের নিয়মে।'

'তবু আর কিছুদিন থাক না মাদার।' কালো মেয়ের কান্না আসে। ভয় করে যেন কোন্ অজানা সাদা মেমকে মনে করে। কে জানে কেমন হবে সে।

* * * *

তখনকার দিনে বিলাত যাওয়া অনেক সময় লাগত। প্রায় ছ মাস। তবু

সাদা মেম জিনিসপত্র কিনছেন। ইণ্ডিয়ার সব কৌতূহল ও কৌতুক-উৎপাদক বাসন, গহনা, গালিচা, হাতির দাঁত, মাটির গালার পাথরের কাঠের খেলনা পুতুল। ওঃ, মাই সিস্টার ব্রাদার অ্যাণ্ড চিলড্রেন সব কটো খুশি হবে। সোচ্ছাস আর বলেন।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাহায্যকারিণী কালো মেম সোনামণির মুখ ম্লান হয়ে যায়।

মেম বুঝতে পারেন। 'ওঃ সোনামণি, মাই মার্থা, তুমি এটো দুঃখিত হয়ো না। প্রভু তোমাদের দেখবেন।' বলে তার পিঠে হাত বুলিয়ে দেন।

এবং যত পুরনো সাদা কাপড় গাউন ইণ্ডিয়ার পরার মত কাপড় জামা সব কালো মেমের জন্য গুছিয়ে রাখেন। বলেন, 'এগুলি টোমার। তুমি পরিবে।'

সোনামণি চোখ মোছে দ্বিগুণ দুঃখে।

* * * *

আর তিন মাস মাত্র বাকি। বর্ষাকাল। শরতে মেমসাহেব যাবেন।

সোনামণি স্কুলের মেয়ে খোঁজে পাড়া-বেপাড়ায়। বউবাজার থেকে ঠনঠনে। ঠনঠনে থেকে শ্যামবাজার। রোদ্দুর বর্ষা মাথায় নিয়ে।

স্কুল যেন মেমসাহেব চলে যাবার পর কানা পড়ে না যায়। নতুন মেম আসবার আগে পুরনো মেয়েদের ভজিয়ে ভুলিয়ে যত্ন করে রাখা—প্রাইজে পুতুল খেলনা দিয়ে ছবির বই দিয়ে। সে ছাড়া নতুন মেয়ে আনা, সংগ্রহ করা।

ওদিকে শ্যামবাজারে নাকি বেথুন সাহেব একটি ইস্কুল খুলেছেন। হিন্দু মেয়েদের জন্য।

সাদা মেমদের কালো মেমর সেজন্যেও ভাবনার শেষ নেই।

কি হবে তাঁদের এই ছোট স্কুলটির। 'সদাপ্রভু'র দয়াতে টিকে থাকবে তো! কালো মেমের মত অনন্য কর্মদক্ষতা কারুর নেই।

হঠাৎ কালো মেম জ্বরে পড়লেন।

সেকালের কলকাতা। মলঙ্গা লেনের এক গলিতে একটি বড়লোকের ঠাকুর-দালানে স্কুল।

সাদা মেম ওরই মাঝে একটু কাছাকাছি ভাল বাড়িতে থাকেন, সেখানেই দু-একটা ঘরে কালো মেম ও অনাথ মেয়ে কটিকে নিয়ে। কালো মেমের দেখা-শোনার ভারও তাঁর। তাঁর ঘরখানির পাশে তাঁর স্থান। আর তাঁরই জ্বর। আর মেমও বিলাতে যাবেন সব ঠিকঠাক। অন্য মেমসাহেব এখনও জাহাজে। এবং সেকালের মশামাছিভরা গোনা লাগা কলকাতার জ্বর।

কে জানে সে কি জ্বর! একাজ্বরী কি ম্যালেরিয়া, কি কবিরাজী মতে অন্ন-বিকার, জানে না কেউ।

সেকালের মত ডাক্তার ও বৈদ্যও এলেন। ওষুধপথ্যের ব্যবস্থাও হল। আর কালো মেম একাজ্বরীতে ভুগতে লাগলেন।

* * * *

সোনামণি বা স্বর্ণময়ী শুয়ে শুয়ে চোখ বুজে কি সব ভাবেন। কলকাতার কাছে গ্রাম দেশ। একটি শীতের সন্ধ্যারাত্রি। পুকুরঘাটে গেছেন বাসন ধুতে।

কারা বা কে যেন এল—কোন গাছের আড়াল থেকে।

হঠাৎ চোখ মুখ বেঁধে ফেলল। আর মনে নেই।

কোথায় নিয়ে গেল, কি বিপর্যয় দেহে মনে জীবনে ঘটে গেল তা আর বলবার দরকার করে না।

অর্থাৎ যা হবার তা হয়ে গেল। সে স্বজন গৃহ ধর্ম সমাজের বাইরে এসে পড়ল। এই ত্রিশ বছর পরেও সোনামণির চোখে জল এল সেই বিভীষিকাময় রাত্রির কথা মনে পড়ে।

মা বাবা ভাই বোন। একটি ছ বছরের মেয়ে নিয়ে বিধবা হয়ে সে পিত্রালয়ে ছিল।

যারা ধরে নিয়ে গিয়েছিল তারা তো অর্ধমৃত অবস্থায় কোন্ এক পথের ধারে এক জায়গায় ফেলে দিয়ে চলে গিয়েছিল।

সে কেমন করে সেই দেহখানি বহন করে শিয়ালদার কাছে ঐ গির্জাটার ধারে এসে শুয়ে পড়েছিল, সে জানে না। গায়ে শুধু মলিন ছেঁড়া কাপড়খানি। সায়া সেমিজ কাকে বলে সেই সেকালে তাদের জানা ছিল না।

বিকেল থেকেই আকাশ অন্ধকার। সন্ধ্যার দিকে ফোঁটায় ফোঁটায় বৃষ্টি এল।

সে গায়ের কাপড়খানা টেনে খুলে মুড়ি দিল। বৃষ্টি তাতে বাধা মানে না।

পথে লোকজন সেকালে কম। পথিক যারা দেখছে, কেউ দাঁড়াচ্ছে। কেউ বলছে, ভিক্ষে যাবি যে। বাড়ি চলে যা। ভিখারিনী মনে করে কেউ পয়সাও দু-একটি দিয়েছে।

হেনকালে গির্জার গেট খুলে কয়েকজন বেরিয়ে এলেন। কজন ছিলেন সে জানে না।

শুধু শুনেছিল একটি বিদেশী কণ্ঠে দুটি কথা, 'কে তুমি এখানে ভিজিটেছ? বাড়ি চলিয়া যাও।'

আর একজন বললে ধরধরে বাংলায়, 'কে রে এখানে? ভিজে মেথার কেউ নেই। অন্য জায়গায় যা।'

সে উঠে বসেছিল। গায়ের কাপড় ভিজে গেছে।

উনিশ-কুড়ি বছরের কোমল একখানি ভীতদৃষ্টি মুখ তুলে সে রেলিং ধরে দাঁড়াবার চেষ্টা করল।

কিন্তু বাড়ি? বাড়ি যাবে? বাড়ি কোথায় তার?

চোখ দিয়ে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে এল।

বিদেশিনী তার দিকে চেয়েছিলেন। বললেন, 'কোটায় তোমার বাড়ি?'

সে সভয়ে চুপ করে রইল। সেই বিদেশিনী এই মেমের সঙ্গিনী—জিজ্ঞাসা করলে, 'কোথায় ঘর তোর? ভিজে যাচ্ছিস যে। জ্বরে পড়বি যে।'

চোখ মুছে সে বললে, ঘর নেই তার। তারপর আবার বসল। আর আস্তে আস্তে ভিজে মাটিতে শুয়ে পড়ল। গায়ে কাঁপুনি ধরেছে। অত্যাচার লাঞ্ছনা অনাহার শীত বৃষ্টিতে তার গায়ে সত্যিই জ্বর এসেছে মনে হচ্ছিল।

মেমসাহেব এদের ভাষা সবটা বোঝেন না। সকরুণ চোখে ঐ অজানা অসহায় শ্যামবর্ণ তরুণী নারীর দিকে চেয়ে রইলেন একটু। ভাঙা বাংলায় তারপর নিজের সঙ্গিনীকে বললেন, 'লক্ষ্মী, সত্য এখানে পড়ে থাকলে শীতে জ্বরে মরিয়া যাবে। আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাব? জিজ্ঞাসা কর তো যাবে কি?'

লক্ষ্মী দ্বিধাভরে বললে, 'মাদার, ও কি জাত! যাবে কি, হিন্দু তো!'

মাদার বললেন, 'প্রভুর দয়ার কাছে হিন্দু ক্রিশ্চান জাতি নেই। দেখছ না ও একলা বসে কাঁপছে। নাও আমাডের গাড়িটে ওকে টুলিয়া নাও।'

লক্ষ্মীমণি স্বর্ণময়ীর হাত ধরে উঠিয়ে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'আমাদের সঙ্গে যাবি?'

সে বিহ্বল চোখে বলেছিল, 'কোথায়?'

এই সেই সাদা মেম। তিনি তখন বলেছিলেন, 'প্রভুর আশ্রয়ে। এস বালিকা।'

লক্ষ্মী তার হাত ধরে ঘোড়ার গাড়িটায় তুলল। পাশে বসল তার।

তারপর অসুখ, জ্বর। আশ্রয়। তারপর লিখতে পড়তে শেখা। সাদা মেমের কন্যাস্নেহে করুণায় মমতায় ফুলের কাজ শেখানো। ক্রমে ধর্মান্তর।

সেই আশ্রয়দাত্রী। এখন সেই সাদা মেম বিলাত চলে যাবেন। নতুন কে আসবেন! কেমন লোক হবেন···! ভাবে।

তার পরিচয় এরা নামমাত্র জানত। কোন্ এক চক্রবর্তী বাড়ির মেয়ে।

বেহালায় বাড়ি। বিধবা। একটি মেয়ে ছিল। অপহৃতা নারী। নামধাম বলেনি। ভাল জানতও না। এরাও জিজ্ঞাসা করেননি আর।

অসুখ বাড়ে। আর সে আচ্ছন্ন হয়ে, কত কি ভাবে।

ভাবে, নিজের মেয়েটির কথা।

সাদা মেম এলেন। লক্ষ্মীদিদির সঙ্গে।

বলেন, 'কেমন আছ, সারিয়া ওঠো শীঘ্র।' যদিও জানেন সারবার আশা কমে আসছে।

কালো মেম চোখ খুলে দুজনের দিকে চাইল।

তারপর বলল, 'আর তো ভাল হব না মাদার। প্রভু আমাকে ডেকেছেন…। শুধু…'

লক্ষ্মী বললে, 'হ্যাঁ, প্রভু ডেকেছেন তোকে! থাম্। তা 'শুধু' কি বলছিস?'

সাদা মেম বিছানার পাশে একট চৌকিতে বসে তার হাত ধরে নাড়ী দেখছেন।

কালো মেম আস্তে আস্তে বললে, 'লক্ষ্মী দিদি, আমার মেয়েটিকে একবার দেখতে ইচ্ছে করে।'

লক্ষ্মী অবাক। তোর মেয়ে! সেই মেয়ে!'

সাদা মেমও অবাক্, 'টোমার মেয়ে। বেঁচে আছে? কোথায় আছে?'

কালো মেম বললেন, 'ইয়েস মাদার। আমার সেই মেয়ে। এই মলঙ্গা লেনের কাছে একটি বাড়িতে তার শ্বশুরবাড়ি। আমি একটি দেশের লোকের কাছে ঠিকানা নাম জেনেছিলাম। একবার যদি দেখতে পেতাম। ওখানে তার বিয়ে দিয়েছিলেন আমার বাবা।'

সাদা মেমের নাড়ী দেখা হয়ে গিয়েছিল। তার হাত ধরে বসেছিলেন।

সে চোখ বোজে। খুব দুর্বল।

তিনি উঠে দাঁড়ালেন। ঘরের অন্যদিকে গিয়ে লক্ষ্মীমণিকে কি যেন জিজ্ঞাসা করলেন।

ডাক্তারও এলেন। দেখে চলে গেলেন।

সন্ধ্যা হল। আবার সাদা মেম লক্ষ্মীমণিকে নিয়ে এলেন।

ঘরের দেওয়ালে সোনামণির ক্রশখানি সুতোতে বাঁধা টাঙানো ছিল।

সোনামণির চোখ বোজা।

সাদা মেম তার বুকে মাথায় মুখে ক্রশখানি ঠেকিয়ে দিয়ে বললেন, 'সোনামণি, প্রভুর কৃপাক্রশ চুম্বন কর। তিনি তোমার কর্তা পিতা মাতা সব হয়ে রয়েছেন।

এখন তিনিই তোমার বন্ধু। সব। তোমার সেই কন্যাকে আমরা কি করে বলব তার মার কথা। সে জানে তার মা মরে গিয়েছিল। লক্ষ্মী বলছে, কাদার বলছেন, এখন তোমার কোন পরিচয় তার জীবনে তার শ্বশুরবাড়িতে নিন্দা কলঙ্ক ও তার বিপদের সৃষ্টি করতে পারে। সে তার স্বামী সন্তান নিয়ে সুখে থাকুক। এবং সেই হিন্দু ঘরের বৌকে এখানে আসতেও দিবে না। তুমি আর তার কথা ভেবো না। এখন প্রভুর কথাই মনে কর। তিনি ত্রাণকর্তা করুণাময়। সকলের পিতা প্রভু। তোমাকে আশ্রয় দিয়েছেন তিনি সেই দুর্দিনে।'

মেমসাহেব সোনামণির হাতে ক্রুশটি দিলেন। কম্পিত হাতে সে ক্রুশটা মাথায় ঠোঁটে ঠেকালো চোখ বুজেই।

শুধু আস্তে আস্তে ফোঁটায় ফোঁটায় জল চোখ থেকে গড়িয়ে পড়তে লাগল।

রচনাকাল—১৩২৭

চিরকামিনী

ভাদ্র মাসের সন্ধ্যা। সারাদিন এলোমেলো বৃষ্টি পথিকদের এলোমেলো ভাবেই ভিজিয়েছে। অতর্কিত ভাবে এসেছে ও থেমেছে।

অসিত সরিৎ সুধাংশু ও অমল বেরিয়েছিল। অকস্মাৎ বৃষ্টি এসে পড়ায় ঐ পথের ধারে একটি পানের দোকানের পাশে তারা মাথা বাঁচবার জন্য দাঁড়াল।

সরিৎ ঝোলানো দড়ির আগুন থেকে সিগারেট ধরাবার চেষ্টা করল, অসিত পান সাজতে বলল।

বৃষ্টি জোরে নামল। অন্ধকারও ঘনিয়ে এলো।

সহসা তাদের চোখে পড়ল দোকানের অন্য পাশে একটু অন্ধকারে দুটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। বৃষ্টি থেকে বাঁচবার জন্য একটু এগিয়ে এসে ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে রয়েছে পান আর একটা কি। পরিধানে ধূপছায়া রংয়ের বাগেরহাট শাড়ি, গোলাপী রংয়ের আর নীল রংয়ের চকচকে কাপড়ের জামা ব্যাগওয়ালাদের কাছে কেনা। কপাল অবধি নামানো পাতাকাটা চুলের সীঁথে ভুরু মাঝখানে মস্ত বড় কালো টিপ, হাতে গোছা-করা কাঁচের আর সেলুলয়েডের চুড়ি, কানে সোনার আধুনিক ঝুমকো, মাথার কাপড় খোলা। খুব অনুচিত ভাবে

আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে তারা এই আকস্মিক বৃষ্টি আর এদের দৃষ্টি এড়াবার চেষ্টা করছে। অবশ্য দুইই নিরর্থক হচ্ছে।

এরাও অস্বস্তি ভরে এদিক ওদিক চেয়ে দেখল, যদি অন্ত কোথারও দাঁড়ানো যায় অথবা বৃষ্টি কমে এলো কি না।

না, বৃষ্টি পানের দোকানের টিনের ছাত বেয়ে সশব্দে তাদের জুতো আর কাপড় ভিজোতে আরম্ভ করে দিল, আর মেয়ে দুটির শাড়ি।

ওদের পান খাওয়া সিগারেট ধরানো হ'ল। কিন্তু বৃষ্টি ধরল না।

সকলেই অতিশয় আড়ষ্টভাবে নানাদিকে চাইছিল মেয়ে দুটির দিক বাদ দিয়ে—তবু প্রত্যেকেরই তাদের দিকে মাঝে মাঝে ঘুরে ফিরে চোখে পড়ছিল।

হঠাৎ সরিৎ বল্লে, 'চল্, এক কাজ করি।'

সকলেই উৎসুক হয়ে তার দিকে চাইল, জিজ্ঞাসা করল, 'কি?'

সরিৎ মেয়ে দুটির দিকে একবার চাইল তারপর বল্লে, 'ওদের বাড়ি গিয়ে বসবি?'

বন্ধুরা ওর দিকে আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে নির্বাক হয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপরে অমল বল্লে, 'তোর মাথা খারাপ হয়েছে?'

সুধাংশু বল্লে, 'ক্ষেপে গেছিস?'

অসিত বল্লে, 'না চল্ রাস্তার ওপারে গিয়ে দাঁড়াই।'

সরিৎ বল্লে, 'কেন দোষ আছে কিছু? এদিকে তো সব মানুষ সমান, অনেক বড় বড় কথা বলিস? সত্যিই চল্ না, দেখে আসি ওদের থাকা।' বন্ধুরা কেউ নড়ল না। অপ্রস্তুত ভাবে দাঁড়িয়েই রইল।'

সরিৎ বল্লে, 'তাহলে আমি যাচ্ছি।' সরিৎ এগিয়ে গেল মেয়ে দুটির দিকে। আর তারা লজ্জা ও ভয়ে প্রায় যেন মিশেই গেল দেয়ালের গায়ে। সরিৎ জিজ্ঞাসা করলে, 'এই—আপনাদের বাড়ি কোথায়? আমরা একটু...' মেয়ে দুটি থমকে হতবুদ্ধির মত বল্লে, 'আমাদের বলছেন?'

সরিৎ বল্লে, 'হ্যাঁ।'

পানওয়ালাটা প্রগল্‌ভ ভাবে একটা অন্ধকার গলি দেখিয়ে বল্লে, 'ঐ দিকে যান বাবু।'

সরিৎ এগিয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুরাও গেল।

অন্ধকার গলি, তার দুয়ারে অন্ধকার ও তিমিত-আলো-আলা কাঁচা পাকা বাড়ি, মাঝে মাঝে সরু রক। একটা সরু রকের ধারে একটি ছোট বাড়িতে

ভেতরে দুটি ঢুকল। তাদের সঙ্কোচের সীমা নেই। এদের কি করে সম্ভাষণ করতে হয় তারা জানে না। একটা ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। একটি মেয়ে বল্লে, 'আসুন ভেতরে।'

অত্যন্ত বিরক্ত ভাবে বন্ধুরা ও নির্লিপ্তভাবে সরিৎ ঘরে ঢুকল।

ছোট ঘর, ছোট একটি চৌকি, বিছানা পাতা। ঘরের কোণে একটি জলচৌকির ওপর ঝকঝকে পানের বাটা আর বাসন-কোসন। মেজেতে একটি মাদুর পাতা। দেওয়ালে মা কালীর, তারকনাথের আর অন্য দু'একখানা ঠাকুরদের পট ও ক্যালেণ্ডারের ছবি। একটি পরিষ্কার হেরিকেন জ্বালা এককোণে।

'আসুন'-বলা মেয়েটিই বল্লে, 'বসুন।' ওরা মাদুরে বসল। মেয়েটি একটু চুপকরে থেকে তারপর বল্লে, 'পান খাবেন? যুঁই, পান সাজ।'

ওরা বল্লে, 'না। পান আমরা খাই না।'

'খাবেন না? খাবার আনব কিছু?'

ওরা বল্লে, 'না না, খাবার দরকার নেই।'

এবারে 'যুঁই'-বলা মেয়েটি কি বল্লে চুপিচুপি। আবার অন্য মেয়েটি বল্লে, 'আমাদের পান না খান, বাজার থেকে এনে দিই?'

এবার অসিত বল্লে, 'না, পানের দরকারই নেই, আমরা খাই না।'

অমল বল্লে, 'বৃষ্টি থেমেছে মনে হচ্ছে, চল যাই।'

সরিৎ জিজ্ঞাসা করলে কথা-বলা মেয়েটিকে, 'তোমার নাম কি?'

সে বল্লে, 'মল্লিকা।'

দুটি কালো মল্লিকা আর যুঁই…অপ্রস্তুত ভাবে দাঁড়িয়েছিল। নামের সঙ্গে তাদের কোনখানটাই মেলে না। তবু সরিতের মনে হল যেন মেলে কোনখানে। রূপে নয়, সৌন্দর্যে নয়, সঙ্কোচে অপ্রস্তুত নত মুখটিতে যেন মেলে যুঁইয়ের।

অসিত জিজ্ঞাসা করলে, 'এঘরটি কার?'

মল্লিকা বল্লে, যুঁইয়ের।'

তারপর সকলে চুপ করে থাকে।

হঠাৎ সরিৎ জিজ্ঞাসা করলে, 'এখানে তোমাদের আর কে আছে?'

এবারে যুঁই বল্লে, 'মা আছে।'

ওরা অবাক হয়ে বল্লে, 'মা আছে?'

এবারে মল্লিকা হেসে ফেল্‌লে—'নিজের মা কি বাবু! আমাদের যে নিজের

আসে তাকেই মা বলি।' সে বোধহয় বড় হবে কিছু, কিম্বা বেশী চটপটে যুঁইয়ের চেয়ে।

আবার বন্ধুরা চুপ করে গেল কিছুক্ষণ।

'আচ্ছা তোমরা লিখতে পড়তে জান ?'

এবারে যুঁই কথা কইলে, বল্লে, 'একটু একটু জানি।'

মল্লিকা চুপ করে রইল, সে জানে না।

'কি কি পড়ছে ?' ছেলেদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, জিজ্ঞাসা করে।

'পেরথম ভাগ পড়েছি।'

'তারপর আর কিছু পড়নি ?' অসিত বলে ফেলে।

লজ্জিতভাবে যুঁই বলে, 'না।'

অমলের ও সুধাংশুর মুখে হাসির আভাস ফুটে ওঠে যেন। প্রথমভাগ ? লেখাপড়া ? পড়তে জানা ? সরিৎ আর অসিত চুপ করে থাকে। আর প্রশ্ন আসে না মনে।

দরজার বাইরে দুএকটি আরো কৌতূহলী অন্ত ঘরের অধিবাসিনীর আবির্ভাব হয়েছিল। হঠাৎ তাদের মনে হয়, এদের অনেকটা সময় নষ্ট করে ফেলেছে ! ওরা উঠে পড়ল। সরিৎ পকেটে হাত দিল। দেখাদেখি সকলেই হাত দিল। সকলের ব্যাগ ও পকেট খুঁজে কয়েকটি টাকা আর কিছু ভাঙানী পাওয়া গেল।

লজ্জিতভাবে সরিৎ গিয়ে ওদের মাদুরে রাখল, বল্লে, 'তোমাদের অনেক সময় নষ্ট হয়ে গেল বোধ হয়, আমরা এবারে যাই।'

অপ্রস্তুত যুঁই চুপ করে রইল। মল্লিকা বল্লে, 'এখনো বিষ্টি পড়ছে বাবু।' তাদের কি মনে হতে লাগল এবং কি বলবে, তারাও বুঝতে পারল না। শুধু বুঝতে পারছিল, এরা অন্ত সকলের মত নয়, যেন কারুর মতই নয় যাদের ওরা চেনে।

দুর্গোৎসবের মহাষ্টমী। সার্বজনীন পূজামণ্ডপে ঠাকুর দেখতে যাবার কথা ওঠে।

যুঁই মল্লিকার দল গঙ্গাস্নান করতে যায়। বিকেলে বসে প্রসাধন করতে করতে গল্প জমে ওঠে। ভাই 'সর্বজননী' ঠাকুর দেখতে যাবি ? কোথায় কোথায় কত দূরে কে ঠাকুর দেখেছে কত, বাড়ীর কর্ত্রী কোথায় কোথায় ঘুরে এসেছে সব গল্প হয়।

যুঁই বলে, 'ভাই সর্বজননী বলে কেন ?'

বিজ্ঞভাবে কে জবাব দেয়, 'সকলের মা কিনা জননী কিনা তাই। তাই এখন আমাদের ও সব জায়গায় দাঁড়াতে দেয়।'

পূজা-মণ্ডপের ভিড় ভেঙে অসংখ্য ভদ্রমেয়েদের সঙ্গে তারা মিশে যায়। চোঙের মধ্য দিয়ে চেঁচিয়ে কার গলা একঘেয়ে নানা কথা বলে যাচ্ছে, কার ছেলে হারিয়েছে, কার ছেলে পাওয়া গেছে, কাকে ডাকছে সে শীঘ্র অমুক গেটে আসুক, সকলে সাবধানে টাকা পয়সা গহনা রাখুন, গলার হার সামলে নিন্, ইত্যাদি ইত্যাদির মাঝে তারা ভিড় পার হয়ে যায়। হঠাৎ বেরুবার পথে চোখে পড়ে সরিৎ দাঁড়িয়ে দু'তিনটি সুবেশ সুশ্রী মেয়ের সঙ্গে। একটি মেয়ের কোলে একটি সুন্দর ছেলে।

যুঁই মল্লিকাকে বল্লে, 'দেখ ভাই, সেই বাবুটি না! আর কি সুন্দর ছেলেটি দেখ্ মেয়েটির কোলে।' রাজকন্যার মত সুন্দর সুশ্রী মেয়ে দুটি সরিতের সঙ্গে হেসে হেসে কথা কইছে যুঁই অবাক হয়ে চেয়ে থাকে, অজানতেই যেন সেদিকে এগিয়ে কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ায়। হঠাৎ দলের নেত্রী ডাকে, 'এই সব দল ছাড়া হচ্ছিস্ কেন ? আ মর্ যুঁই, হাঁ করে দেখছিস্ কি ?'

সরিতের আর তার সঙ্গিনীদের ঐ নারী-বাহিনীর দিকে চোখ পড়ে, যুঁই তখন মেয়ে দুটির কাছে। অমেধ্য স্পর্শের মত তারা দুজন বিতৃষ্ণাভরে চকিতে সরে দাঁড়ায় যুঁইদের পাশ থেকে।

তাদের কানে আসে, 'একেবারে ঘাড়ে এসে পড়েছে। আর কি করে খোকার দিকে চাইছে! যেন গিলে খাবে। নজর দিচ্ছে নাতো ?'

একটু হেসে সরিৎ বল্লে, 'কে ? চল, চল, যত সব বাজে কথা।'

অপ্রতিভ যুঁই পেছিয়ে এলো। মল্লিকা ধমক দিলে। দলনেত্রীও ধমকালে, বল্লে, 'আ মর, ভদ্রলোকের মেয়েদের ঘাড়ে গিয়ে পড়েছিস্ ? ছেলে কি কখনো দেখিস্ নি ? শুনলিনি বল্লে নজর দেবার কথা ?'

যুঁই ভাবে, বাবুটি কি চিন্‌তে পেরেছে, সেই বাবুটিই কি ? না অন্য কেউ ?

পূজা শেষ হয়ে গেল। অপ্রতিভ নির্বোধ যুঁই ভাবতে জানে না, কিন্তু তবু অনেক কথা মনে হয়। সেই বাবুদের কথা...আচ্ছা, তারা পড়াশোনার কথা জিজ্ঞাসা করলে যে ? তা ওতো পড়তে জানে। আচ্ছা ছেলেটি কার, বেশ

ছেলেটি, নয়? ওই মেয়েটি কে? বাবুটির বৌ না আর কে? কি রকম কটমট করে চাইলো মেয়ে দুটো তার দিকে। ওতো ওদের কাছে শুধু দাঁড়িয়েছিল কিছুই করে নি, ছেলের গায়ে হাতও দেয় নি। কিন্তু কি সুন্দর ছেলেটি… ভদ্রলোকদের বাড়ি আর বৌ-ছেলেমেয়ের কথা ভাববার চেষ্টা করে…

দুপুর বেলা ফিরিওয়ালা ডেকে যায়, পেরথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, ধারাপাত, লক্ষীর কথা, শ্রীকৃষ্ণের শতনাম, চণ্ডীর কথা। সহসা যুঁই সচেতন হয়ে ওঠে। মল্লিকাকে নিয়ে আসে দ্বিতীয় ভাগ প্রথম ভাগ কিনতে।

মল্লিকা হাসে, বল্ল, 'দূর আমাদের পড়ে শুনে কি হবে, তুই পাগল।'

'কিন্তু সেই অত বাবুরা যে বলাবলি করছিল পড়ে চাকরি করা যায়।'

'আ বুদ্ধি! সে বুঝি ওই পেরথম ভাগের পড়া!' মল্লিকা হেসে লুটিয়ে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে, আরও অন্য ঘরের মেয়েরাও।

তবু যুঁই বই কেনে, লুকিয়ে লুকিয়ে দুপুরে পড়ে, 'জল পড়ে,' 'পাতা নড়ে', 'অকুতোভয়,' 'পরিবেশন।' লেখবার চেষ্টা করে শ্লেট নিয়ে। তার যেন মন ভাবতে জানে না, সেইখানে অস্পষ্টভাবে তার আশা ফুটে ওঠে, আবার কোন সময়—ঐ বাবুরা এলে সে দেখাবে সে পড়তে জানে, শিখেছে আরো।

তার সঙ্গিনীরা কিন্তু বুঝতে পারে সব, হেসে বলে, 'তোর রাজপুত্তুররা আর আসবে না। বৃষ্টির জন্যে একদিন এসেছিল।'

তাদের কথায় যুঁই চকিত হয়ে ওঠে। তার মনে হয় কিন্তু আবারো একদিন ঐরকমই বৃষ্টি হতে পারে, তারাও আসতে পারে। কিন্তু…তারপরে কি? যুঁই শুধু স্বপ্ন দেখে তাদের পরিচ্ছন্ন সুশ্রী দীপ্ত মুখ আর শান্ত গম্ভীর কথা।…যেন কোন দেবলোকের লোক তারা।

তার পড়া ঐ 'জল পড়ে' 'পাতা নড়ে'তেই থেমে থাকে! যুঁই এখন ভাবে অনেক কথা। অকস্মাৎ এক দুর্দমনীয় কি ইচ্ছা তার মনে জাগে, মনে হয় সে ঝিয়ের চাকরি করবে। তাহলেই বেশ দিন কেটে যাবে। টাকার অভাব থাকবে না।

সঙ্গিনীরা হাসে পরিহাস করে—বাড়িওয়ালী মাসী বকে।

সে তবু বলে, 'হ্যাঁ, কাজ করব।'

সবাই বলে, 'করুক, করুক, বাসন মেজে মরুক! গালাগাল খেয়ে মরুক!'

সঙ্গোপন কোন সাধ মনে নিয়ে সে চাকরি খুঁজতে যায়। যদি হঠাৎ সেই বাবুটিকে দেখতে পায়? যদি তাদেরই বাড়িতে কাজ পায়? কিম্বা সে-বাড়িতে

যদি সে বেড়াতে আসে !......সব ভাবনা সে স্পষ্ট জানে না, তবু মনে ভাবে অনেক আকাশ-পাতাল।

মল্লিকার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে চাকরি খুঁজতে।

রাস্তায় ঝিয়েদের সঙ্গে দেখা হয়, তাদের কাছে খোঁজ নেয় কাজের।

ঝিয়েরা তাদের দিকে চেয়ে দেখে আপাদমস্তক। তারপর বলে, পারবে কি বাছা অত খাটতে? কেউ বা ইঙ্গিতময় ভাবে হাসে। কেউ সরলভাবে বলে, অমুক অমুক বাড়িতে কাজ আছে।

তারা খালি কাজের বাড়িতে যায়।

ঝিয়েদের মত গৃহিণীরাও তাদের দিকে চেয়ে থাকেন। তারপর কেউ বলেন, 'না বাছা, আমার লোক এসেছে।' কেউই বলেন, 'তোমাকে দিয়ে হবে না বাছা।' কেউ বলেন, 'বড় কম বয়স, পারবে না তুমি।' কেউ বা এমন কাজের তালিকা দেন যে সে ভয়ে পেছিয়ে যায়।

কাজ খুঁজে খুঁজে যুঁই ফিরে আসে। আর তারপর দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ে।

সঙ্গিনী রাত্রিচারিণীদের কোলাহলে ঘুম আসে না। আর নিদ্রাহীন চোখের সামনে ভাসে, কাজ খুঁজতে যাওয়া গৃহস্থ বাড়ির গৃহিণীদের, তাদের পুত্রবধূ, মেয়েদের, তাদের বাড়ির তাদের ছোট ছেলেদের ছবি। কেমন বাড়িগুলি। মনে হয় ওরা কেমন সুখে আছে। বেটি কেমন 'মা' বলে এসে দাঁড়াল, মেয়েটির মনে হয় ছেলেপিলে হবে। কিন্তু ওর দিকে তারা কিরকম ভাবে চেয়ে রইল, কেন? গিন্নি কেন বল্লেন, 'না বাছা, তুমি পারবে না।' ও পারত—পারত নিশ্চয়। তার তৃপ্তিহীন লুব্ধ মুগ্ধ মনের চোখের সামনে স্বামী-সন্তান-পরিজন পরিবেষ্টিত মধুর জীবনযাত্রার ছবি ভেসে আসে। সিঁদুর শাঁখা-শাড়ি পরা মেয়ে-বৌ, মোটা বালা-পরা গৃহিণী, সুশ্রী দীর্ঘকায় তরুণ যুবক 'মা' বলে বাড়ি ঢুকল একদিন দেখেছিল এক বাড়িতে, তাদের জীবন তাদের কথা... তারা কেমন......

ঘরের দরজায় ধাক্কা দেয় কে।

সে নিঃসাড়ে শুয়ে থাকে। আবার ধাক্কা পড়ে।

তারপর কে ডাকে, সে সাড়া দেয় না।......

একদিন দুদিন করে দিন কেটে যেতে থাকে।

যুঁইয়ের হাতের টাকা ফুরিয়ে যায়। খরচ কমিয়ে ফেলে, তবু মল্লিকার কাছে

ধার হয়ে গেল ঘর ভাড়ার টাকা। ঝুমকো বাঁধা রেখে আবার ধার করে…অন্য খরচও তো আছে।

আর আবার দুপুরে কাজ খুঁজতে যায়।

এক বাড়িতে ঢোকে। গৃহিণী তাকে নিরীক্ষণ করে দেখলেন, তারপর বল্লেন, 'না বাছা, লোক দরকার নেই।'

তার পাশে আর একজন বর্ষীয়সী দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি বল্লেন, 'এত গহনা পরা কেন বাছা? কাজ করতে এসেছে! লোকজনের গায়ে অত গহনা দেখলে গা কেমন করে!'

যেন কাজ করলে গহনা পরতে নেই! মুখরার মত মল্লিকা কি বলতে গেল, কিন্তু কি বলবে? তোমরা কেন পর? না—আমাদেরও তো পরতে ইচ্ছে হয়? না, পরলে দোষ আছে? কিন্তু কিছুই বলতে পারলো না। শুধু বেরিয়ে গেল তারা।

মল্লিকা বলে, 'আর চাকরি খুঁজতে হবে না। শুনলি তো কেমন কথা। আমি আর তোর সঙ্গে যাব না। মরণ তোর! গেরস্ত বাড়ি তোকে রাখবে না।'

যুঁই চুপ করে থাকে। কিছু বলে না বা বলতে পারে না। কিন্তু এতদিনে সে কি ভাবতে শিখেছে? সেকথা জানে না, আর কেউই জানে না। শুধু কাজ খুঁজতে আর বেরোয় না।

রাত্রে বান্ধবীরা ডাকাডাকি করে, সঙ্গে যাবার জন্য গল্প করার জন্য যুঁই চুপ করে শুয়ে পড়ে। ঘুমের ভান করে।

দিন রাত্রি যেন আস্তে আস্তে মন্থর গতিতে কাটে, হাতে পয়সা নেই অনেক ধার হয়েছে, সঙ্গিনীরা আর ধার দেয় না। রাগ করে, ঠাট্টা করে বিদ্রূপ করে বলে, রাজপুত্তুরদের ধ্যান করছে ও, ওর সব মন্ত্রীপুত্তুর কোটালপুত্তুররা এসেছিল যে একদিন! আসবে না, তারা আসবে না, এলে এতদিন আসত।

ভাবনায় ও বিতৃষ্ণায় অবসন্নভাবে যুঁই শুয়ে থাকে। কেউ আসে না ওর ঘরে!

সহসা অনেক রাত্রে কে ধাক্কা দেয়। ডাকে, 'দরজা খোলো।'

গলাটা চেনা। খাবারওয়ালার দোকানের সরকার চিনে মশাই। অনেক টাকা তার। মাঝে মাঝে আসে। কালো, মোটাসোটা খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁপওয়ালা থেবড়া মুখ, চিনে মশাই ওকে ভালবাসে। ওর ঘরে আসে। তার টাকা আছে, ওর ঘরে আসে বলে বাড়ির সবাই ওকে হিংসে করে।…ওর তখন

খুব অহংকার ছিল কিন্তু এখন আর উঠে দরজা খুলে দিতে ইচ্ছে করে না। আজও করল না।

সে নিঃসাড়ে শুয়ে থাকে। চিনে মশাই হয়ত ফিরে যায়, নয়ত অন্য কারুর ঘরে গিয়ে বসে। আজ তার জন্য উদ্বেগ নেই তার।

রাত্রি গভীরতর হয়, রাত্রিজীবিনী নিশাচারিনীদের ঘরে কোলাহল থেমে আসে। অস্পষ্ট ব্যাকুল ভাবে বিনিদ্র চোখে সে শুয়ে শুয়ে ভাবে নানান্ সব গৃহস্থ বাড়ির কথা যেখানে তারা রাত্রে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোয়, দিনে কাজকর্ম করে…। শান্ত নিস্তব্ধ তাদের রাত্রি আর কোলাহলময় দিন…সে কেমন লাগে!

আবার কে আসে, ধাক্কা দেয় দরজায়, সে সাড়া দেয় না।

হঠাৎ মনে পড়ে যায়, ভাড়া বাকি একমাসের। মল্লিকার কাছে ওমাসের ভাড়াটা ধার রয়েছে, মল্লিকা কাল টাকা চেয়েছিল। ও ভেবেছিল চাকরি করে শোধ দেবে, মল্লিকাও তাই ভেবে দিয়েছিল। চালও বাড়ন্ত। গহনা? চুড়ি? সেই যে সে-বাড়িতে বলেছিল গহনা পরার কথা। সব কেমিকেল সোনার! ওর হাসিও আসে, চোখে জলও আসে।

দরজার বাইরে পায়ের শব্দটা অন্য দিকে চলে গেল।

সে চকিত হয়ে উঠে বসল। তারপর দরজা খুলে দিয়ে বল্লে, 'এসো।' হাতে তার একটিও পয়সা নেই।

না, কেউ নেই। কে এসেছিল, চিনে মশাই? সাধুচরণ?

সে যেন বাঁচে, আশ্বস্ত হয়, কেউ তাহলে আসে নি। পরক্ষণেই মনে পড়ে যায়, চাল বাড়ন্ত, ঘরের ভাড়া, আর ধার। চৌকাটের উপর নিস্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। যদি তারা ফিরে আসে।

আকাশ-ভরা অসংখ্য তারা আর আঙিনার ওপর অন্ধকার পৃথিবী…যুগ যুগান্তর ধরে কোটী কোটী ওর মত মেয়ে হয়ত তারা এমনি দেখেছে…আজকে ওরদিকে মিটমিট করে চেয়ে আছে। তাদেরও হয়ত সেদিন চাল ছিল না ঘরে, পয়সা ছিল না হাতে।

রচনাকাল—১৩৬৫

পঞ্চাশোর্ধ্বে

শাস্ত্রকাররা জানতেন, মানুষের কোন সময় কি লাগে, কি করা উচিত, কি উচিত নয়, তাই এক একটি শ্লোকের মাঝে সমস্ত মানুষের জীবনের কর্মপদ্ধতি ছকে দিয়েছিলেন। কিন্তু মানুষের নিজের বুদ্ধিকেই বড় আর বেশী মনে করার অভ্যাসও তো কম নয়, কাজেই সে বুদ্ধির খাল কেটে সে নিজের ঘরে কুমীর ডেকেই আনে। এও দেখা যায়।

তাই দেখা গেল, চাটুয্যেদের বাড়ীর গিন্নি 'পঞ্চাশোর্ধ্বে' বনে মানে তীর্থে-তীর্থে কিম্বা গ্রামের বাড়িতে যাবার নামটি করলেন না! অথবা হরিনামের মালা নিয়ে আরেকটু আগের কালের মতও ঘরের কোণে বসে রইলেন না! বরং যেমন সধবা অবস্থায় কর্তার রোজগারে কর্তৃত্বের আসনে (টাকার সুদ এখনো কর্তারই) প্রতাপান্বিতার ভূমিকায় সংসার পরিদর্শন করতেন, তাই করতে লাগলেন।

কেন না করবেন? লোকে বলে আহা, সতুর মা—রত্নগর্ভা। তিনটি ছেলে যেমন, মেয়েরাও তেমনি জামাইরাও তেমনি। বড় ছেলে কোন ব্যাঙ্কের বড় কর্তা, মেজ ডাক্তার, সেজ সরকারী বড় কাজ করে। জামাইরাও বড় বড় কাজ নিয়ে আছেন ডাক্তার, উকিল, জমিদার একজন।

কিন্তু রত্নগর্ভা হলেন না হয়, সবই না হয় ভালোও, উত্তর কাল বলে একটা কথা আছে তো। উত্তর-পুরুষ না হয় মাকে সহ্য করল 'উত্তর নারী'রা বড়ই বিপদে পড়ল—গিন্নিকে বা বুড়িকে নিয়ে। শ্বশুর থাকতে তাঁর টাকা, তাঁর কর্তৃত্ব সহ্য করতে হয়েছে না হয়, কিন্তু এখনো শাকের ঘন্ট, মোচার ঘন্ট, কপি বেগুন পটলে খামকা কর্তৃত্ব সহ্য করা ভাল লাগে না। এখন আবার সব রান্না ঘর আলাদা হয়েছে।

সকাল বেলাই বড় বৌমার তরকারীর ঝুড়ি নিয়ে বসে খ্যাচ খ্যাচ করে সতু কবে কি ভালবাসত তাই কুটতে বসবেন। কুটি কুটি করে যা ইচ্ছে কুটে কেটে সব প্রায় জঞ্জাল বানিয়ে দেবেন। যদি তাও সহ্য হয় বৌমার মাছ নিয়ে বা তা রাঁধতে বলে দেওয়া নিজের মতে, এ যেন আর পারা যায় না। কবে ওঁর সতু কি ভালবাসত তাকি আজো বাসে? না, রোজই তাই খাবে? বড় বৌমা তিক্ত-মুখে বিরস হাসি নিয়ে ঘুরে বেড়ান। কিছু বলাও তো যায় না....।

মেজ বৌমার ঘরেও ঢোকেন। সে আবার ডাক্তারের বৌ তার ঘরে কিছুতে হাত দিলেই বলে, সাবান দিয়ে গরম জল দিয়ে তরকারী ফলগুলো ধুয়ে নিতে হবে। তারপর কোটা হবে।

ধোয়া হলে মা বলেন, 'কি কুটবো আরো? এই বেগুনের পরে ভাজা আর শুক্ত কুটলাম। সমর ভালবাসে। মাছে সর্ষে দিয়ে ঝাল করুক?'

মেজ বৌমা চায়ের টেবিল থেকে উঠে এলেন, 'কি কাণ্ড মা? আর অত শুক্ত কে খাবে? আলুগুলো সব ছাড়িয়ে ফেললেন? আমার যে সব 'জ্যাকেট শুদ্ধ্ আলু সেদ্ধর দরকার ছিল বিকেলের চপের জন্ত। কি মুস্কিল এখন! সর্ষে বাটা ওঁর সহ্য হয় না, কেন দিলেন করতে।'

'জ্যাকেট' শুদ্ধ্? জ্যাকেট শুদ্ধ্ আলু কি বাছা?' মা চোখ বড় করে জিজ্ঞাসা করলেন। ওঁদের কালে 'জ্যাকেট' মানে জামা জানতেন!

ঐ খোসাশুদ্ধ আলুকে মেজবৌমা 'জ্যাকেট' শুদ্ধ্ আলু বলেন। স্বামীর ভাষার অনুকরণে। খোসাশুদ্ধ বলেন না। যাকগে, আবার চাকরকে বাজার পাঠালেন অলুর জন্ত।

আর 'সর্ষে বাটা দেওয়া ইলিস মাছ সমর এত ভালবাসত। এইতো সেদিনও খেয়েছে। কবে থেকে আবার সহ্য হচ্ছে না?' মা চোখ কপালে তুলেই জিজ্ঞাসা করলেন।

ডাক্তার গৃহিনী বৌমা বল্লেন, 'ঐ সব খাইয়েই যে হজমটা গেছে। আপনারা তো ওসব বোঝেন না। ছেলেদের শরীর।' মা অবাক, মা ছেলেদের শরীর বোঝেন নি? উনি মা তো বটে।

ছোট বা সেজবৌমার ঘরে তরকারী কাটা হয়ে গেছে। রান্নাও চড়ে গেছে। সে আবার খুব চতুর, দিদিদের বা জায়েদের ঘরে নিত্য ও নৈমিত্তিক গোলমাল দেখে রাত্রেই তরকারী কুটে সব ব্যবস্থা করে রাখে! শাশুড়িকে মিষ্টি হেসে বলে, 'এই হয়ে গেছে মা সব। আপিসের তাড়া কিনা।' মা বিরক্ত মুখে রান্নাঘরের মাঝে ঘুরে আসেন। মাছ দেখেন। এত মাছ আনিয়েছ তা সবই একরকম কেন করাচ্ছ? রোজই ঝোল কেন দাও? অন্য কিছুও তো করতে পার বাছা। কোন ছিরি-ছাঁদ নেই কাজের তোমাদের।

ছেলে এসে পড়লেন খেতে, 'দাও দাও, খাবার দিতে বল।'

অবগুণ্ঠন আর আজকাল নেই, বৌও এসে দাঁড়ালেন। মা এসে দাঁড়ালেন

খাবার জায়গায়। ইচ্ছা, বলেন বৌদের ব্যবহায় কত ত্রুটি, খরচ হয়, ব্যবস্থা হয় না ইত্যাদি…!

বল্লেন, ‘অমন মাছ রোজই একঘেয়ে রাঁধছে! আর তরকারীটা কি রাঁধাই রেঁধেছে! একটু দেখিয়ে দিতে পারে নি বৌমা? কাঁচকলার ঝোল কড়ায় রেঁধেছে কালির মত কালো রং! এ খেতে পারে ওরা? না কখনো এমন খেয়েছে!’

ছেলে খুব ব্যস্ত। বল্লেন, ‘বেশ হয়েছে মা। এত রকমের দরকার কি? ভালই তো ব্যবস্থা করছে। আমার এই রকমই ভালো লাগে। ঝোল তো ভালই হয়েছে!’

মা ‘থ’ হয়ে গেলেন। কোনদিন ছোট বেলায় বা বড় বেলায়ও নরেন রোজ এক রকমের মাছ আর কালো ঝুল ঝোল দিয়ে ভাত খেত না। রাঁধুনির সঙ্গে নিত্য গোলমাল লেগেই থাকত। আর আজ বল্লে, ‘আমার এই রকমই ভালো লাগে!’

তিন ঘরেই সমান। মা আর ‘হালে পানি’ পান না। যেন সব গৃহিনীপনা কাজ কর্ম আরেক রকম ধরণের হয়ে গেছে। এই এক বছর মাত্তর কর্ত্তা মারা গেছেন তারি মাঝে। যখন উনি শোকার্ত ছিলেন ভাবতেন ওদের কত অসুবিধা হচ্ছে—বৌমারা কি তেমন জানেন ওদের রুচি মত রান্না খাওয়া!

কিন্তু চূড়ান্ত আক্কেল হল যেদিন এক বৌমা বল্লেন, ‘ওঁর জন্য কি রাঁধতে দিয়েছেন মা?’

মা একটু অবাক ও বিরক্ত হয়ে বল্লেন, ‘যা ভালবাসে তাই তো কুটে দিয়েছি বাছা!’

বধূমাতা বল্লেন, ‘বলছিলেন বড় একঘেয়ে রান্নার ব্যবস্থা হচ্ছে আজকাল…। তুমি একটু দেখে শুনে বলে দাও না কেন?’

যতই সন্তানের উপর জোর থাক, তাকে জানা থাক, সেই যখন এই কথা বলে, মা হতবুদ্ধি হয়ে যেতে বাধ্য। কিন্তু লজ্জিত হতেও বাধ্য।

এখন মা সকালে তরকারীর ঝুড়ি নিয়ে বসেন, কোটেন না। জিজ্ঞাসা করে কোটেন। যদিও জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয় না। যেন মনে হয়, ‘অনুমতি’ নিয়ে কুটনো কুটতে হবে! দেখ একবার! আমি জানিনে আমার ছেলেরা কি খায়, কি ভালবাসে। কখনো মনে দুঃখ হয়, কখনো রেগে যান তবু কাজ করতে যাওয়া, আদেশ উপদেশ দেওয়ার পুরানো অভ্যাস যায় না।

২

কাছাকাছি বাগবাজারে এক ননদ থাকেন। তিনিও বিধবা। মাঝে মাঝে আসেন সুখ দুঃখের নানা কথা হয়। তাঁর সংসারও পুত্র পৌত্রাদি বেষ্টিত। বৌমারা এই ধরণেরই আধুনিক ; তবে তিনি বহু দিন পূর্বে নাবালক সন্তান নিয়ে বিধবা হয়েছিলেন। এই প্রতাপান্বিতা ভ্রাতৃজায়ার কাছে (মায়ের আমলে) কিছুদিন ছিলেনও। সংসার যাত্রার রকম বেরকম তাঁর কিছু বেশী দেখা আছে এবং যাকে বলে 'মনরাখা' মন বুগিয়ে চলা তাও তাঁর কিছুটা অভ্যাস ছিল। সুতরাং বধূমাতাদের পরোক্ষভাবে কর্তৃত্ব তাঁর খুব অসহ্য হ'ত না।

ঠাকুরঝি এলেন একদিন দুপুর বেলা।

গল্প গুজব নানা কথায় সময় কাটে। ননদের চোখে পড়ে ভাজের বিমনা ধরণের ভাব, যেন সেই চারি-চেঁপাটে স্বয়ংসিদ্ধা ভাবটি আর নেই।

বধূমাতারা ঘরে ঘরে ফ্যানের তলায় বিশ্রামরত'। নাতি নাতনীরা স্কুল কলেজে, পুত্রগণ কর্মক্ষেত্রে, ডাক্তারজন বাদে।

মা নিজের ঘরে মাদুরে শুয়ে একখানি বই খুলে বসেছেন। খুব সেকেলে মতো ন'ন ঠিক ভাগবত রামায়ণ মহাভারতের মত ধর্মগ্রন্থ নয়।

কিন্তু বইটিতে মন নেই। চোখটা দুপুরের আকাশের চিলের দিকে চেয়ে আছে। বইখানা আঙুল দিয়ে চিহ্ন করা রয়েছে শুধু। অনেকগুলো চিল একসঙ্গে সাদা মেঘের পাশেই যেন উড়ে বেড়াচ্ছে। ননদ এসে বসলেন। ভাজ উঠে বসলেন, বল্লেন, 'এসো এসো।—মাদুরে উঠে বোসো, অনেক দিন আসনি এবারে। ভাল তো সব ?'

ভাজের চোখের কোণে শুয়ে থেকে দু ফোঁটা জল এসেছিল কি ? তিনি চোখটা মুছে মাদুরে জায়গা করে দিলেন এবং এই কথাগুলি বললেন।

ঠাকুরঝির সুচতুর দৃষ্টি ভাজের বই নিয়ে শুয়ে আকাশের চিল দর্শন এড়ায়নি ! মুখের ভাবটা যেন বেশ বিমনা। 'বল্লেন, হ্যাঁ ভাই, সব ভালো তোমাদের কল্যাণে। তোমার মুখটা যেন দেখছি বড় শুকনো শুকনো। শরীর ভাল নেই ?'

মন ভাল নেই চট্‌ করে জিজ্ঞাসা করা যায় না। কি জানি কি ভাববেন বৌদি। যদিও বেশ বোঝা যাচ্ছে বিমনা ভাবটা শরীরের নয়, মনেরই ব্যাপার।

ভাজও সুচতুরা। বল্লেন, 'শরীর তাল্লাই আছে। তবে আমাদের জীবনে

ভালমন্দ নতুন আর কি বল। এই আছি মাত্র। বুড়ো বয়সে তোমার ভাই একেবারে সব শূন্য করে দিয়ে গেছেন।'

ননদ বল্লেন, 'সত্যিই তো। তা বেঁচে থাক ছেলেপিলে, ওরা তো 'মা' বলতে প্রাণ বের করে দিত। তোমার আবার ভাবনা কি? বৌমারা হাতে হাতে মুখে মুখে কাজ করতে এগিয়ে থাকতেন। নাতি নাতনীতে জাজ্বল্যমান তোমার সংসার! আর একদিন তো একজন যাবেই, তাই আমার কথা ভেবে দেখ না সেই কবে বিধবা হয়েছি আজো মরণ নেই যেন চিরকালই বিধবা হয়েই কাটল।'

ননদ চোখ মুছলেন।

ভাজেরও চোখ সজল হয়ে এলো। ননদের যে দুঃখের কথা আগে কখনো অনুভব করেননি, সহসা তার সর্বশূন্যতার একটা রিক্ত রূপ আজ যেন দেখতে পেলেন। তারও সন্তানাদি আছে মানুষও হয়েছে, সাংসারিক কোনো দুঃখই আর নেই। তবে? এ কি দুঃখ? কেন এই রিক্ততা? শুধু কি স্বামীর অভাবে, না কি অন্য?

অবচেতন মনের ভিতরের কোন কারণেই হোক বা অকারণেই হোক দুজনেই খানিকটা চোখের জল ফেললেন। দু'চারটি কথা বললেন স্বর্গীয়দের সম্বন্ধে। ভগবানের কঠিন হৃদয়তা সম্বন্ধে। মোট কথা তাঁদের বক্তব্য একটিই ছিল যে নিজেরা আগে না মরে, কেন কর্তাদের এইভাবে মৃত্যু হয়? মেয়েরা কেন এতদিন বাঁচে। (মেয়েরা যে তাদের কর্তাদের চেয়ে স্বভাবতঃই বয়সে ছোট এবং ক্ষয়হীন নিরুদ্বেগ জীবন যাপন করে তা জানা সত্ত্বেও এই দুঃখ আর তাঁদের যায় না।।)

বিকাল হয়ে গেলো। ছেলেরা কর্মক্ষেত্র থেকে ফিরলেন, পৌত্র পৌত্রীরা স্কুল কলেজ থেকে।

ভাজ একটু নড়েচড়ে বসলেন। যেন উঠি উঠি ভাব।

ননদ বল্লেন, 'উঠবে নাকি? ওদের খাবার দেবে তুমি? চল যাই দেখিগে খাবার করা আছে তো?'

ভাজ বল্লেন, 'হ্যাঁ খাবার সব করাই থাকে। এখন তো বৌমারা নিজেদের ঘরে ঘরেই খাবার করেন কিনা। আমি আর খাবার দাবার দিই না।'

ননদ মুখব্যাদন করে বল্লেন, 'ওঃ, ওরা ভেন্ন হয়েছে। অনেক দিন আসিনি কিনা! তা এখন আর ঠাকুর নেই? তা তোমার রান্না কে করে? তুমিই কর?'

'ঠাকুর আছে বড় বৌমার—। মেজর ঘরে চাকর রান্না করে। সেজ আপনি করে নেয়। আর আমার কে আর করবে, নিজেই ওই ভাঁড়ারের এক কোণে দুটো সেদ্ধ করে নিই।'

'ওমা! তা ওরা তিনজনের একজনও পারে না? তা বড় বৌমার তো ঠাকুর রয়েছে, তবু পারে না?'

বড় বৌমা এসে দাঁড়ালেন। কথাটা কানে প্রবেশ করেছিল। মা অপ্রতিভ ননদও চুপ করলেন।

বড় বৌমা ভক্তিভরে পিস-শাশুড়ীর পায়ের ধুলো নিলেন, বল্লেন, 'কখন এসেছেন? ঘুমিয়ে পড়েছিলাম টের পাই নি।' তারপর পিসিমার কথার খেই ধরে বল্লেন, 'মার রান্নার কথা বলছেন বুঝি? ক'মাস তো করে দিলাম বাবা যাওয়ার পর, তারপর এমন মাথার অসুখ হ'ল! সে তো মা জানেন। আর আগুন-তাত সইতে পারলাম না। তা মেজবৌ সেজবৌও তো করতে পারে! ওদের আর কি কাজ! আমার তো শরীরে সহ্য হয় না তাই। নইলে…।'

মেজ বৌমা, সেজ বৌমাও রঙ্গমঞ্চে এসে পড়েছিলেন। বড় বৌমার মন্তব্য তাঁদের কানে প্রবেশ করেছিল।

মেজ বৌমা বল্লেন, 'আমরাও তো ক'মাস রেঁধে দিয়েছিলাম। তারপর আমি ভাইয়ের বিয়েতে বাপের বাড়ি গেলাম এসে দেখি মা-ই রান্না করছেন। দিদি রান্নাঘরে উঁকিও মারেন না। সেজবৌ'র না হয় কচি ছেলে।' মেজবৌ বড়জা'র দিকে অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। দু'কথা শুনে থাকার পাত্রী তিনি ন'ন।

পরিস্থিতিটা এখন ঘোরালো হয়ে উঠ্‌ল। জননী বল্লেন, 'ছেলেদের খাবার দিচ্ছি? কোথায় সব?'

পিসিমা বল্লেন, 'হ্যাঁ অনেক দিন ওদের দেখিনি—চল না যাই খাবার ঘরে।' উঠে দাঁড়ালেন।

'এখন তো ঘরে ঘরে নিজেদের টেবিলে খায়। আগের খাবার ঘরে কেউ খায় না।'

বৌমারা গম্ভীর মুখে প্রস্থান করলেন।

কথার হেরফেরে পড়ে গিয়ে ননদ ভাজ খানিকটা হতবুদ্ধি হয়ে রইলেন।

দুজনেই বুঝতে পারলেন কথাটার জের অনেকদূর গড়াবে।

৩

পরদিন সকালে তিন বৌ স্নান করে খাশুড়ীর রান্নাঘরে এলেন। মেজবৌমা শিলনোড়া পেতে বসলেন। বড়বৌ ডাল চড়ালেন। সেজবৌ তরকারীর ঝুড়ি নিয়ে বসলেন।

খাশুড়ী তেতলার পূজার ঘর থেকে আহ্নিক সেরে এসে দেখে অবাক ও অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন।

অপরাধিনীর মত বল্লেন, 'তোমরা সকলে মিলে এখানে কেন? আমি তো অত তরকারী ডাল রাঁধি না। বাটনাও লাগে না আমার বেশী। কেন এসব করছ? ছেলেদের আপিস ইস্কুলের সময় একি উল্টো কাজ করতে এলে।'

বড় বৌমা তিক্তমুখে ফোঁস করে উঠলেন, 'ওঁদের তো আসবার দরকার ছিল না, ওঁরা এলেন কেন। কথা তো আমাকেই শুনতে হয়, আমিই কাজ করব। কাল পিসিমার কাছে সাত কথা শুনেছি—আবার কোন্‌দিন মাসীমা, জ্যেঠিমারা এসে দশ কথা বলে যাবেন? কি জানি বাপু, আমরা ভাবি একটা মানুষের এই এক মুঠো হবিষ্যি তার জন্ত এত কথাবার্তা কিসের! আমাদের বাড়িতেও তো ঠাকুমারা নিজেরাই করতেন দেখেছি।'

ছেলেরা খাবার ঘরে এসে টেবিলে বৌয়েদের না দেখে জননীর ঘরে এলেন।

বড় ছেলে বল্লেন, 'কি হচ্ছে তোমাদের এখানে? আমার যে আপিসের কাপড় বের করে দিতে হবে, এখনো ভাত দেয়নি ঠাকুর! সন্তুর কলেজের সময় হয়ে গেছে।'

মেজ ছেলে একটু উঁকি মেরে দেখে গেলেন, বল্লেন, 'আজ মার কপাল ফিরেছে, বড় বৌ রান্না করছেন!'

বড় বৌমা দুম করে হাঁড়ি-কড়া নামিয়ে দিয়ে বল্লেন, 'সব সময় ইয়ারকি ভাল লাগে না মেজ-ঠাকুরপো, আমরা কি কাজ করি না?'

তারপর রান্না ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আর ফিরে আসবেন কিনা কারুর জিজ্ঞাসা করার ভরসা হল না।

অপরাধিনী জননী তিন তাল হলুদ-লঙ্কা-ধনে বাটা এবং অর্ধসিদ্ধ ডাল, আধোয়া চাল, কাঁচা তরকারীর স্তূপের মাঝে নীরবে বসে রইলেন কিছুক্ষণ।

তারপর অন্ত বধূদের বল্লেন, 'তোমরা নিজের কাজ করগে, আমি করে নিচ্ছি আমার রান্না।'

বিকেলবেলা ননদ এলেন। ভাজ আজ চিন দেখছিলেন না, চুপ করে বসেছিলেন।

ননদ বল্লেন, 'বৌ কথা শুনতে যাবে?'

ভাজ বল্লেন, 'কোথায়—'

'এই অন্নপূর্ণার মন্দিরে। আমার বাড়ির কাছে। বড় বৌমার কি হয়েছে? মাথায় পটি বেঁধে শুয়ে আছে, খায়নি, বল্লে সেজ বৌমা। বল্লে, মাথা ধরেছে জর হয়েছে একটু!'

'খায় নি? তা তো জানি না, আজ তো আর এদিকে আসেনি। আমার রান্নাঘরে একবার এসেছিল। চল দেখে আসি।'

অপ্রতিভ জননী ও পিসিমা বড়বৌমার ঘরে গেলেন। মেয়ে স্কুল থেকে এসে মাথায় জলপটি দিচ্ছে। দুই জা' কাছে বসে আছে। মৃদুস্বরে কথা কইছে।

পিতামহী কন্যাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হয়েছে মিতু?'

সুমিতা বল্লে, 'মার তো আগুন-তাত সহ্য হয় না। আজকে রান্না করতে মাথায় আঁচ লেগে খুব মাথা ধরে উঠেছে। কিছুই খেতে পারেন নি। হাতে-ভাতে করেছিলেন মাত্র। আজ ভাল মাছ আনিয়েছিলেন তাও খাওয়া হয়নি। তা' ঠাকুর গুছিয়ে রেখে দিয়েছে। বল্লে, মা বিকেলবেলা উঠবেন তখন তাড়াতাড়ি রেঁধে খাইয়ে দেবে।'

ঘর নিঃশব্দ—। নিরপরাধ অপরাধিনী মা, ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেও পারছেন না, বসে থাকাও শক্ত। খামকা রান্নার কথায় একি বিপরীত কাণ্ড।

বড় ছেলে আপিস থেকে এলেন।

স্ত্রী শয্যায় চোখ বুজে পড়ে। জননী পিতৃষসা দাঁড়িয়ে। কন্যা অডিকলোনের শিশি আর জলনেকড়া ভিজিয়ে মাথার কাছে বসে।

চক্ষের পলকে ব্যাপারটা বোধগম্য হ'ল। নীরবে কাপড় বদলে চায়ের খাবারের ঘরে ঢুকলেন। কারুর সঙ্গে কথা না বলেই।

শুধু কন্যাকে বললেন, 'বাহাদুরী করে আগুনের তাতে যায় কেন? রাঁধতে তো অন্য সকলেও পারে!'

মা ও পিসিমার কানে কথাটা গেল পরোক্ষ হলেও।

কথা শুনতে যাবার অনুমতি বা গাড়ি চাইবার ভরসা আর হ'ল না! ননদ এই দু'দিনেই বাড়ির আবহাওয়া বুঝে নিয়েছিলেন, সরে পড়লেন।

বল্লেন, 'আজ যাই ভাই। আর একদিন নিয়ে যাব।'

৪

কিন্তু দিন দিন ভয় বাড়ে বই কমে না। প্রতাপান্বিতা গৃহিণী এখন আশ্রিতা—জননীও যেন অবাঞ্ছিত আত্মীয়ার পর্যায়ে পড়েছেন।

অস্তিত্বটাই যেন অপরাধ বিশেষ। অকারণ সমীহ সম্ভ্রম করার লোক বাড়িতে থাকা যেন সকলেরই যন্ত্রণাবিশেষ। উভয়তঃই।

জননী কোথায় লুকোবেন ভেবে পান না।

সেকাল নয় যে, একটা মৌখিক শিষ্টাচার পরিজনরা রাখবে। নাতি নাতনীরা গল্প শুনবে, ছেলের কথা কইবে, বৌমারা একটু কাছে বসবেন। একেবারে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যময় ধন-গর্বিত মানুষের অভদ্র একাল। যেখানে ধন সেখানেই মানসম্ভ্রম, নইলে কিছুই নেই।

অত যে বোঝেন জননী, তা নয়, তবে এটা বোঝেন যে, যেন একটা অনাবশ্যক অতিরিক্ত বাড়তি মানুষ।

আবার একদিন সহসা ননদের অবির্ভাব হ'ল তীর্থে যাবেন।

এবার একেবারে সরাসরি প্রস্তাব ছেলেদের কাছে।

'আমাদের পাড়া থেকে কুণ্ডু কোম্পানীর রেলে সব তীর্থ করতে যাচ্ছে, আমি যাবার ঠিক করেছি—বৌকে নিয়ে যাই—কি বলিস তোরা?'

সকলের ঘর আলাদা—চা ও খাবার জায়গা পৃথক।

সকলকেই পৃথকভাবেই আবেদন করতে হ'ল।

জ্যেষ্ঠ বল্লেন, 'তা যান। কতটাকা লাগবে—আমার হাতে এখন বেশী কিছু নেই।'

মধ্যম বল্লেন, 'কতদিন হবে তোমাদের? আর মাসে মাসে টাকা দিতে পারব—থোকে একেবারে দিতে পারব না।'

কনিষ্ঠ বা তৃতীয় বল্লেন, 'তা' ঘুরে আসুন কিছুদিন। এখানে যা খরচ হয় তার ওপর রেল ভাড়াটা—সে ব্যবস্থা হয়ে যাবে এখন।'

কেউ বল্লে না, 'মার কষ্ট হবে কিম্বা তাদের কোন অসুবিধা হবে অথবা খোঁজ খবর দিয়ো।'

অবশ্য মা সেকথা ভাবেনও নি। তবুও পিসিমার মনে হ'ল।

বহুসংখ্যক বুড়ো বুড়ি—কিছুটা প্রৌঢ় প্রৌঢ়া, ধনী-দরিদ্র-মধ্যবিত্ত নানাশ্রেণীর তীর্থাভিযানের মাঝে এই ননদ-ভাজ ও তাঁদের বন্ধু-বান্ধবী সমভিব্যাহারে যোগ দিলেন। হিন্দুস্থানী, মাড়োয়ারী, বণিক শেঠও প্রথম শ্রেণীর যাত্রী জুটল।

কাশী, গয়া, অযোধ্যা, প্রয়াগ—মথুরা, বৃন্দাবন, জয়পুর—আগ্রা, দিল্লী, হরিদ্বার সেরে দ্বারকা শেষ করে ফেরা।

মাড়োয়ারী মেয়েরা—আকণ্ঠ অবগুণ্ঠনের মাঝে গান ধরে—যেখানে যেমন। গাড়িতে উঠে গায়,

'শুনো রেলকা বয়ান।
শুনো রেলকা বয়ান
কলকত্তামে আয়ো গাড়ি ঝন নন নন্।
গাড়ি কলকত্তামে আয়ি
দেখো নীচে গঙ্গা মাঈ।'

রেলের প্রথম স্তুতি-সঙ্গীত। প্রপিতামহীর আমলের।

তারপর সকল তীর্থের জয়ধ্বনি করতে করতে বলে কাশী জী কী জয়, গয়াজী কী জয়, প্রয়াগ মহারাজের ভজনও গায়, সীতারামের ভজনই বেশী। অযোধ্যায় গাইল রাম নাম। কাশীতে গাইল, 'মহাদেব সতত ভজত দিব্য রাম নাম, কাশী মরত, মুক্ত করত, শুনায়ে রাম নাম।'

বৃন্দাবনে, মথুরায় আবক্ষ ঘোমটা টেনে হাততালি দিয়ে তারস্বরে গায় মন্দির দুয়ারে দাঁড়িয়ে,—'উঠ্ নন্দরাণী খোল কেওয়াড়িয়া। লাল আয়োগায় চরায় কে!' (ওঠো নন্দ-রাণী দুয়ার খোলো, তোমার দুলাল গরু চরিয়ে এলো)।

কখনো গায়, 'হরিসে লাগি রহোরে ভাই,
তেরা বনত্ বনত্ বনি যাই।
অঙ্কা তারে, বঙ্কা তারে,
তারে সুজন কসাই।
শুগা পঢ়ায়মে গণিকা তারে
তারে মীরাবাঈ।'

আবার গাড়িতে উঠে গায়,—'উঠ চলো মুসাফির ভোর ভয়ো
অব রইন কাঁহা যো সোওত হায়।'

পথে নেমে তৃতীয়, দ্বিতীয়, মধ্যম শ্রেণী সকলেই এক গান গায়, একভাবে পথ চলে।

সমরের মা পিসিমারাও তাদের দলে একপাশে বসে থাকেন। স্টেশনে স্টেশনে নামেন, রান্নাবান্না করেন, দর্শন করে ফেরেন, পথে চলেন।

শুধু তাদের মত ঐ আনন্দময় তীর্থ-সঙ্গীত বা ভজনের গান এঁদের দলের কেউ গায়ও না জানেও না।

কদাচ কখনো যদিবা কোন বৈরাগী গায়, তাহলে গায়—

'আমার আশার আসা ভবে আসা
আশা মাত্র সার হোলো।
চিত্রিত পদ্মেতে যেন ভ্রমর ভুলে র'ল।
চিনি বলে নিম খাওয়ালি মা ক'রে কত ছল,
আমার মিঠার লোভে সারাটি দিন (মাগো)
তেতো মুখে গেল।'

আর বাঙালী যাত্রিনী-যাত্রীদের চোখ জলে ভেসে যায়।

কোথায় কবে কে যেন চিনি বলে নিম খেয়েছে! চিত্রিত পদ্মকে সত্যি মনে করেছে। সে কে? কারা? সকলেই? কিন্তু ওরাতো ওই অন্য প্রদেশীয়ারা তো নয়। পিসিমা ও সময়ের জননী ভাবেন যেন কত গান, আধুনিক, রবীন্দ্রসঙ্গীত কত শুনেছেন তবু আজকের মত এমন কোরে গান কি মনে দাগ কেটেছিল?

গান শেষ হয়—

'প্রসাদ বলে, ভবের খেলায় মাগো, যা হবার তা হোলো:
এবার সন্ধ্যে হোলো কোলের ছেলে ঘরে নিয়ে তোলো।'

কোথায় সে ঘর? সহসা সকলের মনে হয়ে যায় যেন আরেক জনমের কথা।......

যাইহোক কুণ্ডু মশাইয়ের তীর্থযাত্রার শেষ আছে, মাস তিনের মধ্যেই সে যাত্রা শেষ হ'ল।

তারপর? এবার আর তো তীর্থপথ নেই।

ননদ-ভাজ দু'জনেই চুপ করে বসে ভাবেন। এবার কোথায় যাবেন? বাড়ি? বাড়ির কথায় আনন্দ হয়, কিন্তু মমত্ববোধের সুখ হয় না। যেন ভয়ে সঙ্কোচে ভরা কি ভাবনা জাগে।

যেদিন স্বামীর মৃত্যুর পর আবার সংসারের দিকে ফিরে তাকিয়েছিলেন, সেদিন যেমন সব কিছু ঠিক থাকা সত্ত্বেও একটা আমূল পরিবর্তন কোনখানে হয়েছে, বুঝতে না পারলেও অনুভব করেছিলেন, বাড়ি ফিরে এসে আজ তাঁর মনে হ'ল, সহসা তিনি যেন আর কাদের বাড়ি এসেছেন। যারা তাঁর আত্মীয় নন, কুটুম—যাদের তিনি স্বজন নন, অতিথি।

৫

রান্না করা এবং খাওয়ার শেষ আছে। আহ্নিক পূজা জপেরও শেষ আছে।

কথা কার সঙ্গে কইবেন ? ছেলেরা কাজে ব্যস্ত—বৌমারা বিলাস-ব্যসনে ব্যস্ত, নাতি-নাতনীরাও পড়াশুনায় ব্যস্ত।

শীত শেষ হয়ে গেল।

ননদ মাঝে মাঝে আসেন, একদিন বল্লেন, 'চল ভাই, দোলগোবিন্দ দেখে আসে পুরীতে। আর জন্মে আর বিধবা হতে হবে না।'

ভাজ হাসলেন, 'আবার জন্ম ? আবার বিধবা ? তাও এদেশে ! কে জানে হয়ত অন্য দেশে জন্মাব।'

ননদও হাসেন, 'কি বলা যায় ? যাবে তো ঠিক করি। গিয়ে কিছু দিন থাকা যাবে। ছেলেরা যাচ্ছে, তারা মাসখানেক থেকে ফিরবে। আমরা ছোটখাটো বাড়ি দেখে নিয়ে রথ অবধি থেকে আসব।'

প্রস্তাবটি লোভনীয় মার কাছে। পুত্র ও বধূদের কাছেও অপছন্দ নয়………।

সঙ্গে পৌত্র পৌত্রী বধূরা দু' একজন জুটে গেলেন। যাঁরা বাকি রইলেন, পরে যাবেন। পুত্ররাও যাবেন।

অকস্মাৎ দুই জননী আবার পুরাতন কর্ত্রীত্বের ও সংসারের মোহের খেই খুঁজে পেলেন এই তীর্থ-যাত্রায়।

যেন মথুরাধামের দ্বারকা[illegible]শের দর্শনের লীলায় একবার দেবতা-দর্শন একবার পর্দা ফেলার মত, আবার তাঁরা সবশুদ্ধ পুরীতে এক অস্থায়ী সংসার পেতে বসলেন।

ভারি আনন্দে কাজ করেন, দর্শন করেন, সমুদ্রস্নান করেন, মন্দিরে মন্দিরে কথা শোনেন। লক্ষ্মীমন্দিরের, ষড়ভুজের মন্দিরে—মন্দিরের প্রাঙ্গণে এদিক ওদিকে কথকতা যেন লেগেই আছে। উড়িয়া ভাষায় মিষ্ট স্বরে গান গেয়ে যায় অন্ধ যুবক 'জগন্নাথ তুম্হে বড় দারুণ (নিদারুণ অতি)।'

কি তাঁর নিদারুণতা তা আর সে খুলে বলে না, শুধু গায় অতি অকরুণ তিনি।

দিন কেটে যায়। নাতিরা বৌমারা ফিরে যান, আবার আসেন। ননদ ভাজ থাকেন। মন্দিরের ফুলের মালা গেঁথে দেন। কেয়া-পাতার মালা রচনা করতে শেখেন। রচনা করে দেন দেবতাকে। কথা-পাঠ, কীর্তন শোনেন, আর রাত্রে শুয়ে ভাবেন সংসারের কথা। কোন্ ছেলে কে-কোন কথা কবে বলেছে, কে কি খেতে ভালবাসে……।

বছর কাটে।

বধূরা পুত্রেরা বেড়িয়ে যায়। ছেলেরা কেউ হেসে বলে, 'মা আর যাবে না, দেখছি জগন্নাথেই আটকে গেলে?'

বলে না, 'মা চলো। আমাদের ভাল লাগছে না।' জননী যে-কথাটি শুনতে উৎকর্ণ হয়ে থাকেন।

বধূরা বলেন, 'মা বেশ মায়া কাটালেন। আর কি কলকাতা ভাল লাগবে? তারাও বলে না, 'মা চলুন'। যদি মা সত্যই তাদের সঙ্গে যান!

ফিরে গিয়ে চিঠি একজন লেখে, 'মা কি রকম নিশ্চিন্ত হয়ে আছেন, কতদিন হল বাড়ি ছেড়ে আছেন।'

অন্যজন লেখে খুব মুন্সীয়ানা করে; 'বড় চমৎকার জায়গা, গেলে আর আমাদেরই আসতে ইচ্ছা করে না। তা আপনারা আর কি করে আসবেন ইত্যাদি।'

তৃতীয়া লেখে, 'এবার গিয়ে আপনাকে আমরা নিয়ে আসব আপনার নাতিরা বলেছে……।'

ননদের তারি মাঝে ডাক পড়ে, ছোট ছেলের বৌর আঁতুড় তুলতে। মেয়ের ছেলে হবে আসা দরকার তাদের গৃহস্থ ঘর, লোকের দরকার।

ভাজের ছেলেদের টাকা আছে, লোকজন আছে—তাদের ঘরে আত্মীয় মানুষের প্রয়োজন নেই। থাকলে অসুবিধা, সঙ্কোচ।

জননী সকলের চিঠি পড়েন, মনে হয় ওরা সত্যই যেতে লিখেছে। একবার বলেন, 'যাব।' কি কি নেবেন মনে মনে ভাবেন।

হ্যাঁ, পুরীর জিনিষপত্র সরু চিঁড়ে, বড় মানকচু, সরভাজা, খেলনা পুতুল সব নিতে হবে। শাড়ি বৌমাদের নাতনীদের জন্য, কন্যাদের জন্য।

অনেকগুলি টাকাও সেজন্য দরকার……। বাড়িখানা রেখে যাবেন, না ছেড়ে যাবেন তাও ভাবেন। ভাবেন ননদ ফিরে এলে পরামর্শ করে যাবেন। বধূমাতাদের চিঠি লেখেন, 'এবার যাব অনেক দিন রয়েছি…।'

শ্রীমন্দিরে কথা শুনতে যান, মহাভারতের স্ত্রীপর্ব শেষ হ'ল। ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী তখনো যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে বাস করছেন……। তারপর ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী বিদুর সবাই বনে চলে গেলেন। কুন্তীও তাঁদের সঙ্গে গেলেন……। পুত্রদের রাজ্যপাটে রাজভোগে থাকতে চাইলেন না।

কয়েকদিন বাদে—বধূমাতাদের কাছ থেকে চিঠির জবাব এলো। 'মা আপনি

আসবেন শুনে বড়ই আনন্দ হয়েছিল, কিন্তু আমরা সকলে কয়েকদিনের মধ্যেই একটু দেশ বেড়াতে যাচ্ছি—আগ্রা দিল্লি হরিদ্বার আর বম্বে মাদ্রাজ সব ঘোরা হবে। ফিরতে দেরী হবে। আপনি একলা এসে কষ্ট পাবেন……তাই আপনার ছেলেরা বল্লেন, মা যেন পুরীর বাড়ি ছেড়ে না দেন হঠাৎ।'

ছেলেরা বধূদের ওকালতনামা দিয়েছে সব বিষয়ের। তারা নিজেরা আর চিঠি দেয় না। সন্ধ্যাবেলা মহাভারত খুলে বসলেন। অনুশাসনপর্ব চল্‌ছিল, সহসা চোখে পড়ল, 'অপত্যের অপত্য হইলে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা আর সংসারে বাস করিবেন না…।'

রচনাকাল—১৩৬০

দময়ন্তীর ঠিকানা

ভৃত্য এসে বললে, একজন ভদ্রলোক এসেছেন।

সুরমা কুটনো কুটছিলেন। বললেন, 'বাহির ঘরে বসাও যাচ্ছি।' বঁটি কাত করলেন। রান্নার লোককে ডাকলেন। রান্না বুঝে নিতে।

বাইরের ঘর তো দু' পা। ছোট বাড়ি মাত্র। প্রাসাদ তো নয়।

পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকতেই লোকটি উঠে দাঁড়ালেন। আর সুরমা থমকে দাঁড়ালেন।

তুমি!

লোকটি হাসল ওর চমকে ওঠা দেখে। 'হ্যাঁ আমি। অবাক হয়ে গেছ।'

সুরমা সামলে নিয়েছেন, বললেন, 'বোসো একটু চা করতে বলে আসি। এখুনি আসছি।'

দু' মিনিটের মধ্যে ফিরে এলেন। সহজভাবে এবারে হেসে বললেন, 'কবে এলে যতীন? কোথায় ছিলে? দিল্লীতেই ছিলে সেই অবধি?'

'না। অন্য জায়গায় বদলী করেছে হঠাৎ। মাদরাজ।'

'তা মেয়ের বিয়ে দিয়েছ শুনলাম। আমাকে বলনি তো বিয়েতে।'

মুখে তিক্ত ব্যঙ্গময় হাসির আভাস।

সুরমা সহজ ভাবে কথা বলবার চেষ্টা করলেও কিন্তু মুখটা যেন একটু ভীত

বিব্রত হয়ে গেল। বললেন, 'তোমার ঠিকানা তো জানতাম না। কোথায় আছ আর হঠাৎই বিয়ের ঠিক হয়ে গেল দময়ন্তীর—খুব শীঘ্র সব যোগাড় করে নিতে হ'ল। অনেককেই ঠিক সময়ে জানাতে পারি নি।'

'তা বেশ করেছ। আমি এসে পড়লে অসুবিধা হ'ত। বাধাও পড়ত হয়ত। তা পাত্র কি করেন! ঠিকানাটা দাও। দেখা করে আসি একদিন। একটা উপহার তো দিতে হবে আমার ছাত্রী কতদিনের। এক বন্ধুর মুখে খবর পেলাম কলকাতায় এসে দময়ন্তীর বিয়ের। আমার ঠিকানা ওরা সবাই জানে ওরা দিতে পারত। তোমার না হয় ভয় হয়েছিল?'

ভদ্রলোক কুটীলভাবে হাসলেন।

সুরমা শঙ্কিত হলেন। শঙ্কাকে চাপা দিয়ে একটু হাসবার চেষ্টা করলেন।

'না, ভয় কিসের। ভাল ছেলে পাওয়া গেল আর মেয়েরও বিয়ে দিতে হবে। যোগাযোগ ঘটে গেল।'

চা এসে পড়েছিল। বললেন, 'চা চালি? তারপর? কোথায় রয়েছ? ক' দিন আছ?'

'আপিসের কাজে পাঠিয়েছে এক মাস বা দু'মাস এক বছর লাগবে তা জানিনে এখনো। এসেছি পরশু। দময়ন্তীর বিয়ের খবরে তোমাদের অভিনন্দন জানাতে এলুম।' শেষ কথাটায় বিদ্রূপ ঝলমল করে উঠল হাসির সঙ্গে। 'তা' ঠিকানাটা বলো। মাইনে মন্দ পাই না এখন। কিছু উপহার কিনব। তার সঙ্গে দেখা করে তাকে নিয়েই দোকানে যাব। গয়না তো দিতে হতই আমার বিয়ে করলে—! তা' এখনো দেওয়া যাক্, কি বল!'

সুরমার মুখ শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে রইল। তবু একটু হাসবার চেষ্টা করে বললেন, 'তা দেবে বই কি! তুমি তো ওর পর নও ছোট থেকে তোমার কাছে গান শিখিয়েছ। নাচের ইস্কুলে নাচ শিখিয়েছ। কিন্তু ওরা এখন কলকাতায় নেই। কোথায় বেড়াতে গেছে ছোটনাগপুরের কোন্ পাহাড়ী জায়গায়। ঠিকানা ঠিক দেয় নি। ডাক বাংলোয় থাকে, ওর বর ফরেষ্ট অফিসার!'

'ও: বেশ বেশ। ভালো জামাই পেয়েছ। তা এখানে এসে কোথায় থাকে? ছেলে-টেলে হয়েছে?'

'হ্যা একটা খোকা ক'মাসের। শ্বশুরবাড়ীতে কেউ বড় নেই। শুধু বাড়িটায় চাকর-বাকর আছে। সেখানে ও থাকে।'

'—আমার কাছেও থাকে।'

সতীশ চায়ে দু' একটা চুমুক দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বললে, 'আচ্ছা এবার উঠি। কলকাতায় রইলাম এখন। আসব মাঝে মাঝে। তার গানও শুনব। তা' আমার শেখানো নাচ গানের জোরেই রূপের মেয়ে সৎপাত্র পেয়ে গেছ! ছেলেটিকে দেখব।'

তা' জানো, আমিও এখন বড় কাজ করি। মাইনে কম পাই না। ১০০ দেয় এ অফিসে এখন। বিয়ে হলে দময়ন্তী ঠকৃত না।'

সুরমা কাঠ হয়ে গেল।

২

সুরমা মিথ্যে কথা বলেছিলেন। মেয়ে এখানেই আছে। জামাই কলকাতার কাছে কোথায় বদলী হয়েছে। ওদের বাগবাজারের বাড়ীতেই তারা আছে।

বিভ্রান্ত মনে কাজকর্ম করতে লাগলেন। আপিসের বেলা হল, স্কুলের বেলা হল। স্বামী ছেলেরা দেবর খেতে এলেন।

স্বামীকে কিছু বলা যাবে না এখন। রাত্রে বলবেন। কিন্তু কি বলবেন? তিনি তো সব জানেন না।

সেই সব কথা কি বলবার মত?

দুপুরবেলা একটা রিক্সায় করে দময়ন্তীর বাগবাজারে কুমোরটুলীর এক গলির বাড়ীতে পৌঁছলেন।

মার মুখ চিন্তিত। অন্যমনস্ক। দময়ন্তীর কোলে ৫।৬ মাসের একটি ছেলে। সে এগিয়ে এলো হাসি মুখে। ছেলেও দিদিমার কোলে ঝাঁপিয়ে এলো।

গলির মোড়ে পোর্টকমিশনারের রেলগাড়ীগুলো হঠাৎ চলতে আরম্ভ করেছে মৃদুগতিতে। গাড়ীর চাকার মৃদু শব্দ কানে আসছে। একঘেয়ে শব্দ। কি যেন বলছে একই কথা কাকে। শব্দটা যেন ঠিক্-কানা-ঠিক্-কানা, সেই ঠিক্-কানা! বলছে!

মা মেয়ের উজ্জ্বল হাসির দিকে তাকালেন। তাকিয়ে রইলেন। মনে হল সেই সব কথা!

না! আহা, ওকে আর সতীশের কথা বলবেন না। ঠিকানা সে পাবে না খুঁজে। আর যদি পায়ই তো কি আর হবে। ততদিনে জামাই অন্য জায়গায় বদলী হয়ে যেতে পারে।

নাতিকে খুব আদর করে কুমোরটুলীর একটা কি পুতুল কিনে দিলেন। সেটা হাতে দিয়ে অনেক গল্প করে চলে এলেন।

গলির পথে সিদ্ধেশ্বরী, মদনমোহন, মহাদেব কত ঠাকুর—অনেক মানত করলেন। ফিরে এলেন। মন শান্ত হল দেবতার সান্নিধ্যে। স্বামীকেও আর কিছু বলবেন না। সব ঠিক হয়ে যাবেই।

৩

মাসখানেক কি আরো বেশী হয়ে গেল।

হঠাৎ সতীশ এলো। বললে, 'তারা ফিরেছে?'

সুরমা বললেন, 'না। এখনো দেরী আছে আসতে।'

'হ্যাঁ আমার কিছু টাকা চাই। যোগাড় করে দিতে পারবে?'

'টাকা?' সুরমা অকূলে পড়লেন। 'কত? টাকা কোথায় তার?'

'শ' পাঁচেক। ভাইঝির বিয়েতে একটা গয়না দিতে হবে। বড় কাজ করি তো দিতেই হবে। কিন্তু এখন হাতে অত টাকা নেই।'

সুরমা কূল পেলেন। হ্যাঁ, গহনা তাঁর আছে। আর যদি এই গয়না দিয়ে ওকে সন্তুষ্ট রাখা যায়। তাহলে দময়ন্তীর জন্ত আর অত ওঁকে উদ্বিগ্ন হতে হবে না। ঠাকুর দেবতারা আছেন। কৃপা করেছেন। মনে মনে ভাবেন।

বললেন, 'টাকা তো আমার কাছে নেই। থাকে না। গহনা আছে আমার কিছু। দেখবে?'

সতীশ বললে, 'দেখি।'

সুরমা শোবার ঘরের আলমারী থেকে গহনার কেস নিয়ে এলেন কয়েকটা।

গলার নেক্লেস। হাতের মানতাসা। আর কিছু ছোট ছোট চুড়ী বালা আংটী কানের দুল।

চুড়ী বালাটা দময়ন্তীর ছোটবেলাকার গহনা।

সতীশ বললে, 'বা! বেশ জিনিষ। তোমায় টাকা দোব কিস্তিতে তিন মাসে। গহনা আর ফেরৎ দোব না।

আমি ছুটো গহনাই নিলাম। আর এ গহনা তো আমি পেতাম কিছু! আমার সঙ্গে ওর বিয়ে হলে'—একটা কুটীল হাসি ওর মুখে ভেসে উঠল।

সুরমা আবার পুরোনো কথা তোলায় শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। তবু যতদিন থামিয়ে রাখা যায়! কি ভুলই করেছিলেন। কে করেছিল? মেয়ে না মা?

সতীশ চলে গেছে। সুরমা বাকি গহনা তুলতে তুলতে ভাবেন মা না মেয়ে?

তাঁর হাত অসাড় হয়ে আসে মনের সঙ্গে।

ঝি নিচে ডাকল।

৪

দুপুরের ভরা রৌদ্র—বাড়ীতে কেউ নেই। দময়ন্তীর ঘুম ভেঙে গেল নীচে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে। ঝি এলো। এখন মোটে দেড়টা ঘড়িতে।

দোতলা থেকে নামল। দরজা খুলল। আর তার হাত পা যেন মাটিতে বসে গেল। জমে গেল।

'আপনি! সতীশদা।'

'হ্যাঁ আমি। মনে হচ্ছে ভূত দেখেছ! তেমনই ভয় পেয়েছ! তোমার বিয়ে হয়ে গেছে শুনে আমি দেখা করব ভাবছিলাম।

তা' তোমার মা বললেন তুমি এখানে নেই। হঠাৎ তোমার বন্ধু আমারও ছাত্রী সেই মীনার সঙ্গে দেখা, সে ঠিকানা দিলে। ভেতরে ঢুকতে দেবে না নাকি? অসুবিধে হবে? একটুখানি বসি!' একটা অদ্ভুত ধরণের হাসল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আসুন আসুন। হঠাৎ অনেক দিন পরে দেখা তো।'

দময়ন্তী বাইরের ঘরে নিয়ে বসালে।

'তোমার বিয়ে হয়ে গেল। একটা খবরও দিলে না কেউ। তোমার মাও বাজে কথা বললেন। ঠিকানাও দিলেন না। তা' নাকি খুব ভালো বিয়ে হয়েছে। তা' কখন তোমার সেই ভালো বরটি বাড়ী থাকেন? আলাপ করে যাব একদিন।'

দময়ন্তী সামলানো শুষ্ক মুখেই হাসল। বললে, 'হ্যাঁ নিশ্চয় আসবেন। এই পাঁচটার পর আসেন। কোন দিন কোথাও গেলে একটু দেরী হয়। একটু চা করি?'

দময়ন্তী চা করতে গেল। রাঁধুনী ঝি বেরিয়েছে।

ছেলে কাঁদল। ছেলে কোলে নিয়ে ঘরে সোফায় বসিয়ে চা নিয়ে এলো। প্লেট করে মিষ্টি আর বিস্কুট।

সতীশ ঘরে ঘুরে ঘুরে দেখছিল। ছেলে দেখে বললে, 'বেশ ছেলেটি তো!' ঠিক যেন গল্পে শোনা ডাইনীর মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ছেলের দিকে চাইল।

'দেখছি, তা' বেশ ভালো বিয়েই তো হয়েছে। মোটরের গ্যারাজও রয়েছে। বাড়ী কি নিজের?'

দময়ন্তী চা ঢালতে ঢালতে শুষ্ক মুখেই ঘাড় নাড়ল।

'হ্যাঁ বিয়ে ভালোই হয়েছে। এই ছবি ভদ্রলোকের ছবি। হুঁ, চেহারাও ভালোই তো! অবশ্য চেহারা আমারো ভালোই। তবে 'বাড়ী গাড়ী' তো নেই।'

'তা' সেসব না থাকলেও তো কথা দিয়েছিলেন তোমার মা। আর তুমিও। এবং সব ঠিকই ছিল। বিয়ের তিন মাস আগের চিঠিটাও তো একেবারে কি রকম করে লিখেছিলে……মনে আছে…?

তা' ভালো মেয়েরাও ভালো ছেলে বর পেলে এই রকমই হয়ে যায় গল্পের বইতে পড়েছি। 'বাড়ী গাড়ী' 'ভালো কাজ' কি কম কথা।'

'চা টা খান জুড়িয়ে যাবে' দময়ন্তী মৃদুস্বরে বললে।

দু'এক চুমুক চা খেয়ে সতীশ উঠল 'থাক যখন নিজের বাড়ী। ঠিকানা বদলেছ কেউ আর বলতে পারবে না। তোমার ভালো বরের সঙ্গেও একদিন দেখা করে যাব। আর মাঝে মাঝে আসব। আপনার লোকই ছিলাম তো। হতেও পারতাম! সেকথাটাও ভাববার কথা—কি বল? কত চিঠিপত্র। কত বেড়ানো একসঙ্গে।'

দময়ন্তী নীরব। তার বুক মুখ গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

৫

সুরমা বা দময়ন্তীর মা বেশ নিশ্চিন্ত। সতীশকে গহনার উৎকোচ ঘুষ দিয়ে সন্তুষ্ট করতে পেরেছেন মনে ভেবেছেন। দময়ন্তী অনেকদিন আসেনি এবং তিনিও যেতে পারেননি। মনে মনে ঠিক করেছেন সতীশের বোনের নাম করে সব গহনাগুলোই তাকে দেবেন এবং একটি সুন্দরী জানাশোনা মেয়ের চেষ্টাও দেখছেন। তাতে যদি সতীশ ভোলে।

ও: কি ভুলই করেছিলেন। সতীশ যে এমন…। কিন্তু তাঁদেরও তো ভুল হয়েছিল। কোথায় কোথায় বটানিক্যাল গার্ডেনে পিকনিক, ভিক্টোরিয়া

মেমোরিয়ালে রাত অবধি বেড়ানো। আবার বিয়ের কথা দেওয়া··· । এবং··· ।
ওরা জানে বিয়ে তো হবেই। তা' আর এসবে দোষ কি ?

সতীশ নির্ভীক বেপরোয়া হৃদ্যতা দেখিয়ে দময়ন্তীর 'মাষ্টার' বলে তার ঘরের সঙ্গে আলাপ করে গেল। এখবরও মার কানে পৌঁছল না।

মা তাঁর সোনা রূপার উৎকোচের সাফল্যের কথা মনে করে নিয়ে নিশ্চিন্ত রয়েছেন। কিন্তু দময়ন্তী যেন সাপের সামনে পড়ার মত অভিভূত হয়ে গেছে! কাকে বলবে ? লিখবে ? কার হাতে চিঠি পড়বে কে জানে !

৬

শীতের দুপুর। দময়ন্তীর বাড়ীর কড়া নড়ল।

'কে ? কে ?' দরজা খুলে দিল।

সতীশ বাড়ীতে ঢুকে সদর বন্ধ করে বলল, 'চল আজ একটু ওপরে তোমাদের শোবার ঘরে বসি হাত পা ছড়িয়ে। আপত্তি আছে ?'

'না আপত্তি আর কি ? আসুন।' দময়ন্তী হাসবার চেষ্টা করে বললে। খাট-বিছানা। একপাশে খোকা ঘুমুচ্ছে।

সতীশ তার স্বামীর বিছানায় শুয়ে পড়ল। বললে, 'একটু এসে বোসো না কাছে।'

দময়ন্তী শুষ্ক মুখে একটা চেয়ার টেনে বসল।

'কেন ? খাটে বসবে না ? দোষ হবে ?'

'না : এমনিই।'

'আমি কিন্তু মাঝে মাঝে জিরোতে আসব। আর দুপুরে এই ঘরেই শোব।'

দময়ন্তী অস্ফুট স্বরে বললে, 'আপনার আসার কি আর দরকার। এতে পাড়ার লোকেরা পাঁচ কথা বলবে হয়তো।'

'ও: তোমার নাম খারাপ হবে! তা বটে! তাহলে না হয় মাসে দুমাসে একবার করে আসব। কিন্তু এই ঘরেই বিশ্রাম করব। কিন্তু তুমি তো 'অসতী' হয়েই গেছ এ বিয়ে হয়ে। নতুন করে আর "সতী অসতীর" ভাবনা ওঠেই না। এখন অসতীত্বের ভয় করা তো ভণ্ডামী! নিজেই জানো ঠিক না ? কি বল ?'

সতীশ হাসল। 'এসে বোসোনা কাছে· আগে তো আমাকে ছুঁয়েছিলে। ঘর

তো পরে। আমার বাগদত্তা সতী-স্ত্রী কবে কেমন করে হয়েছ আর কার সতী-স্ত্রী! সেটাও ভাববার!' আবার হাসল সতীশ। প্রতিহিংস্র মুখে।

দময়ন্তী নীরব।

'বড় ভয় পেয়েছ দেখছি। আচ্ছা। আজকে যাচ্ছি। কিন্তু আবার আসব। এ ঘরটা বেশ। এখানেই জিরোবো। তোমাদের এই বিছানাতেই। সেই তোমাদের বাড়ীর একদিনের মত…। মনে আছে তো নিশ্চয়ই। সেইদিনই কাছে এসো।'

দময়ন্তী 'পাথর' হয়ে গেল।

কি রকম করে লোকে পাথর হয়?

অহল্যা 'পাথর' হয়েছিল বিয়ের আগে না পরে! তাহলে দময়ন্তীর তো বিয়ের আগেই পাথর হওয়া উচিত ছিল। অহল্যা অসতী না সতী॰

দময়ন্তী কার সতীস্ত্রী। স্বামীর না কথা দেওয়া লোকটার। শুধু কি কথা। দময়ন্তী যেন জড়পদার্থ হয়ে গেছে। তারপর খোকা জাগল। ঝি এলো। রাঁধুনী এলো। স্বামী এলেন।

৭

অনেক রাত্রি। কৃষ্ণপক্ষের রাত।

খোকা ঘুমুচ্ছে। কর্মক্লান্ত স্বামীও নিদ্রিত।

অন্য ঘরে দময়ন্তী চিঠি লিখছে। আবার ছিঁড়ছে। আবার লিখছে। স্বামীকে লিখল কিন্তু ছিঁড়ল। কি লিখবে তাঁকে। কি লিখবে? না, মাকেই লিখবে।

মা, সতীশদা এসেছিল। আমার ঠিকানা খুঁজে পেয়েছে। তোমার কাছে নাকি কবে গিয়েছিল। তুমি তো আমায় বলনি। ক'দিন আগে এসেছিল।

ওঁর সঙ্গে আলাপ করে গেছে। কালও দুপুরে এসেছিল। বলেছে দুপুরে এখানে এসে মাঝে মাঝে জিরোবে। আমাকে বিছানায় ওর কাছে গিয়ে বসতে বললে।

আমি ওঁকে বলব ভাবছিলাম, আগেকার এইসব কথা। কিন্তু সাহস হচ্ছে না। কি করে বলব? উনি সহ্য করতে পারবে কি এসব কথা। জানি না। খুব ভয় করছে।

সতীশদা বলেছে এ তো নিজের বাড়ী। এর তো আর ঠিকানা বদল করতে পারবে না কেউ। আমি আসব ইচ্ছে হলেই।

কিন্তু আমি আজ রাত্রে ঠিকানা বদল করব।

তুমি এই চিঠি ওঁকে দেখিয়ে দিও। ইতি দময়ন্তি।

রাত্রি তিনটা। কলকাতার বাগবাজার নিঝুম। দময়ন্তী একটি নীল রঙয়ের শাড়ী পরল। সোনার চুড়ী হার খুলে রাখল মাথার বালিশের পাশে। দুটো শাঁখা শুধু হাতে রইল। নীল রঙয়ের শাড়ী অন্ধকারে মিশে যাবে। আর চিঠিখানা রইল বিছানার পাশে।

অন্ধকার ঘরে দাঁড়িয়ে মনে হল একবার খোকাকে আদর করে।

মনে হল স্বামীর কাছে একবারটি শোয়। কিন্তু যদি ঘুম ভেঙে যায় ওদের। নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। আর তো কখনো ওদের কারুর কাছে আসবে না। ছোঁবে না।

গলির মোড়ে পোর্টকমিশনারদের রেলগাড়ী তখনো এঞ্জিন জোড়েনি। এমনিই আস্তে আস্তে অনেক দূর থেকে মৃদুশব্দে চলেছে গন্তব্যমুখে। শোনা যাচ্ছে।

দময়ন্তী ফুলের সাজি গঙ্গাজলের ছোট একটা কলসী হাতে নিল। লোকের বাড়ীর ঝিয়েদের মত। হাতে গামছা কাপড়।

মাথায় ঘোমটা টেনে পথে নামল। দরজা ভেজানো থাক। একতলায় রাঁধুনী ঘুমুচ্ছে।

রেলগাড়ীটা গলির সামনে দিয়ে চলেছে 'ঠিক্ কীনা' 'ঠিক্ কীনা' কি একটা অবোধ্য শব্দ করতে করতে। রাস্তার ওপারে মা গঙ্গা জোয়ারের জলে ভরে স্থির হয়ে রয়েছেন।

একটা নৈশ পাহারাওয়ালা তাকালো ওর দিকে। স্নানার্থিনীর বেশ। কিছু বলল না। রাত্রি তৃতীয় প্রহরের কোটায়। অন্ধকার পাতলা হয়ে এসেছে।

গাড়ীটি খুব লম্বা। কুলিগুলো ক্লান্ত হয়ে শুয়ে বসে আছে কোথায় দেখাও যাচ্ছে না। খুব মৃদুগতিতে চলেছে তার নিজের ঠিকানায়।

দময়ন্তীও পাশে পাশে চলেছে।

তার এক পাশে গঙ্গা, অন্ত পাশে রেলগাড়ীটা। তারাও যেন ঠিকানা খুঁজে চলেছে তারই মত। মাঝখানে সে। তারও পৌছতে হবে এমন কোথাও যেখানে নাম চেহারা মানুষকে আর চেনা যায় না। কিন্তু সেটা কোন পথে গেলে পাবে। বাঁদিকে না ডানদিকে ?

সন্তান স্বামী গৃহ মা বাপ তার মনের কোনোখানে কেউ কোথাও আর নেই। চোখে জল নেই। কিছু নেই। আছে শুধু ভয়। চিরকালের নারীর লজ্জার ভয়ের অবমাননা ধিক্কারের অজানা মহা আতঙ্কে সে অন্ত ঠিকানা যে ঠিকানায় কেউ খুঁজে পাবে না তারি খোঁজে চলেছে।

অন্তমনস্ক দময়ন্তী পথের মাঝে হঠাৎ পিছন থেকে একটা ট্রাক শব্দ করে এলো। দময়ন্তী চম্‌কে সরে গেল একদিকে। আর এঞ্জিনহীন গাড়ীর একটি লোহার বাহুতে ধাক্কা লেগে আবার একবার চমকে মাটিতে পড়ে গেল।

একটি কথাই শুধু শোনা গেল 'মাগো।' গাড়ীটা ধীর মৃদু-গতিতে একটা একটা করে সমস্ত গাড়ীর ওয়াগনের চাকা জমা দিয়ে লাইনটা মাড়িয়ে মাড়িয়ে ঘষে চলে চলে বাগবাজার ষ্ট্রীট পার হয়ে গেল। এবারে নরম পথে চাকা চলেছে।

ওরকম নীল শাড়ীতো অনেকেই পরে। গঙ্গাস্নানে যেতে ঘড়া আর ফুলের সাজিও তো অনেকেই নেয়। ক্ষীণদেহ দময়ন্তীর দেহটার ঠিকানা চাকাগুলোর তলায় গুঁড়ো হয়ে গেছে বোধহয়।

সতীশ কথা রেখেছে। মাসখানেক বাদেই দময়ন্তীর বাড়ীর কড়া নড়ল।

এবার দরজা খুলল একটা ছোট চাকর। বললে, কাকে চাই ? কেউ নেই বাড়ীতে।

সতীশ বললে 'মাজী কোথা ?'

সে বললে, 'মাজীকে সে দেখেনি জানে না সে কথা। বাবু বিদেশে গেছেন।'

হতাশ উন্মত্ত রাগে কুটীল বিকৃত মুখে সতীশ সোজা সুরমাদের বাড়ী এলো।

একেবারে সুরমার শোবার ঘরে ঢুকল। সুরমা চুপ করে বসেছিলেন। পাশে দময়ন্তীর নিদ্রিত শিশু। সুরমা জানালার দিকে চেয়ে বসেছিলেন।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সে কর্কশ গলায় জিজ্ঞাসা করলে 'দময়ন্তী কোথায় ?'

সুরমা পাশের একখানা বই থেকে দময়ন্তীর চিঠিখানা বার করে ওর সামনে ফেলে দিলেন।

সতীশদের মতন লোক পাথর হয় না।

কিন্তু সেদিন ওর দুটো পা যেন কণিকের মূর্তির মতন বিরাট জমাট পায়ের মতন মাটিতে জমে গেছে। যেন অনড় অচল হয়ে গেছে।

তাকে কেউ বসতে বলেনি। সেও বসেনি।

সে মূর্তির মতই কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর অস্পষ্ট স্বরে বললে, 'এরকম করবে আমি ভাবিনি। কোথায় গেছে? বেঁচে আছে?'

চোখ ফিরিয়ে সুরমা শুকনোভাবে তার দিকে একবার চাইলেন।

তারপর বললে, 'তুমি চলে যাও।'

একটা প্রকাণ্ড 'হাঁ'

রাত্তির তিনটে হবে। নীতি উঠে বসল বিছানায়। মনে হল স্বপ্ন, না, জেগেই ছিল? কিন্তু দিনদিন ধরেই ঐ প্রকাণ্ড হাঁ করা চাঁদের মুখের মত হাসি ভরা একটা মুখ ওকে যেন মনের মধ্যে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। যেন কি বলতে চায় অথচ বলছে না। শুধু বিশ্রী ব,- ভরা একটা হাঁ করা হাসি ওর দিকে চেয়ে আছে। চাঁদের মুখের মত কাত হওয়া মুখটা। তার সমস্ত গালটা হাসিতে বিভাসিত। যেন মানুষের মুখের স্বাভাবিক হাসি।

নীতির পাশে ভাই বোনরা ঘুমচ্ছে। তাদের গভীর শান্ত নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। জানালার বাইরে আকাশটা দেখা যাচ্ছে। নীতি ভাবল চাঁদ কি উঠেছে? আজ কি তিথি? চাঁদটা কোন্ দিকে? উঠেছে, না উঠবে? জ্যোৎস্না কি আছে? কিন্তু কলকাতায় জ্যোৎস্না—তার আনাগোনার জায়গা খুবই সঙ্কীর্ণ। মাঝের তিথিতে অর্থাৎ পূর্ণিমার কাছাকাছি তিথিগুলোতে একটু আধটু আলো জানালার পাশে বারান্দার পাশে আর ছাতে আসে তাতে চাঁদকে যে সবসময় দেখা যাবে তা নাও হতে পারে। শুধু জ্যোৎস্নার আভাসটাই উঁকি মারে।

নীতি জানালার বাইরে একবার তাকালে। তারপর বিরস মনে টেবিল আলোটা জেলে স্কুলের পরীক্ষার খাতাপত্র বিছানায় ছড়িয়ে বসল। আর চাঁদের হাসির চালাকির কথা ভাববার দরকার নেই—চাকরী তো আছে।

খাতা দেখে। সংশোধন করে। নম্বর ফেলে।—ভালো বা মন্দ মন্তব্য লেখে। আর মাঝে মাঝে সকৌতুকে হাসে ছাত্রীদের ভুল দেখে।

হঠাৎ পাশের ঘরে দরজার খিল খোলার শব্দ হ'ল। মা উঠলেন হয়ত। ঘড়ির দিকে চোখ পড়ল পৌনে পাঁচটা।

এতক্ষণে শরীরের কথা মনে হল। ও: পিঠটা আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে।

আর খাতা দেখে না। প্রায় শেষ করে এনেছে।

শুয়ে পড়ে। এবার জানালা দিয়ে আশ্বিনের শেষ রাত্রের হাওয়া আসে। আর হ্যাঁ, ক্লান্ত হয়ে পড়া চাঁদকেও পশ্চিম দিগন্তে দেখতে পেল।

হঠাৎ ঐ সমস্ত অস্বস্তিকর ভাবনাগুলোকে কঠিন ভাবে নেড়ে চেড়ে তলিয়ে দেখতে ইচ্ছে হ'ল।

কোথেকে, কেমন করে, কবে, কেন ঐ প্রকাণ্ড হাসির গহ্বরওয়ালা ব্যঙ্গ হাসিভরা চাঁদের মুখ ওর মনে বাসা বাঁধল। জাগল। চাঁদ তো আজ বা কালই দেখছে। হয়ত মার কোলে থেকে 'আয় চাঁদ আয়' শুনেছে।

কিন্তু মনে মনে একটু হেসে ফেলে। মার কোলে-? তিন ভাই চার বোনের একজন। মার কি কোনো মেয়ে নিয়ে আর 'আদিখ্যেতার' অবসর ছিল! আগে পরে আরো বোন আর ভাই!

যাক্, সে তলিয়ে ভাবতে বসল সেই কবেকার কথা। যখন থেকে ঐ মনের মধ্যে প্রকাণ্ড ফাঁক ঐ 'হাঁ'টা বাসা বেঁধেছে। তাকে দেখে নিয়ে হয় ঝেড়ে ফেলতে হবে, নয় কি করা যায় তাই করতে হবে।

২

হ্যাঁ, ওর ইস্কুলটা বেহালায়।

সেদিন ট্রামে ফিরছিল। মেয়েদের সিটের পাশের জায়গাটা খালি ছিল। বিকেলের রোদ্দুরে আকাশভরা আষাঢ় মাস। সে জানালার বাইরে তাকিয়েছিল।

সহসা কে একজন জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে কি একটু বসতে পারি।'

মুখ না ফিরিয়েই সে বললে, 'হ্যাঁ বসুন।' সারাদিনের ক্লান্তিতে গরমে চোখ যেন জ্বালা করছিল। বাড়ী গিয়ে শুয়ে পড়তে পারলে বাঁচে ভাবছে। চোখ বুজেই কিম্বা না দেখা চোখে সে বসেছিল।

যে পাশে এসে বসল, সে হঠাৎ বেশ একটু 'কিন্তু' 'কিন্তু' ভাবে বললে, 'কিছু মনে করবেন না। আপনি কি নীতি মৈত্র ?'

নিজের নাম শুনে সে চমকে উঠে মুখ ফেরালো।

ক্ষীণকায় পাশের লোকটি ও তার মুখটি দেখে চমকালো।

এবারে বললে, 'তুমি—তুমি নীতি ? আপনি নীতি মৈত্র তো।'

নীতি বললে, 'তুমি ! আপনি ? তুমি অমল ঘোষ ? তোমাকে যে চেনা যায় না এমন হয়ে গেছ··· ।'

অমল একটু হেসে বললে, 'তোমাকেও তো ওই কথাটাই বলতে পারি।'

নীতি শুকনো ভাবে একটু হাসলে। কিছু বললে না।

দুজনেই চুপ করে রইল খানিকক্ষণ। ঝাপসা ছবির মত অনেকগুলো দিন আর ঘটনা ভর ভর করে চোখের সামনে ভেসে এলো। দুজনের মনে দুভাবে।

নীতির থার্ড ইয়ারে পড়ার সময়ে দুজনের আলাপ হয়। ভাব হয়। ভালো-বাসে পরস্পরকে। ভালো লাগাটা ভালোবাসার পরিণতি লাভ করে।

তারপর পিতার ক্রোধ জননীর বিরাগ প্রতিবেশীদের ইঙ্গিতময় নিন্দার গুঞ্জন সব জড়িয়ে একটা জটিল অবস্থা।

অসবর্ণ বিয়ের কথা তারা বলে। প্রচণ্ড রাগে তাতে পিতা জননীকে দিয়ে বলেন, 'ওসব বিয়ে হতে গেলে কোমরে টাকার জোর থাকা চাই। বুঝলে, টাকার জোর বড় জোর। টাকার জোর থাকলেই ওসব 'প্রেম ট্রেম' করে বিয়ের ব্যবস্থা করা যায়। ওসব খেয়াল ছাড়তে বল। ওই করার জন্তে ওকে আমি কলেজে পড়াই নি। মন দিয়ে পড়ে পরীক্ষাটা দিয়ে আমার মাথা কিনতে বলো।'

ছোট বাড়ী।—পাশের ঘরে সরব কথা। মাকে আর বলতে হল না কিছু। ভাই বোনে সবাক্ষবে বসে নীতি সব কথাই শুনতে পেল।

মা এসে কেঁদে ফেলে বললেন, 'আমি কি করে মুখ দেখাব পাড়ায়—সমাজে সকলেরি কাছে। তোরা এই করে আমাদের মুখ ডুবিয়ে দিবি······।'

নীতি লজ্জায় ধিকারে যেন মরে গেল। কিন্তু নাঃ। নীতি প্রেমের জন্তে আত্মহত্যাও করেনি। পালিয়েও যায়নি বাড়ী থেকে। ভালো করে মন দিয়ে পড়ে বি. এ. পরীক্ষা ভালোভাবেই পাশ করল।

তারপর বি. টি.। তারপর চাকরী। বাবার সংসারের কিছু ভার নেওয়া।

ট্রাম চলেছে রেস কোর্সের পাশ দিয়ে। নামবার সময় হয়ে এলো। তার চোখটা পাশে বসা অমলের দিকে পড়ল।

সেও ভাবছিল ঐ রকমই সব কথা। পড়ায় ভাল। তার ভাগ্যে এসে পড়েছিল পিতার মৃত্যু, কিফ্‌থ ইয়ারেই পড়া বন্ধ। মা ভাই বোন, সংসার। সকলের ভার। জীবিকার সন্ধান……।

একটা ইপে ট্রাম থামল।

কিছু কথার আগেই একটি মেয়ে এসে সিটের পাশে দাঁড়াল। অমল উঠে দাঁড়াল।

ধর্মতলা এসে পড়ল। এবার নামতে হবে। নীতি এদিক ওদিক তাকাল। অমল কোন্ দিকে? নেমে গেল কি? না। অমল নামছে। সেও নামল।

সে একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলে, 'তুমি কোন দিকে?'

নীতি বললে, 'বেলেঘাটা। তুমি?'

শ্যামবাজার। দুজনে নামল।

'এদিকে তোমার কি আপিস?' নীতি বলে।

'খিদিরপুর ডকে একটা কেরাণীগিরি' একটু হেসে অমল বলে। 'তুমি?'

'আমিও বেহালায় একটা স্কুলের টিচার।'

প্রতিদিনের একই পথের যাত্রী! এতদিন দেখা হয় নি। আশ্চর্য। দুজনেই ভাবে।

অমল। '—আচ্ছা। আজ যাই। তুমি কটায় বেরোও? কিছু কথা হল না আজ।'

নীতি। '—বড্ড ভিড় হয়ে যায় তাই প্রায় একটু সকালেই বেরুই। মাঝে মাঝ বাসেও উঠি।'

৩

তারপর থেকে এখন প্রায়ই দেখা হয়। যেন দেখা হবার জন্যেই দুজনেই সময়ের একটু বেশী আগে আসে। দু একটা কথা কয়। হাসে।

নীতি ভাবে যেন কতদিন হাসেনি। কারো সঙ্গে গল্প করেনি।

দু একদিন পরে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'সেই বাড়ীতেই আছ?'

অমল বললে, হ্যাঁ।

নীতি জানত অমলের বিয়ে হয়েছে। একটু দ্বিধা করে বললে, 'কে কে আছেন বাড়ীতে? তাঁরা মা কোথায়? ছেলেমেয়ে আছে?'

অমল বললে, 'মা আছেন। আর কেউ নেই একটি ছেলে আছে শুধু।'

'—বৌ কোথায় ?'

একটু থেমে অমল বললে, 'এই বছর খানেক হল হাসপাতালে বাচ্চা হতে গিয়ে আর ফিরে আসেনি।'

নীতি চুপ হয়ে গেল।—তারপর বললে, 'আহা ! বাচ্চাটি ?'

'সেও নেই।'

'বাড়ীতে তবে শুধু মা আছেন ?'

'হ্যাঁ, আর বড় ছেলেটি আছে।'

অমল কথা শেষ করে বললে, 'নিজের কথাই বলছি তোমার কথা তো কিছুই জিজ্ঞেস করিনি। সিঁথির দিকে তাকালো। সরু সাদা সিঁথেটা। বিয়ে করনি দেখছি ?'

সে শুকনো ভাবে একটু হেসেছিল। কিছু বলে নি।

অমল একটু পরে জিজ্ঞাসা করল, 'ভাই বোনদের বিয়ে হয়েছে ? প্রীতি বীথি, গীতি ? প্রীতি তো তোমারি মত দেখতে অনেকটা। বেশ সুন্দর ছিল, না ?'

ওর মত ? সুন্দর দেখতে ! নীতির চোখবসা ক্লান্ত মুখে একটা শীর্ণ হাসি উঁকি মেরে যায় যেন। মুখে বললে, 'হ্যাঁ ওদের বিয়ে হয়েছে। দাদারও বিয়ে হল। শুধু গীতি বাকি।'

'ও !' অমল অবাক হয়। '—প্রীতির কোথায় বিয়ে হল ? বর ভালো হয়েছে ?'

নীতি ওর দিকে ফিরে একবার তাকালো। তারপর বললে, 'হ্যাঁ খুব ভালো বর ঘর। পূর্ববঙ্গের এক জমিদারের ছেলে। সুধাংশু মিত্তিরের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। দাদারও হয়েছে একটি দত্ত বাড়ীর মেয়ের সঙ্গে। অসবর্ণ, ওরাও একসঙ্গে পড়ত। ভাব হয়েছিল। সুধাংশুরা খুব বড় লোক। এরাও বড় লোক নয়। কিন্তু দাদা তো রোজগার করে।'

যেন নীতি রোজগার করে না। অমল একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল। অসবর্ণ ? দুটো অসবর্ণ বিয়ে দিলেন ওর বাবা মা ? না, তাঁরা হয়ত নেই।

নীতি চুপ করেই ছিল। দুজনেই এককথাই ভাবছিল। সেই নিজেদের কথাই কি ?

অমল এবারে বললে, 'মা বাবা আছেন ? মত দিলেন এই সব বিয়েতে ?'

ট্রাম ধর্মতলায় এসে পড়েছে। নামতে হবে। নীতি উঠে দাঁড়িয়ে

বলেছিল, 'হ্যাঁ। খুব বড় লোক তারা। বাবার অমত হয়নি। চল নামি।'

…তার মুখে মৃদু একটু হাসির রেখা ফুটল কি? অমল ভাবে।

৪

নীতি শুয়ে শুয়ে আবার ভাবে। হ্যাঁ খুব বড়লোক জমিদার সুধাংশুরা। প্রায়ই গাড়ি করে আসত। জমিদারীর মাছ ফল আম কাঁঠাল গুড় মিষ্টি সন্দেশ পাঠাত ঝাঁকা ঝুড়ি ভরে থালা ভরে। বাড়ীতে উৎসব পড়ে যেতো। তাকে নিমন্ত্রণ করা হত। সেও আবার সকলকে সিনেমায় থিয়েটারেও নিয়ে যেতো। মাছ এলে সেদিন বাবা রান্নার মেনু করে দিতেন। রাত অবধি বসে তার সঙ্গে সকলের খাওয়া-দাওয়া হ'ত।

বিয়ের প্রস্তাব আসার আগেই তাঁরা মনে মনে সব ঠিক করে রেখেছিলেন। ছেলে নিজেই কর্তা।—বিধবা মা কোনো আপত্তি করবেন না। আভাস দিয়েছিল প্রীতি।

ছেলের প্রস্তাবে মা আর বাবা বললেন, 'এত ভাগ্য প্রীতির হবে তা কে জানত।……'

* * *

তারপর ঘোর ঘটা করে পাশের বাড়ীর ছাত সামনের বাড়ীর উঠান বাহিরের ঘর সব নিয়ে মহা জাঁকজমক করে প্রীতির বিয়ে হয়ে গেল।—বাবা জামাইকে হীরের আংটি দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। প্রীতিকেও গহনাপত্র দিলেন। কিছু ধার দেনাও হ'ল। কিন্তু সে তো 'হাঘরে' বরের হাতে দিতে গেলেও নগদে গহনায় দিতেই হত……

এবার নীতির মুখে একটা হাসির রেখা ফুটে ওঠে। সে উঠে বসে খোঁপাটা ঠিক করতে করতে ভাবে, কিন্তু এবার আর মা কেঁদে বলেন নি, কি করে মুখ দেখাব লোকের কাছে। বেশ মুখ মাথা উঁচু করেই লোকজন খাওয়ালেন। গর্বিত ভাবেই মুখ দেখালেন মা। প্রতিবেশীদের কাছে জামাইয়ের ঐশ্বর্য এবং সৌন্দর্য নিয়ে কাহিনী বিবৃত করেই বলতে লাগলেন। তারা বিক্ষুব্ধ ঈর্ষাতুর শুকনো মুখে শুনতে শুনতে নেমন্তন্ন খেল। খেয়ে বাড়ী গেল। নিন্দে করতে বা জাতের খোঁটা দিতে পারল না। অত বড় লোক কম কথা।…কত বড় গাড়ীখানা। গলিতে ঢুকতেই পারে না।

৫

আর চাঁদটা নিজের খুশীমত নীতির অবসর হলেই 'হাঁ' করে হেসে যায় তার মনে। সেটা বেশীর ভাগই নীতির রাত্রের নিশুতি অবসরে। যখন বাবা মা নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে পড়েন। ভাই ভাজ পাশের ঘরে গুনগুন করে গল্প করে। ভাইয়ের ভালো কাজ হয়েছে। সংসার সচ্ছল হয়েছে। বোনেরা শ্বশুরবাড়ী থেকে আসা যাওয়া করে। বাড়ীতে হাসি গল্পের ধুম। চায়ের আসর সন্ধ্যা-রাতে জমে।—যখন নীতি খাতার বোঝা ছড়িয়ে খাতা দেখে। চাঁদটাও হাসে মনের ভেতরে।

* * *

পাশের ঘরে—এবার বাবা মা জাগলেন। নীতি শুয়েছিল সেও এপাশ ওপাশ করে ক্লান্ত মুখে উঠে বসল।

ঝি এসে কড়া নাড়ল।—তারপর উনোনে আগুন পড়ল।—ভাজ উঠলো। মা রান্নাঘরে গেছেন। চায়ের কেতলী বসেছে। নীতি মনে মনে সব দেখতে পাচ্ছে। কার জন্য বিস্কুট, কার জন্য রুটি, কার জন্য জিলিপী আসবে। সিঙ্গাড়া আসবে কোন্‌দিন তাও সে সব জানে।

তারপর প্রকাণ্ড হাঁড়ি করে সিদ্ধচালের ভাত বসবে আলু ভাতে আর হয়ত কুমড়া ঝিঙেও ভাতে দেওয়া হবে। হয়ত ডাল ভাতে। বাবা বাজারে যাবেন। মাছ আসবে তরকারি আসবে। ততক্ষণে নীতির স্নান কাপড় পরা হয়ে যাবে। ডাল ভাতই খেতে পাবে। মাছ কুটে বেছে দিতে ঝিয়ের সময় হয় না। বৌদিকেই কুটতে হয়। সে ছোট ছেলে নিয়ে সব দিন ঠিক সময়ে আসে না।

মা বলেন, 'একখানা মাছ ভাজা হলে হতো। রোজই ডাল ভাত আলুভাতে বেগুন পটল ভাজা দিয়ে খাওয়া… ।'

কিন্তু তাই খেতে হয়। খেতে দেন। সে আর কিছু বলে না। বেহালা তো কম দূর নয়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাসে ট্রামে শরীর 'তক্তা' হয়ে যায়।

মনে মনে হাসে 'তক্তা!' হ্যাঁ তক্তাই তো! সংসারকে দাঁড়াতে বসতে আশ্রয় দিতে সে তো 'তক্তার' কাজই করছে।

কিন্তু হঠাৎ যেন কি রকম মনটা ভাল হয়ে যায়। সে ডাল ভাত খেয়ে বেরিয়ে পড়ে প্রতিদিনের চেয়ে কুড়ি মিনিট আগেই। অমলকে ধর্মতলায় পেয়ে যাবে তাহলে।

ভাই বলে, 'এত আগে ছুটছিস কেন?'

বাবাও বলেন, 'এখনো তো নটাই বাজেনি।'

তার মুখ কঠিন হয়ে ওঠে। 'বা ভিড় হয়ে যায় জানইতো।'

দুজনে দেখা হয়। হয় ফেরবার পথে নয় যাবার মুখে।

দুজনেই যে একই কথা অনেক বার ভেবেছে। আবারো ভাবে। কেউ কাউকে যদিও বলে না।

আবার একদিন অমল বললে, 'ছেলেটার পড়াশোনার জন্যে ভাবনায় পড়েছি। মা বুড়ো হয়েছেন সামলাতে পারেন না রাস্তায় বেরিয়ে যায়। নিজের তো কিছু হ'ল না ছেলেটিকে যে কি করে দেখি ভনি। একটা ভালো বোর্ডিং-এর সন্ধান দিতে পার? কিংবা ভালো মাষ্টার?'

নীতি বললে, 'আচ্ছা সন্ধান দেখব। কিন্তু বোর্ডিং-এ অনেক খরচ হবে। কত বড় হ'ল?'

'এই ছয় হয়েছে।'

'বড্ড ছোট্ট না বোর্ডিং-এর পক্ষে?'

'কিন্তু বাড়ীতে আর তো সামলাবার লোক নেই।'

৬

বাড়ীতে বোনেরা এসেছে। হৈ হৈ উৎসব পড়ে গেছে তাদের ছেলেমেয়ে নিয়ে। বরদের অর্থাৎ জামাইদের নিয়ে।

নীতি শুকনো চোখে বসা ক্লান্ত মুখে এসে রান্নাঘরে পিঁড়িতে বসে চা আর যা হোক দুটি রুটি অথবা অতিথিদের জন্য আনা ভালো মন্দ খাদ্য খেয়ে উঠে পড়ে।

কোনো দিন পর্বতপ্রমাণ খাতার বোঝা নিয়ে বসে। কোনো দিন ক্লান্ত মুখে চোখ বুজে একটা চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে।

ভাবে, ভাই টাকা রোজগার করে। বাবাও অর্জন করেন কিছু···। কিন্তু তার মত এই অবসাদ ক্লান্তি কষ্ট তাঁদের তো হয় না!

ভাই পরমোৎসাহে বৌকে নিয়ে সিনেমা চলে যায়। নয়ত বৌয়ের বাপের বাড়ী, মাসী পিসির বাড়ী যায় কিংবা যেখানে খুসি।

বাবা ক্লাবে বসে রাজনীতি সমাজনীতি করেন। পরম উদারভাবে এককালে

তাঁরই নিন্দিত ধিক্কৃত অসবর্ণ বিবাহকে এখন সমর্থন করে নিজের ঔদার্য প্রকাশ করেন।

বোনেরা যখন আসে মার সঙ্গে শ্বশুরবাড়ীর জা ননদদের 'শ্রাদ্ধ' করে। কিংবা বাড়ীর ঝি চাকরদের পিণ্ডদান করে অথবা সেজে গুজে তারাও সান্ধ্য-ভ্রমণে বেরোয়।

সে তখন খাতা দেখে নয়ত কোনো ছাত্রীকে পড়াতে যায়। চুপি চুপি এক একবার ভাবে যদি এম. এ.-টা দিত। আরো ভাল করে পাস করতে পারত। তাহলে এই খাতা দেখার বিরাট খাটুনিটা থেকে অব্যাহতি পেত।

নাঃ এম. এ. পড়া হয়নি।

৭

আশ্বিনের সূর্য অস্তোন্মুখ। ধর্মতলা এলো।

দুজনেই ধর্মতলায় নামল। দুটো বাস না ট্রাম থেকে।

নীতির স্কুল গরমের ছুটির পরে খুলেছে। অনেক দিন দেখা হয়নি।

অমল এগিয়ে এল হাসিমুখে। সকালে ওঠবার সময় দেখা হয়নি। বিকালেও ভিড়েতে কেউ কারুকে খুঁজে পায় নি।

দুজনে দাঁড়াল একটু পথে। খুব ভিড়।

তারপর অমল বললে, 'একটু পরেই যাব না হয়—চল একটু ঘুরি ময়দানে।'

নীতি বললে, 'চল।'

অমল। 'কার্জন পার্কে বসবে? বেশ ঠাণ্ডা। যদিও ভিড়।'

'তা হোক। ভিড় আর কোথায় নেই পথে পার্কে ঘরে। বাড়ীতেও তো ভিড়।'

অমল কিছু বলে না। তার বাড়ীতে ভিড় নেই!...

নীতির মনে হয় একটা ছোট শোবার ঘর। এক গাদা বিছানা। ছোট বোন ছোট ভাইয়ের পড়ার একটু জায়গা। নিজের একটা টেবিল। মাটিতে রাত্রে তিনটে বিছানা পড়বে। তাকে টেবিলে নিজের বই। ভাইবোনদেরও বই আছে।

ঘাসের ওপরে বসে একটা একপাশে জায়গা দেখে।

নীতি বললে, 'তোমার ছেলের জন্ত বোর্ডিং-এর খোঁজ করেছিলাম। ঐটুকু ছেলের জন্তে বিলিতী বোর্ডিং খুব বেশী চায়। দেশীতেও কম নয় অথচ পড়া বা খাওয়াও ভালো নয়। মুস্কিল। আর একটু বড় হলে না হয় অত খরচ করতে।'

অমল বললে, 'তা তো বুঝি। কিন্তু কেউ যদি দেখবার মত বাড়ীতে থাকত। মার পক্ষে তো দুরন্ত ছেলের ভার নেওয়া সম্ভব নয়। তা পার তো একটি ভালো মাষ্টার দেখো যদি কোনো মেয়ে পড়াতে পারেন।'

'দেখব। কিন্তু সে তো ওদিকের কাউকে পেলেই ভাল হয়। এদিকের মানুষ অতদূর যাওয়া আসার ঝঞ্ঝাট পোয়াতে যাবে না হয়ত। তা' একদিন ছেলেকে নিয়ে এসো না। দেখতে ইচ্ছে করে।'

'খোকাকে?' তারপর একটু হেসে বললে, 'কিন্তু কোথায় নিয়ে আসব?'

নীতি বললে, 'তাইতো। তা একদিন ময়দানেই নিয়ে এসো না।'

'সে বাড়ী ফিরে গিয়ে তো আর হয় না। তাহলে একদিন ছুটির দিন আনব।'

'তাই এনো। দেখা যাবে পড়াশোনা ও কেমন করে?'

'একটা ছোট স্কুলে পড়ে পাড়ায়। ভালো পড়া কি আর হবে।'

'তবু এনো। চল বাড়ী ফেরা যাক।'

সন্ধ্যা শেষ হল। বাড়ী ফিরতে হবে। বাড়ী?

দুজনেই অন্যমনে ট্রামে ওঠে। একজনের ভাইবোন বাপ মা সব আছে বাড়ীতে। আর একজনেরও মা ছেলে আছে। কিন্তু বাড়ী মনে হচ্ছে না যেন সেটা দুজনেরই। যেখানে স্বজন আছেন। শয্যা আছে। খাদ্য আছে। তবে?

৮

একটা রবিবারের বিকালে অমল ছেলেকে নিয়ে এসে ময়দানের পথে দাঁড়াল।

নীতিও নামল বাস থেকে। হাতে একটা বল চকোলেট খেজুরের প্যাকেট। কাগজে মোড়া।

ছেলে বাপের হাত ধরে দাঁড়িয়েছিল। অকুণ্ঠ মুখে বলটা নিল। চকোলেটের মোড়ক খুলল। ছাড়িয়ে দু' একটা খেল।

তারপর বললে, 'তুমি কে?'

তার বাবা বললে, 'মাসী হয়।'

নীতি হাসল। বললে, 'তুমি কে?'

ছেলে বললে 'আমি অনিল। বাবা খোকা বলে। আমি এবারে বল খেলি।'

বল গড়িয়ে দেয় যেদিকে ইচ্ছে। কুড়িয়েও আনে। আবার অমল নীতি যেদিকে বসেছে সেদিকেও ছুঁড়ে ফেলে।

একটা বেলুনওয়ালা এলো। একটা চিনেবাদামওয়ালা। ঝালমুড়ি ফেরিওয়ালা আসে। কাজুবাদামওয়ালা আসে।

নীতি বেলুন কিনল। বাদাম কিনল। খোকা বেলুন ওড়াল এবং ফাটালো। আর খুব হাসল। নীতি ওর হাসি দেখে ওর সঙ্গে হাসে। অমলও হাসে।

অমল বললে, 'মাসী আর বেলুন কিনে দেবে না।'

খোকা নীতির দিকে চেয়ে বলে, 'দেবে না আর? সত্যি?' শুনতে নীতির ভারি ভালো লাগে। ওরা বসে বসে বাদাম ছাড়ায় আর একটা দুটো করে খায়। সন্ধ্যা শেষ হয়ে রাত হয়ে গেল।

অমল উঠে দাঁড়াল, বললে, 'এবারে যাই, মা ভাববেন। খাবার সময় হল খোকার।'

অন্ধকার থেকে বল কুড়িয়ে নিয়ে ছেলে ফিরে এলো। নীতিও দাঁড়াল।

৯

মা বসেছিলেন রান্নাঘরে আর সকলের খাওয়া হয়ে গেছে। এক বোন এসেছে শ্বশুরবাড়ী থেকে। জাঁতৃড় হবে।

নীতি খেতে বসে। মাও বসেছেন।

মার লাল পাড় শাড়ী। পরিষ্কার চুল বাঁধা সিঁদুর টিপ কপালে। আগের মত মুখে আর চিন্তার রেখা নেই। তিন ভাই-ই বড় হয়ে গেছে। দুজন ভাল কাজ করে। একজন পড়ে। ছোট বোনেরই শুধু বিয়ে হয়নি।

আর নীতির। হঠাৎ আজই যেন নীতির মনে হল আর নীতিরও তো বিয়ে হয়নি।

মা ওকে ভাত দেন। দিয়ে নিজে বসেন।

নীতি ভাত নিয়ে নাড়াচাড়া করে মুখে তোলে অন্যমনস্কভাবে। কত কি ভাবছে। কূল মেলে না যার। একটা ভাবনা থেকে আর একটা। তারপর আর একটা। খেই হারিয়ে যায়। মূল সূত্রটা কি আবার ভাবতে বসে। মূল সূত্রটা কি অমল? অমলের অসহায়তা? না তার সুন্দর ছেলেটি? যে বললে অবাক হয়ে, 'আর বেলুন দেবে না?' অথবা সেই চাঁদের হাঁ করা ব্যঙ্গ ভরা হাসি। যা রাত্রে ওকে ঘুমের সময় ঠাট্টা করে কি বলে কে জানে।

নীতি মুখ তুলে বললে, 'মা।'

মা খাচ্ছিলেন। বললেন, 'কিরে খেতে পারছিস না? রোজই আজকাল রাত করে ফিরিস। খাটুনি বেড়েছে? আর একটু ঝোল নিবি! নেবু দেব?'

মা ঝোল তুললেন কাঁসি থেকে। আর কি একটা ছোট্ট বড় বড়ির মত। মাছ না বড়ি?

নীতি সকালে মাছ খেতে পায় না। এটা সকালের ক্ষতিপূরণ।

সে থালা সরিয়ে নিল। বললে, 'আর কিছু লাগবে না মা।'

অবাক হয়ে মা বললেন, 'তবে ভাতগুলো কি করে খাবি।'

'আর পারব না খেতে।'

মা শঙ্কিত মুখে বললেন, 'শরীর ভালো নেই?' এবার ভাবনা হল। রোজগারী মেয়ে।

নীতি বললে, 'না ভাল আছি। আমি আর চাকরী করব না মা।' তারপর খুব আস্তে বললে, 'এবার তোমরা আমার বিয়ে দাও।'

সবটাই মা শুনতে পেলেন। কিন্তু বুঝতে পারলেন না। এমনই আশ্চর্য কথা দুটোই।

চোখ বড় করে বললেন, 'চাকরী করবি না। তাহলে কি করবি?' —বিয়ের কথাটা বুঝতেই পারলেন না।

এবারে নীতি মুখ তুলল। কথাটা একবার বলা হয়ে গেলে আর দ্বিতীয় বার মুখে আনা বা বলবার জন্য বেশী সাহসের দরকার হয় না। সেটা বেরিয়ে ঘরের বাতাসে মিশে গেছে তখন।

বললে, 'তোমরা আমার বিয়ের ব্যবস্থা করো।'

মা হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। বিয়ে! নীতি বিয়ের ব্যবস্থা করতে বলছে—নিজের!

কিছুক্ষণ পরে মুখে কথা এলো। 'তোর বিয়ে? এই বয়সে? পাত্র কোথায় পাব? এত বয়সের মেয়েকে কে বিয়ে করবে?'

নীতির গলায় সাহস এসেছে। 'পাত্র তোমায় খুঁজতে হবে না। আছে মা।'

পাত্র আছে! নীতি সব ঠিক ক'রে ফেলেছে তাহলে?

মা আবার হতবুদ্ধি হয়ে বললেন, 'পাত্র আছে! কে পাত্র? খরচপত্রের কি হবে? বিয়ের তো খরচ আছে একটা। তার কি হবে?'

নীতির গলা স্পষ্ট হয়ে বললে, 'পাত্র অমল ঘোষ। খরচপত্র? আমার প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা আছে। বেশী লাগবে না।

মা স্তম্ভিত। সেই অমল ঘোষ! কায়স্থ! কায়স্থ বলায় অসবর্ণ বলায় আর মুখ নেই। উপায় নেই। কিন্তু দোজবরে! বললেন, 'দোজবরে!'

নীতি স্পষ্ট গলাতেই বললে, 'হ্যাঁ মা দোজবরে। ছেলেও আছে একটা! কিন্তু তখন আগে সেতো দোজবরে ছিল না। এবারে দোজবরেতেই দাও। নইলে তেজবরে হয়ে যাবে।'

মার মুখে কথা এলো না। নীতির বিয়ে হয়ে চলে যাবে!...একটা আয়। মোটা আয় বন্ধ হয়ে যাবে। চাকরী কি করবে না সত্যি? আর করলেও তাঁদের কি লাভ। মনে ভয় জাগে।

বললেন, 'দেখি ওঁর কি মত হয়।'

নীতি উঠল। বললে, 'বাবাকে শুধু দিন ঠিক করতে বলো। মতামতের আর কিছু নেই। খরচের টাকা আমার আছে।'

অনেক রাত। শোবার ঘর অন্ধকার। ভাইবোনেরা ঘুমোচ্ছে।

জানালা খোলা! মনে হল চাঁদটার কথা। এখনো সে আজ ওঠেনি! কি তিথি কে জানে।

মনে হল না আর চাঁদের হাসির কথা। নীতি ঘুমিয়ে পড়ল সেদিন।

১০

অমল ট্রাম থেকে নামল। দেখতে পেল একটু দূরে নীতি দাঁড়িয়ে রয়েছে। হাসিমুখে এগিয়ে গেল সেদিকে। বললে, 'আমার আসতে আজ দেরি হয়েছে। কাজ ছিল একটু, আর ভিড়ে তিনখানা ট্রাম ছেড়ে দিতে হয়েছে। তুমি কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছ?'

'বেশীক্ষণ নয়। চল একটু গঙ্গার ধারে যাই। যাবে?'

দুজনে হাঁটে। পথিক মানুষ। আপিস ভাঙা ভিড়। যানবাহনের ভিড়। ধীরে এগোয়।

সামনেই গঙ্গা। ঘাটের সিঁড়ি। জোয়ার এসে কখন নেমে যায় সে হিসাব ওরা রাখে না।

নীতি নেমে গেল, বললে, 'এসো না। একটু গঙ্গাকে ছুঁই আজ—।'

সিঁড়ির কাদা মাড়িয়ে গঙ্গাজল হাতে স্পর্শ করে মাথায় ঠেকাল। ওর

দেখাদেখি অমলও তাই করল।—যেন দুজন ছোটবেলায় ফিরে গেছে হঠাৎ।
নীতি বলে, 'এসো বসি একটু।'

অমল বললে, 'বড় কাদা।—'

নীতি বললে, 'কিন্তু এইখানেই একটু শুকনো দেখে বসব আজ।'

দুজনে বসে। পায়ের কাছে জল। বসার জায়গা শুকনো। নীতি একটু কাছাকাছি হয়ে বসল। অমল অবাক। সূর্য অস্ত গেছে। আকাশটা লাল। কোনোখানে ঘোর লাল। কোনোখানে কালো হয়ে আছে। গঙ্গার জলও কোথাও কালো কোথাও রঙীন।

দুজনে নীরব। হঠাৎ নীতি বললে, 'তোমার সেই টীচার দেখতে বলেছিলে। পাইনি। অত দূর কেউ যেতে চায় না।'

অমল বললে, 'যাক্‌গে। কি আর করা যাবে।'

নীতি একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, 'ভাবছি আমি যদি পড়াই।'

পাশাপাশি বসা দুজন। তার দিকে চেয়ে অমল আশ্চর্য আনন্দে বললে, 'তুমি? এত ভাগ্য ওর হবে? কিন্তু তোমার সময় হবে সেই বেলেঘাটা থেকে শ্যামবাজার। এই ভিড়ে যাওয়া আসা।'

নীতি জলের দিকে চেয়ে ছিল। ওর দিকে তাকায় নি। একটু চুপ করে থেকে বললে, 'যাওয়া আসা করতে হবে না।'

অমল আশ্চর্য। তারপর হেসে বললে, 'তার মানে? মজা করছ?'

একটু অপ্রতিভ ভাবে নীতি বললে, 'মাকে বলেছি কাল, আমি শ্যামবাজারে গিয়ে থাকব এখন থেকে। এই মাসেই একটা ভাল দিন দেখতে। তুমি তোমার মাকে বোলো ব্যবস্থা করতে।'

গঙ্গায় সন্ধ্যার অন্ধকার। অমল নীতির অত কাছে বসার মানে বুঝতে পারল এবার। সে তার একখানি হাত নিজের দু হাতে জড়িয়ে নিল।

কতক্ষণ গেল। কখন পায়ের কাছে কুলকুল করে জোয়ারের জল এসে ছলাৎ ছলাৎ করে ঘাটের সিঁড়িতে ঢেউ দিতে লাগল। নীতির শাড়ীর পাড় জুতো জলে ভিজে গেল।

প্রেম জিনিসটা এমনই বটে! রেবার মনে মনে হাসি এলো। দাদা যতদিন চুপচাপ ছিল ততদিন কেউ জানত না যে ওর মনে এত উচ্ছ্বাস আছে।

তা যাক্, ভালই তো। কিন্তু তার যে ভারি বিপদ হ'ল! নীরা আর তার দাদার এই উচ্ছ্বাসে মিলনে তার শুধু যোগাড় দিলেই হবেনা, সাংসারিক ও সামাজিক উদ্যোগ করলেই হবে না, যোগ দিতে হবে! অর্থাৎ যোগ শুধু উলু দেওয়া বা শাঁক বাজানো নয়, আর একখানি আলপনা দেওয়া পিঁড়িতে 'কনে' সেজে বসতে হবে!

কবে একখানি সেকেলে বইয়ে পড়েছিল রেবা, যাতে শেষ অবধি পিসিমার জয় মঙ্গলবার ব্রতের কাহিনীর মত জলেডোবা, সাপে কাটা, নিরুদ্দেশ হওয়া সবাই ফিরে এলো, ঘড়া ঘড়া মোহর পেল নায়ক মাটি খুঁড়ে এবং পরম সুখে দেশের ঘরের যাবতীয় নটেগাছগুলি মুড়িয়ে (ভক্ষণ করে? কি দুর্লভ ও উপাদেয় বস্তু! সেকালকার পিতামহীরা কি সরলই ছিলেন!) দিনাতিপাত করতে লাগলেন।

অনেকে হাসে। অর্থাৎ কু-সমালোচকে হাসে। রেবা ভাবে হাসবে কেন? ওঁদের ওইসব সেকালের লেখকদের হৃদয় এতবড় যে ওরা কাউকে শেষ অবধি অসুখী রাখতে পারেন না। বিধাতার চেয়ে দাতা ওঁরা, বিধাতার দেওয়া সুখের শান্তির ফুলে দুঃখের কীট থাকে, মিষ্টিতে বালি থাকে। এঁরা সৃষ্টি করতে বসে নিজের সৃষ্ট প্রাণীর সে কষ্ট সইতে পারেন না। উদার মনে যা দরকার দিয়ে দেন।

রেবার দাদার মতলবটা এক জাতের। দাদাও চায় তাদের এই সুখের মাঝে তারো একটু সুখ হোক। উদ্দেশ্য ভালো, কিন্তু সুখের যে প্রকার ভেদ আছে, তা ওরা ভুলে গেছে। ওদের সুখকে তর্জমা করে রেবার মনে বসিয়ে দিলেই যে সেটা রেবার হয়ে যাবে, রেবার তা মনে হয় না।

ওদের কিন্তু ধারণা তাই হবে। ওদের এখন ধারণা বিয়ে আর প্রেম না হলে কি সুখ আছে আর?

নীরা অনেক ভেবে বলে, (সে ভাবী ভাজও বটে) 'আচ্ছা ভাই, শঙ্করবাবুকে যদি বিয়ে না করিস তো আর কারুকে পছন্দ কর্ না?'

আর দাদা বলে, 'হ্যাঁ একি! তুই থাকবি সন্ন্যাসীর মত বসে…? আমার ছোট বোন তো বটে!'

রেবা হাসে, বলে, 'মানে ? আমি খাচ্ছিদাচ্ছি, সাজসজ্জা যথোচিত করছি, হাসি গল্প গানেও আছি, এতে সন্ন্যাসটা কোন্‌খানে ? যে সহজ সুখের বন্ধনের লোভে লোকে বিয়ে করে, সেই সহজ মুক্তির লোভেই আমি বিয়ে করছিনে। তোমার বিয়ে করে সুখ, আমার সেটা না করে সুখ'। সুখের প্রকারভেদ মাত্র। এইমাত্র তফাত। আর ছোট বোন বিয়ে না করাটায় দোষই বা কি।'

নীরা মেয়ে কিনা—বুদ্ধিটি কিছু অদূরদর্শী অর্থাৎ সন্নিকটদর্শী। (বিলাতী পণ্ডিতদের মত এটা, আমার নয়) সে বললে, 'আচ্ছা, সীতেশবাবুকে তোর কেমন লাগে ?' (ওদের কলেজের একজন প্রফেসার ওর হাতের কাছের যোগ্য পাত্র !)

রেবা হাসবে, না কাঁদবে, ভেবে পেলে না। অবশ্য হাসলই খুব। বললে, 'অর্থাৎ ছেলেরা যেমন মেয়ে দেখে বলে আর একটু ফরসা, আর একটু রোগা বা মোটা কি লম্বা হলে বিয়ে করা যায় ! আমি কি এইজন্যে বিয়ে করছিনে ? তাই তুই রাম না হলে শ্যাম, না হলে যদু মতি চুনীবাবু ইত্যাদিদের নাম করতে থাকবি, আর আমি সেকালের স্বয়ম্বর সভায় রাজকন্যের মত তোর (সখির) মুখে সকলের পরিচয় শুনে বরমাল্য হাতে এগিয়ে যেতে থাকব ? না ভাই, তোরা তো বিয়ে কর্‌। আমার যেদিন মনে হবে সেদিন এসে বলব। তোরা যথারীতি ঘোর ঘটা করে বিয়ে দিস্‌।'

দাদা অট্টহাস্য করলেন। নীরাও অপ্রস্তুতভাবে হাসতে লাগল। আসলে, একমাত্র বোন রেবাকে ফেলে ওদের বিয়ে করতে লজ্জা করছিল।

দাদা শুধু বললেন, 'শঙ্কর কিন্তু বড়ই দুঃখিত হবে।' শঙ্করবাবু বাড়ীর পুরাতন বন্ধু। পাত্রও ভালো।

রেবা ভাবে, শোনো একবার ! মনে মনে বলে, বিধাতা যদি ঐ আগের বলা লেখকদের মত আমার হাতে তাঁর কলমটি দিতেন, তাহলে না হয় শঙ্করবাবুর ললাট লিখনটি কেটে দিয়ে আবার নতুন করে লিখে দিতাম তিনি যাতে সুখী হন এমন কিছু। আর ভাবে, আমি তো দধীচি মুনি নই, যে পরোপকারের জন্যে শরীর দান করব। তাও আমার মৃতদেহ নয়, জ্যান্ত !

২

তারপর থেকে দাদা তর্ক না করে হতাশভাবে নীরার সঙ্গ খুঁজতে থাকে। আর নীরা রেবাকে নিঃসঙ্গতা থেকে রক্ষে করতে এ বাড়িতে আরো যাওয়া আসা করে। ফলে যা হয়, রেবা আর্ট স্কুলেই বেশীক্ষণ থাকে বাড়ি ছেড়ে, নয়ত নিজের

ঘরে নিজের কাজ নিয়ে থাকে। ওরা পরম দুঃখে রেবার কথা আলোচনা করতে বসে ভুলে গিয়ে নিজেদের কথাই কয়।

এমন অবস্থায় আর পিসিমাকে না আনলে চলে না। সামনে বৈশাখেই যাতে শুভকাজ করা যায়। বিয়ের যে একটা বাইরের অনুষ্ঠান আছে সেটা তো সোভিয়েট রাশিয়ার মত সংক্ষিপ্ততম নয়, সুতরাং—ছিরি, বরণডালা, পিঁড়ি, আলপনা, শাঁক, কলাতলা, আইবুড়ো ভাত, গায়ে হলুদ, অধিবাস, নান্দীমুখ এসব কে করে ?

অবশ্য পিসিমা কাশী থেকে আসার আগেই রেবা পাঁজিতে শুভদিনের নির্ঘণ্ট দেখে বিয়ের দিন ঠিক করে নিয়েছিল। শাঁক কলাগাছ পদ্মলতায় বেড় দিয়ে লাল চিঠিও ছাপিয়েছিল সেই "যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদন" করে।

নতুন কিছু করতে বসেও মানুষ পুরোনোর মোহ ছাড়ে না। পিসিমা এসে সব ঠিক দেখে খুব খুশী হলেন, কিন্তু রেবার শঙ্করের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে না দেখে খুব রাগও করলেন। শঙ্করের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাবটি বহুদিনের। উহ্যভাবে ছিল যদিও।

তারপর ? তারপর পিসিমা পুরুতমশাই আর পুরবাসিনী এয়োদের নিয়ে ওদের বিয়ে হয়ে গেল। কেউ বর তুলে নিলে না, কেউ 'কনে' খারাপ বললে না, বরের বাড়ি থেকে তত্ত্বও কেউ ফেরত দিলে না। এবং খবরের কাগজে বেরুল, "স্বর্গীয় অমুকের পুত্রের সঙ্গে শ্রীযুক্ত অমুকের কন্যা কল্যাণীয়া অমুকের শুভ বিবাহ হয়েছে। বহু সম্পন্ন ব্যক্তি নিমন্ত্রিত ছিলেন ও বরপক্ষ যৌতুক গ্রহণ করেন নি।"

এবং শঙ্করবাবুও প্রথমে করুণ মুখে রইলেন। তারপর একসময় সহসা হাসিমুখে নানারকম কাজ করতে লাগলেন। ফুলের মালা ও দই পরিবেশনের ভার নিলেন। গল্পের নায়কদের মত কিছুই করলেন না। শেষ অবধি প্রচুর খেলেনও।

অর্থাৎ বিয়ের ব্যাপারটা ফুলের মালা ও দইয়ের হাঁড়ির মত যেমন সুন্দর রঙিন তেমনি স্থূল ও বাস্তব।

রেবার নিজেরও ভারি মজা লাগছিল। কত লোক তাকে ভর্ৎসনা করে গেল বিয়ে হল না বলে। জনান্তিকে কেউ কেউ দাদাকে নিন্দা করে গেল, মা বাপ নেই তাই বোনকে ফেলে নিজে বিয়ে করে নিলে বলে।

যাই হোক্‌ ওদের বিয়ের অষ্টমঙ্গলার পর রেবা পিসিমাকে নিয়ে তাঁর সঙ্গে কাশীতে তার নতুন চাকরিতে চলে গেল।

৩

রেবা ভাবে এবার মুক্ত। মুক্তি এবং মুক্তির নামে আর এক কর্মের বন্ধন।

বিয়ে আর প্রেমের একঘেয়ে ন্যাকামি শুনতে শুনতে তার মনে হ'ত মানুষের এদেশে বুঝি আর কোনো কাজ নেই, শুধু আছে বিয়ে হওয়া আর বিয়ে করা!

পিসিমার যতই দুঃখ হোক রেবার কাজ যেন তাকে একটা আশ্রয় দিয়েছে। কিছুদিন অন্ততঃ সত্যমিথ্যাময় প্রেমের ছলনা আর বিয়ের কথা থেকে অব্যাহতি পেয়েছে।

তাই মনে হয় যা সহজ আর স্বাভাবিক তাকে শুভ নিগড়ে বেঁধে গণ্ডিতে ঘিরে গোলকধাঁধায় ফেলেছে এরা। মনে মনে ভাবে প্রেম কোথায় আছে? মরে গেছে না পচে গেছে?

যা প্রত্যেক মানুষের কাছে চির নতুন অথচ সৃষ্টির পুরাতনতম আদিমতম বিষয়, তাকে কে জেনেছে শেষ করে, বলতে পেরেছে তার মর্মের চরম কথাটি? নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়ে?

অন্ততঃ রেবার মনে হয় কেউ পারে না এবং জানেও না। তার মনে হয়, এদের এই প্রেমের অভিজ্ঞতাকে বলা যায় এটা অনেকটা জামাজুতোর মত। সকলেই জামাজুতো পরে, তাতে এ বোঝায় না একজনের জিনিস অন্যের পরা চলবে, গায়ে হবে। তোমার পরা জামা আমার গায়ে হবে না, এ তুমি জানো, কিন্তু তোমার প্রেমের ভালবাসার নজির আমার বেলায় খাটবে না, এ বুঝতে পারো না?

সে ভাবে, তার চেয়ে ওরা একটা প্রেম প্রকরণ ('ফরমুলা') তৈরী করুক না? অনুরাগ, পূর্বরাগ, সেবা যত্ন, নেশা মোহ, সহিষ্ণুতা ধৈর্য সব মিশিয়ে যেখানে যেমন যে দেশে যেমন দেশাচার, ধর্ম, বিজ্ঞান, সাহিত্য, তথ্য অনুসারে।

আধুনিকতম সোভিয়েট রাশিয়ার প্রেম, বারট্রাণ্ড রাসেলের 'ম্যারেজ এণ্ড মরালস'-এর মতের প্রেম, নানা দেশের আদিম ও নব্যতম প্রেমের নানা সিদ্ধান্ত নিয়ে, সংক্ষিপ্ত এবং দীর্ঘসূচী প্রেম, জৈব ও আধ্যাত্মিক প্রেম সব নিয়ে, তার পাচক ও মারক ক্ষমতা বিশ্লেষণ করে! (যার শেষ কথা মেয়েদের কতটা জড়িয়ে জীর্ণ করতে পারা যায়। ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বটি সম্পূর্ণরূপে হজম করা আর কি!).

৪

নীরার চিঠি আসে প্রায়ই নিজেদের সুখের কথা নিয়ে, আর রেবার বিয়ে না হওয়ার দুঃখের বিলাপের কথা লিখে।

রেবা ভাবে, ভালো বিপদ এদের নিয়ে তো।

উপরে লেখা 'প্রেম প্রকরণে'র কথা সংক্ষেপে লিখে সে চিঠির জবাব দেয়।

ভাই নীরা, তোর চিঠিটার আর সব কথার জবাব তো দিলাম। এখন আমার নতুন চাকরি ও তার কর্তৃপক্ষের কথা বলি শোন্। এটির এরা 'আদর্শ হিন্দু আশ্রম' নাম দিয়েছে সতীশবাবু সুকুমারমতি বালক-বালিকাদের নিয়ে একটি স্কুল তৈরী করেছেন।

আমি তাদের একটু পড়াই, আঁকতে শেখাই, মাটির পুতুল গড়তে শেখাই। পড়ার আগে প্রথমে নানাবিধ জন্তু তারা আঁকতে শেখে, গড়তে শেখে। বেশ মজার ব্যাপার তাদের আঁকাটা! কারুর হাতিটা হয় ইঁদুরের মত, কারুর বা ইঁদুরটা হয় হাতির মত। সাপটা ওরা সহজে আঁকতে পারে, পাখীটাও আঁকে, কিন্তু ব্যাঙ মোটেও আঁকতে পারে না। ওদের চিত্র-বিদ্যা ও ভাস্কর্য শেখাতে গিয়ে মনে হয়, নিজে না চিত্র-বিদ্যাটি ভুলে যাই।

কর্তৃপক্ষটি হচ্ছেন, সেই ধরনের লোক, যারা পৃথিবীকে একটা ইউটোপিয়া (রামরাজ্য) বানিয়ে দিতে চান। ইনি পৃথিবীকে নাগালে না পেয়ে কাশীটাকে ধরেছিলেন। এখন তাও সম্পূর্ণ অধিগত হল না, সুতরাং এই স্কুলটি আর তার পঁচিশটি ছাত্রছাত্রী নিয়ে তাঁর এক্সপেরিমেন্ট বা গবেষণা চলছে। উদ্দেশ্য মহৎ, ওরা নৈতিক ও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী থাকবে পঁচিশ বছর অবধি তারপর খাঁটি বর্ণাশ্রম মতে সংসারী হবে।

শারদা বিলের জন্য গৌরী বা কন্যা মেয়ে দশ বছরের পাবে না, তাই বড় মেয়ে চলবে।

তা তারা যা ইচ্ছে করুক। আমার মতে এখন তারা যদি ছবি আঁকা শেখবার জন্য একটু ভাল করে ড্রয়িং শেখে তো কাজ হয়।

আমি সমস্তদিন স্কুলে থাকি, সন্ধ্যায় বাড়ী আসি। তাদের কাপড়-চোপড় পরিষ্কার রাখা, দাঁত মাজা, স্নান করানোর তদ্বির করি।

চুপি চুপি বলি ভাই, আমার ইউটোপিয়ার আদর্শ কিন্তু কিছুটা অন্য, পরিচ্ছন্ন শরীর ও নির্মল মন, বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব যদি পাওয়া যায় সকলে পাক।

সে যাক। যদি তোমরা একবার আস তো দেখে অবাক হয়ে যাবে আমার কি অসীম সহিষ্ণুতা। একেবারে বালখিল্য ব্রহ্মচারী দল পরিবেষ্টিত বিশ্বমাতারূপ! (মানে স্কুল-মাতা)।

এখন অবধি বেশ শান্তিতেই তো ছিলাম।

কিন্তু হেনকালে হঠাৎ গঙ্গার ঘাটে পিসিমার সঙ্গে শঙ্করবাবুর মার দেখা।

তিনি কিঞ্চিৎ দুঃখ ও ক্রোধ প্রকাশ করেছেন আমার উপর। তাঁর ছেলের জন্য মেয়ের আবার ভাবনা কি? তবে কিনা ওঁরা একবার কথা পেড়েছিলেন, তাই সে এখনো ওই মেয়ের পানেই চেয়ে আছে…এবং 'যাচা কনে।' ইত্যাদি… আর দাদার বিয়ে হয়ে গেলো, বোনের বিয়ে হ'ল না। আশ্চর্য ও লজ্জার কথা নয় কি?

আর পিসিমাকে কে পায়! তাই তো, সত্যিই তো, রজনীরই বা কি আক্কেল! নিজে বিয়ে করল আর বোন করছে চাকরি। গঙ্গার ঘাটে আমার মুখ দেখানো ভার! তোদের জন্যে।

আমি পিসিমাকে বললাম বুঝিয়ে, 'দাদাও চাকরি করছে। এবং আমারও বিয়ে হতে পারবে ইচ্ছে করলেই। সেটা আমিই ইচ্ছে করি নি।'

তারপর বললাম, 'তুমি এক কাজ কর, তুমি ওঁর নাইতে যাবার সময়টা কাটিয়ে দিয়ে গঙ্গায় যেয়ো। তা'হলে আর কথাও বাড়বে না, মুখ দেখানোর অসুবিধেও হবে না!'

পিসিমার ঐ এক যুক্তি ও বিলাপ ঐ প্রবচনটি, 'যাচা কনে', 'বাছা বর।' এবং এরপর আমার আর বিয়ে হবে না কোনোকালে।

বললুম, 'নাই হ'ল।'

পিসিমা রাগে গরগর করতে করতে পুজোর ঘরে ঢুকলেন।

আমি ভাবতে লাগলাম, 'যাচা কনে' অর্থাৎ আমাকে যাচ্ঞা করেছে তারা। কৃতার্থ হয়ে গেলাম! কেউ যাচ্ঞা করেছে বলেই আমি তাকে যাচ্ঞা করব।

মানুষের দেখি মজার স্বভাব, আমরা ছেড়ে দিলেই তারা আঁকড়ে ধরে। সত্যই তো এই কন্যাদায়ের দেশে কি আর মেয়ে নেই?

পিসিমার বিলাপ আর শঙ্করবাবুর মার বিরাগ-সংবাদ শেষ করি এইখানেই।

হায়রে আমার শান্তি!…ইতি রেবা।

জলের মত দিন, মাস, বছর যে কত এলো গেলো রেবাকে, রেবার দাদাকে, বৌদিকে পরিক্রমা দিয়ে সে আর কারো মনে নেই।

তার মাঝে আরো দু'চারবার রেবাকে যাচ্ঞা করেছে দু'চারজন। রেবা ফিরেও চায়নি। পিসিমা বিরক্ত হয়েছেন। দাদা নীরা বলে বলে হাল ছেড়ে দিয়েছে। শেষ অবধি পিসিমারও কাশীপ্রাপ্তি হ'ল। দাদা বৌদিও সংসারযাত্রায় জড়িয়ে পড়ল ছেলেমেয়ে আত্মীয়কুটুম্ব নিয়ে, লোক-লৌকিকতা নিয়ে।

বছরের হিসাব কে রাখে ? আর রেবার বয়সের হিসাবই বা কে রেখেছে, পিসিমার মৃত্যুর পর। কত বছর হ'ল চাকরি ? বয়সও কত হল ? এক একবার ভাবে সে। বার বছর ? চৌদ্দ বছর ? সতীশবাবুর আদর্শ আশ্রম থেকে ছেলে-মেয়েরা গেছে কয়েকটি।

তবে ভীষ্মদেব শুকদেবের মতও কেউ হয়নি। রাম লক্ষ্মণের মতও কেউ হয়নি। বর্ণাশ্রমের দ্বিতীয় আশ্রমটিতে ঢুকেছে, চাকরিবাকরি করছে। ম্লেচ্ছ স্কুলে পড়া লোকেদের মতই যতটা পারে সুখের স্বাচ্ছন্দ্যের লোভও করেছে। সন্নিকট আত্মীয়স্বজনকে বাদ দেবারও অভিসন্ধি রাখে আধুনিকতম ভাবেই।

রেবা মনে মনে হাসে। কিন্তু চাকরি ছাড়তে পারেনি। ছেড়ে করবেই বা কি ? যেন অন্যমনেই জীবনটা তার কেটে যাচ্ছে।

গরমের ছুটি এলো। বহুদিন পরে রেবা কলকাতায় এলো।

নীরা বেশ গিন্নীবান্নি হয়েছে, দাদাও যেন খুব কর্তাব্যক্তি হয়েছে। নিজের বয়সের কথা রেবার মনে পড়ল না কিন্তু। আশ্চর্য !

এও তো সত্যি, বেশ ভারিসারি চেহারা ওর ছিলও না, হয়ও নি। পিসিমার মৃত্যুর পর সে অনেক কাল আসেনি, প্রায় পাঁচ বছর। রেবার মনে হল, ওরা আপনার লোক বটে কিন্তু যেন কত তফাত হয়ে গেছে। যেন ভীষণ আত্মকেন্দ্রিক। কথাবার্তা কাজকর্ম সবই যেন শহুরে সমসাময়িক দ্রুত চিন্তায় আর আত্মকথায় ভরা। ওদের আশেপাশে যে অন্যকোন কাজ বা কথা অথবা মানুষ আছে তাদের কথা ওদের মোটেই ভাববার সময় নেই। রেবার অস্তিত্বও যেন আর ওদের মনে থাকতে চাইছে না।

কলেজের জীবনের কথা মনে পড়ল রেবার। মাঝে মাঝে পুরানো কথা তোলে সে, কিন্তু নীরা বা দাদার মোটেই আর সে প্রসঙ্গে আগ্রহ নেই।

৫

রেবার ফেরবার সময় হলো কর্মক্ষেত্রে।

রাত্রের গাড়ি। মধ্যম শ্রেণীর একটি কামরায় উঠে সে বসলো। ভিড় মন্দ নয়। কতজন এলো, জায়গা করে নিল বসবার শোবার। দাদা তুলে দিয়ে চলে গেছে।

সহসা শেষ মুহূর্তে একজন পুরুষ একটি মেয়েকে তার দুটি সন্তান নিয়ে গাড়ীতে তুলে দিতে এলেন।

বসবার জায়গা নেই তা নয়, কিন্তু রাত্রের যাত্রীরা বিছানা পেতেছে। বিছানা তুলে নিতে কেউ রাজী নয়। মেয়েটি দাঁড়িয়ে রইল ছেলেটিকে বাঙ্কের উপর বসিয়ে। বিছানাওয়ালাদের যুক্তি, আগে এসে জায়গা নিয়েছে তারা।

রেবারও বিছানা পাতা অর্ধেক বেঞ্চি। সে একটু ভেবে বললে, 'আমি ওপরে একটা বাঙ্কে উঠে যাচ্ছি, আপনি ওদের নিয়ে এখানে বসুন। বাচ্চাটিকে বিছানা পেতে শুইয়ে দিন।'

সে কৃতজ্ঞও হ'ল। আবার 'না না, সে কি?' তাও বললে।

বেশ সুন্দর ছেলে দুটি। শ্যামবর্ণ দীপ্ত চোখ বুদ্ধিমান চেহারা বড়টির। রেবার মনে হতে লাগল, কার সঙ্গে সাদৃশ্য আছে যেন ছেলেটির। কে সে? মনে করতে পারলে না। ছোটটি যেমন হৃষ্টপুষ্ট তেমনি সুন্দর ফর্সা।

বাঙ্কের উপর থেকে সে ছেলে দু'টিকে দেখে, তাদের জননীকে দেখে। বিছানা পাতা হ'ল, বেঞ্চির মাঝখানে বাক্স দিয়ে জননী সেখানে বসল। পাছে শিশুটি পড়ে যায়। বড়টির কোনোক্রমে একটু ঠেস দিয়ে শোবার জায়গা করে দিল।

গাড়ি ছেড়ে গেল। যাত্রিনীরা এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হয়ে সকলে সকলের দিকে চাইল, নাম ও পরিচয় নিতে বসল। যাত্রাপথের ও গন্তব্যস্থানের কথা হ'তে লাগল।

আপনি কতদূর যাচ্ছেন? ও বাবা দিল্লী? আপনি? কাশী? আপনি? পাটনা? কাশীতে কেন? ছেলেদের মা জিজ্ঞাসা করে। কে আছেন সেখানে? আর একজন বলে।

রেবা হাসে, বলে, 'কেউ নেই, চাকরি করি।'

একজন বর্ষীয়সী বললেন, 'বিয়ে হয়নি বুঝি? মা বাপ নেই? দেখতে তো খাসা।'

রেবা হাসে, উত্তর দেয় না।

অন্য বাঙ্কের ওপরের স্তূপাকার বাক্স, তোরঙ্গ, অল চোখে পড়ে। লেবেলগুলির নাম চোখে পড়ে। 'হাওড়া টু ডেল্হি এন. কে. মিত্র।'

'হাওড়া টু পাটনা। এস. পি. দত্ত।' 'হাওড়া টু বেনারস' আরেকজনার নাম!

রেবা শুয়ে পড়ে, ঘুম পায়। যাত্রিনীরাও আপনাদের কথা আলাপ শেষ করে শুয়ে পড়ে।

ভোর হয়ে এলো। বাংলাদেশের শ্যামল মাঠ ঘাট নদী বন আর নেই। গ্রামও আছে, শ্যামলতাও আছে। কিন্তু সেগুলি বাংলাদেশের "ছায়া সুনীতল নদী

কালোজল, ছোট ছোট গ্রামগুলির" মত নয়। রেবার বাঙ্ক থেকে সে দৃশ্য দেখা যায় না, নামতে ইচ্ছা করে। কিন্তু জিনিসপত্র নারী ও শিশুদের বিস্রিস্ত পুরীতে নামা শক্ত। সে শুধু চেয়ে চেয়ে দেখে যায়।

পাটনা-যাত্রিনী উঠে পড়েছে। ছোট ছেলেটি ঘুমোচ্ছে, মার মত মুখ। বড় ছেলেটিকে কিন্তু কেবল চেনা চেনা মনে হয় রেবার।'

সহসা সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই পাটনা জংসন এসে পড়ল।

একটি পুরুষ এসে ডাকল, 'এসো, এসো, নেমে এসো। মমতা, খোকাকে আমার কোলে দাও, ঘুমুচ্ছে। জিনিসপত্র ঠিক আছে তো? এই কুলি দো আদমী আও। রাত্রে ঘুমুতে পেরেছিলে?'

মেয়েটি বল্লে, 'হ্যাঁ, ভাগ্যিস ইনি ছিলেন, ওই যে বাঙ্কে রয়েছেন। উনি উঠলেন তাই তো জায়গা পেলাম, নইলে কি আর···। উনিই নিজের জায়গাটুকু দিলেন।'

'ওঃ' বলে পুরুষটি ওপরে চেয়ে দেখলেন, বল্লেন, 'অনেক ধন্যবাদ।'

রেবা তখন উঠে বসেছে। সহসা পুরুষটি বল্লেন, 'রেবা?'

অস্ফুট স্বরে রেবাও বললে আশ্চর্য হয়ে, 'শঙ্করবাবু!'

কুলিরা এসে পড়েছে, জিনিসপত্র নামানো ও অন্য যাত্রী ওঠার ভিড়ের মাঝে মেয়েটি একবার একটু হেসে বললে, 'নামি ভাই। আপনাকে উনি চেনেন দেখছি।'

শঙ্কর নেমে গিয়ে জানলা দিয়ে বললে, 'আচ্ছা। খুব হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। কতকাল পরে।'

রেবা বাঙ্ক থেকে নেমে পড়ল। তাদের তখন প্লাটফরমে জিনিসপত্র কুলির মাথায় তোলা হচ্ছে। ছেলে দুটি মার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। জানলা পথে ওকে দেখতে পেয়ে মেয়েটি আর একবার হাসল, বেশ দাঁতগুলি, চেহারাটিও মন্দ নয়। ছেলেমানুষ দেখতে। একখানি ধানী রংয়ের শাড়ি পরা ব্লাউজের সঙ্গে। চুলটি সাদাসিদেভাবে বাঁধা। হাতে ক'গাছা চুড়ি, গলায় হার, মাথায় সিঁদুর। বেশ দেখাচ্ছে উস্‌কো-খুস্‌কো চুলে। কত বয়স?···

বাক্স ওঠানো হ'ল কুলির মাথায়। শঙ্করও একবার কামরার মাঝে চাইল। তখন ভিড়ে ভরে গেছে গাড়ি নতুন যাত্রীনীদের। রেবাকে ভাল করে দেখা গেল না। রেবা অবশ্য দেখতে পেয়েছিল। তার মনে হল আর ভিতরে চাইবার কি দরকার?···কিন্তু···।

গাড়ি ছাড়ল। কি ভেবে সে মুখটি একটু ঝুঁকিয়ে বাইরের দিকে চাইল।

তারা চলে যাচ্ছে, বেরিয়ে গেল প্লাটফরম থেকে, মেয়েটির ধানী রংয়ের শাড়ী, শার্ট ও হাফপ্যান্টপরা ছেলেটি, বাপের কোলে ছোট ছেলে। মুখ হাত ধুয়ে সে ফিরে এসে একটা বেঞ্চির এক কোণে বসল। জানলা দিয়ে অন্য মনে বাইরে চেয়ে রইল।

এবার দানাপুর, তারপর? মনে পড়ে না।

মনে পড়ল মেয়েটির কথা কয়টি, উনিই আমার জায়গা ছেড়ে দিয়েছেন। সহসা মনে হ'ল কত নিগূঢ় অর্থ যেন কথাটার? 'জায়গা ছেড়ে দিয়েছেন।' কোন জায়গা, কতটা জায়গা? তার ট্রেনের বসবার জায়গাটুকু শুধু?...

এবার মনে পড়ল পিসিমার কথা। 'যাচা কনে'। হ্যাঁ, পিসিমার আট বছর মৃত্যু হয়েছে, তারপর আর তার কথা কেউ ভাবেনি। সে নিজেও ভাবেনি।

কেউ তাকে আর 'যাচ্ঞা'ও করেনি। আর 'যাচ্ঞা' করবার লোকও কেউ আসবে না বোধহয়।

এবারে সহসা মনে হয়, কোনো কার দুটি বলিষ্ঠ বাহুর মাঝে সেই জায়গাটি ছিল। আর তারই একখানি ঘরে আর দু' একটি কচি হাতের বন্ধনে ঘেরা সে জায়গা। কে সে? শঙ্কর? আর কেউ? কিন্তু সে সব জায়গাই ছেড়ে দিয়েছে অনেকদিন আগে। আর কোথাও জায়গা নেই।

রচনাকাল—১৩৬৪

জননী

জাজ্বল্যমান সংসার। চার ছেলে, দুই মেয়ে, পৌত্র পৌত্রী, দৌহিত্র দৌহিত্রীতে সাজানো, সমৃদ্ধ। ছেলেরা কৃতী—একজন প্রফেসার, একজন ডাক্তার, দু'জন উকিল।

সংসার চলে স্বচ্ছন্দে সচ্ছলে; সময় কাটে কাজে কোলাহলে; সুতরাং সাংসারিক অশান্তি শুধু বাক্যের পথ দিয়েই উঁকি মেরে যায়।

মোটের ওপর সব ভাল।

কিন্তু একটি চিরন্তনী গোল ছিল, সেটা ছিল বড় ছেলের মাতৃহীন বালক যোগেনকে নিয়ে।

মায়ের অভাবটি পরিপূর্ণ ক'রে দেবার প্রবল প্রচেষ্টাতে পিতামহী যে প্রচুর পরিমাণে প্রশ্রয় তাকে দিয়েছিলেন, সেইটেই পিতামহী আর পৌত্রের দুজনেরই কাল হয়েছিল। দ্বন্দ্ব, বিবাদ, বিরোধ, বচসা যা কিছু উঁকি মারত, তার যবনিকার অন্তরাল থেকে সপিতামহী যোগেনকে সকলেই চট ক'রে আবিষ্কার করত।

মার পক্ষপাতিত্ব বাড়ির কাকপক্ষীও দেখতে পায়, এইটে ছিল বাড়ির মতামত।

নানা পথ দিয়ে বিরক্তি আসে, বিরক্তির সঙ্গে বিঘ্নও আসে। মাসের পয়লা থেকে হিসাব-নিকাশের সময়, মুদী, ময়রা, গয়লা, ধোপা, দর্জী তো আছেই, তার ওপর গলির মোড়ের 'সর্বভাণ্ডার' দোকানের চায়ের টিন, বিস্কুটের বাক্স, দেশলাই, মোজা, জামা, শাড়ি, ধুতি, সাবান, কাপড়কাচা সাবান, কাগজ, পেন্সিল, কালি আদি নানাবিধ দ্রব্যের অনাদ্যন্ত বিল আসে। চার বউ, চার বাবুর ইনিশিয়েল সই ক'রে দেন। মুদী আসে, ময়রা আসে, সর্বভাণ্ডার আসে সরবরাহ নিয়ে। দর্জী আসে গজ নিয়ে ফিতে নিয়ে ইত্যাদি।

মাসকাবারি নানাবিধ বিল দেখতে দেখতে কারুকে দিয়ে, কারুকে স্থগিত রেখে, কারুকে ভগ্নাংশ মাত্র দিয়ে, বিরক্ত মুখে বড় ছেলে উঠে এলেন, এই সেদিন আর বছর এত বিছানাপত্র করালে মা, আবার এবার?

অপ্রস্তুত মা বললেন, যশুর জন্যে করতে দিয়েছিলাম।

অপর ছেলেরাও এসে বসলেন।

সেদিনকার গুলো? বিরক্তি জিনিসটা সংক্রামক। বিরক্ত তৃতীয় পুত্র বললেন, সেগুলো কার?

সেগুলো অন্য পৌত্রদের, তৃতীয় পুত্রের মেয়ের, বড় ছেলের ছেলের ইত্যাদির।

জননী নাম করলেন না।

মধ্যম পুত্র বললেন, মা, তোমার কেমন যোগে যোগে বাতিক! সেদিন তো যোগেনও কি একটা হ'ল? আর লেপ?

জননী বললেন, সেটা বালিশ একটা যোগের। এবং একবার বলতে চাইলেন, যে লেপটা যোগেনের নয়, সেটা বিশুর; কিন্তু নিরর্থক হবে জেনে মৌন হয়ে রইলেন।

বড় খগেন্দ্র বললেন, দেখ না, এ মাসে দর্জীর বিলই কত হয়েছে! দুধের হিসেব দিয়ে গেল মতি, চল্লিশ টাকা এবার দুধের। সবই মোটা অঙ্কে বেড়েছে যে। দশ টাকা ক'রে প্রত্যেকটায় বেশি আছে, কম তো কোনটাতে নয়।

মধ্যম জগদিন্দ্র বললেন, হ্যাঁ, আমি তো দেখিছি, যেন কিছুরই মাত্রা নেই।

পাশের ঘরে বধূরা কন্যারা ছিল, জননী ব্যাকুল হয়ে বললেন, ওরে, এ মাসে যে সব তত্ত্ব-তালাস আনা-নেওয়া মেয়ে-বউমাদের করলাম, জামাইরা এলেন, ভাইদ্বিতীয়া গেল, ছেলেপিলে পাঁচটি এসেছে, খরচ তো হবেই, অত চেঁচাস নি।

আগে? এত কি তখনও খরচ হ'ত?—কনিষ্ঠ পুত্র জিজ্ঞাসা করলে।

মা বললেন, ওরে, এখন যে সব মাগ্‌গিগণ্ডা হয়েছে। মুখে এল—তখন ছেলেপিলে সংসারে সকলের হয়নি; কিন্তু ষাট, সে তো মনেই আনতে নেই, মুখে তো দূরের কথা। তারপর হাসি-অশ্রুতে মিলিয়ে মনে এল তখনকার হিসাব।

কিন্তু তোমরা হিসেব বোঝ না।—তৃতীয় নরেন বললেন।

সকলেই বললেন, সেটা ঠিক।

মা অপ্রস্তুতভাবে একটু হাসবার চেষ্টা করলেন।

আর যোগেনের বজ্জাতির শেষ নেই, সে খবর তো মা রাখ না। পড়াশোনায় বাবু আজকাল বেজায় স্বাধীন, তুমি ওর মাথাটি চিবিয়ে খাচ্ছ মা।—কনিষ্ঠ পুত্র উষ্ণ স্বরে বললেন।

ষাট ষাট, তোমাদের কি কথা বাবা! কথা কি কইলেই হ'ল?—যশুর পিতামহী ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

কনিষ্ঠের কথায় যোগেনের পিতা বললেন, বটে। এদিকে ছোঁড়া বাড়ছে যেন তালগাছ। খাবে আর বজ্জাতি করবে।—বিরক্ত স্বরে ব'লে আপনা হতেই যেন মার দিকে চাইলেন।

খাওয়ার কথায়ই জননীর মনটা পীড়িত হয়ে উঠল। যোগেনের সত্যই সুখাদ্যে আত্যন্তিক রকম রুচি ছিল। মাতৃহীন বালককে পিতামহী কোন দিন সে বিষয়ে কিছু বলেনও নি, এখন কিন্তু অন্যত্র তাকে সুখাদ্যের সঙ্গে খোঁটাও খেতে হ'ত।

খরচপত্র, আয়ব্যয়, পুজোর পর মোটর কাজ, বাকি টাকা ইত্যাদি, যোগেন এবং অন্য বালক বালিকা, নানাবিধ আলোচনার পর ছেলেরা কেউ ঘরে কেউ বাইরে গেলেন।

স্তিমিতপ্রদীপ আলো-আঁধারের আভাসে ভরা দালানে ব'সে হরিনামের মালাটি হাতে নিয়ে জননী মনে মনে হয়তো বেদনার মালা জপ করতে লাগলেন।

তা তুমি যতই বল মেজবউ, ওর দোষ উনি দেখতে পান না। ওই বুড়ো হাতী ছেলে কি রকম যে করে ছোটদের সঙ্গে, তা মা যদি একটি কথা ওকে বলেন!—সেজবউ বললেন, মেজবউয়ের ছেলের সঙ্গে সেদিন যোগের ঝগড়া হয়েছিল।

সেজবউ বললে, মা তো তাই কারুকেই কিছু বলেন না। তা ছাড়া ওর মা নেই। প্রথমকার নাতি। তার নিজের জননীরও ওই রকম পৌত্রের উপর ঝোঁক ছিল।

নাতি তো সবাই।—মেজবউ গম্ভীর অপ্রসন্ন মুখে ব'লে আরব্ধ কাজে মন দিলে।

প্রতিবাদ জিনিসটা যতই জনান্তিকে হোক না, যার নামে হয় তার কাছে একদিন এসে পৌঁছয়ই এবং শুধু পৌঁছয় না—অলঙ্কৃত সুসজ্জিত হয়ে আসে।

মা যেন মাটি হয়ে গেলেন।

বার্ধক্য আসে নি, কিন্তু স্থবিরতা এল।

আস্তে আস্তে সংসারের সব কাজ এবং দায়িত্বভার ছেড়ে দিয়ে সকালে নিভৃত ঠাকুরঘরের কোণ, আর সন্ধ্যায় শিশুদের রূপকথায় মণ্ডল সৃষ্টি ক'রে, বহু যত্নে বহু আয়াসে পরম মমতায় গ'ড়ে তোলা সংসারকে জননী ছেড়ে দিলেন।

বধূরা মাঝে মাঝে ডাকে, মা, এইটে বলুন, এইটে ক'রে দেবেন। মা মৃদু হাস্তে স্বীকার ক'রে নেন, কিন্তু দরকারের সময় ঠাকুরঘরেই থাকেন।

হিসাব-নিকাশ, গৃহিণীপনার স্রোত তার নির্দিষ্ট পুরাতন প্রণালী না পেয়েও ছোট ছোট নতুন প্রণালী দিয়ে সহজেই ব'য়ে যায়।

মার দিকে চোখ পড়ল সকলের, কিন্তু ধরা গেল না। বুড়ো হয়েছেন? শরীর ভাল নেই? বাঁচবেন না আর? সবাই—ছেলেরা ভাবে নিজের মত ক'রে। মাকে আবশ্যক না থাক, বেদনাবোধ তো আছে। বহুকালের পুরাতন প্রপিতামহীর প্রতিষ্ঠা করা দীঘি, গাছ হঠাৎ শুকিয়ে যেতে থাকে, মনের ভেতর কি যেন অভাব বোধ হয় হয়তো।

ছেলেরা বধূরা সব জিজ্ঞাসা করেন, মায়ের কি চাই? মায়ের যোগের কি চাই? অভিযোগের অনুযোগের ভাবে নয়—আন্তরিক।

যোগের? কি জানি, সবই তো আছে—দেখ এ'খন তোমরা। নিজের?—জননী মৃদু হাস্তে বলেন, না বাবা, নিজের আর কি চাই? সবই তো আছে।

সংসার সুনিয়মে চলে। অন্তরে বেদনা কারু বাজে, কারু বাজে না; সেটা আছে হয়তো।

কবে জর হয়েছে জান না?—বিরক্ত বড় ছেলে স্ত্রীকে বললেন।

আমরা কি ক'রে জানব ? রোজ নেয়েছেন, পুজো করেছেন, খেতে পারেন না শুধু। আজ সকালে যোগেন এসে বললেন, ঠাকুমা ডাকছেন, জ্বর হয়েছে। তাই টের পেলুম। আমাকে বললেন, ঠাকুররা উপসী থাকবেন, তাই পুজো করতে।—যোগেনের বিমাতা উত্তর দিলেন।

চল, দেখে আসি, তোমরা আশ্চর্য মানুষ !—বড় ছেলে বেরিয়ে এলেন।

একে একে চার ছেলে সব এসে বসলেন। জননী চুপ ক'রে শুয়েছিলেন, যোগেন পাশে ব'সে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল।

বড় ছেলে মার মাথায় হাত দিলেন। ডাক্তার-ভাইকে ডেকে বললেন, সভু, দেখ, জ্বর বেশ।

জননী, ছেলের হাতখানি মাথায় সুশীতল মনে হওয়ায়, 'আঃ' ব'লে বললেন, 'না, জ্বর বেশ কোথায় ? এই গায়ে কেমন বড্ড ব্যথা, তাই আর উঠি নি। তোরা মিছে হৈচৈ করছিস।

সকালবেলা হৈচৈ বলা সত্ত্বেও বিকালে চোখ আর মায়ের খুলতে চাইল না, আচ্ছন্ন হয়ে শুয়ে রইলেন।

দিন তিনেকের মধ্যে ওষুধে টিউবে ইন্‌জেক্‌শনের সাজ-সরঞ্জামে বিঘে উদ্রেককে ঘরের টেবিল টুল ভ'রে গেল।

স্তব্ধ আচ্ছন্নমুখ জননীর মুখপানে চেয়ে ছেলেরা আসা-যাওয়া করেন, বারবার জিজ্ঞেস করেন, মাকে ওষুধ দিয়েছ ? দুধ ? আঙুরের রস ? কতটুকু ক'রে দাও ? দেখ না কেন ?

অর্থ ব্যাকুলতা, সেবা নিরর্থক শত পথ দিয়ে বেরিয়ে যায়, যাঁর জন্য, তিনি কিছুই জানতে পারেন না।

ও মা, মা ? দিদিকে আজ আনতে পাঠাব ? ছোড়দি এসেছে।

জননী একবার চোখ খুলে বললেন, আচ্ছা।

যত ঘুরে-ফিরে আসে, সেই ঘরে বেড়ায়, তার আকুলতা কারুর চোখে লাগে না। রাত্রে সবাই বিশ্রামের জন্যে একটু গেলে সে পিতামহীর বুকের কাছে মাথাটা আনে, তিনি অজানতেই ক্ষণচেতনে একবার তার মাথায় ওপর শীর্ণ হাতখানি রাখেন।

তারপরেই আবার চোখ বুজে নেন, নয়তো আপন মনে কি সব বলতে আরম্ভ করেন।

কর্ম-অবসরে ছেলেরা এসে বসেন ; মনের বিস্মৃত কোণ থেকে বাল্যকাল,

জননী, খেলাধূলা, আবদার প্রশ্রয় থেকে আরম্ভ করে সেদিনের সম্প্রতির ছোট ছোট কথা বাদানুবাদ বিসর্পিতগতি বেদনার বার্তা ব'য়ে এসে দাঁড়ায়; আঘাত? মাকে? মন স্তব্ধ হয়ে থাকে, জবাব দেয় না। তর্ক? দুঃখ দেওয়া? যোগের জন্যে? কই, না তো। কিন্তু যোগের জন্যে মা তো আর কিছুই কোন দিন বলেন নি। জননী কি আর সংসারের মাঝে ছিলেন না?

রোগিণীর ম্লান বিশীর্ণ মুখের পানে চেয়ে চোখ ভ'রে আসে, সকলেই আপনার কাছেই আপনার অন্তর গোপন ক'রে নিতে চায়।

মাকে যত্ন করবার, জিজ্ঞাসা করবার, শুধু ডাকবার একটা আকাঙ্ক্ষা অন্তর মথিত ক'রে ওঠে; কারণে অকারণে ছেলেদের আসা-যাওয়া জিজ্ঞাসার বিরাম নেই; শুধু জননীর চেতনা কখনও অল্পমাত্র সাড়া দেয়, কখনও দেয় না।

পিসীমাদের চতুর্থী সারা হ'তে না হ'তেই ছেলেদের মাতৃদায়ের আয়োজন শুরু হয়ে গেল।

খাট, পালঙ্ক, সাটিনের বালিশ, সুদৃশ্য ছিটের লেপ তোষক, নেটের মশারি, ঘড়া, গাড়ু, তৈজসপত্রে বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ ভ'রে গেল।

চার ছেলের চারটি, পৌত্রদের মধ্যে বড় এবং পিতামহী অত্যধিক ভালবাসতেন ব'লে যোগেনেরও একটা ষোড়শ।

পিসীমাদের, জননীদের, বাপ-কাকাদের নিরবসর দিন। জননীকে কেন্দ্র ক'রে যে আয়োজন, তাতে জননীকে স্মরণ করবার অবসর নেই। শুধু ক্ষণে ক্ষণে অভ্যাগত কুটুম্ব সমাগমে সকলের মনের গোপন ব্যথিত অংশ একবার দেখা দিয়ে যায়।

যগু কি করে, খায়, না খায়, কোথায় থাকে, কি ভাবে থাকে লক্ষ্য করবার সময় কেউই পায় না। মাঝে মাঝে ছোট কাকা এক একবার ডাকে ডাকে; হ'তো কাকের মতন রুক্ষ চুলে, দীর্ঘ শীর্ণ দেহে, সাদা উত্তরীয়ে থানে, কিম্ভূত-কিমাকারদর্শন বালক; আহ্বান করলে মুখে দীন ম্লান অপ্রতিভ হাসি ভেসে ওঠে একবার, চোখে জল এসে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে।

তৃতীয় প্রহর শেষ হয়ে এসেছে, ডাক পড়ল, যগু, ওরে যোগে, যোগে কোথা? ডাক ডাক, কাজ আরম্ভ ক'রে দিক।

সুসজ্জিত সভামধ্যে কীর্তনের আসরে কুটুম্ব আত্মীয় বন্ধু স্বজনের সংখ্যা ছিল না।

কে এক ভৃত্য শীর্ণ, দীর্ঘকায়, তেরো বৎসরের বালককে ডেকে আনলে। কোথায় ছিলি? আয় আয়।—পিতা আহ্বান করলেন।

বিস্ফারিত চোখে বালক জিজ্ঞাসা করলে, কি?

আসনে ব'স।

পুরোহিত বললেন, এই যে এইখানে বাবা।

যশু বললে, কি করব?

তোকে যে ঠাকুমার দান উৎসর্গ করতে হবে—এই সব।—সুসজ্জিত দ্রব্যাদি দেখিয়ে পিতা বললেন।

বালক আশ্চর্য হয়ে বললে, কাকে?

আঃ, ব'স না, ঐ মন্ত্র পড় না।

নির্বোধের মত খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে দু একটা উৎসর্গের মন্ত্রপাঠের পর কুশের আংটি শ্বেত উত্তরীয় ফেলে লুটিয়ে প'ড়ে সে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল, ওরে ঠাকুমারে, তোমাকে ওরা তখন কেন এই সব একটাও দেয় নি রে—

কীর্তনের আসরেই জনতা বেশি; দু-একজন একদিকেও ছিল, তারা আর তার বাপ-কাকারাও ছুটে এলেন, কি রে? কি হয়েছে কি? কাঁদিস কেন?

বালক ততক্ষণে চোখ মুছে স্তব্ধ হয়ে উঠে বসল।

কি হ'ল কি? জবাব দেয় না। এই?—পিতা রেগে উঠলেন।

অন্য পাঁচজন বললে, আহা, ওর মন কেমন করছে। ছোট কাকা নীচু হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, কি রে যশু?

যশুর টপটপ ক'রে ধারা ব'য়ে চোখ থেকে জল পড়তে লাগল, মৃদুস্বরে সে বললে, তখন তো কেউ তোমরা ঠাকুমাকে এই সব কিছুই দাও নি! খালি সবাই রাগ করতে।

বালক আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, আমি মরা ঠাকুমাকে দিতে চাই না।

ছোট কাকার চোখ ভিজে উঠল, চার ভাই স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

রচনাকাল—১৩৪২

পর, পর মা, গয়না পর।

ওরা কনে দেখে ফিরে গেল, গহনা কাপড় সব ছেড়ে ছাতের কোণে এসে ব'সে নিভার চোখ দিয়ে টপটপ ক'রে জল পড়ছিল।

সূর্যাস্তের সময়। রাঙা হয়ে উঠেছে পশ্চিম দিগন্ত। কালো কালো মেঘ, একদিকে গোটাকতক সোনালী-পাড় কাপড়ের মতন প'ড়ে আছে। অন্য সময় ঐ শোভা দেখাতে সে ছোট বোনকে মেজ বোনকে ডাকে, আজকে তার চোখে ওসব শোভা হিসেবে পড়ছিল না আর। এমনিই চেয়েছিল।

আজকে ওরা আবার—বড়রা কেউ ছিল না—সব নাকি ছেলেটির বন্ধুরা,—ওকে ইংরিজী বাংলা লেখালে।

ওরা কি জানে না, ও লিখতে জানে? কেন, ছোটকা তো বললেন ওর সামনেই যে, ওকে সেকেন ক্লাস অবধি পড়িয়ে আমরা স্কুল ছাড়িয়ে নিয়েছি, বড় বড় মেয়ের স্কুলে যাওয়ার প্রথা আমাদের বাড়িতে নেই কিনা। তারপর বললে, গান জানে?

কাকা বললেন, জানে; কিন্তু ওর লজ্জা করবে মশাই, ছেলেমানুষ কিনা। একটা ছেলে একটু মুখ টিপে হেসে বললে, ছেলেমানুষই মেয়ে হয় মশাই।

গান গাইতে গলা কেঁপে গেল, ছাই হ'ল গান। অত ছাই ও কোনদিন গায় না, এমন কি বিচ্ছিরি ক'রে চেষ্টা করলেও ও রকম হয় না। কাকা কেন বললেন না, গান ও জানে না!

ওর চোখ দিয়ে টপটপ ক'রে জল পড়তে লাগল। ওরা নাকি সভ্য, ওরা নাকি সব বিদ্বান। ওদের বোনকে এদের কেউ অমনই ক'রে দেখে!

মেজদি এল কাপড় কেচে, ছাতে কাপড় শুকুতে দিতে।

ওমা, তুই বুঝি এখানে ব'সে, আর মা সারা পৃথিবী খুঁজছেন! খাবার খাস নি যে? কাঁদছিস কেন?

ও রাগ ক'রে বললে, কই কেঁদেছি? চোখ দুটো সঙ্গে সঙ্গে জলে ভ'রে এল।

ওরে, এ দুঃখ সবারই করতে হয় যে, তোর একার নয়। আমাকে আবার আমার মামাশ্বশুর সমস্ত জালানটা হাঁটিয়ে নিয়েছিলেন। আর একটা কে ছিল, সে বললে, চুলটা খুলে দেখান নি কেন মশাই? বড় খোঁপা দেখে ভাবলে বোধ

হয়, গুছি দিয়ে চুল বাঁধা। ও তো ভাল। সেই প্রতিমার—আমার ননদের মেয়ে যে, খুব সুন্দর দেখতে, মনে আছে তো? তাকে আবার দেখতে এসে সব বলে, মশাই, হাতে মনে হচ্ছে কড়া পড়েছে। নন্দাইয়ের রাগে মুখ লাল হয়ে গেল, তবু বললেন, টিপে দেখুন হাত। ছেলেটি এম. এ. পাস করেছেন, বাড়ি আছে নিজের, বাপ মা আছে, কি করা যায়, সবই সহ্য করলেন। কিন্তু এখন যদি হাত দুটো দেখিস তার! শাশুড়ী ঝি-চাকরের জল-বাটনা নেয় না। রোজ ভাল ভাল বাটনা বাটে, জল তোলে। মুখখানি কচি টুলটুল করছে, হাত দুখানা যেন কার! তা হ'লে কড়া পড়া তখন কেন যে বলেছিল, কে জানে।

কথাগুলো খুব আশাপ্রদ নয়। নিভা অবাক হয়ে শুনছিল। সে বললে, দিদি, তোমাকে তারাই পছন্দ করলে, যাঁরা হাঁটালে?

মেজদিদি বেশ স্বচ্ছন্দভাবেই হাসলে, হাঁটালেন তো বাড়ির কেউ নয়, মামাশ্বশুর।

নিভা আরও অবাক হয়ে বললে, জামাইবাবুর মামা তো! তা তুমি সেখানে গিয়ে রাগ কর নি, কিছু বল নি কারুকে? জামাইবাবুকেও না?

ওঁর দোষ কি? আর এ যে রেওয়াজ, সবাই এই করে।

নিভার রাগে গা জ্ব'লে যায়। কিন্তু মেজদির যেন সবই খুব সহজ মনে হচ্ছে।

পাশের বাড়ির ছাতে কে উঠলেন, বললেন, তোমাদের নিভাকে আজ দেখে গেল? কি বললে?

মেজদির উপদেশ-স্রোত থামল। কথার গন্ধ পেয়ে পুলকিত হয়ে আলসের ধারে গিয়ে দাঁড়াল, হ্যাঁ, দেখে তো গেল, এখনি কি কি বলবে, কিছুই বলে নি। (ঈষৎ মৃদুকণ্ঠে) আর শ্যামবর্ণ কিনা ভাই, সহজে কি পছন্দ করে? বাবা এই দুটি ছোট বোনের বিয়ে দিতে জেরবার হয়ে যাবেন ভাই। যে দেখছে সেই বলে, সব ভাল মশাই, কিন্তু রংটি যদি একটু ফরসা হ'ত। গান গাওয়ালে, লেখা দেখলে, কত কি।

প্রতিবেশিনী একটু মুখভঙ্গি ক'রে বললেন, লেখা নিয়েই বা কি করবেন? গানেই বা কি করবেন? সেই সুনীরার কথা মনে আছে তোর? সেই যে আমার ছোট পিসীমার মেয়ে? কি চমৎকার গলা, পাড়ার লোক দাঁড়িয়ে যেত গানের সুরে তার। রং তেমন ছিল না, ঐ গানের আর বাপের টাকার জোরে, বিয়ে তো হ'ল, এখন শুনি নাকি বর কারুর কাছে কোন জায়গায় গান গাওয়া পছন্দ করে না। বড্ড খপিশ! বলে, মেয়েদের আবার বিয়ের পরে গান কি!

কোনখানে পাঠায় না। মেয়ে-মজ্‌লিসেও গাইতে বারণ, কাজের বাড়িতে পাঁচটা পুরুষ আসে তাই।

মেজদি বললে, অথচ মরবে সব বিয়ের সময় সব জিজ্ঞেস ক'রে। যার হাতে পড়বে সেই যদি ওসব না চায়—ছাই দরকারেও লাগে না।

তা দরকারে লাগে না বটে, কিন্তু সুনীরার মেয়েটি যে কি চমৎকার গায়!

মা এলেন, কথায় বাধা পড়ল।

হ্যাঁরে, নিভা কই? কি সব ঢং বল তো, খাবার খেলে না অবধি! চিরকালকার জিনিস, তারা নিয়ে যাবে—দেখবে না? দেখেছে তো মেয়ে অমনি গ'লে গেলেন!

মার পেছন দিয়ে নিভা নেমে গেল।

ভাল লাগে না জানি, তা কি করব ছাই!—একসঙ্গে এত কথা এবং এত রাগ গলার কাছে জড় হ'ল যে মার আর কথা বেরুল না মুখে।

অনেক রাত্রি।

ছোট ছেলেরা সকলে খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়েছে। পুরুষদেরও খাওয়া চুকেছে, মার কাজ সারা হ'ল।

পাশের ঘরে মেয়েছেলেরা ঘুমোচ্ছে, নিভাদের বাবা এ ঘরে চুপচাপ শুয়ে আছেন।

নিভার জননী জলের ঘটি, দুধের বাটি, পানের ডিবে, মিছরি-বিস্কুট নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। একে একে সবগুলি যথাস্থানে নাবিয়ে স্বামীর বিছানার পাশে এসে বসলেন।

তারপর?

স্বামী বললেন, কিসের?

এই যে গো, নিভাকে দেখে কি বললে? পছন্দ করেছে ছেলে?

স্বামী বললেন, কাল ওর বোনেরা মা আর ঠাকুরমা আসবে দেখতে। ছেলের ছোট্‌ভাই ছিল, ব'লে গেল।

মাতা পিতা দুজনেই জানালার পথে রাস্তার গ্যাসের দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন।

অবশেষে বড় নিঃশ্বাস ফেলে মা বললেন, মেয়েটার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল, কতবার যে সব দেখলে!

বাপ চুপ ক'রে রইলেন।

মা বললেন, দেখ না, সেবার নরেশবাবুরা, হাঁটালে, বিষ্টুবাবুরা কি সব ব'লে গেল। তারপর জগন্নাথবাবুরা মুখের ওপর 'কালো' বললে।

মা আবার বললেন, ওরা নাকি বলে, আমাদের চেয়ে বাজারে মাছের দর আছে।

নিভার পিতা অন্যমনে শুনছিলেন, শেষ কথাটায় একটু হাসলেন ; বললেন, মিছে বলে না।

খানিক চুপ ক'রে বাপ জিজ্ঞাসা করলেন, ওরা ঘুমোচ্ছে ?

মা বললেন, হ্যাঁ।

রাত্রি গভীর হয়ে এল, ক্লান্ত স্বামী ঘুমোলেন।

নিভার মার চোখে আর ঘুম এল না। মনে হয়, বারে বারেই নব অভিজ্ঞতায় এই একই অভিনয় দেখছেন। অসম্মান, সম্মান, অবমাননা, অত বোঝে না মন, শুধু একে একে মনে পড়ে কত বিয়ের কথা, জানাশোনা, স্বজন আত্মীয়— কত কথা।

কারও বা গহনা, কারও বা গহনার ওজন, কারও বা গহনার রং, কারও বা নিজেরই রং ; কারও বা তুচ্ছ কথা, কারও দরিদ্র পিতা-মাতা, যা হোক অমনিই তো হয়ে থাকে। বলে, লক্ষ কথা না হ'লে বিয়ে হয় না।

ছোট বোন সুধারই তো বিয়ের পরদিন কুশণ্ডিকার আগেই গহনা ওজন ক'রে দেখেছিল তারা। ষাট ভরিতে দেড় ভরি কম ছিল। কাঁটা হয়ে ওঠে নি। তাঁদের বাপ গিয়ে তাড়াতাড়ি কাঁটার ত্রুটি সেরে নিলেন কাঁটা দিয়ে।

হয়তো তখন সুধার মনে একটু কাঁটা ফুটেছিল।

তা হোক। আজ সুধার ঐশ্বর্য দেখে কে ? ছেলে মেয়ে সুখ ঐশ্বর্য ঘর বাড়ি হীরে মুক্তা।

আহা, তা বেঁচে থাক। আহা, বাবা দেখে যান নি। কিন্তু—

তা কি হবে, এই রকমই তো সব ঘরে !

রাত্রি গভীর হয়ে আসে। ছেলেমেয়েরা সব ঘুমোচ্ছে। মা তাঁর কালো মেয়েটির মুখের দিকে একবার চান। গ্যাসের আলো ঘরে পড়েছে, তারই সামান্য আলোয় দেখা যায়, খোকার গায়ে চাদর নেই, নিভার মাথার বালিশটা কোথায় স'রে গেছে। ঠিক ক'রে দিয়ে মা শুয়ে পড়েন।

আকাশে নিঃস্তব্ধ শান্তি। এক আকাশ তারা ঝিকমিক ক'রে ঘুমের রাজত্বে চেয়ে আছে।

পরদিন বৈকালে ছেলের মা আর অন্য পরিজনরা দেখতে এলেন ভেতরে, আর বাইরে এলেন বাপ, মাতুল, কাকা।

পূর্বদিনের চেয়ে বেশি ক'রে সাবান স্নো ঘ'ষে রংটা অনেকটা খসখসে ক'রে মাথা ঘ'ষে চুল খুলে মাথাটা মাথার তেলের বিজ্ঞাপনের মতন ক'রে শাড়ির সঙ্গে জামার রঙে মিল করিয়ে, ভেবে চিন্তে অনেক পরিশ্রমে সবাই সাজাল।

অবাধ্য অপমানবোধ কেবলই নিভার চোখের কোলে উপচে জল পাঠায়। আর দিদিরা ধমক দেয়।

কাকে আবার না দেখেছে, কে আবার না দেখে! তোর রকম দেখে বাঁচি না—চোখ-মুখের কি ছিরি হবে!

মেজদি বললে, বেশ দেখাচ্ছে এবার। নিভার মুখখানি যে বেশ।

যথারীতি প্রণামাদি ও শিষ্টাচারের কথা সমাপ্ত ক'রে মেয়ে দেখা। মেয়ে অন্দরে প্রেরণ করাও হ'ল।

খোশগল্পে আসর জমকে ওঠে। যথারীতি দেশের কি অবস্থা, বেকার-সমস্যা, ঘি-দুধের দুর্মূল্যতা, পাস করার নিষ্ফলতা এবং না পাসকরা কৈইয়াদের উপার্জনে কৃতিত্ব ইত্যাদি প্রসঙ্গে এসে ছেলের মাতুল পৌঁছলেন।

বলবেন না মশাই, রাম রাম, কি যে সব হয়ে দাঁড়াচ্ছে ব্যাপার, আমরা তবু রোজগার করছি, ছেলে ব্যাটারা আর খেতে পাবে না।

পাত্রীর পিতা 'আজ্ঞে হ্যাঁ' ব'লে সমর্থন করলেন। তারপর কন্যাদায় ও তারপর পাত্রপক্ষের নানা রকম অভদ্রতার কথাও ওঠে।

এবার পাত্রীর পিতা কিছু বলতে পারেন না। কে জানে, যদি কারও গায়ে বাজে!

কিন্তু মশাই, আসল ব্যাপার হচ্ছে এই কালোকে ফরসা করতে জানা। মাতুল ডাক্তার, বেশ নাম-করাও। উৎসুক হয়ে শ্রোতারা মুখের দিকে চেয়ে রইল, ভদ্রলোক কিছু ঔষধ বলবেন না কি?

স্মিতহাস্যে মাতুল বললেন, তা হচ্ছে মশাই এই—বং অনুপাতে যৌতুক, অনুব-বিমুখ নয়; এই আমাদের পাড়ার সম্প্রতি একটি বয়াকালো মেয়ের বিবাহ হ'ল। বাপ বেশ বড় কাজ করে। মেয়ের মুখ তাকিয়ে দিলে মশাই। বলব কি, আট

হাজার নগদ দিলে। ছেলেটি সোনার চাঁদ—যেমন রূপ, তেমনই গুণ। খরচ করলে যেমন, পেলেও তেমনই। বুঝলেন কিনা? মাতুল আবার উচ্চহাস্যে ঘর ভরিয়ে দিলেন। অবশ্য আমরা অর্থাৎ আমার ভগ্নীপতিদের টাকা নগদ নেওয়ার প্রথা নেই; তবে—

বিমূঢ় অপমানিত বেদনায় অনুজ্জ্বলবর্ণা মেয়ের পরিজনরা হাসবার চেষ্টা করলে তাঁর সঙ্গে, পাছে ভদ্রতার লাঘব হয় আর তাতে মেয়ে পছন্দতে ত্রুটি ঘটে।

নিভা ওপরে উঠে এল। এবার মা জলটল খাওয়াবেন ওদের। আর চোখে জল এল না। যা হোক একটা নিষ্পত্তি—এস্পার কি ওস্পার হয়ে চুকে গেলে ও বাঁচে।

এ বাড়ির ও বাড়ির চিনু বিনু রুনু রেবা আশা সব বারান্দায় ছাতে দাঁড়িয়েছে।

নিভা উদাসীনভাবে ছাতের অন্য এক কোণে দাঁড়ায়। গল্পের কথা কানে টুকরো টুকরো ভেসে আসে।

জান ভাই, আমার বে'তে পাঁচবার দশবার দেখাদেখি কিছু হয় নি। যেমন শাশুড়ী দেখলেন, অমনই সব কথা ঠিক হওয়া।

তা ভাই, তোমার বাবা যে তেমনই দু' হাজার ক'রে খরচ করেছিলেন। তোমাদের ঐ সুধার কেন অত নাকাল?

দেখতে তো সুধা ভাল নয়। আর কাকা তেমন খরচ করলেন কই?

এইবার একটি মুখরা মেয়ের গলা শোনা গেল বেশ জোরে, তা ব'লে তোরা যারা রূপসী তাদেরই সব ভাল হবে? তা হ'লে তোদের লীলার কেন ভাল ঘর বর হ'ল?

সে যে তার বাপের একটি মাত্র মেয়ে, অত বিষয় সেই পাবে। আর কালো, তা মুখখানি কি সুন্দর! স্বামী খুব আদর-যত্ন করে।

মুখরা মেয়েটি থামা, বিদ্রূপ-হাস্যে সে বললে, তাই বল, আসল কথা টাকা, তাই মুখখানি ভাল, তাই তার শ্বশুরবাড়ির যত্ন।

যে তর্ক করছিল সে বললে রাগ ক'রে, তা টাকা তো কি? যার বাবার আছে, তিনি দেবেন না?

কেউ হারে না, নানামুখী তর্ক চলে।

রাত্রি হ'ল। অন্ধকারে নিভা একলা ছাতে শুয়ে ভাবে।

মনের এক পাশে দাঁড়ায় আকাশভরা তারা, অন্য ধারে পৃথিবীজোড়া অন্ধকার।

সেদিন দিদি এসেছিল। ওপরে এল তারা।

হ্যাঁরে, ওপরে একলা ?

নিভা উঠে বসে।

সেই একই কথা। দিদি বেশ ক'রে বসে সান্ত্বনা দেবে ভাবে, বলে, এমনিই হয়েছে ভাই। সে তাদের পাড়ায় কার কন্যাদায়ের নিদারুণ মর্মস্পর্শী ব্যাখ্যা দেয়। আর উপসংহারে বলে, কি করবি, এমনই ঘরে ঘরে।

তারপর মেজদি তার মামাশ্বশুরের শ্বশুরবাড়ির কার এক কন্যাদায়ের ভয়াবহ অথচ উজ্জ্বল ব্যাখ্যা দেয়; অর্থাৎ কৃষ্ণা মেয়েটি বিয়ের পরে নাকি আত্মহত্যা করে। তার উপসংহারে সে বলে, তার চেয়ে আমাদের নিভা দিব্য ঢের করসা—

রাত্রিও বাড়ে গল্পও বাড়ে। আসর জমে ভূতের গল্পের মত। নিজ নিজ নিতান্ত নিরীহ নিরপরাধ হৃদয়বান অথচ পিতৃমাতৃভক্ত স্বামীদের বাদ দিয়ে—অন্ত সকলের ভদ্রতাহীন বিয়ের কথা বলে। শ্বশুরালয়ের খোঁটার কথা বলে।

নিভা আড়ষ্ট হয়ে শুয়ে থাকে। বর এবং বরপক্ষীয়দের সম্বন্ধে তার ধারণা তো খুব ভাল হয়ই না, বরং বেশ ভীতিপ্রদ হয়ে ওঠে।

অনেক রাত্রে দিদি গেল ছেলে শোয়াতে।

চুপ ক'রে থেকে থেকে সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা ক'রে বসল, আচ্ছা ভাই মেজদি, মেজ জামাইবাবুরাও তো অমনই করেছিলেন ?

মেজদি সোজাসুজিই বললে, দেনা-পাওনার কথা আবার কোন্ বিয়েতে না হয় ? হয়েছিল বইকি। তা সে তো আমার দিদিশাশুড়ী আর শ্বশুর করেছিলেন। উনি তার কি জানেন ?

মেজদির স্বামীকে ভাল বলবার সরল প্রচেষ্টায় নিভার হাসি পেল। সে একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, তা হ'লেও ভাই উনি তো মা-বাপের ছেলে, বলতে পারতেন না কি ?

মেজদি বললে, তা কি ক'রে বলবেন ? মাথার ওপর গুরুজন বাপ মা, তাঁরা যা করবেন ভালর জন্যেই তো ? আর এ তো সবাই করে।

নিভা অপ্রস্তুতভাবে বললে, তা হ'লেও অত বিদ্বান জামাইবাবু—

মেজদি বললে, তাতে কি ?

নিভার অন্তরে বিদ্বান পুরুষসমাজের ওপর ঈষৎ শ্রদ্ধা ছিল তখনও। সে ভাবত, বোধহয় তারা পৌরুষে দীপ্ত, আকাশের মত উদার, অচলের মত দৃঢ়,

সমুদ্রের মত গভীর। নিত্যকার ছোট ছোট দৈন্য, ক্ষুদ্রতা, লোভ তাদের স্পর্শ করে না।

আবার সে বলে, আচ্ছা ভাই, তোমার শাশুড়ী নাকি বড় খোঁটা দিয়েছিলেন বাবাকে, তাতেও জামাইবাবু চুপ ক'রে রইলেন ?

তা কি ক'রে বলবেন ?—তুই এক পাগলী। মা-বাপকে বলা যায় ? হ'লই বা শোনালেন আমার শাশুড়ী। তাঁদের হ'ল গিয়ে ছেলে, আমার বাবার মেয়ে ! লোকে কত কথা বলে, তাঁরা আর এমন কি বলেছেন ? বিয়েতে লক্ষ কথা হবে, আর ছেলের পক্ষ মেয়ের পক্ষকে বলবে, এই হ'ল ধারা।

যুক্তিসঙ্গত জবাব পেয়ে নিভা চুপ ক'রে গেল।

আকাশের এক প্রান্ত থেকে কৃষ্ণা-তৃতীয়ার বাঁকা সোনার থালার মত চাঁদ উঠল। মা ডাকলেন, ওরে ও মেয়েরা, কত রাত্তির হ'ল, ছেলে-মেয়েকে খাইয়ে নে না ? নিভাকেও খেতে ডাক।

নিভা উঠল।

এবারে সে কুণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা দিদি ভাই, তোমাদের জামাইবাবুদের ভাল লেগেছিল ?

তার ষোলো বছর পার হয়ে গেছে, গল্পের বই পড়ারও প্রচুর সময় ছিল, কাব্য-জাগতিক আদর্শ স্বামী সম্বন্ধে কল্পনার যথেষ্ট অবকাশ ছিল।

মেজদিদি উঠছিল, হেসে গড়িয়ে পড়ল, স্বামীকে ভাল লাগবে না ? কেন ? শোন একবার মেয়ের কথা ! হাসিয়ে পাগল করতে পারে ও। মাগো, ওদেরও বিয়ে হয়েছিল সব, কই, এসব কথা তো ভাবেও নি ! মেজদিদি, দিদি আর মার কাছে এত হাসির কথা বলতে নেমে গেল।

অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে নিভা দিদিদের ছোট ছেলেদের ঘুম পাড়াতে মার কাছ থেকে নিয়ে এল।

আদর কাড়াতে নিভা পায় না, আদরই পায় নি। দর থাকলে আদর থাকে। বোনেদের প্রথম নয় শেষ নয় সে, আদর কাড়াতে অপ্রস্তুত মনে হয়।

তবু অনেক রাত্রে যখন দিদিরা ঘুমোল, ছেলেরা ভাইয়েরা ঘুমোল, মার পায়ের শব্দে নিভা উঠে বসল। সবাই ঘুমোচ্ছে।

জননীর চোখ পড়ল, কি রে ?

একটু জল খাব। —উঠে এসে কুঁজো থেকে জল খায়।

কলকাতার আকাশ ঝাপসা জ্যোৎস্নায় তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে মহানগরীর দিকে চেয়ে আছে। পাড়ার প্রায় সব বাড়িই অন্ধকার।

মা তখন ভাবছিলেন, স্বামীর কাছে গিয়ে কিছু পরামর্শ করবেন, জিজ্ঞাসা করবেন।

নিভা এসে দাঁড়াল কাছে।

কি রে?

আমার ও রকম ক'রে বিয়ে দিও না মা।

কি রকম ক'রে?—মা ভ্রূকুঞ্চিত করলেন।

ঐ কেবলই টাকা আর গয়না দিয়ে। আমি ওদের ভালবাসতে পারব না। তার চোখ ছলছল ক'রে এল।

শোন কথা! ওরা টাকা নিয়ে বিয়ে করবে, তার সঙ্গে তোর সম্বন্ধ কি? পাগল আর কি! এঁরাও তো টাকা নিয়েছিলেন।—

তাঁর নিজের ভালবাসার কথা মা আর বললেন না।

রাত হয়েছে, যা শুগে।

বাপ জেগেই প্রায় ছিলেন; জিজ্ঞাসা করলেন, নিভা কি বলছিল?

মা বললেন। নিভার বাপ একটু চুপ ক'রে থেকে একটু হেসে বললেন, তা ভালবাসায় ব্যাঘাত হয় না। দৃষ্টান্ত যা দিয়েছ, তার জবাব দেবার উপায় ওর আর নেই, আমারও নেই।

স্ত্রী অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন।

কথা উল্টে বললেন, ওরা কি বললে? জবাব কবে দেবে? পছন্দ হয়েছে?

স্বামী বললেন, ওরা ব'লে গেল, মেয়ে পছন্দ হয়েছে ওদের, রং ফরসা করার উপায়ও একটা বাতলে দিয়েছে, সেটা হ'লেই ওরা বিয়ে সামনের বৈশাখে দেবে।

উৎসুক নিভার মা জিজ্ঞাসা করলেন, সে কি উপায়?

কিছু বেশি টাকা। নগদ ওরা নেয় না, কিন্তু রকম নেয়।

খানিক চুপ ক'রে থেকে পত্নী বললেন, তা কি করবে?

তাই দোষ আর কি। ছেলেটি ভাল, স্বাস্থ্য ভাল, বাপের অবস্থা ভাল, বাজারে দর আছে। তা ছাড়া মেয়েকে গয়নাগাঁটি দেবে, আদরও করবে। তারপর একটু থেমে ঈষৎ হেসে বললেন, আর তুমি তো বলেছ ঠিকই—ভালবাসতে কোনই বাধা হয় না।

রচনাকাল—১৩৩৯

জবালা

পথে অসম্ভব ভিড় জমেছে। বাড়ীর সামনে বসেছে একটি নহবতখানা—বসানো হয়েছে গেটের একদিকে একটি মঞ্চ করে। নিচে দুটো বেঞ্চিতে সানাইওয়ালার দল বসে সানাই বাজিয়ে চলেছে। একদল ব্যাণ্ডপার্টিও রাস্তার ধারে পাতা বেঞ্চিতে বসে আছে, উৎসব জমাট হলে হুকুম-মতো বাজাবার অপেক্ষায়।

সারা পথ এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত আলোয় ঝলমল করছে। নানা রঙের বিদ্যুতের আলোর বাল্‌ব, নানা রঙের পতাকায়, ফানুসের আলোয় উৎসব-বাড়িখানি যেন আলতা-সিঁদুর-চন্দন-মালা-বেনারসী-জরী-জড়োয়ার নানা অলঙ্কার বসনভূষণ পরা নতুন কনেটির মতো সেজে বসে আছে।

শহরে নতুন এসেছি। ভিড় ঠেলে যেতে যেতে বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কাদের বাড়ি? বিয়েবাড়ি বোধ হচ্ছে। খুব বড়লোক বুঝি?'

বন্ধু বললেন, 'জানো না বুঝি? শশী দত্তর ছেলের বিয়ে। লোহার কারবারী শশী দত্ত। লাল হয়ে গেছেন। এই সেদিন গুলজারবাগে মস্ত বাড়ী করেছেন। ছোট ছেলের বিয়ে দিচ্ছেন নতুন বাড়ীতে এসে।'

'ও:। না, আমি তো সবে এসেছি বদ্‌লি হয়ে। ওঁর নাম শুনিনি।'

অভ্যাগত নিমন্ত্রিতদের নানাবিধ যানবাহন আর পথিক দর্শকদের এবং ভিড় ঠেলে নানারকম ভোজ্যবস্তুর ঘ্রাণে আমোদিত পথ ছাড়িয়ে পথের অন্ত প্রান্তে এসে পৌঁছলাম।

বাঙালী ব্যবসা করে এত বড়লোক হয়েছে কৌতূহল হল। 'তা শশী দত্ত লোকটি কে? কোথাকার মেয়ে? কলকাতার?'

বন্ধু বললেন, 'না:, কাশীর মেয়ে! ও:, তাইতো, তুমি তো কিছুই জানো না শশী দত্তর ইতিহাস।'

আশ্চর্য হয়ে বললাম, 'এর আবার ইতিহাস কি?'

'বেশ একটু আছে। শুনবে?'

বললুম, 'বলো।'

বন্ধু বললেন: আমারো শোনা কথা। অনেকদিনের কথা হল। বহুদিন আগে একবার এক শীতের সন্ধ্যায় হঠাৎ বৃষ্টি নেমে এলো। পথের লোক যে যেখানে পারে আশ্রয় নিল। কেউ-বা কোনো দোকান-ঘরে, অনেকে কারুর

বাড়ির রকে, কেউ-বা গাছতলায়। ভদ্রলোক, সাধারণ লোক সকলেই ঘেঁষাঘেঁষি করে একত্র জড়ো হয়ে দাঁড়াল। বর্ষাকালের বৃষ্টি হলে তো বেশী ভাবনা ছিল না,- শীতের সন্ধ্যায় বৃষ্টিতে ভিজলে পরদিনই শুয়ে পড়তে হবে। তারপর পরিণামে হয়ত চারজনের কাঁধে চড়ে নৌকা করে ঘাটভাঙ্গাঘাটে পৌঁছতে হবে। কিন্তু অত ভিড়ের মাঝে মেয়ে একটিই ছিল। কি করে সে বৃষ্টির সময় সঙ্গিনীদের দলছাড়া হয়ে গিয়েছিল, তারা বা কোন্‌দিকে গেল তা বুঝতে পারল না। নিরুপায় হয়ে সে একটা বড় গাছের তলায় এসে দাঁড়াল। বাড়ির রকে অনেক পুরুষ দাঁড়িয়ে ছিল। সে আর উপরে ওঠেনি।

কিন্তু খানিকক্ষণের মধ্যেই খুব জোরে বৃষ্টি নামল আর মেয়েটি তার কপালের 'টিকুলী', গায়ের 'চোলী', 'ইমামী' রঙের (মহরমের উৎসবের রং) ঘনসবুজ শাড়ী সবসুদ্ধ ভিজে সপসপে হয়ে গেল। কপালের টিকুলী ভেসে গেল—শাড়ী, জামা গায়ে লেপটে গেল।

রকের ওপরের দু' একজন লোক বললে, মাইয়া (মেয়ে) উঠে আয়না ? কিন্তু সিক্তবাসা প্রায়-ষোড়শী মেয়েটির এ অবস্থা দেখে রকের ওপরেই দু'একটা ইতরশ্রেণীর লোক গুনগুন করে অশ্লীল গ্রাম্য গান গাইতে সুরু করে দিলে ইঙ্গিতপূর্ণ চোখে বন্ধুদের দিকে চেয়ে।

মেয়েটি বা রামপতিয়া গ্রামের মেয়ে ? গ্রাম্য সঙ্গীত আর ঐ ধরনের ভাবভঙ্গী তার অজানা নয়। তার সঙ্গের লোকজনও হারিয়ে গেছে। তারা আপনজন না হলেও, একজায়গার লোক তো বটে।

সে নিরুপায় ভয়ে ভাবনায় চুপ করে দাঁড়িয়েই ভিজতে লাগল। যারা উপরে উঠে দাঁড়াতে বললে, তাদের কথা শুনতেও ভরসা পেল না ঐ গায়কদলের ভয়ে। কে জানে ওরা সকলে কেমন। বৃষ্টিও জোরে নামল। রামপতিয়ারও ভয়ে ভাবনায় ভীত চোখেও বৃষ্টির ধারা নেমে এলো। এদিকে গায়কদের গান আরো উত্তাল হয়ে উঠল।

এমন সময়ে একটা ঝড়ঝড়ে ঘোড়ার গাড়ী রকের সামনে এসে দাঁড়াল। আর, একটি ভদ্রলোক গাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে রকের ওপর উঠলেন। একটি ভৃত্য এসে বাড়ির দরজা খুলে দিলে। বোঝা গেল তিনি বাড়ীর লোক বা মালিক।

তিনি তীক্ষ্ণ চোখে রকের জনতাকে একবার চেয়ে দেখলেন, গাছের তলায় মেয়েটির দিকেও চোখ পড়ল।

গানটা তখন সহসা থেমে গেছে। লোকটি বাড়ির মধ্যে ঢুকলেন। খানিক পরে যখন তিনি আবার একবার বাড়ির রকে এসে দাঁড়ালেন তখন রক একেবারে খালি—বৃষ্টি কমে এলেও, পড়ছে। শুধু গাছতলার মেয়েটি রকের ওপর এসে দাঁড়িয়েছে—তার সর্বাঙ্গ দিয়ে জল ঝরে পড়ছে।

একটুখানি কী ভেবে তিনি মেয়েটিকে বললেন, 'তুমি ভিতরে এসে দাঁড়াবে? বৃষ্টি থামলে বাড়ি যেয়ো।'

মেয়েটি ভিতরে এলো। সদরের গলির মধ্যে একটা কেরোসিনের ডিবে জ্বলছিল। ভদ্রলোক তার দিকে চেয়েছিলেন। তারপর ভৃত্যকে বললেন, 'যা, আমার একটা ধুতি এনে ওকে দে। ও কাপড়টা ছাড়ুক রান্নাঘরে গিয়ে। তারপর ওকে একবাটি চা বানিয়ে দে।'

মেয়েটিকে বললেন, 'কাপড় ছাড়ো, চা খাও, তারপর বাড়ি যেয়ো।'

অত ভেজার ফলে মেয়েটি কাপড় ছেড়ে চা খেয়েও ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। এবারে বসবার ঘরের আলোতে দেখা গেল বছর পনের ষোল বয়স হবে মেয়েটির। শ্যামগৌর রং। অত্যন্ত ভীত ত্রস্ত মুখখানা।

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার ঘর কোথায়?

সে শহরের কাছাকাছি এক গ্রামের নাম করল।

'সেখান থেকে এতদূরে এসেছে কেন—কী কাজে?'

মেয়েটি বললে, 'আমার সঙ্গীরা সব মহরমের মেলা দেখতে এসেছিল এখানে, আমিও সেইসঙ্গে ছিলাম। তারপর এই বৃষ্টিতে তারা হারিয়ে কোন্‌দিকে গেল আর দেখতে পাই নি। তাই এইখানেই দাঁড়িয়েছিলাম।'

এবারে সে বসে পড়ল গুটিয়ে-সুটিয়ে। বেশ বোঝা গেল সে কাঁপছে। একটা কম্বল এনে সদয়ভাবে ভদ্রলোক বললেন, 'তুমি কাঁপছ। এই কম্বলটা নাও। মুড়ি দিয়ে একটু শুয়ে থাকো। শীত কমবে।'

শীত কমল কিনা, বৃষ্টি থামল কিনা, রাত্রি কত হ'ল কিছুই আর রাজপতিয়ার জ্ঞানগম্য হ'ল না।

কোনো সময়ে তার যখন চেতনা ফিরে এলো, সে তখন হাসপাতালের একটা বিছানায় শুয়ে। যে-বাড়িতে সে ছিল, এটা সে বাড়ি নয়। সে আবার চোখ বুজে শুলো।

বিকালবেলা সেই ভদ্রলোক তাকে দেখতে এলেন। তার জ্ঞান ফিরেছে

দেখে বললেন, 'আজ তাহলে চোখ খুলেছে। ভালো আছে?' মেয়েটিকে বললেন, 'ভালো আছ? তোমার জ্বর হয়ে গেল। সেই-যে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুলে আর ওঠোনি। তখন আমি তোমাকে হাসপাতালে পাঠালাম আজ তিন দিন হল। তুমি একেবারে অঘোরে ছিলে।'

রামপতিয়া চুপ করে নির্বোধের মতো চেয়ে রইল। গ্রাম থেকে মেলায় আসা, গাছতলা, লোকটির বাড়িতে আশ্রয়, হাসপাতাল সব তার কাছে স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছিল।

ভদ্রলোক বললেন, 'তাহলে ভালো হয়ে বাড়ী যাবে। তাদের নাম-ঠিকানা বলো। তারা আসতে পারবে খবর দিলে।'

রামপতিয়া ক্লান্তভাবে চোখ বুজলে।

লোকটি বললেন, 'আচ্ছা, আজ থাক।'

কয়েকদিন বাদে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার সময় এলো।

ভদ্রলোক এলেন। বললেন, 'আজ তোমায় ছাড়বে এরা। কোথায় যাবে?'

রামপতিয়া চাদর গায়ে দিয়ে মহরম-রঙা নিজের কাপড়খানি প'রে চুপ করে খাটের ওপর বসেছিল।

ভদ্রলোকটির কথায় প্রথমে উত্তর দিলে না। তারপর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। একটি নার্স এসে দাঁড়িয়েছিল; বললে, 'কাঁদছিস্ কেন? আজ তো বাড়ি যাবি।'

সে চোখ মুছলে, তারপর বললে, 'আমার তো বাড়ি নেই।'

'সেকি! তোর গ্রাম দেশ কোথায়?'

রামপতিয়া গ্রামের নাম বললে, বাপেরও নাম বললে। কিন্তু বললে, 'আমার মা-বাপ তো নেই, সবাই পিলেগে মারা গেছে অনেকদিন। আমাকে আমার এক গ্রামসুবাদে নানীর বাড়িতে গ্রামের লোকেরা রেখে দিয়েছিল। আমি তাদের বাড়ির সব কাজ করতাম, গরু-ছাগলের কাজ করতাম, নানীর পা টিপতাম, তেল মাখাতাম—তারা খেতে পরতে দিত। এতদিন পরে গেলে তারা তাড়িয়ে দেবে, মারবে।

নার্স অবাক হয়ে চুপ করে রইল। তারপর বললে, 'তবে নবীবাবু, কি করবেন? কোথায় যাবে ও? আজ তো ওকে যেতেই হবে। আপনিই নিয়ে যান।'

রামপতিয়া এবারে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। বললে, 'বাবুজী, আমাকে আপনার বাড়ীতে "দাই" ঝি করে রেখে দিন—আমি সব কাজ করতে পারি। গ্রামে গেলে এতদিন পরে তারা আমাকে আর রাখবে না। জাত নষ্ট হয়ে গেছে বলবে।'

পনের ষোল বছরের কোমল মুখখানি ক'দিনের রোগে একটু পাণ্ডুর হয়েছে। কিন্তু বিশ্রামের জন্য রঙটা একটু উজ্জ্বল হয়েছে। মুখটির চেহারা এতদিন স্পষ্ট ননীবাবুর চোখে পড়েনি, আজ মনে হল বড় ভীত শঙ্কিত অসহায় মেয়েটি।

কিন্তু নার্সকে বললেন, 'আমি কী করে নিয়ে যাব? আমারো তো বাড়ীতে কেউ নেই। একটা চাকর মাত্র থাকে। আমি চাকরি করি, বাড়ীতে থাকি না সারাদিন।'

নার্সটি বললে, 'আপনি কোনোখানে চাকরি করতে দিয়ে দেবেন ওকে। আপনি তো বাঙালী। কত জানাশোনা বাড়ী আছে তারা ছেলেমেয়ের কাজে রেখে দেবে।'

রামপতিয়া চোখ মুছে উঠে দাঁড়াল আশ্বস্তভাবে। আর ননী দত্ত বিব্রতভাবে একটা ঘোড়ার গাড়ীতে তাকে নিয়ে উঠলেন।

না:, রামপতিয়া বা পতিয়ার চাকরি কোথাও হল না।

কেউ বললেন, 'ঐটুকু মেয়ে কী কাজ করবে?'

বুদ্ধিমান প্রাজ্ঞ কেউ-বা বললেন, 'না:, ওরকম মেয়ে কে আগলে বসে থাকবে···।'

কোনো রসিক বয়স্ক বললেন, 'তুই-ই রাখ্,—তোর ঘরে কেউ তো মেয়েমানুষ দেখাশোনা করবার নেই···।'

রামপতিয়া ঘর ঝাঁট দেয়। বাসন মাজে। কাপড় কাচে সাবান দিয়ে। আর, ব্যাকুল উদাস মনে বসে থাকে আর মাঝে মাঝে কাঁদে। তাকে ননী দত্ত না পারেন তাড়াতে, আর সেও যেতে ভয় পায়, অথচ গ্রামের জন্যও মন কেমন করে। ননী দত্তর কোন কোন বন্ধুরা—আমার বাবাও একজন বন্ধু ছিলেন—বললেন, 'অনাথ আশ্রমে পাঠিয়ে দাও হে—বাঙালী নয়,—তোমার এত দায় বা দায়িত্ব কিসের?'

সেকালে অনাথ আশ্রম তেমন কিছু এখানে ছিল না। হিন্দু-অনাথ আশ্রম তো নয়ই। দানাপুরে একটা অনাথ আশ্রম ছিল যেন, কিন্তু সেটি খ্রীষ্টানদের।

ননীবাবুর বন্ধুরা বললেন, "হোক ক্রিশ্চান। তুমি দিয়ে দাও ওখানেই। আর ওর কি জাত-টাত বজায় থাকবে? পথে পথে চাকরিই করবে তো।'

খ্রীষ্টান অনাথ আশ্রমের লোকেরা তাকে নিয়ে যাবে শুনে, রামপতিয়া আকুল অঝোর ধারে কাঁদতে আরম্ভ করলে। আর আহার-নিদ্রা ছেড়ে দিয়ে কয়লার ঘরের কোণে আশ্রয় নিলে।

অবশেষে নিরুপায় হয়ে ননী দত্ত ওকে সেখানে পাঠাবার চেষ্টা ছেড়ে দিলেন। আর কিছু করার আশা বা হালও ছেড়ে দিলেন। তবু মাঝে মাঝে বন্ধুদের বাড়ী 'দাই' বা ঝি করে রাখতে পারা যায় কিনা চেষ্টা করছেন। যদি অন্যভাবে দায়মুক্ত হতে পারেন।

এমন সময় মার্চের শেষে সেকালের মতোই সমারোহ ক'রে বিহারের গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে প্লেগের সমাগম হল। প্রথমে গ্রাম, তারপর শহরের নানা বস্তি, তার পরে ঘরে ঘরে—এর বাড়ীর কোনো সঙ্কীর্ণ কোণে জলের জালার পাশে, তার বাড়ীর ভাঁড়ারের চালের টিনের পাশে, কারুর বাড়ীর বাক্সের পিছনে—গলাফুলো অর্ধমৃত ও মরা ইঁদুর দেখা দিতে লাগল। পোড়ো মাঠ বেয়ে, নর্দমার ধার বেয়ে সারি সারি নির্জীব ইঁদুরের পলায়ন অভিযানও দেখা যেতে লাগল।

মানুষও গলা ফুলে ওঠবার আগেই অর্ধমৃত হয়ে উঠল আতঙ্কে। দিনে রাত্রে যখন তখন বাড়ীর পাশের বস্তি থেকে, কাছাকাছি পাড়াঘর থেকে কখনো মৃদু কান্নার গুঞ্জন ওঠে। কখনো উত্তাল উচ্ছ্বসিত কান্নায় আকাশ বাতাস ভেঙে পড়ে। আর তার পরে দেখা যায় ছোট-বড় বাক্স তোরঙ্গ পেঁটরা মাথায় অথবা জীর্ণ মলিন বিছানা আর কাপড়ের পোঁটলা-পুঁটলি মাথায় হাতে নিয়ে সারি সারি আতঙ্ক-অভিভূত নরনারী—ছেলেমেয়ে শিশু কোলে নিয়ে, হাত ধরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে চলেছে পথে—মৃত্যুর করাল প্রসারিত বাহুর সীমানা ছাড়িয়ে যাবার প্রয়াসে ও আশায়। কোথায় যাবে তা তারাও জানে না, আমরাও জানতুম না।

আর বস্তির সঙ্গে প্রাসাদ-অট্টালিকা থেকে নিয়ে সবরকম ঘর-বাড়ীর অধিবাসীরাও দেশ ছেড়ে পালাতে লাগলেন। শোন নদের উপরে জনবিরল গ্রামে, রাজগীরের কাছে বিহারের নানা স্থানে নানা পল্লীগ্রামে যেখানে প্লেগের বিস্তৃত আলিঙ্গন তখনো পৌঁছতে পারেনি সেইসব জায়গায় ছোট-বড় ঘর বাড়ী নিয়ে লোকেরা আশ্রয় নিলেন।

আর প্রায়-জনশূন্য রাজপথের দু'ধারে সরকারী 'ঝোপ্ড়ী' তৈরী করে

প্লেগাক্রান্ত রোগীদের রাখা হতে লাগল। কুম্ভমেলায় সাগরমেলায় তীর্থ-যোগ্‌ভীর মতো।

ননী দত্ত আপিসের সামান্ত কেরানী। বাড়ীতে আর কে-বা আছে যে পাঠাবেন তাদের? নিজেরও ছুটি নেই।

বাবা আমাদের পাঠিয়ে দিলেন শোনের ধারের গ্রামে কৈলওয়ারে। পুরুষরা—উকিল ডাক্তার দোকানদার—নানা কর্মচারী—সকলেই নিজের নিজের পরিজন স্ত্রী-পুত্রদের পাঠালেন বটে, নিজেরা কিন্তু যেতে পারলেন না রুজি-রোজগারের দায়ে। চাকরির দায়ে। তাঁরা আসা-যাওয়াও করতেন। প্রাণ হাতে দিয়ে শহরেও বসে থাকতেন।

ননী দত্তও গেলেন না।

হঠাৎ একদিন তাঁর সর্বাঙ্গে ব্যাথা হয়ে প্রবল জ্বর হল। চাকরটা বাবার কাছে খবর দিতে গেল মুখ শুকনো করে। বাবা ডাক্তার নিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই, তার শরীর খারাপ লাগছে তাই বাড়ী যাচ্ছে ব'লে চাকরটা পালালো।

বাড়ীতে শুধু রামপতিয়া আর রোগী। বাবাও সভয়ে ডাক্তারকে নিয়ে বাড়ীতে ঢুকলেন। সে প্লেগের যে কী ভীষণ আতঙ্ক তুমি বুঝতে পারবে না। দেখতে শুনতে সময় হতো না। শরৎ চাটুয্যের 'শ্রীকান্ত'তে নিশ্চয় পড়েছ প্লেগের একটু আধটু অথচ স্পষ্ট বর্ণনা।

যাই হোক, বাবাও শুকনো মুখে শঙ্কিতভাবে বন্ধুর ঘরে এসে দাঁড়ালেন ডাক্তার নিয়ে।

ডাক্তার নাড়ী টিপে, বগল আর সব গ্ল্যাণ্ডের জায়গা দেখে আশ্বস্ত ও নিশ্চিন্ত মুখে বাবাকে বললেন, 'না, প্লেগের আক্রমণ হয়নি। মনে হচ্ছে, বসন্ত হবে। গায়ের জ্বর-ব্যথা সেইজন্তেই।'

তারপর চারদিকের আবহাওয়ায়—প্লেগ, মাঝখানে একটি বসন্ত-রোগীকে নিয়ে রামপতিয়া সাবিত্রীর মতো বসে রইল; এবং বাবা আর ডাক্তার নিয়মিত দেখাশুনা করতে লাগলেন।

তারপর ননী দত্তকে যমের মুখ থেকে একলাই ঐ মেয়েটাই টেনে নিয়ে এলো যেন। বুঝতেই পারছ, এরপর সে তার ঐ 'সাবিত্রী'-ব্রতের পূর্ণফলই পেল। ননী দত্ত তাকে আর কোন জায়গায় পাঠাবার বিশেষ চেষ্টা-চরিত্রও করলেন না।

সেও রয়েই গেল। এবং ক্রমে যেন সে তাঁর একজন আপনার লোকের মতো বা ঘরের লোকের মতো হয়ে উঠলো।

ধর্মরাজ যম তাকে কিছু 'বর' দিয়ে গিয়েছিলেন কিনা জানি না। কিন্তু একসময়ে তারপরে সে শতপুত্র না হোক, ননী দত্তর এক পুত্রের জননী হয়ে বসল।

এই শশী দত্তই সেই ছেলে।

বিয়ে হ'ল কিনা—হতে পারত কিনা এখনকার মতো মান-সম্ভ্রম বজায় রেখে রেজিস্ট্রি করে—ননী দত্তর মনে সে-সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কিছু হয়েছিল কিনা, ঠিকঠাক কিছুই আমরা শুনিনি। আর তখনকার এদেশের বাঙালী-সমাজে কতখানি তিনি পাঙ্‌ক্তেয় ছিলেন বা না-ছিলেন তাও জানি না। তবে দু'একজন তাঁর বন্ধু, যেমন আমার বাবা আর কেউ কেউ তাঁকে অপাঙ্‌ক্তেয় করেন নি। এ ছাড়া তখন সেকালে এখানে সম্পন্ন লালা কায়েত (কায়স্থ), 'বাভন' (যাদের বলে জরাসন্ধের ব্রাহ্মণ) ঘরে নৈতিক চরিত্র-নিষ্ঠাতে একটু এদিক-ওদিক হলে কিছু এসে যেত না। নিন্দেও হত না। অনেকেরই প্রকাশ্যভাবেই 'অবিত্তা' থাকত। অবিত্তাদের সন্তানাদিও থাকত। কমবয়সী রূপবতী দাসীদেরও পরিবারে একটা স্থান থাকত। আমাদের সেকালের বাংলাদেশের জমিদার ও ধনী মহিলাদের মতো এখানকার গৃহিণীরাও এ-সব গলাধঃকরণ করে নিতেন, সন্দেশের মতো না হোক কুইনাইনের মতো করেই।

সুতরাং 'ননী দত্ত ও ামপতিয়া সংবাদটা'তেও মনে হয় সেকালের বাঙালী-সমাজ তেমন মাথা ঘামায়নি। বিদেশ-বিভূঁইতে একলা মানুষ অমন হয়েই থাকে এই ভেবে।

যাই হোক, ননী দত্ত যে কী ভেবেছিলেন সেটা বাবাও ঠিক জানতেন না। তবে তিনি যেমন অসহায় অনাথ মেয়েটিকে তাড়িয়ে বা সরিয়ে দিতে পারেন নি, সে-ও তাঁর জীবন-সংশয়ের দিনে তাঁকে ফেলে যেতে পারেনি। যেন উভয়তঃ মনে একটা দাগ কেটেছিল ঘটনা দুটি।

কিন্তু তারপরে যখন ঘরণীর মতো হয়ে বসল, আর তার সন্তান হল—সে যেন বড়ই সঙ্কুচিত হয়ে গিয়েছিল। বাড়িতে সে ঝিয়ের (দাইয়ের) মতোই থাকত। হয়ত তার মনে হ'ত সে ঐ বাঙালী ভদ্রলোকটিকে তার সমাজ থেকে নামিয়ে এনেছে। কোথায় যেন তার একটি ভদ্র মন ছিল, পরে সেটা আরো বোঝা গেল।

ননীবাবু ছেলেটিকে কিন্তু ভালো স্কুলে দিয়ে, পিতৃনাম পরিচয় দিয়ে পড়াতে লাগলেন। দাসীপুত্র বা অবিত্তাপুত্রের মতো রাখলেন না।

ছেলে লেখাপড়া ভালই শিখল। বি. এ. পাসও করল। তারপর কেমন ক'রে চোদ্দ সালের যুদ্ধের সময়ে পিতাপুত্রে ব্যবসা করে একেবারে ফেঁপে উঠল। বি.এ. পাস, টাকাকড়িও হয়েছে, এবং ছেলেরও বিয়ের বয়স হল। পিতা পুত্রকে নিয়ে কলকাতায় গেলেন। মা বা রামপতিয়া এখানেই রয়ে গেল। কী ভেবে ননী দত্ত নিয়ে যাননি কে জানে। আমার বাবা গিয়েছিলেন বরযাত্রী হিসেবে।

এই বিয়ের পরই ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে উঠল। প্রায় অর্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যার মধ্যে মেয়ে এলো কলকাতায় বেশ সম্পন্ন এক স্বজাতির ঘর থেকে রূপ নিয়ে, অর্ধেক রাজত্ব না হোক, বেশ-কিছু যৌতুক-গহনা-আসবাব নিয়ে।

স্ত্রী-আচার-মতে বরণ-আচার-অনুষ্ঠান আদির আয়োজন ননী দত্ত বাড়ীতে এখানকার কিছু রাখেননি। রামপতিয়াও কিছু করেনি। কিন্তু সে গ্রাম্য সরল আনন্দে বিহারের মেয়েদের মতোই কপাল অবধি সিঁদুর প'রে, টিকুলী প'রে হলদে রঙের একখানি ভালো শাড়ী প'রে দুটি ভরা ঘট দু'পাশে রেখে নিজের মনের মতো মাঙ্গলিকের কিছু আয়োজন করে রেখেছিল। ঝি বা দাই শ্রেণীর কয়েকটি মেয়েও জড়ো হয়েছিল মঙ্গলগান গাইবার জন্ত।

তারপর কয়েকখানা ঘোড়ার গাড়ী বোঝাই করে যখন ছেলে-বউ নিয়ে ননী দত্ত বাড়ীতে উঠলেন—বাবা দাঁড়িয়ে দত্তর পাশে। গ্রামকন্যা রামপতিয়া হাসিমুখে সামনে এসে রূপে-সাজে ঝলমল-করা বাঙালী কনে-বৌ দেখে এত অবাক হয়ে গেল যে, এগিয়ে আর এলো না। আস্তে আস্তে পিছিয়ে রান্নাঘরের দরজার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল।

শশী বৌ-সুদ্ধ এগিয়ে গেল মার কাছে। মাকে প্রণাম করবে বলে বোধহয়। করলও হয়ত। কিন্তু বৌ একেবারে হতবুদ্ধির মতো চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার সঙ্গের ঝি (সেকালে ঝি আসত বিয়ের কনের সঙ্গে) গালে হাত দিয়ে বললে, 'ও কে, জামাইবাবু? পেন্নাম করছ যে?'

অস্পষ্ট স্বরে, মাথা না ঘুইয়েই কনে-বৌও বলল, 'ও কে?'

বাড়ীতে আশপাশের সমবেত সামান্য লোক-ক'টির সঙ্গে শশীর বাবা, আমার বাবাও যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। যেন শশীর বাবা, শশী—তাঁরাও বুঝতে পারেন নি বা ভাবেন নি এরকমটা হতে পারে রামপতিয়াকে নিয়ে—তার বেশভূষা নিয়ে।

ইতিমধ্যে রামপতিয়া কিন্তু চট করে কী ভেবে নিয়ে যেন সবদিক সামলে ভাঙা বাংলায় বললে, 'আমি শশীর দাই, ওকে মানুষ করেছি।'

বাবা আর ননী দত্ত বাইরে বেরিয়ে এলেন। বাবা বললেন, ননী দত্তর মুখটা যেন লজ্জায় কিরকম হয়ে গিয়েছিল। আর শশী? তার বৌ, তার ঝি, তারা কি ভাবল কি করল পরে সে আর আমরা জানি না। বাবাও বাড়ী ফিরে এলেন।

তারপর আরও কিছুদিন গেল। শশী আর মাকে 'মা' বলত কিনা বা রামপতিয়া কিভাবে থাকত কেউ জানি না। শশীদের কারবারের তখন পুরো মরশুম। অবস্থা বেশ সচ্ছল।

নতুন-বউ মনে-মনে কী ভেবেছিল তাও কেউ জানে না। কিন্তু তার অবজ্ঞাময় উদ্ধত উগ্র কর্ত্রীত্ব ও আচরণ রামপতিয়া থেকে ননী দত্ত, শশী—সবাইকেই যেন নিজেদের বাড়ীতেই তটস্থ কোণঠাসা করে দিয়েছিল।

শুনেছি রামপতিয়া নিচে রান্নাঘর, কয়লার ঘর ছেড়ে আর ওপরে উঠতোই না সহজে। ননী দত্তও নিচের বৈঠকখানাতেই আশ্রয় নিয়েছিলেন। কদাচ ওপরে উঠতেন।

ভীরু ভালোমানুষ রামপতিয়া বেশীদিন আর বাঁচেনি। সামান্য কী অসুখে —বোধহয় ইনফ্লুয়েঞ্জায় মারা যায়।

অসুখ হ'লে শশীর বাবা একটু দেখাশোনা করতেন। বধূ নেপথ্যে শুনিয়ে শুনিয়ে বলেছিল, 'বুড়োমানুষের আবার ঝিয়ের জন্য অত দেখাশোনা কেন? আমরা কি দেখছিনে?'...আরো অনেক কথা। কথাগুলো খুব ইঙ্গিতময় ও নোংরা।

কিন্তু ননী দত্ত তাতে আর ভয় পাননি।

আর রামপতিয়াও মারা গেল।

তারপর এলো শেষকৃত্য, শ্রাদ্ধশান্তির সমস্যা।

ননী দত্ত বিহ্বলভাবে বসে রইলেন। বাবা গেলেন তাঁর বাড়ী। তখন ওঁদের অবস্থা খুব ভালো। সেইটেই হ'ল মুশকিল। ধনী হয়েছে—লোকজন প্রতিষ্ঠা বেড়েছে। শশীই কি শেষকাজ করবে? বৌমা তো চারজন ব্রাহ্মণ দিয়ে ঘাটের ব্যবস্থা করতে চাইল।

লোকেরা যেন চারদিক থেকে চেয়ে দেখছে ওঁদের বাড়ীকে। এতদিন পরে যেন ভাবছে, কে ঐ রামপতিয়া—শশীর দাই না মা?—না, বাড়ীর ঝি?

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'তা, শশী কি জানতো না রামপতিয়া ওর মা?'

কি জানি, ছোটবেলা থেকে তো মা বলেই জানত। হঠাৎ বিয়ের পর দাই

তবে আর সে মা-ও বলেনি, চমকে গিয়েছিল যেন। কিছু জিজ্ঞাসাও করেনি বাপকে। আসলে ওর বিয়ের পর বাড়ীতে সহজভাবে আর কেউ ছিল না। বড়লোকের মেয়ে এনে কেমন একটু সঙ্কোচ হয়েছিল। তা ছাড়া মেয়ের তো জাত কুল উঁচু ছিল। আসলে স্পষ্টকথা শশীও জিজ্ঞাসা করেনি, ননী দত্তও বলেন নি তখনো।

তারপর—বাবা তো সব জানতেন। ননীবাবুকে বললেন, শশী যাক শ্মশানে, যা কর্তব্য মনে হয় করবে। তুমি আর কিছু বোলো না। "গোলে হরি বোল" দেওয়ার মতো শেষকাজ হ'ল। শ্রাদ্ধও হ'ল। ব্রাহ্মণ ভোজনও হ'ল। ওরা তখন বড়লোক। লোকে ধন্ত-ধন্তও করলে দাইয়ের শ্রাদ্ধে সমারোহের জন্ত।

তারপর বেশী কিছু আর নেই। ননীবাবু বুড়ো তো হয়েছিলেনই আরো শীগ্‌গির বুড়ো হতে লাগলেন। কয়েক বছর বাদে মারা গেলেন। সেই সময়ে একসময়ে শশীকে ডেকে বাবার সামনে বলে গেলেন শশীর মার জীবনের সব কাহিনীটা। নিজের দুর্বিপাকে পড়া, দয়া করা—তারপর রামপতিয়ার তাঁর দুর্যোগের দিনে জীবন-সংশয়ের দিনে সেবা ও বাঁচিয়ে তোলা…।

আমি বললাম, 'শশী কী বললে?'

শশী কী বললে আমি কিছু শুনিনি। তবে তার উদ্ধত স্ত্রীকে সেই প্রথম থেকেই ভয় করত। আর তার ছেলেমেয়েও তো হয়েছিল। শশী দত্ত বাপের কাছ থেকে সব স্পষ্টভাবে জেনে মার জন্ত দুঃখ পেয়েছিল হয়ত। কেননা বাপের মরার পর সে স্ত্রীকে বড় কেয়ার বা সঙ্কোচ আর করত না। বোধহয় বলেছিল সব কথা। এখন লোক কানাঘুষো করে—তাই নিজেই ছেলেমেয়েদের বিয়েতে সে আর কলকাতায় গিয়ে ভালো কুল ঘর দেখে পাত্র-পাত্রী খোঁজ করে নি। স্বামী-স্ত্রী কাশীতে গিয়ে কিছুদিন থেকে নিজেদের মতো খুঁতওয়ালা ঘর বংশ দেখে ছেলে আর মেয়ের পাত্র-পাত্রী ঠিক করেছে।

'তাহলে সে এখন জাতে উঠেছে—না অপাঙ্‌ক্তেয়?'

'ঠিক এখানকার সমাজের জাতে ওঠেনি হয়ত। কিন্তু অগাধ টাকা, ছেলে-মেয়েরা সব শিক্ষিত বিদ্বান—বেশিদিন কুলদোষ থাকবে না।'

আমি বললাম, 'কিন্তু মেয়েটা অত আশ্চর্য ভদ্রমেয়ের মতো বুদ্ধি কেমন করে পেল ভাবছি।'

রচনাকাল—১৩৬৬

অমৃতভাষিণী

চৌঠা মাঘ বিয়ের দিন ঠিক করেছে তারা। পৌষ মাসেই সব যোগাড়-যন্ত্র করতে হচ্ছে। বাড়িটা রং করা হয়েছে। সাজানো হচ্ছে। শতক্রু নিজে এসে দেখে যাচ্ছে। ঘরের দেওয়ালের রং-এ পর্দার রং মেলানো হচ্ছে। আধুনিক হালকা আসবাব কেনা হচ্ছে খুঁজে খুঁজে। অত্যাধুনিক হওয়া চাই বিমলের মতে। শতক্রু হাসে। সে বলে, 'সোজাসুজি পরিচ্ছন্ন কম কম জিনিস দিয়ে ঘরবাড়ি সাজাও! মিথ্যে কেবলি নতুন খুঁজে বেড়িও না! নতুনের শেষ আছে?' আবার হাসে, বলে, 'অত নতুন লোভ থাকা ভাল নয়।' এবারে দুজনেই হাসে।

বিয়ের আনুষ্ঠানিক যোগাড় একটা করতে হবে। তার জন্য বিমলের বিধবা বোন সুনীতিও এসে গেছে, তার তিনটে রোগা হ্যাংলা ছেলেমেয়ে নিয়ে। থাকবে না অবিশ্যি। যদিও তার ধারণা সে থেকে যাবে নতুন বৌয়ের সঙ্গিনী হিসেবে।

বুদ্ধি দেখ! এখনকার দিনে আবার নতুন বৌদের আগলাবার কি সঙ্গী লাগে! বিমল হেসেছিল তার কথায়। অবিশ্যি বলেনি কিছু। তার দুঃখ হবে বলে। বড় গরীব শ্বশুরবাড়ি তার, তাইতেই বোধহয় ছেলেগুলি অমন। যেন তাড়া খাওয়া হ্যাংলা জন্তু। (জীবজন্তু কথাটাই সে মনকে বলে। যে কথাটা মনে আসে সেটা আর স্পষ্ট করে ভাবে না)। তাদের দেখলে দয়া হয় কিন্তু গা যেন শির শির করে। কেমন নোংরা-নোংরা মনে হয়।

বিমলের দাড়ি কামানো আর ঐসব ভাবনার মধ্যে শতক্রুর চাকর একখানা চিঠি দিয়ে গেল।

শতক্রুর সঙ্গে কদিন দেখা হয় নি। সেই যেদিন সুনীতি এসেছিল সেই-দিনের পর সে আর যেতে সময় পায় নি। আর শতক্রুও আসে নি। বিয়ে এগিয়ে এলো, ঝঞ্ঝাট ঝামেলা ওর। আর বিয়ে এগিয়ে এলো বলেই বোধহয় তারও আসতে সঙ্কোচ হচ্ছে।

দাড়ি কামানো শেষ করে বেশ প্রসন্ন পরিচ্ছন্ন মুখে সে চিঠি খুলল। মস্ত বড় চিঠি। কি এত লিখেছে! বিমলের আবার অত চিঠিপত্র লেখাপড়া এখন আর আসে না। সোজাসুজি বেড়াতে চল, গল্প কর, সিনেমা চল, বন্ধু-বান্ধব নিয়ে

জুড়িয়ে আড্ডা দাও। পড়াশোনা, চিঠি লেখা ওসব কাব্য তার এখন আর পোষায় না। ওসব যারা বসে থাকে তারা পারে।

তাদের এই যুদ্ধের দিনের কালো, ফিকে কালো, ঘোর কালোবাজারে নানা জিনিসের কারবার, কাব্য করার সময় কোথায়? লেখাপড়া পাশ-টাস সেও করেছিল। কলেজ জীবনের দু-একটা কবিতাও হয়তো আছে কলেজ ম্যাগাজিনে। তারপর? তার পরে দুর্দিন? ভাগ্যিস কালোবাজারের সন্ধান পেয়েছিল। যাক্‌গে। আসলে বিমলের মতে টাকাই হচ্ছে একমাত্র নির্ভর করবার জিনিস পৃথিবীর মাটির মত। আকাশে চাঁদ আছে দেখে মুগ্ধ হও, মেঘ দেখে মোহিত হও, সূর্যাস্ত সূর্যোদয় দেখে কত কাব্য কর; কিন্তু সে যে দেখো সেতো আর আকাশে দাঁড়িয়ে নয়, মাটিতে দাঁড়িয়ে দেখতে হয়। তেমনি মাটির মত টাকাই হচ্ছে সবারি আগে একমাত্র নির্ভর করবার জিনিস। অবশ্য বিমল এও বলে মাটির মত পায়ের তলাতেই রেখে।

কিন্তু চিঠিতো শতরু কোনোদিন লেখেনি। দরকার হয়নি লেখার। কেননা কেউ বিদেশের নয়। অভিভাবকের ভয়ে ভীত নয়। কারুরই অভিভাবক গুরুজন নেই। বসে বসে অবসর যাপন করার সময়ও তাদের নেই। চিঠি লাগে না তাই। মাস ছয়েক পরিচয় হয়েছে। শতরু কাজ করে সাপ্লাইয়ে। সেইখানেই তাদের পরিচয়।

বংশ-পরিচয় সামান্য দুজনেরই। বাপ মা গুরুজন কারুরই নেই। ভাইবোন আছে। কিন্তু পিতৃমাতৃহীন স্বাধীন পরিবারে ভাইবোনের বন্ধন হয় খুব সূক্ষ্ম, নয় খুব স্থূল। অর্থাৎ সূক্ষ্ম মানে নেই, স্থূল মানে পরস্পর স্বজনের অনুগ্রহজীবী।

এক জাত কিনা? তাও ভাববার দরকার নেই। টাকা আছে বিমলের, জাতের বা কারুর ধার ধারে না সে। এক কথায়—ভালবাসার এবং বিয়ের পথে ওদের কোনো বাধাই নেই।

বিমল চিঠি পড়তে লাগল।

বিমল, আমি কিছুদিন আগে একটা চাকরির দরখাস্ত করেছিলাম। চাকরিটা পেয়েছি। ছাড়লাম না, নিলাম।

মনে হল, বিয়েটা এখন থাক। ভাল চাকরি তো অপেক্ষা করতে পারে না। ভালবাসা হয়তো অপেক্ষা করতে পারে।

কিন্তু ভালবাসার কথা রেখে, কেন যে চাকরি নিলাম, সে কথা আমি কদিন ঘুরে ভাবছি তাই বলছি।

যেদিন তোমার বোন সুনীতি এলো, সেইদিন থেকেই ভাবছি। আমি সেদিন সেইখানে তোমাদের কাছেই দাঁড়িয়েছিলাম। তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে সে তোমার ঘরের সুমুখে এসে দাঁড়াল। তার ছেলেদের আমি [illegible] দেখিনি শুধু ছোট্ট মেয়েটির দিকে একটু চেয়েছিলাম। সাবান কাচা আধ ময়লা ফ্রক পরা, পায়ে জুতো নেই, মুখ হাত-পা ট্রেনের কালিধুলো মাখা। তোমার বাড়িতে এসে তারা যেন অবাক হয়ে গিয়েছিল—এত পরিচ্ছন্ন এত সুন্দর (তাদের কাছে) বাড়ি! এত লোকজন জিনিস-পত্র আসবাব মানুষের থাকে? আছে? হয়ত ভাবতে পারলে ভাবত কি কাজে লাগে এত আয়োজন?

তোমার বোন আর তার ছেলেমেয়ে তোমার দিকে এগিয়ে গেল। বোন তো তোমার চেয়ে ছোট, বোধহয় প্রণাম করতে গেল। তুমি পিছিয়ে গেলে। কেন, অপরিষ্কার বলে? যাই হোক সেও আর এগিয়ে গেল না, প্রণামও করতে পারলে না। ছেলেমেয়েরাও সেইখানেই থমকে দাঁড়িয়ে রইল। মেয়েটি একবার হাসিমুখে 'মামা' বলে ডেকেছিল, আমি শুনতে পেয়েছিলাম। আমি তার রোগা কালো হাতখানা [illegible] করেছিলাম, 'কি নাম তোমার?' সে নাম বলার আগেই তুমি [illegible] বলে, 'যা' তোরা কাপড়-চোপড় বদলে আয় বড় ময়লা হয়েছে সব।' তারপর চাকরকে বল্লে, 'ওদের ও ঘরে নিয়ে যেতে।'

সুনীতি অপ্রস্তুত মুখে বল্লে, 'আমার জিনিষ-পত্রগুলো নামিয়েছে কি? দাদা, তোমার জন্যে পাটালী গুড় এনেছি। আর আমসত্ত্ব। তুমি ভালবাসতে।' তুমি বল্লে, 'থাম্ থাম্ কলকাতায় যেন পাটালী গুড় আমসত্ত্ব পাওয়া যায় না।'

এইবার তার জিনিষ তোমার চোখে পড়ল। ময়লা কাপড়ের বোঁচ্কা পুঁটলী, অপরিষ্কার সতরঞ্চিতে দড়িবাঁধা বিছানা, রং ওঠা টিনের বাক্স, সরা ঢাকা হাঁড়ি,—তোমার মুখ বিরক্ত হয়ে উঠ্‌ল। টিফিন কেরিয়ার, হোলড্ অল্, মিলিটারি থলে, সুটকেস দেখা তোমার এখনকার চোখ।

তুমি বিরক্ত ভাবে বল্লে, 'এত জিনিস এনেছিস এই ক'দিনের জন্যে?'

সে যেন কেমন হয়ে গেল (তুমি তার মুখ দেখনি জিনিষের দিকে চেয়েছিলে)। থমকে গিয়ে সে বল্লে, 'আমাকে যে দেওরর বল্লেন এখন তো ওখানেই থাকবে! আর ফিরে আসছ না সব নিয়ে যাও।'

তুমি বল্লে, 'আর তুমি তাই শুনলে।'

সে আরো অপ্রস্তুত হয়ে গেল, 'মেজ দেওর তার শাশুড়ীকে এনেছে মায়ের অসুখ। বাড়িতে ঘর নেই আর আমার ঘরেই তিনি থাকবেন। ছেলেদের পড়াও হচ্ছে না।'

চাকর এসে দাঁড়িয়েছিল তারাও শুনতে পেল সব। তুমি বল্লে, 'ওদিকের কোণের ঘরে ওদের নিয়ে যাও।'

তারা চলে গেল।

তোমার তখনো তাদের খেতে বলা কি বসতে বলাও হয়নি। আমার একবার ছেলেমেয়েদের শুকনো মুখ দেখে বলতে ইচ্ছে হ'ল, কিন্তু পারলাম না বলতে। যদিও ঐখানেই ঘরে আমাদের চায়ের টেবিলে সবই ছিল—মাখন রুটি বিস্কুট মিষ্টি সন্দেশ জ্যামজেলি। এরপর আমরা দু'জনেই বাজার করতে না বেড়াতে বেরিয়ে গেলাম। আমার মনে হচ্ছিল, ওরা কি খেল? সুনীতি কি করছে। নিশ্চয়ই চাকররা সব ব্যবস্থা করেছিল।

সুনীতির ছেলেমেয়েদের দেখে এই প্রথম আমার নিজের ছেলেবেলার কথা মনে পড়ল। অবশ্য আমি কিছুই জানি না।

কিন্তু আমার মনে হল আমার মাও কি ঠিক ঐরকম ভাবেই ছেলেমেয়েদের নিয়ে তাঁর আত্মীয়দের বাড়ীতে এসেছিলেন। আমিও ঐরকম ভাবেই তাদের কাছে গিয়েছিলাম কি? সুনীতি অত অপ্রস্তুত হয়ে যাচ্ছিল কেন? ওই রকমই কি সব মেয়ে হয়?

তোমার তার মুখ দেখে মায়া হয়নি? দয়া হয়নি?

আমারও মায়া-দয়া হয়নি, সে সম্পর্কও নয়। কিন্তু কি একটা কষ্ট হচ্ছিল। কেমন লজ্জা হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, তুমি একটু ভাল করে মিষ্টি করে কথা বল্লে না কেন ওদের সঙ্গে? কর্তব্য মনে করেও তো বলতে পারতে, ভদ্রতা করেও পারতে। মিষ্টি করে কথা বল্‌তে, যত্ন করতে তো তোমায় দেখেছি। এইতো সেদিন আমার বন্ধুদের বেশ যত্ন আদর করলে। তাহলে ওকি গরীব বলে করলে না? না, তোমরা নিজের প্রিয়জন কিম্বা দরকারী লোক ছাড়া কারুকে আদর যত্ন করতে পার না। তোমার কাছে বলতে সঙ্কোচ হচ্ছে। কিন্তু, সে লজ্জা-সঙ্কোচ তোমার কাছেই আজ করব না। আজ সত্যি কথাই বলব সম্পর্ক না থাকলেও আমার আপনার লোকদেরও তো দেখেছি ঐরকমই। তাঁদের পরমাত্মীয়াদেরও সুনীতির মতই ঐরকম দীন মূর্তি দেখেছি। আরো যেন কত

জায়গায় দেখেছি, তাদের নাম পরিচয় মনে নেই, কিন্তু সে মুখ সকলেরই একই রকম।

তাহলে মানুষের কাছেও জীব-জগতের মত আদিম আর জৈব ভালবাসাই চরম আর পরম? আর সব কথা, কথা মাত্র?

আমার কেউ নয় সুনীতি। কিন্তু আমার মনে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠ্‌ল ওকে দেখে আমাদের নিজেদের কথা। আমরা কত দীন, কত অসহায়! আর অন্ত-দিকে তোমাদের কাজে লাগার সময়ে এই আমাদের জন্যই কত সুখের আয়োজন। যে সুখের লোভে, যা হারাবার ভয়ে আমরা কখনো আপনার জাতের কথা ভাবিনি। নিজেদের কথাও স্পষ্ট করে ভাবিনি।

আমার কেমন ভয় হ'ল। ভবিষ্যৎ দুর্ভাগ্যের ভয় নয়। জানি, তোমার অনেক টাকা, তোমার অনেক ব্যবস্থা করবার শক্তি আছে, তোমার স্ত্রী-পরিবারের জন্য। দারিদ্র্যের দুঃখ আমার অন্ততঃ সুনীতির মত হবে না।

আমার ভয় হ'ল, তোমাকে এত ছোট দেখ্‌ব কি করে? সেদিন হয়ত তোমার ভুল হয়েছিল তাই ভাবার চেষ্টা করব। কিন্তু কাছে থেকে তোমার ছোট হওয়া কি করে সইব?

এইজন্য কি ছোটতে বিয়ের ব্যবস্থা ছিল। বুদ্ধি পরিণত হ'ত না, সাহস থাক্‌ত না। স্বার্থও হ'ত এক তোমাদের তৈরী আদর্শ ও সত্য-মিথ্যা নিয়ে আমরা দেবী হতাম, রাণী হতাম, পথের ধারেও দাঁড়াতাম! 'হতাম' কেন হই। আর চিরকালের স্বাচ্ছন্দ্যের মোহে সুখের দায়ে মূঢ় ভয়ে অসত্যের বোঝা বয়ে আদর্শ মেয়ে হয়ে থাকি। মনে কিছু হলেও যার ভরসা নেই। কি মিথ্যে-ভরা ক্ষুদ্রতাভরা জীবন আমাদের। চিরদিন মিথ্যে শুনি, বলি, আর তা আদর্শ বলে বিশ্বাসও করি।

সেদিন যখন আমি বলতে পারলাম না, কোনো কথাই তখন বুঝলাম তোমার ওপর কোনো কথাই কখনোই হয়ত বলতে পারব না। বিরাট অজগরের সামনে মুগ্ধ জন্তুর মত তোমার ঐশ্বর্যের সুমুখে আমিও মূঢ় হয়ে যাব।

অনেক ভাবলাম। সুখ-স্বস্তির ঘরের লোভ আমারো কম নেই। 'ধরণীর এক কোণে স্বর্গ খেলনা' গড়বার মোহও ছিল। কিন্তু তোমাকে কিছু বলবার, তোমার কিছুতে প্রতিবাদ করবার শক্তি সাহস যদি আমার না থাকে সে 'স্বর্গ' দুজনের হবে না।

আমিতো ছোট হয়ে যাবই, তুমিও আমার কাছে ছোট হয়ে যাবে।

সুখ-স্বস্তির মোহে অন্নের দায়ে বেঁচে থাকার দায়ে যারা চিরদিন নিজেদের কথাই ভাবল, মিথ্যাকে সত্য বলে মনে করল, তাদের অন্তত: একজন একজনের কাছে আজ সত্যি করে বলি—তাদের এই মিথ্যার ইতিহাস, এই ভয়ের কাহিনী, —এই চিরকালের অসত্যভাষিণী আমাদের কথা। ইতি—শতদ্রু।

রচনাকাল—১৩৫৫